পূর্ব পুরুষ

[দ্বিতীয় পর্ব]

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

উত্তর পুরুষ—

অর্থাৎ

শ্রীমান সুশান্ত ও

শ্রীমতী নূপুর গুপ্তকে

এই লেখকের :

আকাশের আয়না
রাণী কাহিনী
তব দক্ষিণ পাণি
আসা-যাওয়ার পথের ধারে
কলকাতার কাছেই
পৌষ-ফাগুনের পালা
বহ্নিবন্যা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মনে ছিল আশা
সোহাগপুরা
সমুদ্রের চূড়া
কোলাহল
জ্যোতিষী
আব্‌ছায়া
প্রেরণা
ছুটি
প্রভাত-সূর্য
যোগাযোগ
কুবেরের অভিশাপ
পুনর্ণবা
নববধূ
নীলকণ্ঠী
রাত্রির সীমানা
রক্ত কমল
নবজন্ম
গল্প পঞ্চাশৎ
সুপ্তিসাগর
স্বপ্ন সন্ধ্যা
কঠিন মায়া
একদা কী করিয়া
উপকণ্ঠে
দহন ও দীপ্তি
আমি কান পেতে রই
ভাড়াটে বাড়ি
শুভ-বিবাহ কথা
এক প্রহরের খেলা
জীবনস্বপ্ন
জন্মেছি এই দেশে
নারী ও নিয়তি
রাত্রির তপস্যা
বিধিলিপি
তবু মনে রেখো
রমণীর মন
তারা ভৈরবী
রাতের বাসা
স্মরণীয় দিন
বিজয়িনী
স্বপ্ন আমার জোনাকি
জায়া নয় দয়িতা
বাহির বিশ্ব
শ্রেষ্ঠ গল্প
দেহ দেউল
পাও নাই পরিচয়
বক্ষে বাজে বাঁশী

পূর্ব পুরুষ

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

এতদিনের ভবঘুরে বৃত্তির পর বাগানবাড়ির শান্ত নির্জনতা বড় ভাল লাগে হেমন্তর। একটু যেন বোঝাপড়া ক'রে নিতে পারে নিজের সঙ্গে—চিন্তাগুলোকে থিতিয়ে গুছিয়ে নিতে পারে। এতকাল একটু শান্তির জন্যে ছুটে বেড়িয়েছে—একটা তীর্থ থেকে আর একটা তীর্থে—তাতে ফল কি হয়েছে, ছেলের শোক কতটা ভুলতে পেরেছে তা বুঝে মিলিয়ে দেখার অবকাশ পায় নি। সেই অবকাশটাই পেল এখানে এসে।

শান্ত হয়েছে, অনেকটা শান্তি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। চুপ ক'রে নিজেকে নিয়ে থাকতে পারাটাই অনেকখানি শান্তি। কোন কাজ নেই, কাজের তাড়াও নেই। এককালে বাইরের কাজ ছিল, তারপর ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে এক বছর প্রায়, তারও পরে এই ছুটোছুটি, এক দেশ থেকে আর এক দেশে।

বহুদিন পরে বোধহয় জীবনে এই প্রথম ছুটি পেল সে, কর্মহীন দায়িত্বহীন পূর্ণ অবকাশ। শোক শূন্যতা তো আছেই, জীবনের একমাত্র অবলম্বন উদ্দেশ্য গেছে হারিয়ে—সে শূন্যতাবোধ ও হাহাকার মনের একটা দিক পাথর ক'রে রেখেছে—স্মৃতিও আছে তার সঙ্গে, সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কত ঘটনা কত মানুষের স্মৃতি ভীড় ক'রে আসে—বিশেষ এই কর্মহীন অবসরে যেন বেশী ক'রে ঘিরে ধরে তারা—কিন্তু এ তো চিরদিনের সঙ্গী হয়ে রইল, এরা তো থাকবেই। এসব সত্ত্বেও এই নির্জনতা, এই নৈষ্কর্ম্য ভাল লাগে। কিছু না করার, না করার কথা ভাববার অধিকার—এও তো একরকমের মুক্তি।

পূর্ণবাবুও তা বোঝেন। তিনি তাই বিকেলের দিকে আসেন, ঘণ্টাখানেক বসে গল্প করেন, কোন দিন বা আরও একটু বেশী থাকেন —তারপর চলে যান। 'কী করবে এখন, কাজকর্ম আরম্ভ করবে কিনা' এ প্রশ্ন তোলেন না। এমন কি, সেই যে বাড়ি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল—কেনা বা ভাড়ায়—সে কথাটাও মনে করিয়ে দেন না।

এর মধ্যেই একদিন সংবাদ আসে—গোপালীর শেষ সময় উপস্থিত।

ধন্নুবাবু খবর পাঠান, ওকে দেখতে চাইছে সে। হেমন্তর মনের অবস্থা তিনি বুঝতে পারছেন—তবু যদিই সে ক'টা দিন গিয়ে একটু থাকতে পারে তো খুব ভাল হয়, তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

অনিচ্ছাতেও যেতে হয়।

আবার, আর একজন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু দেখার ইচ্ছা নেই। সে যা দুর্ভাগিনী তাকে যে ভালবাসে সে বাঁচবে না, এ তো জানা কথাই—কিন্তু সে কথা ধন্নুবাবুকে বলা যায় না। ওর মনের কথা কেউ বুঝবে না—ভুল বুঝবে, অকৃতজ্ঞ ভাববে।

তাই যেতেও হয়, চুপ ক'রে বসে থাকতেও পারে না। সেবার ভারও তুলে নিতে হয়। শিক্ষিত অভ্যস্ত হাত তার। সেবার কোন ত্রুটিও ঘটে না। তবে বার বার ঐ একটা কথাই মনে হয়, না এলেই ভাল হত। অনেক দিন দেখে নি গোপালীকে, বৎসরাধিক কাল। সেই চেহারার এই হাল হয়েছে—সেই রূপের এই পরিণতি—না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এ চেহারা দেখতে না এলেই ভাল হত—নিজের মনে কেবলই ঐ কথাটা বলে হেমন্ত। এ কাকে দেখতে এল সে! না দেহে না মনে কোথাও ওর পরিচিত সেই গোপালীর অস্তিত্ব নেই; সেই হাসিখুশী পরোপকারী কোমলপ্রাণা অথচ আত্মবিশ্বাসী মেয়েটির। দীর্ঘকাল ভোগার ফলে মাথাতেও কেমন গোলমাল হয়ে গেছে—কখনও চিনতে পারে

কখনও পারে না। কী যেন বলতে চায়, কী যেন বলার ছিল—মনে পড়ে না। সবচেয়ে, বারে বারেই তারকের কথা জিজ্ঞাসা করে। কখনও মনে হয় তার অসুখের কথাটাও মনে নেই, কখনও আবার সে কথা মনে পড়ে, প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁরে সে কেমন আছে, খোকা? সেরে উঠেছে বেশ? কোথায় আছে, চাকরি করছে?…বে দিবি না?…আসতে বলিস একবার। কতদিন দেখি নি!'

এই সময়গুলোয়ই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। চোখের জল রোধ করা যায় না। ধন্নুবাবু হয়ত তারকের মৃত্যুর খবর জানান নি তাকে। জানালেও ভুলে গেছে গোপালী। এখন আর নতুন ক'রে জানাতে গিয়ে মৃত্যু-পথযাত্রিণীকে আঘাত দিয়ে লাভ কি! গোপালী তারককে আপন ছেলে না হোক, আপন বোন-পোর মতোই ভালবাসত—তা হেমন্ত জানে।

আরও কষ্ট হয় যখন গোপালীর ছেলে হেমন্তর চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের ছেলে, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় সুকান্তি ছেলে, শালের কোঁড়ের মতো সজীব সতেজ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ওকে দেখে আর তারকের কথা মনে হয়। আপনা থেকেই যেন বুক ভেঙে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। এ নিঃশ্বাস পড়া উচিত নয়, অকল্যাণ হবে হয়ত ছেলেটার, নজর লাগছে—গোপালীর ছেলের যদি অমঙ্গল হয় এ নিঃশ্বাসে, তার অপরাধের শেষ থাকবে না—তা বুঝেও সামলাতে পারে না নিজেকে।

সৌভাগ্যক্রমে গোপালী অল্পেই অব্যাহতি দিয়ে যায় ওকে। মাত্র সাত-আটদিন থাকতে হয়েছিল হেমন্তকে, তার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। হঠাৎই শেষ হয়ে গেল একদিন। বেশীদিন বাঁচবে না আর, সবাই জানত, তবু এমন আকস্মিক চলে যাবে কেউ ভাবে নি।

হেমন্ত কাঁদল না। কান্না আর তার ছিল না। ইহজগতের যে ক'টি বন্ধন ছিল, যে ক'টি অবলম্বন, ভগবান একে একে সব

ঘুচিয়ে টেনে নিলেন। সবক'টি প্রিয় ব্যক্তি চলে গেল—সে যাদের ভালবাসত, তাকে যারা ভালবাসত—সব। এই বোধহয় তার ললাটলিপি। স্নেহ প্রেম ভালবাসার কোন বন্ধন ভগবান তার রাখবেন না—কে জানে তাঁর কী উদ্দেশ্য সাধিত হবে এতে।... আবারও শাশুড়ীর সেই কথাটা মনে পড়ে। সত্যিই কি সে পিশাচী, তার নিঃশ্বাসে সবাই শুকিয়ে মরে যায়?

এবারের এই তীর্থযাত্রার মধ্যে বৃন্দাবনে একটা কথা শুনেছিল সে। গোপীনাথের মন্দিরে কথকতা হচ্ছিল, একদিন বিকেলে শুনতে গিয়েছিল। কথক প্রভুপাদ শ্যামকিশোর গোস্বামী না কে—মনে নেই ঠিক—কথাপ্রসঙ্গে বিষকন্যার কথা বলেছিলেন। সেও কি সেই বিষকন্যা?

কে জানে, তাই যদি হয়—তার কি দোষ! ভগবান তাকে যেমন তৈরী করেছেন, সে তেমনি হয়েছে।...

চারিদিকে যখন সকলে হাহাকার ক'রে কাঁদছে—প্রৌঢ় ছঁদে য়্যাটর্নী ধনুবাবু পর্যন্ত আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেন—তখন তার মধ্যে শুষ্ক চোখে পাথরের মতো বসে এই কথাগুলোই ভাবছিল সে।

বোধহয় তার আসাটাই অন্যায় হল, চক্ষুলজ্জায় পড়ে না এলেই ভাল হত।

কে জানে, সে না এলে হয়ত আরও দুটো দিন বাঁচত গোপালী—অবুঝের মতো এই কথাটাই মনে হয় বার বার।

কোন অর্থই নেই এ-কথার, তাহলে যতদিন একত্রে ছিল, তখনই ওর নিঃশ্বাসে গোপালী মরতে পারত—এসব জেনেও ব্যথাটা মন থেকে একেবারে দূর করতে পারে না।...

ওর এই শুষ্ক চোখ ও কঠিন মুখভাবের কারণ বুঝতে পারে না অনেকেই। 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর' এই কথাটাই ভাবে কেউ কেউ।

গোপালীর মৃত্যুতে একটা সত্য পরিষ্কার হয়ে যায় ওর কাছে।

কী করবে তা স্থির করতে না পারলেও, কী করবে না সেটা ঠিক ক'রে ফেলে।

নিজের বৃত্তিতে আর ফিরে যাবে না সে। ও-কাজ আর করতে পারবে না।

রোগীর বিছানার পাশে বসলেই ওর তারকের কথা মনে পড়বে, গোপালীর কথা। তাছাড়া এ-কাজ সে নিয়েছিল তারকের জন্যই। সে-ই যখন রইল না, তখন কার জন্যে এই রক্ত-পুঁজ ঘাঁটতে যাবে—যা ওদের দেশে অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়েরা চিরকাল ক'রে এসেছে—ছেলে প্রসব করানোর কুৎসিত দৃশ্য সহ্য করবে বার বার।

এটা করবে না স্থির ক'রে ফেললেও, কী করবে সেটা ঠিক করতে পারে না।

পূর্ণবাবু অবশ্য বলেন, 'কিছু আর না করলেও চলবে তোমার, একটা লোক—চলেই যাবে। বড় বাড়িটাও যদি ভাড়া দাও, দু'খানা ছোট বাড়ির একখানাতে থাকো—তাহলে একশো টাকা না হোক সত্তর-আশি তো পাবেই। টেক্স-খাজনা বাদ দিয়েও যা থাকবে, একটা মানুষের হেসেখেলে চলে যাবে। তখন তো আর এতগুলো লোক রাখারও দরকার হবে না—একটা ঝি থাকলেই চলবে।'

তারপর বলেন, 'আর যদি এখানে না থাকতে চাও, বাড়ি ক'খানাই বেচে দিয়ে টাকাটা কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করো—কিছু, না হয় এক-আধ হাজার পোস্টাপিসে রেখে দিলে, হঠাৎ দরকারের জন্যে—যা সুদ পাবে তাতেই কোন তীর্থে গিয়ে, কাশী কি বৃন্দাবনে বাস করতে পারবে অনায়াসে।

'রক্ষে করো' প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে হেমন্ত, 'অমন দুর্গতি যেন আমার কখনও না হয়। যা দেখে এলুম! কাশীতে আট-দশদিন ছিলুম তো, বৃন্দাবনে আরও বেশীদিন—দিন-পনেরো বোধহয়—তাতেই ঐসব বিধবাদের দেখে নিয়েছি। ঐ যারা মাসিক তিন টাকা চার টাকা আয়ে দিন কাটায়, ওখানে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

…মন পড়ে আছে এইখানে, "পরের মেয়ে বৌ এসে সেখানে রাজত্ব করছে, আমি এখানে একা পড়ে আছি"—এই হিংসেতে জ্বলে-পুড়ে মরছে দিনরাত। যার ছেলেমেয়ে নেই, ভাগ্নে কি ভাশুরপো সাহায্য করে, তারাও জ্বলছে, মন পড়ে আছে সব্বক্ষণ এইখানে, সংসারেতে—কেবল ভাবছে সবাই মিলে তাদের ওপর অবিচার করছে, কিম্বা তারা যেমন গুছিয়ে সংসার করত, এরা কি তা পারছে—এখনকার ঝি-বৌরা? এতটি অপ্‌চ করছে—অথচ তাকে দু'টাকা বেশী দিতে বুক ফেটে যায়।…কাশীতে গোপালবাড়ি কি দশাশ্বমেধে কথা শুনতে যায়, বৃন্দাবনে গোপীনাথের মন্দিরে রাধারমণের মন্দিরেও গিয়ে দেখেছি—হয়ত ভাগবত পাঠ হচ্ছে—সেখানে বসে বসে গুজগুজ ক'রে—বেটা-বৌ, নয়ত দেশে যে-সব আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের নিন্দে করছে এতটি। দর্শনে বেরোয়—তা ঐ বেলপাতার ডগা ক'রে শিবের মাথায় একটু জল দিল কি না দিল—আধ পয়সার আনাজ কি এক পহলার শাক নিয়ে কচা-কচি, হাঁ ক'রে খাবারের দোকানের রকমারি মিষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিঃশ্বেস ফেলে, কেউ বেড়ালের নাম ক'রে মাছ কেনে, কেউ অতটা না করলেও অকারণেই মাছের বাজারে উঁকি মারে—কোন্ মাছ কী দরে কে কিনল, লোককে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে। ওভাবে বেঁচে থাকতে আমি চাই না।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবারও বলে, 'তাছাড়া এখন থেকে গিয়ে চুপচাপ বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করা—কবে মরব সব জ্বালা জুড়োবে তার দিন গোনা—অথচ মরণের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা—ও আমার ধাতে সইবে না। আরও কতকাল বাঁচতে হবে ঠিক তো নেই, ভগবানের যা রকম-সকম, মনে হয়—আমাকে ভালমতো দগ্ধাবেন বলেই পাঠিয়েছেন—অনেক কালই বাঁচতে হবে হয়তো—এই দীর্ঘকাল চুপচাপ বসে খাওয়া? কোন কাজ হাতে না থাকলে পাগল হয়ে যাব…না, ও হবে না। দেখি, যদি অন্য কোন কাজ খুঁজে না পাই—শেষ পর্যন্ত কোন হাসপাতালেই চাকরি নোব।

এ-কাজ যদি করতেই হয়, টাকা নিয়ে আর করব না—পরের দোরে ছুটোছুটিও না। সময় নেই অসময় নেই ডাকলেই ছুটতে হবে, তার জন্যে তিন-চারটে লোক পুষে ঠাট সাজিয়ে বসে থাকা আর নয়। ...হাসপাতালে কাজ করি সে একরকম। বাঁধা সময় বাঁধা কাজ। এখানে যদি পাই বিনি মাইনেতেই করব, সেও ভাল।'

কিন্তু অতকিছু করতে হয় না, কর্মক্ষেত্র একটা আপনা থেকেই চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। হঠাৎই।

বাড়ি বিক্রী করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে সেই পুরনো দালালকে একটা খবর দিয়েছিল। কী রকম এখন দর-টর যাচ্ছে খানিকটা জানবার জন্যেই আরও—দালাল কেশববাবু চিঠি পাওয়ামাত্র ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন।

'ছোট বাড়িটা বিক্রী করবেন মা-ঠাকরুন? ঐ নেবুতলার বাড়িটা? খুব ভাল দর পাবেন। আপনি সারিয়ে-সুরিয়ে রঙ করিয়ে এখন বেশ পছন্দসই ক'রে দিয়েছেন তো, খদ্দেরকে দেখালেই পছন্দ করবে।'

'কত দর উঠবে আপনি আশা করেন?'

কেশববাবু এই কাজে বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি অত সহজে ভাঙবার লোক নন। হাত কচলাতে কচলাতে সবিনয়ে হেসে প্রশ্ন করলেন, 'আজ্ঞে, আপনি কতটা পেলে খুশী হন?'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মনে মনে হিসেব ক'রে নিল হেমন্ত, বাড়িটা ন' হাজারে কেনা, রেজেস্ট্রী খরচা-টরচা নিয়ে আরও পাঁচশো, মেরামত খরচা, মায় একটা অতিরিক্ত কলঘর ও ছাদে নতুন একটা রান্নাঘর নিয়ে ধরো দেড় হাজারের মতো খরচ হয়েছে, সামান্য দু-একশো বেশিও হতে পারে, মোট এগারো হাজারই ধরা উচিত। ভাড়া পাচ্ছে মাসে আটাশ টাকা ক'রে—ট্যাক্স্, ছোট-খাটো মেরামতি প্রভৃতি দিয়েও অনেক পেয়েছে এই দেড় বছরে।

সে দ্রুত সবটা ভেবে নিয়ে কতকটা মরীয়া হয়েই বলল, 'পনেরো দিতে পারবেন?'

'একটু শক্ত হবে মা-ঠাকরুন।' কেশববাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'খুব বোকা খদ্দের না হলে ও বাড়ির জন্যে অত কেউ দেবে না।… বোকা খদ্দের তো সব সময় মেলে না।…ভাড়া তো ঐ, টাকাটা অন্য কোথাও লগ্নী করলে ঢের বেশী পাবে, কোন ভাল মাড়োয়ারীর গদিতে জমা রাখলে তো কথাই নেই।…আচ্ছা দেখি, কতদূর কি করতে পারি!'

কেশববাবু ফিরে এলেন তিনদিনের মাথাতেই।

বললেন, 'মা, ভাল দাঁও পেয়ে গেছি। ভেতরটা তো দেখাতে পারি নি, সে আপনি গিয়ে না দাঁড়ালে, ধরুন ভাড়াটেরা বাড়ি দেখাবে কেন—বাইরে থেকে দেখিয়েছি, তাতেই চৌদ্দ পর্যন্ত উঠেছে। এতেই ছেড়ে দিন মা-ঠাকরুন, এতও কেউ দেবে না। আরও দু-একটাকে বাজিয়ে দেখেছি। বারোর ওপর উঠতে চায় না কেউ।'

হেমন্ত সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির ক'রে ফেলে, 'আমি রাজী, আপনি বায়না করান।'

তারপর কেশববাবু চলে গেলে পূর্ণবাবুকে বলে, 'তুমি যে সেই বালিগঞ্জে কি বাড়ির কথা বলেছিলে, সে বিক্রী হয়ে গেছে?'

'না, এখনও হয় নি। পড়েই আছে।'

'কী রকম বাড়ি, কত বড়? জমি কতটা?'

'র'সো, মনে করি। অত কি আমার মুখস্থ আছে! কেন বলো দিকি, অত তাড়া—?'

'বলোই না তুমি! তারপর বলছি।'

পূর্ণবাবু ভেবে নিয়ে বলেন, 'দেড় কাঠার ওপর বাড়িটা বলেছিল বোধহয়। দু'খানা ঘর, কল-পাইখানা, চিলে কোঠাটায় কেবল টিনের চাল, সেইখানেই রান্নাঘর, বাইরের দিকে একটু সরু বারান্দা আছে, ভেতরেও আড়াই হাত চওড়া রক। জমি সবসুদ্ধ সাড়ে ছ'কাঠা।'

'কত চাইছে?'

'বারো হাজারের কমে দেবে না। ছোট হোক, নতুন বাড়ি।'

'তুমি কথা বলো ভদ্দরলোকদের সঙ্গে। আমি কিনব।'

'সে কি! তারপর? কী করবে নিয়ে? ভাড়াটে পাবে না ওখানে। যে বাড়ি করেছিল সে ভাড়া দেবে বলেই করেছিল, কিন্তু অত নির্জন জায়গায় কেউ আসতে চায় না। লোকের বাস বলতে তো মনোহরপুকুর, সেখান থেকে তিরিশ ফুট রাস্তা গেছে, এখনও কাঁচা—তা থেকে আবার কুড়ি না পঁচিশ ফুট পথের ওপর এই জমি। পথ ঐ যা ম্যাপে দেখানো, হিসেব ক'রে কাটিয়ে নিতে হবে। তাও—বাড়ি ছাড়া জমি যা আছে, রোড-ফ্রণ্টেজ পঁচিশ ফুটের বেশি হবে না। আশপাশে কপি-ক্ষেত মটর-ক্ষেত, গরমের দিনে এমনি পড়ে থাকে। শুনছি কারা যেন দাঁওয়ে ঐ সমস্ত ক্ষেতগুলো কিনে নেওয়ার তালে আছে—সবটা কিনে নিজেরা রাস্তা বার ক'রে ফালি ফালি বিক্রী করবে—তবে সে ধরো সুদূরপরাহত, যাকে বলে বিশ-বাঁও জল!'

'তা হোক, তুমি ঠিক করো। আমি গিয়ে থাকব।'

'তুমি থাকবে? পাগল নাকি! থাকতে পারবে—একা সেই তেপান্তরের মাঠের মধ্যিখানে?'

'কেন, এই তো রয়েছি! এই বা কি এমন সদরবাজার জায়গা?'

'এখানে থাকা আর সেখানে থাকা! এখানে আমার চাকর-দারোয়ান আছে, মালী আছে, সরকারবাবুরা আছে। সেখানে তোমার ঝিকেই রাখতে পারবে না। এক রাত কাটাতে হলেই খসে পড়বে।'

'তা পড়ুক। একাই থাকব না হয়। আমার অত ভয়-ডর নেই আর। গয়না টাকাকড়ি সেখানে কিছু রাখব না যে, ডাকাত পড়বে, নিজেরও সে বয়েস নেই যে, লুটে নিয়ে যাবে। আমি নিজে ঐ বাড়িতে বাস ক'রে যদি পাশের জমিতে বাড়ি তুলতে পারি, তাহলে ভাড়াটেও আসবে—চাই কি বিক্রীও করতে পারব। এখন কেউ নেই তাই, আমি থাকলে তো আর সে-কথা বলতে পারবে না যে, বিজনপুরী, জনমনিষ্যি নেই কোথাও!'

'কী জানি! আমার তো মনে হয় এটা বড় বেশী ঝুঁকি নিচ্ছ!'

'ঝুঁকি আর কি। না হয় ফেলে চলে যেতে হবে, বাড়ি পড়ে থাকবে। আজ না হয়, পাঁচ-সাত বছর পরে তো খদ্দের পাব। আমারও কিছু এমন অবস্থা নয় যে, ঐ ক'টা টাকার জন্যে ডান হাত বন্ধ থাকবে।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'যে অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে প্রায় এক বছর কাটিয়েছি—সে তুমি ভাবতেও পারবে না। লোকালয় থেকে কত নিচে স্যানাটোরিয়াম, চারিদিকে শ্যাওলা-ধরা বড় বড় গাছ আর কালো কালো পাহাড়। দুপুরবেলায়ই ভাল আলো আসত না। কুয়াশায় ঢেকে থাকত মাসের মধ্যে বিশ দিন। কাছাকাছি কোন জনবসতি নেই, দূরে দূরে গুর্খাদের খুপরি-খুপরি ঘর হয়ত এক-আধখানা, তাও তার বাসিন্দারা তো সুপুরি-পচানো মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে দিনরাত।···নিচে একটা ঝরনা, তার কি গর্জন, ভোরে সন্ধ্যেয় সে আওয়াজ কানে গেলে বুকের মধ্যে গুরগুর ক'রে উঠত! তার মধ্যে যখন অত কাল কাটিয়েছি, তখন এ বেশ থাকতে পারব।'

'ছ্যাখো—যা ভাল বোঝো।'

পূর্ণবাবু আর কিছু বলেন না।···

নেবুতলার বাড়ি বিক্রী হয়ে যায়, বালিগঞ্জের জমি-বাড়িও কেনা হয়।

এই যেন একটা কাজের রাস্তা পেয়ে যায় হেমন্ত। সে কেশববাবু ছাড়াও দু-একজন দালাল লাগিয়ে দেয়, ভাঙা পুরনো বাড়ি কোথায় সস্তায় আছে কেনার জন্যে। নিজের যে দু'খানা বাড়ি এখনও আছে, তাতে মিস্ত্রি লাগিয়ে নতুন ক'রে রঙ করায়।

ঐ বাড়িটা—কমলাক্ষর স্মৃতি, তারকের স্মৃতিমাখা ঠিকই, কিন্তু সেই জন্যেই বিক্রী করবে সে, মন স্থির ক'রে ফেলে। যারা চলে গেছে তাদের ব্যবহার-করা জিনিস-আসবাব বুকে ক'রে সারাজীবন দগ্ধানোর কোন মানে হয় না। ভুলে যাওয়াই ভাল।

শুধু বাড়ি নয়—ওখানের খাট-বিছানা আলমারি ঝাড় বাতিদান—সব বেচে দেবে সে। দরকার হয় আবার কিনবে—কিন্তু ওসব জিনিস আর সে দেখতে চায় না। পুরনো চাকর-বাকরকেও সরানো দরকার, বড় বেশী সান্ত্বনা দিতে আসে যখন-তখন।

মধ্যে এই ক'মাসের নিষ্ক্রিয়তায় ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল হেমন্ত—এবার সে প্রচণ্ড উৎসাহে কাজে নেমে পড়ল। পূর্ণবাবু ঠিক বুড়ো হয়ে না পড়লেও আজকাল আর আগের মতো অত ঘোরাঘুরি করতে পারেন না, নিজের কাজই কমিয়ে দিয়েছেন আগের থেকে। সুতরাং তাঁকে দিয়ে আর বিশেষ সাহায্য হয় না। যা করতে হয় ওকেই করতে হয়।

প্ল্যান-মেকারকে দিয়ে বালিগঞ্জের জমির প্ল্যান করায়, নিজেই বাতলে দেয় কি করতে হবে। জমি কেনার সময় দেখা গেল পঁচিশ নয়, প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ ফুট 'ওপনিং' আছে রাস্তার ওপর। তা থেকে আট ফুট রাস্তার জন্যে ছেড়ে সামনের জমিতে একখানা মাঝারি ও পেছনের সব জমি জুড়ে বড় একখানা—মোট দু'খানা বাড়ির প্ল্যান করায়। লাগোয়া নয়, বিচ্ছিন্ন। যাতে বিক্রী করার সময় অসুবিধা না হয়। প্ল্যান-মেকার পরামর্শ দিয়েছিল, 'লাগোয়া করলে অনেক জমি বেঁচে যাবে আপনার, তেমন বোঝেন চওড়া দেওয়াল করুন—বিক্রীর সময় অর্ধেক দেওয়ালের স্বত্ব লিখে দেবেন, তাহলে আর ঝগড়া-বিবাদের কোন প্রশ্ন থাকবে না।'

'তাহলেও থাকবে। আপনি এখনও মানুষ চেনেন নি। তাছাড়া, মাঝে একটু ফাঁক থাকলে ঘরগুলো হয়তো ছোট করতে হবে, তেমনি চারদিকে ফাঁকা, বাড়ি হিসেবে বেশী দাম উঠবে। যা বলছি আপনি সেইভাবেই করুন।'

প্ল্যান তৈরী হওয়ার পর শোনা গেল ঘুষ ছাড়া নাকি প্ল্যান পাস হয় না। দু'খানা প্ল্যানে একশো টাকার মতো লাগবে।

হেমন্ত ভুরু কুঁচকে বললে, 'ঘুষ ? তাই নাকি ? আচ্ছা দেখা যাক।'

তারপর নিজেই একদিন খোঁজ ক'রে মিউনিসিপ্যালিটির আপিসে গেল। বয়স হলেও এখনও হেমন্তর চেহারায় যথেষ্ট জেল্লা, আজকাল পুরোপুরি বিধবার বেশ ধরেছে সে—শুভ্র দামী কাঁচির থানধুতি পরনে, গায়ে সাদা চাদর—গিয়ে দাঁড়াতেই সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর যখন গলা বেশ চড়িয়েই সে বললে, 'শুনছি আপনাদের এখানে ঘুষ না দিলে নাকি প্ল্যান পাস হয় না, আমি স্বামীপুত্রহীনা মেয়েছেলে—আমার কাছেও কি ঘুষ খাবেন, না—প্ল্যানটা ছেড়ে দেবেন ?···পনেরো দিন দেখব, এর মধ্যে যদি প্ল্যান না পাস হয় তো আমি সব খবরের কাগজের আপিসে আপিসে গিয়ে বলে আসব আপনারা ঘুষ চেয়েছিলেন—দিই নি বলে প্ল্যান পাস হয় নি। আমার নামে মানহানির মামলা এনেও কিছু করতে পারবেন না, আমি আদালতে গিয়ে হলপ ক'রে বললে আমার কথাই হাকিম বিশ্বাস করবেন।'

সে একটা হৈ-চৈ ব্যাপার আপিসে। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সকলেই একসঙ্গে কথা কইতে চান। কে একজন—বড় গোছের কেউ হবেন—টেবিল ছেড়ে উঠে এসে একটা চেয়ারে হেমন্তকে বসিয়ে তখনই ডিপার্টমেন্ট থেকে প্ল্যান আনিয়ে দেখে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান, পনেরো দিন লাগবে না, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই প্ল্যান পেয়ে যাবেন। প্ল্যান ঠিক আছে—কোন গোলমাল হবে না।'

এর পর আরও যা ক'রে বসল হেমন্ত, পূর্ণবাবু সুদ্ধ অবাক হয়ে গেলেন। মিস্ত্রিকে ডেকে পাঠিয়ে তার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে ঘুরে ঘুরে ইট-চুন-সুরকি, কাঠ-কাটরা দর-দস্তুর ক'রে বায়না দিয়ে এল এবং বালিগঞ্জের নতুন বাড়িতে উঠে এসে নিজেই দাঁড়িয়ে ভিত কাটাতে শুরু ক'রে দিল। নতুন বাড়িতে আসার আগে গৃহপ্রবেশের কোন পূজো-আশ্রা বা হোম-যাগ করল না। নতুন ভিত কাটার আগেও না। মুসলমান মিস্ত্রি পর্যন্ত ওর এই দুঃসাহসে হকচকিয়ে গেল, বললে, 'সে কি—মাটির বুকে কোদাল চালানো—একটু

নবরত্ন না কি দেন যেন আপনারা, ঠাকুরের পুজো—সে-সব কিছু করবেন না ?'

হেমন্ত কঠিন হাসির সঙ্গে জবাব দিল, 'ওসব অনেক করেছি মিস্ত্রি, তার ফলও দেখলুম। এবার কিছু না ক'রেই দেখতে চাই।'

পূর্ণবাবু অন্য দিকের কথা বললেন, 'ছোটখাটো মেরামত, সে এক-রকম, তাও তো আগে আগে আমিই করিয়ে দিয়েছি—কিন্তু এ একটা গোটা বাড়ি করানো—এ কি তুমি পেরে উঠবে ? মিস্ত্রি-মজুররা ঠকাবে, মালপত্রের দাম জানো না, ওসব ঘুরে ঘুরে দেখে মাল চিনে কিনতে হয় দর-দস্তুর ক'রে—বেশী দাম নেবে হয়ত, নয়ত মালের পরিমাণে ঠকাবে—ও তুমি পারবে কেন ? বরং ভাল দেখে একজন ঠিকেদার রাখো, তার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত ক'রে নাও। সে একটা লোকের ওপর বরং নজর রাখা সহজ।'

'সেও তো কিছুটা মজুরী নেবে, কত সহুরে নেবে, আর কতটা চুরি করবে—তাও তো জানি না। তাতেও তো ঠকতে হবে খানিকটা, অথচ তাতে কাজটাও শিখতে পারব না। তাই যদি হয়—ঠকে আর ঠেকেই না হয় শিখি এবার। ঠকলে এই একবারই ঠকব। এই বাড়িটা করার সময়ই। এটা করতে করতেই কাজটা শিখে নিতে পারব আশা করছি—পরে যখন করাব তখন আর কারও ওপর ভরসা করতে হবে না।'

পূর্ণবাবু কাঁধের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে হাল ছেড়ে দেন।

এই সব নিয়ে যদি ভুলে থাকতে পারে তো থাক। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই।

তবে, বাড়ির যখন গাঁথুনির কাজ শেষ ক'রে ছাদ পেটানো ও পলেস্তারার কাজ হতে শুরু হল, তখন খরচের খাতায় মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে পূর্ণবাবুকেও স্বীকার করতে হয় যে, খুব বেশী একটা কেউ ঠকাতে পারে নি ওকে।

এই বাড়ি উঠছে দেখে পাশেও এক ভদ্রলোক বাড়ি তুলতে শুরু ক'রে দিলেন। মনে হল এদিক দিয়েও হেমন্তর হিসেব ঠিক,

এবার এখানে আস্তে আস্তে বসতি শুরু হয়ে যাবে, ওর ভাড়াটে বা ক্রেতার অভাব হবে না।

॥ ২ ॥

কর্মক্ষেত্রে নামার পর দেখা গেল এই ব্যবসা সম্বন্ধে হেমন্তর একটা "অতিরিক্ত অনুভূতি আছে—এখন যাকে ইংরেজীতে ষষ্ঠ অনুভূতি বলে। পূর্ণবাবু তো বটেই, আরও অনেককেই মানতে হয় কথাটা। অনেক পাকা ঘুঘু ব্যবসাদার অনভিজ্ঞা অভিভাবকহীনা বিধবা মেয়েছেলে দেখে সোৎসাহে ঠকাতে এসে যা খেয়ে ফিরে গেল হার মেনে। অনেক ঘাগী দালাল হিমসিম খেয়ে গেল ওর দূরদর্শিতা ও বুদ্ধির কাছে।

নারকেলডাঙ্গার তিন কাঠা জমির ওপর অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি—ওপর-নিচে চারখানা ঘর—যেখানে সাড়ে আট হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে—তা না কিনে আহিরীটোলায় সওয়া কাঠা জমির ওপরে বহু পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ি আট হাজার টাকায় কেন কেনে তা পূর্ণবাবু পর্যন্ত বুঝতে পারেন না। তিনি খবরটা শুনে—হেমন্তকে ক'টা ব্যাপারে বেশ লাভ করতে দেখে লুব্ধ হয়ে নিজেই কিনে নিলেন নারকেলডাঙ্গার বাড়িটা। কিন্তু তারপর—ঐ ন' হাজার (কেনার খরচ সুদ্ধ ধরলে ন'য়ের বেশিই হবে বোধ হয়)-এর ওপর আরও হাজারখানেক টাকা খরচ ক'রে দীর্ঘদিন বসে রইলেন, মোট খরচের দশ হাজার টাকাও কেউ দিতে চাইল না। অথচ হেমন্ত আহিরীটোলার বাড়িতে স্রেফ পলেস্তারা লাগিয়ে সামনেটা সামান্য একটু অদল-বদল ক'রে পাইখানাটা ভেঙে নতুন ক'রে তৈরী করিয়ে অনায়াসে বারো হাজার টাকায় বেচে দিল। অর্থাৎ নীট দেড় হাজার টাকা লাভ। সব খরচ-খরচা মায় ওর ছুটোছুটির ঘোড়ার-গাড়ি-ভাড়া ধরেও।

হেমন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় ছ'-সাত হাজার টাকা লাভ ক'রে ফেলল। একটা ব্যাপারে খালি কিছু লোকসান দিতে হয়েছিল, তাও লোকসান এই হিসেবে যে, খরচে আমদানিতে হেরাহেরি, ওর খাটুনির কোন মজুরী পায় নি। বালিগঞ্জের যে বাড়িটা তৈরী করিয়েছিল—আগেই পেছনের জমিতে বাড়ি করেছে, সামনের বাড়ি উঠে গেলে পেছনের অসুবিধাটা স্পষ্ট চোখে পড়বে সকলের এটা বুঝেছিল ও—খরচ-খরচা বাদে শ'সাতেক টাকা লাভে বেচেছে, এখন সামনের অংশে বাড়ি তুলছে। এবং নিশ্চিন্ত আছে—পেছনের বাড়ি যে কিনেছে সে-ই নিজের গরজে খদ্দের খুঁজে আনবে।

তবে বালিগঞ্জে ওর নিজের থাকার সুবিধে হল না। কাজকর্ম বেশির ভাগই উত্তরের দিকে—অতদূর থেকে আসা-যাওয়ার অসুবিধে হয়, আজকাল অনেক মেয়েছেলে ট্রামগাড়িতে চড়ছে, কিন্তু হেমন্ত পারে না, ওর ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া যাতায়াত পোষায় না। তাই বাদুড়বাগানে নিচেতলায় ভাড়াটে সুদ্ধ একটা ছোট বাড়ি কিনে উঠে এল আবার। বালিগঞ্জে যে বাড়িটা আগে কিনেছিল—জমির সঙ্গে—সে-বাড়িটা বেচল না। একখানা ঘর নিজের জন্যে রেখে ভাড়া দিয়ে দিল। ভাল ভাড়াটেই পেল, ঠাকুরবাড়ির কে এক দৌহিত্র ব্যারিস্টার সবে বিলেত থেকে এসেছে, সে একটু নিরিবিলি হালপছন্দর বাড়ি খুঁজছিল, তার পছন্দ হয়ে গেল জায়গাটা ও বাড়িটা। এক কথায় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়াতে নিয়ে নিল সে। খবরটা শুনে পূর্ণবাবু পর্যন্ত হাত তুলে নমস্কার করলেন, বললেন, 'তোমারই হাতযশ। ঐ সম্পত্তিটা এক বছরের ওপর পড়ে ছিল, নতুন তৈরী হয়ে ইস্তক, কেউ একবার দেখতেও চায় নি। তুমি বাবা ভেল্‌কি লাগিয়ে দিলে।'

পরিচিত মহলে কথাটা একটু একটু ক'রে রাষ্ট্র হয়ে গেল বৈকি! হেমন্ত আগেও, খাটা কড়িতে ছু' পয়সা করেছিল, কিন্তু এখন ছেলে মরার পর, একেবারে যেন চারহাতে টাকা রোজগার করছে।

ভাগ্যে থাকলে নাকি এমনিই হয়—যে-সর্বনাশে নাকি একেবারে ভেঙে পড়ার কথা, তাতেই কারও কারও সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। ছেলে মরার ফলে তার আসল যা কাজ যদি ছেড়ে না দিত হেমন্ত, তাহলে এ-কারবার এমনভাবে শুরুও করতে পারত না, এমন বরাতও খুলত না।

পরিচিত মহল এখন এ-শহরে ছোট নয়। এত বছর ধরে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ ক'রে গেছে, বহু ভদ্রলোকের বাড়িই যেতে হয়েছে তাকে। কোথাও কোথাও বার বার যেতে হয়েছে। বড় সম্পন্ন পরিবারে বহু বধূ বহু কন্যা থাকে, সে-সব বাড়িতে বছরে চার-পাঁচবার ডাক পড়াটা খুব সাধারণ ঘটনা, স্বাভাবিক। এইসব বাড়িতে বার বার যাতায়াত করার ফলে অনেকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে গেছে। এই বাড়ি কেনা-বেচার কারবারেও এই রকম প্রাক্তন মক্কেলদের অনেকের সঙ্গে নতুন ক'রে যোগাযোগ হল—এদের মারফৎও বিস্তর খবর আসতে লাগল—মাল ও ক্রেতা উভয়েরই।

সুতরাং ওর উপার্জন-বৃদ্ধি বা অবস্থা ফিরে যাওয়ার সংবাদ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে—ক্রমশ সেটা অতি দূরের আত্মীয়-সমাজে পর্যন্ত পৌঁছবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আর পয়সার গন্ধ পেয়ে সেই সব আত্মীয়-সমাজ নতুন ক'রে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্যে ব্যস্ত হবে—তাতেই বা বিস্মিত হবার কি আছে!

তবে হেমন্ত এটা ভাবে নি। তার অস্তিত্ব—বিশেষ ক'রে তার ঠিকানা তার তথাকথিত আত্মীয়রা সন্ধান করতে পারবে এ-কথাটা একবারও মনে হয় নি তার।

বিশেষ প্রথম যার আগমন ঘটল তার কথা সুদূর কল্পনাতেও মনে আসে নি কখনো।

দাদা। ওর আপন দাদা।

হেমন্ত চিনতেও পারে নি প্রথমটায়। সারাদিন দু' জায়গায় মিস্ত্রি খাটানোর তদারক করা, সুরকি-গোলায় গিয়ে বাজে সুরকি দেওয়ার জন্যে রাগারাগি করা, খালধারে গিয়ে ছাদে পাতবার টালি

দর ক'রে বায়না দিয়ে আসা—এইতেই কেটেছে। একেবারে ভোরে স্নান-আহ্নিক সেরে একটু শরবৎ খেয়ে বেরিয়েছে—সমস্ত দিনে আর কিছুই পেটে পড়ে নি। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে আবার স্নান-আহ্নিক সেরে দুটো ভাত খেয়ে নেবে, রাত ন'টা বেজে গেলে আর খাওয়ার উপায় থাকবে না—সেইজন্যেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। বামুনঠাকুরকে কিছুই বলে যায় নি, কখন ফিরবে বা কি খাবে—এই ছুটোছুটি শুরু হবার পর আবার একটি ঠাকুর রেখেছে—সে যদি উনুন না জ্বেলে থাকে এখনও, কিংবা মনতোলা ক'রে লুচি-পরোটা কিছু ভেজে রেখে থাকে, তাহলে আর দুটো ভাত জুটবে না অদৃষ্টে, অথচ প্রাণটা টা-টা করছে সারাদিনের উপোসে, ঘোরাঘুরি ও বকাবকিতে—অন্তরাত্মা একান্তভাবে দুটো ভাতই চাইছে, সেজন্যেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত।

কিন্তু যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত উত্যক্ত হেমন্ত গাড়ি থেকে নামতেই চারুর মা এসে খবর দিলে, কে একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছেন, ওর সঙ্গে দেখা করবেন বলে।

'ভদ্রলোক? কী রকম লোক? কী চান? বাড়ির দালাল, না খদ্দের?'

'না, দিদি। দালালবাবুদের মোটামুটি সবাইকে চিনি, তেনারা কেউ নয়। খদ্দের বলেও মনে হল না—মানে শাঁসালো মানুষ কেউ নয়। কাপড়-জামার হাল ভাল না। বামুনসজ্জন হবে—মাথায় টিকি আছে।'

বিরক্ত হয়েই এসেছিল, বিরক্ত মিস্ত্রি থেকে মহাজন সকলের ওপরই প্রায়, এই উৎপাতে আরও বিরক্ত হয়ে উঠল।

'তা কেন এসেছে, কী চায়—তাও জিজ্ঞেসা ক'রে রাখতে পারিস নি? হয়ত শুনব কার কন্যেদায়, কিম্বা পিতৃদায়—কিম্বা জ্ঞাতিরা ঠকিয়ে নিয়েছে যথাসব্বস্ব, খেতে পাচ্ছে না—সাহায্য চাইতে এসেছে। নানান সত্যি-মিথ্যে এক কাঁড়ি কথা বসে বসে শোনো এখন! তাও এক কথায় কথা শেষও করবে না।

উঠবেও না—ন্যাকড়ায় আগুন সব—ঘ্যান ঘ্যান ক'রেই যাবে বসে বসে।'

'শুধিয়েছিলুম দিদি, বললে নি। বললে, "তেনার সঙ্গে আমার দরকার আছে বিশেষ। আমি তেনার আপনার লোক" !'

'আপনার লোক! আমার আপনার লোক আর কেউ নেই। এক যম আছে শুধু।'

গজগজ করতে করতেই বাড়ি ঢুকল।

ওপরে উঠে দেখেও চিনতে পারল না।

খোঁচা খোঁচা একমুখ গোঁফদাড়ি, হয়ত দীর্ঘকাল কামানো হয় নি, কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুল, তার মধ্যে একটা টিকি ফাঁস দেওয়া—আধ-ময়লা ধুতি আর একটা আধ-ময়লা জিনের কোট।

বুঝল ওর অনুমানই ঠিক, সাহায্য চাইতে এসেছে কোন অছিলায়। ঝি এমনি ঢুকতে দেবে না বা বসতে দেবে না বলে আপনার লোক সেজেছে।

আরও বিরক্ত হয়ে, ভুরু কুঁচকে বেশ কঠিনকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কাকে চান আপনি? কী দরকার?'

লোকটি মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে চেয়ে বসে ছিল। ঘরে চেয়ার আছে তাতে বসে নি, চারুর মার পেতে-দেওয়া আসনে আল্‌তোভাবে বসে আছে।

হঠাৎ হেমন্তর এই রুক্ষ রুষ্ট প্রশ্নে চম্‌কে মাথা তুলে, ওর কঠিনতর ভ্রূকুটির দিকে চেয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। একটু হাসির চেষ্টা ক'রে বলল, 'আমি—মানে—হিমি, আমাকে চিনতে পারলি না?'

হিমি!

বহু যুগ বহু শতাব্দী আগেকার নাম এটা, যেন জন্মান্তরের। মনে হল এ-জন্মের অপর পার থেকেই নামটা কেউ উচ্চারণ করল।

এ-নাম হেমন্ত নিজেই ভুলে গেছে। ওর মা ডাকতেন এই নামে

শুধু। বাবা পুরো নাম উচ্চারণ ক'রে ডাকতেন হেমন্তবালা বলে। বাকী সবাই বলত মেজখুকী।

এবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখে মনে হল—এই মুখ না হোক, এই হাসির ভঙ্গীটা, চোখের বোকা-বোকা পরনির্ভরশীল বিমূঢ় চাউনির ভাবটাও—একেবারে ওর অপরিচিত নয়।

তবে পরিচিত হলেও বহুদিনের পরিচয়, জন্মান্তরেরই।

দাদা! সেই দাদার এই হাল হয়েছে!

একবার, এক মুহূর্তের জন্যে স্বাভাবিক স্নেহজনিত উৎকণ্ঠা বোধ করেছিল, একটু সহানুভূতি—কিন্তু সে ঐ এক মুহূর্তের বেশি নয়।

'দাদা' শব্দটাও মুখ থেকে বেরোতে যাচ্ছিল—সহজেই, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললে, 'ও, অদ্বৈতবাবু! তা কি মনে ক'রে—এমন অসময়ে?···আমি বড্ড ব্যস্ত, দেখতেই পাচ্ছ। সারাদিন স্নানাহার হয় নি—খুব ক্লান্তও।···কোন বিশেষ দরকার আছে?'

আর যা-ই হোক, ওর দাদা এই 'অদ্বৈতবাবু'টার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বোধহয়। অদ্বৈত নাম রেখেছিলেন বাবা, অদ্বৈতচরণ বড় ও চন্দ্রশেখর ছোট ছেলের নাম—কিন্তু সে-নাম কেউই ব্যবহার করত না। মা ডাকতেন বাদল বা বাদু বলে—শ্রাবণ মাসে হয়েছিল, ঘোর বর্ষায়—সেই নামটাই বেশী পরিচিত।

ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—এই একটি নাম উচ্চারণের আঘাতে, কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না, এমনিই—অনেকদিন কোন খোঁজ-খবর পাই নি—তাই। এই অঞ্চলে আছিস শুনেছিলুম—অনেক কাণ্ড ক'রে আমাদের এক শিষ্যর কাছ থেকে ঠিকানাটা আজই যোগাড় করেছি—'

বাধা দিয়ে হেমন্ত বলল, 'কেন, এতদিন পরে এত কাণ্ড করার কি দরকার হয়ে পড়ল—হঠাৎ?'

'না—মানে খবর তো পাই নি—'

'খবর রাখার কি চেষ্টা করেছিলে খুব? যেদিন তোমার বাবা

উঠবেও না—ন্যাকড়ায় আগুন সব—ঘ্যান ঘ্যান ক'রেই যাবে বসে বসে।'

'শুধিয়েছিলুম দিদি, বললে নি। বললে, "তেনার সঙ্গে আমার দরকার আছে বিশেষ। আমি তেনার আপনার লোক"!'

'আপনার লোক! আমার আপনার লোক আর কেউ নেই। এক যম আছে শুধু।'

গজগজ করতে করতেই বাড়ি ঢুকল।

ওপরে উঠে দেখেও চিনতে পারল না।

খোঁচা খোঁচা একমুখ গোঁফদাড়ি, হয়ত দীর্ঘকাল কামানো হয় নি, কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুল, তার মধ্যে একটা টিকি ফাঁস দেওয়া—আধ-ময়লা ধুতি আর একটা আধ-ময়লা জিনের কোট।

বুঝল ওর অনুমানই ঠিক, সাহায্য চাইতে এসেছে কোন অছিলায়। ঝি এমনি ঢুকতে দেবে না বা বসতে দেবে না বলে আপনার লোক সেজেছে।

আরও বিরক্ত হয়ে, ভুরু কুঁচকে বেশ কঠিনকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কাকে চান আপনি? কী দরকার?'

লোকটি মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে চেয়ে বসে ছিল। ঘরে চেয়ার আছে তাতে বসে নি, চারুর মার পেতে-দেওয়া আসনে আল্‌তোভাবে বসে আছে।

হঠাৎ হেমন্তর এই রুক্ষ রুষ্ট প্রশ্নে চম্‌কে মাথা তুলে, ওর কঠিনতর ভ্রূকুটির দিকে চেয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। একটু হাসির চেষ্টা ক'রে বলল, 'আমি—মানে—হিমি, আমাকে চিনতে পারলি না?'

হিমি!

বহু যুগ বহু শতাব্দী আগেকার নাম এটা, যেন জন্মান্তরের। মনে হল এ-জন্মের অপর পার থেকেই নামটা কেউ উচ্চারণ করল।

এ-নাম হেমন্ত নিজেই ভুলে গেছে। ওর মা ডাকতেন এই নামে

শুধু। বাবা পুরো নাম উচ্চারণ ক'রে ডাকতেন হেমন্তবালা বলে। বাকী সবাই বলত মেজখুকী।

এবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখে মনে হল—এই মুখ না হোক, এই হাসির ভঙ্গীটা, চোখের বোকা-বোকা পরনির্ভরশীল বিমূঢ় চাউনির ভাবটাও—একেবারে ওর অপরিচিত নয়।

তবে পরিচিত হলেও বহুদিনের পরিচয়, জন্মান্তরেরই।

দাদা! সেই দাদার এই হাল হয়েছে!

একবার, এক মুহূর্তের জন্যে স্বাভাবিক স্নেহজনিত উৎকণ্ঠা বোধ করেছিল, একটু সহানুভূতি—কিন্তু সে ঐ এক মুহূর্তের বেশি নয়।

'দাদা' শব্দটাও মুখ থেকে বেরোতে যাচ্ছিল—সহজেই, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললে, 'ও, অদ্বৈতবাবু! তা কি মনে ক'রে—এমন অসময়ে?···আমি বড্ড ব্যস্ত, দেখতেই পাচ্ছ। সারাদিন স্নানাহার হয় নি—খুব ক্লান্তও।···কোন বিশেষ দরকার আছে?'

আর যা-ই হোক, ওর দাদা এই 'অদ্বৈতবাবু'টার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বোধহয়। অদ্বৈত নাম রেখেছিলেন বাবা, অদ্বৈতচরণ বড় ও চন্দ্রশেখর ছোট ছেলের নাম—কিন্তু সে-নাম কেউই ব্যবহার করত না। মা ডাকতেন বাদল বা বাদু বলে—শ্রাবণ মাসে হয়েছিল, ঘোর বর্ষায়—সেই নামটাই বেশী পরিচিত।

ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—এই একটি নাম উচ্চারণের আঘাতে, কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না, এমনিই—অনেকদিন কোন খোঁজ-খবর পাই নি—তাই। এই অঞ্চলে আছিস শুনেছিলুম—অনেক কাণ্ড ক'রে আমাদের এক শিষ্যর কাছ থেকে ঠিকানাটা আজই যোগাড় করেছি—'

বাধা দিয়ে হেমন্ত বলল, 'কেন, এতদিন পরে এত কাণ্ড করার কি দরকার হয়ে পড়ল—হঠাৎ?'

'না—মানে খবর তো পাই নি—'

'খবর রাখার কি চেষ্টা করেছিলে খুব? যেদিন তোমার বাবা

আমাকে বাড়ি থেকে ঐভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেদিন এত টান এত উৎকণ্ঠা কোথায় ছিল ? সেদিন তো একটা কথাও বলো নি ! এত কি ভয়ের ছিল বাবাকে ? তার তো—একটু নড়ে বসলেও যদি এক পয়সা রোজগার হয়—সেটুকু নড়ে বসারও সামর্থ্য নেই । তোমার ওপরই তাঁর নির্ভর ।···আর সে তো বহুকালের কথা হল—এতদিনই বা খবর নেবার দরকার বোঝ নি কেন ?'

'না, মানে পাই নি বলেই—' গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ওঠে বাদল, 'চেষ্টা করেছি বৈকি !'

'মিথ্যে কথা ! এত কাণ্ড করলে ঠিকই পেতে । আজ যাদের কাছ থেকে পেয়েছ, তাদের কাছেই পেতে । তা তো নয়—খবর পেয়েছ বলেই খবর নাও নি । দাইয়ের কাজ করে একটা মেয়েছেলে—তার খবর নিলে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা করলে লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না—তাই ।'

'তা—মানে শিষ্যি-সেবক নিয়েই তো আমাদের চালানো—'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে এখন এত খবর নেওয়ার চাড় কেন হল অদ্বৈতবাবু, রাতারাতি কি শিষ্যি-সেবকরা সব খ্রীষ্টান হয়ে গেল—না তোমাদেরই আর তাদের ওপর নির্ভর করার দরকার রইল না ?'

চুপ ক'রে থাকে ওর দাদা, মাথা হেঁট ক'রেই বসে থাকে ।

'তা নয় ।' হেমন্তর গলা বিলিতী ক্ষুরের মতো শানিত হয়ে ওঠে, 'এখন শুনেছ অনেক টাকা হয়েছে, সে-কাজও ছেড়ে দিয়েছি, তাই এসেছ । যেদিন বাড়ি থেকে অসহায় বোনটাকে একটা শিশুসুদ্ধ সবাই মিলে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেদিন ভাবো নি যে, এমন দিনও তার আসতে পারে—না ? তবে শুনে যাও, সেদিন শেষ অবধি এক বেশ্যার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল—তারই দয়ায় প্রাণ বাঁচানো শুধু নয়—পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, নিজে স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পেরেছি । এর পরও ইচ্ছে হচ্ছে এখানে বসতে ? ছাখো—গিয়ে আবার প্রাচিত্তির করতে হবে না তো ? উঠে পড়ো,

উঠে পড়ো—কথাটা জানার পর আর এখানে বসে থেকো না। পাপ হবে।'

উঠেই দাঁড়ায় অদ্বৈত, তার কপালে তখন রীতিমতো ঘাম দেখা দিয়েছে, এককালে সুগৌর-কান্তি ছিল, তা আর নেই—তবু হেমন্ত লক্ষ্য করল ওর মুখ আগুনবর্ণ ধারণ করেছে।

কিন্তু বাইরের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও, একটু থমকে দাঁড়িয়ে প্রায় মরীয়া হয়ে বলে ওঠে, 'শিবুটা মানুষ হল না, নেশাখোর হয়ে গেছে, বাড়িতেও থাকে না সব সময়—বোধহয় চরিত্রেরও ঠিক নেই, বাবা কিছু বলতে গেলে অকথ্য অপমান করে, আমার একার ওপরই সব।···বাবা শয্যাগত, এখন-তখন অবস্থা, শোথ রোগ হয়েছে—টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না—'

'ওসব কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন? আমার জন্মদাতা এক ব্যক্তি ছিল, ঘোর স্বার্থপর, লোভী ও অকর্মণ্য—তার অত্যাচারে আমার মার অকালমৃত্যু হয়েছিল—আমার কাছে সে লোক বহুকাল মৃত। তোমার বাবা আমার কেউ নয়। সুতরাং, ওসব নাকে-কান্নায় আমার মন গলবে না। যতদূর শুনছি, তোমাদের মধ্যে শিবুরই কিছু মনুষ্যত্ব গড়ে উঠেছে। মানে মানুষই সৎ হয়—মানুষই বদ হয়। তোমাদের মতো বেনে-পুতুলরা কিছুই হতে পারে না।···যাক, তেতেপুড়ে এসেছি, আমাকে আর বকিও না। আর কখনও কষ্ট ক'রে খবর রাখারও চেষ্টা ক'রো না। তোমাদের যে মেজ বোন একজন ছিল, তাকে তোমরাই মেরে ফেলেছ একদিন—এইটে জেনে নিশ্চিন্ত হও। তোমার বাবা তোমার সে মেজ বোনের বিয়ে দেওয়ার আগে একটু উয্যুগ ক'রে খবরও নিতে পারে নি যে, কার হাতে কোথায় দিচ্ছে, বিয়ের পর সে কি অবস্থায় আছে তাও খবর নেওয়া দরকার মনে করে নি। তুমি নিজে দেখে এসেছিলে তার দুর্গতি—তোমার মুখে শুনেও মেয়েকে সেখান থেকে নিয়ে আসার কথা মনে হয় নি তার—শুধু যখন ছোট জাতের মেয়ে একটা ঝিয়ের দয়ায় মৃত্যুর হাত থেকে যমদূতদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে একটা

মহাপ্রাণ ছেলের সাহায্যে কোনমতে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছিল—তখন বামনাই দেখিয়ে বংশ দেখিয়ে সোজা দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল, জেনে-শুনে তাকে হয় আত্মহত্যার দিকে, নয়তো খান্‌কিগিরির দিকে ঠেলে দিতে পেরেছিল !···সেই অমানুষ জানোয়ারটার কথা শোনাতে এসেছ আমাকে ! তার অসুখ !···টান মেরে রাস্তায় ফেলে দাও নি কেন, জ্যান্তে শ্যাল-কুকুরে টানাটানি ক'রে ছিঁড়ে খেলে তবে তার মহাপাপের প্রাচিত্তির হত ।'

তারপর একেবারে দাদার দিকে পেছন ফিরে বললে, 'শুনলে তো আমার মত, এখন সরে পড়ো ।'

বলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। ঠাকুর ও ঝিয়ের সকৌতূহল বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে অপমানিত বড় ভাই কীভাবে চোখের জল চাপার চেষ্টা করতে করতে মাথা নিচু ক'রে নেমে গেল, তাও ফিরে দেখল না আর।

চারুর মা পুরনো লোক, অনেক দেখেছে—সে অতটা ভয় করে না। সে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, এ তোমার আপন দাদা ? মায়ের পেটের ভাই ? তাকে এমন নভূতো নছুতো করলে! এতটা বাপু তোমার উচিত হয়নি ।'

বলতে বলতেই তার নজরে পড়ল হেমন্তরও দুই চোখে টলটল করছে জল। বহুকাল পরে ওর চোখে আবার জল দেখল চারুর মা। তার শিক্ষা-দীক্ষা কম, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝল, আঘাতটা আহতের থেকে আঘাতকারীকে কম বাজে নি, সে চুপ ক'রে গেল।

কিন্তু হেমন্ত উত্তর দিল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'আমার বাপ-ভাই কেউ কোথাও নেই। সব মরে হেজে গেছে, সপুরী এক গাড়ে গেছে। ওদের মুখ দেখলেও মহাপাপ হয়। ওরাই আমাকে আজ এই পথে ঠেলে দিয়েছে।···উচিত, ঐ লোকটা যেখানে বসেছিল সেখানে গোবর-জল-ছড়া দেওয়া। আমার একটিই আপন লোক ছিল, তোদের ও-বাড়ির দিদি, সেও মরে গেছে, তার সঙ্গেই

ইহজগতের আপনার লোক চলে গেছে সবাই। ঐ যে এসেছিল তার চেয়ে তোরা আমার ঢের বেশী আপন।'

বলতে বলতেই আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল—যেন হাঁপাচ্ছে তখন সে—এবং এতখানি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াতেই দুই চোখের বাঁধ ভেঙে আকুল অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

৩

আত্মীয়-সমাগমের এই শুরু, শেষ নয়।

বাদল এসে চলে যাওয়ার দিন কয়েক পরেই একদিন দুপুরবেলা একটি বৃদ্ধ লোক এসে উপস্থিত। মাথার সব চুল সাদা, ঘোর-কৃষ্ণ বর্ণ। অতি মলিন একটি জীনের কোট পরনে, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

কিছু আগেই লোকটি পাড়ায় এসেছে, এবং খোঁজ-খবর করছে, হেমন্তর রাঁধুনী এসে বলে ছিল। তখন সে বসে বসে মিস্ত্রির হিসেবে 'ঠিক' দিচ্ছিল, অতটা কান করে নি। গত কয়েক দিনে বিস্তর হিসেব জমে গেছে, মিলিয়ে দেখা হয় নি, বিশেষ ছুতোর-মিস্ত্রির হিসেবটা কালই চুকিয়ে দিতে হবে, হপ্তায় হপ্তায় হিসেব ক'রে পাই-পয়সা চুকিয়ে দেয় বলে অনেক সস্তায় হয়, কিছু টাকা কেটে নিলেও ওরা বেশী আপত্তি করে না। সেই দিকেই মনটা ছিল, এখন ঠাকুর এসে খবর দিতে চমকে উঠল, 'মা, সেই যে বুড়োটা পাড়ায় আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল বললুম— ? সে এসে হাজির হয়েছে। দেখা করতে চায়।'

'বুড়ো ? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়··· ? পাড়ায় খবর নিচ্ছিল—কে বললে ?'

'খানিক আগে দোকানে গিয়েছিলুম না—তখনই শুনে এসেছি, ঐ গুপ্তদের বাড়িতে আপনার নাম ক'রে কি সব জিজ্ঞেস করছে,

কোন্ বাড়ি, কতদিন এখানে এসেছেন, কে কে থাকে বাড়িতে, কি করেন—এই সব।...আপনাকে যে তখন বললুম এসে?'

'অত কান করি নি তাহলে। কিন্তু, কি দরকার কিছু বলেছে?'

'না, তা কিছু বলছে না। আমি তো বললুম তাই। তা শুধু বলে, আপনার সঙ্গে দেখা করবে। বলে, ওকে দেখলেই নাকি আপনি চিনতে পারবেন।'

'না, তা হবে না।' বিরক্ত হয়ে ওঠে হেমন্ত, 'বলো গে, কোথা থেকে এসেছে, কি নাম, কি দরকার—তা না জানলে মা দেখা করবে না—'

কিন্তু এত কথা বলবার আর অবসর মিলল না।

তার আগেই আগন্তুকটি ভেজানো দরজার সুযোগ নিয়ে সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। সামান্য একটা অনুমতি নেওয়ার জন্যে অযথা বিলম্ব করতে সে রাজী নয়। সিঁড়ির মুখ থেকে একটু এগিয়ে এসে গলা-খ্যাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, 'এই আমি এইছি গো বৌমা। আসা তো হয় না কলকেতায়—এইটুন্ তো পথ, হেঁটেই মেরে দিই—তা ধরো নানা ঝঞ্চাট তো—ঐ কেত্তনউলীরা গায় না—"কব কি বিশেষ, আঙিনা বিদেশ"—তা আমাদেরও ধরো তাই—তাই এসেই যখন পড়লুম, বলি—দেখা ক'রেই যাই একবার। ত্যাখন একটা ভুল বোঝাবুঝিতেই—মিছিমিছি তুমি বৌমা ভয় পেয়ে চলে এলে—আমার মা-টাও ছিল তেমনি পাগল—তাই বলে সত্যি-সত্যিই তো আর আমরা থাকতে—তোমার দিদিরা থাকতে—'

আর বলতে হল না।

না বললেও চিনত। বুকের দিক চাপা, পেটের দিক চওড়া—এ গঠন ওর অতি পরিচিত। শ্বশুর-বংশের সকলেরই এই ধারা। কেবল তারকই ছোটবেলা থেকে কলকাতায় ছিল বলে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে পিলে লিভার বাড়ে নি বলেই, রোগা হলেও এমন বিসদৃশ গঠন হয়ে ওঠে নি।

এ বিষ্ণুচরণ, ওর ভাসুর।

বুড়ো হয়েছে, কিন্তু মুখের ভাবে ও ভাষায় সেই বজ্জাতি ষোল-আনাই বজায় আছে। চোখের দৃষ্টিতে সেই লুব্ধ ধূর্ততা।

নিমেষে জ্বলে উঠল হেমন্ত। এত ক্রোধ ইদানীং কালের মধ্যে আর কখনও বোধ করে নি ও। দাদা আসতে উত্তেজিত হয়েছিল, বহু দিনের চাপা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, কিন্তু ক্রোধের সঙ্গে এমন অপরিসীম ঘৃণা বোধ করে নি। অথবা, এই ইতর খুনেটাকে দেখে ওর যা মনোভাব হল—তা ক্রোধ বা ঘৃণা—কোন শব্দ দিয়েই বোঝানো যায় না।

সে বিষ্ণুচরণের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে বললে, 'ঠাকুর, ঐ বজ্জাত লোকটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দাও এখুনি। সহজে যেতে না চায়—মোড়ের মাথা থেকে কনেস্টেবল ডেকে নিয়ে এসো—বলো গে একটা লোক চুরি করতে এসেছিল তাকে ধরেছি।...আর তুমি খবরদার অমন দরজা খুলে রেখে আমাকে খবর দিতে আসবে না, যত রাজ্যের চোর-জোচ্চোর খুনে-বদমাইশ লোক ঐ ফাঁকই খোঁজে, ঢুকে পড়ে। ফের এ রকম গাফিলি দেখলে তোমার মাইনে কাটব—বলে রাখছি!'

বিষ্ণুচরণ বোধ হয় এই রকম অভ্যর্থনাই আশা ক'রে এসেছিল।

তাই সে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আগের মতো অমায়িক কণ্ঠেই বলে উঠল, 'না না, বৌমা—ছি ছি, এসব কি ছেলেমানুষী করছ! অত কিছু করতে হবে না, বললেই যথেষ্ট অপমান করা হল, তার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।...দেখছি ভুলটা তোমার ভাঙে নি পুরোপুরি।...আমি এমনিই খবর নিতে এইছিলুম, কিছুর পিত্যিশী হয়ে আসি নি। বরং—চাও তো এখনও তোমার শ্বশুরের বিষয়ের হিস্যে বুঝিয়ে দিতে পারি।...অবিশ্যি অর্শায় না আর—আমাদের ছেলে যখন চলে গেছে তখনই তো—তবে ওসব আইনের চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস হল বংশের মর্য্যেদা!...ব্যস্ত হয়ো না—আমি যেমন এইছিলুম তেমনিই চলে যাচ্ছি, তবে—। ভুল একদিন বুঝতে পারবে—তাও বলে যাচ্ছি—'

ধীরে সুস্থে মুখে একটি অমায়িক হাসির ভাব ফুটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বিষ্ণুচরণ।

বিষ্ণুচরণের আবির্ভাবের পর দরজা খোলা আর বন্ধ রাখার বিষয়ে একটু সতর্ক হতে বাধ্য হল হেমন্ত।

দারোয়ান আর ছিল না, রান্নার লোকও মধ্যে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, নিজেই রান্না করত। এখন বাইরের কাজ বাড়ায়—প্রকৃতপক্ষে একটা ছোটখাটো কনট্রাক্টরের কাজই করতে হচ্ছিল তাকে, বালিগঞ্জের নতুন বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেলেও কোথাও-না-কোথাও মিস্ত্রি খাটানো লেগেই থাকে প্রায়, বাড়ি ফিরেও হিসেব নিয়ে বসতে হয় আবার—রান্না-খাওয়ার সময় থাকে না। সে জন্যেও বটে আর বাইরের বাজার-হাট, পোস্ট-আপিসে যাওয়া এসবের জন্যে পুরুষ একটা দরকার বলেও বটে—সে আবার ঠাকুর রেখেছে। ঠাকুরকেই বলে দিল সে, ভেতরে কেউ এসে গেলে কিংবা বাইরে চলে গেলেই যাতে দরজা বন্ধ হয় সেদিকে কড়া নজর রাখবে; নিজে কোথাও যাবার সময় চারুর মাকে দরজা দিতে বলে যাবে; চেনা লোক ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবে না—কেউ এলে ভেতরে খবর দিতে আসবে যখন, দরজা বন্ধ ক'রে আসবে। তাতে কোন ভদ্রলোক রাগ করেন সে দায়িত্ব হেমন্তর। নাম, কোথা থেকে কি কাজে এসেছেন—ভাল ক'রে জেনে এসে অনুমতি নিয়ে তবে ওপরে আসতে দেবে। ভাড়াটেরা তাদের বাইরের ঘর দিয়ে যাতায়াত করে, সুতরাং এ ব্যবস্থায় তাদের কোন অসুবিধা ঘটবে না।

এই বাড়তি ঝঞ্ঝাটের জন্যে সে এক টাকা ক'রে মাইনে বাড়িয়ে দিল ঠাকুরের।...

তবে তাতেও অব্যাহতি পাওয়া গেল না।

আজকাল বাড়ি দেখতে যাওয়া একটা কাজ হয়েছে, প্রায়ই বেরুতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পছন্দ হয় না—মানে বাড়ির অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে দামের সামঞ্জস্য হয় না, তবু দেখতেও

যেতে হয়। কোন্‌টা পছন্দসই হবে, না দেখে স্থির করা সম্ভব নয়।

একদিন এমনিই একটা বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল দালাল। কাছাকাছি বলে হেঁটেই গিয়েছিল, হেঁটেই ফিরছে—বাড়ির সামনে আসতে একটি ছোকরা এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করল।

ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, বিরাট য়্যালবার্ট-টেরিকাটা লক্‌কা লক্‌কা চেহারা, দূর থেকেই দেখেছে হেমন্ত—আলোর খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বার্ডসাই টানছে। ওকে দেখেই সেটা যে ফেলে দিয়েছে তাও লক্ষ্য করেছে—অতর্কিতে ফেলতে হয়েছে বলে চিহ্নটা গোপন করতে পারে নি, এখনও নাক দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কাছে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে সস্তা চুরুটের কড়া গন্ধে মাথা ধরে উঠল।

বিরক্তিই বোধ করার কথা, করলও একটু। এমন উপদ্রব বেশী দিন চললে এ পাড়াও ছেড়ে দিতে হবে—বালিগঞ্জের নতুন বাড়ি এখনও বিক্রী হয় নি, সেখানে গিয়েই উঠতে হবে, পুরনো বাড়িতেও একখানা ঘর আছে—যাতায়াতের খরচ বেশী পড়বে—কিন্তু তার আর উপায় কি?

কয়েক লহমার মধ্যে কথাগুলো খেলে গেল মাথায়। তবু কে জানে কেন, এই ছোকরার মুখের দিকে চেয়ে কেমন মনে হল—এর মুখটা একেবারে অপরিচিত নয়। কোন একটা পরিচিত প্রিয় মুখের সঙ্গে কোথায় একটা আদল আছে। চড়ানো গাল, কোটরগত চক্ষু—ঈষৎ রক্তাভ—একমাথা চুলে আধুনিক উৎকট টেরি—সবটাই বখা ছেলের লক্ষণ—রোগা, তার ওপর এই বয়সেই একটু কোলকুঁজো হয়ে পড়েছে—মুখে নানাবিধ অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট, তবু কে জানে কেন, হয়ত চাহনিটা সরল বলেই—মনটা আপনিই কোমল হয়ে এল একটু।

কিন্তু কোমল হলে চলবে না। মনকে শাসন ক'রে কণ্ঠস্বর রুক্ষ করায়।

'কি চাই ?'

ছেলেটি বার-দুই মাথা চুলকে বলে ফেলে, 'আমি—মানে আমি শিবু, দিদি !'

শিবু ! চন্দ্রশেখর !

ও, তাই কোথায় যেন মুখটা দেখেছে বলে মনে হচ্ছে। মনে পড়া সম্ভব নয়, মার সঙ্গে মুখের সাদৃশ্য আছে বলেই এই ভাবটা মনে এসেছে।

মনে পড়ল দাদার কথা, 'একেবারেই বিগড়ে গেছে শিবু। নেশাভাঙ করে, বাড়ি আসে না—হয়ত চরিত্রও খারাপ, বাবা কিছু বললে তেড়ে মারতে আসে—।' চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে পাচ্ছে কথাগুলো।

মুখে যতদূর সম্ভব বিরক্তি টেনে এনে বলল, 'অ ! তা এখানে কি মনে ক'রে ? কি চাই ?'

এবার হেসে ফেলে শিবু, বলে, 'কি চাই বললেই দেবে ? আমি যা চাই তা তো বুঝতেই পারছ। টাকা চাই। কোথাও কিছু জোটে নি, ট্যাঁক গড়ের মাঠ একেবারে। তাই অনেক খুঁজে এইছি। ক'দিন আগেই বাড়িতে পরামর্শ হচ্ছিল কিনা—আমাকে ওরা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না তো—আমি কিন্তু কান খাড়া ক'রে সব শুনে নিইছি—তোমার অনেক টাকা, তোমাকে গিয়ে ধরলে যদি কিছু দাও, কি সব ক'বছরের টেক্স খাজনা দেওয়া হয় নি, শীতের কাপড়-জামা নেই—তাই তোমার কাছে আসা। জানি না কি হয়েছে, দাদা তো চোখ-মুখ লাল ক'রে ফিরল, বুঝলুম তোমাকে গলাতে পারে নি। সেই দেখে আমারও ভরসা হয় নি আর এদিকে ঘেঁষতে। নিহাৎ আজ কোথাও থেকে আর কিছু পাবার আশা নেই বলেই—এক বন্ধু ছিল আমার মতোই হতভাগা, সে আবার কোথায় চলে গেছে, নিরুদ্দেশ। বন্ধুটা বেশ যোগাড়ে ছিল, যখন এই রকম অবস্থা হত ঠিক কাউকে তাপ্পি দিয়ে টাকাটা সিকিটা বার ক'রে আনত। সে গিয়েই আরও—তাই মরীয়া হয়েই এসে পড়লুম

তোমার কাছে। বলি আমি তো আর ওদের মতো মানুষ নই—আমার অত মান-অপমানও নেই, তাড়িয়ে দাও চলে যাব— ।'

'তা মানুষ হোস নি কেন?' আপনিই বেরিয়ে আসে প্রশ্নটা, নিজের অজ্ঞাতসারেই। মনটা অকারণেই কোমল হয়ে আসে।

দেখা গেল মানুষ হোক না হোক, বোকা নয় শিবু। এই কোমলতাটা তার বুঝতে দেরি হয় না। সে উৎসাহিত হয়ে বলে, 'তা বাড়ি ঢুকব না? ভয় নেই, বেশীক্ষণ থাকব না। কিছু যদি খেতে দাও খাব, ঐ সঙ্গে কিছু দক্ষিণে পাই আরও ভাল, তার পরই চলে যাব।'

ওর রকম-সকম দেখে হাসি পায় হেমন্তর। বলে, 'তা চলো। তবে সত্যিই বেশীক্ষণ বসা চলবে না। তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা আমার ঘুচে গেছে অনেক দিন। আমার বাপ-ভাই মরে গেছে বলেই আমি জানি।'

'সে বাবা আর দাদা। আমাকে মেরো না দিদি এরই মধ্যে—দোহাই! আমি তো তোমার কাছে এই সবে জন্মালুম। আমাকে তো হিসেবের মধ্যেই ধরা ছিল না। আমি যে আছি তাই তো জানতে না। তাহলে সে-অতদিন আগে মরব কেমন ক'রে?'

ভেতরে এসে চারুর মার পেতে দেওয়া আসনখানা টেনে একটা দেওয়ালের দিকে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে জুৎ ক'রে।

উনুন ধরানোই ছিল, হেমন্তর নির্দেশে ঠাকুর ক'খানা লুচি ভেজে লুচি আর রসগোল্লা সন্দেশ সাজিয়ে দেয় জল খেতে। গণ্ডুষ ইত্যাদির বালাই তো নেই-ই, হাতও ধোয় না শিবু। রেকাবীটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু ক'রে দেয়। বলে, 'বাঁচালে ভাই, কি বলে যে আশীর্বাদ করব! যে নেশা করি তাতে একটু দুধ-মিষ্টির জন্যে প্রাণটা আইঢাই করে—কে দিচ্ছে বলো! অনেক দিন এমন জুতের ভোজ জোটে নি অদৃষ্টে!'

'তা কেন, নেশাভাঙ করোই বা কেন? বামুনের ছেলে, গুরু বংশের ছেলে—লেখাপড়া শিখতে পারো নি?'

'হয়ে ওঠে নি। ঐ গুরু বংশের ছেলে হওয়াটাই কাল হয়েছে। ভণ্ডামি দেখে দেখে সমস্ত ব্যাপারটার ওপরই ঘেন্না হয়ে গেছল। বিশেষ ঐ বাবাটাকে সহ্য করতে পারি না একেবারে। এমন স্বার্থপর লোক যদি দুটি দেখেছ সংসারে!...তাই মাথায় ঢুকে গেছল বাবা যা বলবে তার উল্‌টোটা করব। সেই জন্যেই লেখাপড়া শেখা হল না—বদ সঙ্গে পড়ে নেশাভাঙ ক'রে উচ্ছন্নয় গেলুম। তবু রক্ষে যে, মদটা ধরি নি। একেবারে খাই নি যে তা নয়, দু-একদিন চেখে দেখেছি, কিন্তু ওতে দেদার পয়সা লাগে। তাছাড়া—হুঁশজ্ঞান থাকে না, নদ্দমায় গড়াগড়ি যায় নেশার ধমকে—দেখে দেখে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছল গোড়া থেকেই, তাই বেঁচে গিইছি!'

অকস্মাৎ একটা অকারণ মমতায় যেন চোখে জল এসে যায় হেমন্তর।

অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে, 'তা এখনও তো ফেরা যায়, সময় তো যায় নি! কতই বা বয়েস তোর?'

কিছুক্ষণ বসে লুচি চিবোতে থাকে শিবু, যেন কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করে বসে বসে। তারপর বলে, 'নাঃ, ও আর হবে না। মিথ্যে স্তোক দিয়ে লাভ নেই তোমাকে। অনেক দিনের অব্যেস হয়ে গেল—এ কি ছাড়তে পারব? তাছাড়া বকাটে বাউণ্ডুলে স্বভাব হয়ে গেছে, আর শোধরানো যাবে না। বদ সংসর্গের বড় কড়া টান, কেউ এসে ডাক দিলেই চড়ুকে পিঠ সুড়সুড় ক'রে উঠবে থাকতে পারব না, দলে ভিড়ে যাব আবার।'

'কিন্তু এইভাবেই কি চলবে? বিয়ে-থা সংসার-ধর্ম করতে হবে না?...রোজগার-পাতি? কে তোকে বারো মাস নেশার পয়সা যোগাবে?'

'কে আর যোগাবে! না যোগানোই তো ভাল। পয়সা না জুটলে ও কম্ম আর হবেও না।...আর সংসার-ধম্ম? সে তো মানুষে

করে দিদি। আমি কি একটা মানুষ? এমনিভাবে চলতে চলতে একদিন কোথাও পড়ে মরে থাকব—চুকে যাবে ল্যাটা, পুলিশে এসে ডোম ডেকে মুর্দো সাফ করাবে।'

খাওয়া শেষ ক'রে কি ভাগ্যি উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে আসে কল থেকে।

হেমন্তও আর কথা বাড়ায় না। একবার মনে হয় কাছে রেখে দেয়, সংশোধনের চেষ্টা করে। তার পরই বোঝে বৃথা চেষ্টা। বদভ্যাস এতদূর মূল বিস্তার করেছে—তার উচ্ছেদ আর সম্ভব হবে না। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে চারটে টাকা বার ক'রে এনে ওর হাতে দেয়।

টাকার পরিমাণটা দেখে দুই চোখ যেন চকচক ক'রে ওঠে শিবুর।

বলে, 'এত দিলে! অনেক দিন এত টাকা একসঙ্গে চোখেই দেখি নি। ভালই হল, ছোট ভাইপোটা বড্ড কাকা-কাকা করে—ঐ একজনই যা টানে ও বাড়ির মধ্যে—কখনও এক পয়সার একটা পুতুল নিয়ে যেতে পারি না—দেখি যদি সব উড়িয়ে না দিই পথের মধ্যেই—কিছু একটা নিয়ে যাব ওর জন্যে!'

হেমন্ত নিজের ভুলটা বোঝে। প্রথমেই এত টাকা দেওয়া উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব সংশোধনের চেষ্টায় বলে, 'কিন্তু ঘন ঘন এলে পাবে না, তা আগেই বলে দিচ্ছি। আমার যে-কথা সেই কাজ।··তোমার দাদাকে যেমন তাড়িয়েছি তেমনিভাবে তোমাকেও তাড়াব তাহলে ঐ বাইরে থেকেই—দূর দূর ক'রে। আমার কেউ নেই এ পৃথিবীতে আপনার লোক, কারও ওপর আমার এক কড়ারও টান নেই।'

শিবু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'আমাকেও তেমন বোকা পাও নি যে, তোমার মতো শাঁসালো মক্কেলকে জ্বালাতন ক'রে মূলো-তোলা করব!···এক বছর। দেখে নিও, এক বছরের মধ্যে যদি তোমার চৌকাট মাড়াই তো কি বলেছি?'

সে তর তর ক'রে—তুটো ধাপ একসঙ্গে ডিঙোতে ডিঙোতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।

শিবু তার কথা রাখতে পারে নি কিন্তু—শেষ পর্যন্ত।

এই দেখা হওয়ার ছ'মাসের মাথাতেই আর একদিন এসে হাজির হয়েছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন, হেমন্ত তার পুজোর পর্ব শেষ ক'রে উঠে—সবে-দিয়ে-যাওয়া সাপ্তাহিক খবরের কাগজখানা খুলে বসেছে—ঝি এসে খবর দিলে, 'তোমার সেই ছোট ভাই এয়েছে গো দিদিবাবু, বলে, দিদিকে গিয়ে বলো আমার কথার খেলাপ করি না আমি, টাকা চাইতে আসি নি, অন্য খুব জরুরী কাজে এইছি।·· ও দিদি, তেনার তুই চোখ যেন করমচার মতো লাল—'

'গুচ্ছের কি সব নেশা করেছে আর কি! গাঁজাফাঁজা খায়, যা বুঝলুম কথার ভাবে। তাতেই বেভ্‌ভুল হয়ে চলে এসেছে ঝোঁকের মাথায় হয়ত—' হেমন্ত অপ্রসন্ন মুখে বলে।

'না গো দিদি—নেশা নয়।' চারুর মা বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'নেশা হলে বুঝতে পারতুম, এ অন্য জিনিস। মনে হচ্ছে খুব কাঁদাকাটা করেছে।'

ভ্রূকুটি ঘনতর হয় হেমন্তর। বলে, 'নিয়ে আয় ওপরে, আসনটা পেতে দে।'

ওপরে এসে কিন্তু বসে না শিবু, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি কিন্তু নিজে থেকে আসি নি দিদি, আমাকে যেন দোষ দিও না—সবাই মিলে হাতে-পায়ে ধরে পাঠিয়েছে—'

গলার আওয়াজেই হেমন্ত বুঝতে পারে যে, চারুর মার অনুমানই ঠিক, কণ্ঠস্বর অশ্রুতে বা তার আভাসেই এত গাঢ়। তাছাড়াও, কথা বলছে যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

সে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে, 'তা এত হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'এতটা পথ হেঁটে—প্রায় দৌড়েই বলতে পারো—এইছি যে!

নিছাৎ আসার আগে জগা তেলেভাজাওলার দোকান থেকে কষে একটান গাঁজা টেনে এসেছিলুম তাই—নইলে কি সোজা পথ এটা, আড়াই কোশ বেওজর!'

তারপর মিনিটখানেক যেন দম নিয়ে বলে, 'বুড়োর বোধ হয় শেষ সময় উপস্থিত। তোমাকে একবার দেখতে চায়! বলে তো মাপ চাইবে নাকি—অন্যাই যে করেছে তা বেশ বুঝেছে—সেইটেই বলে যাবে।...তা তবু আমি সহজে আসতে চাই নি—বুড়ো যখন আমারও হাত ধরে বললে, আমাকে মাপ করিস শিবু। আমি বাপ হয়ে কখনও বাপের কাজ করি নি—আমি ঘোর পাপী, তখন যেন কেমন হয়ে গেল, কান্না পেয়ে গেল গুচ্ছের, তাই আর থাকতে পারলুম না। গাড়িভাড়ার পয়সাও তো নেই, ইদিকেও সময় নেই—হেঁটে আসা ছাড়া উপায় কি বলো, বেশ জোরেই হাঁটতে হয়েছে। তা ঐ বুড়োর কথাতেই আসা। যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছে!'

হেমন্ত বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। অনেক দিনের অনেক বিস্মৃত আবেগ, অনেক অভিমান, অনেক রোষ—একসঙ্গে যেন ভীড় ক'রে আসে মনের মধ্যে। সেটা সামলে নিয়ে গলা পরিষ্কার ক'রে দৃঢ়স্বরে বলে, 'না ভাই, আমার যাওয়ার কোন কারণ নেই। যার কথা বলছ, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার বাপ-ভাই মরে গেছে বহুদিন। তারা যদি বেঁচে থাকত তাহলে বোধহয় আজ এমন ক'রে—আমার বলতে একমাত্র যে ছিল পৃথিবীতে—সেই ছেলেকে হারিয়ে পথের ভিখিরীর অধম হতে হত না। তোমার বাবা—তোমার দুঃখ তো হতেই পারে—কিন্তু আমার কেউ নয় ও, কোন কালেই ছিল না। যে ছিল সেও আমার মাকে খুন করেছে, আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছে—নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু ভাবে নি কোনদিন—এই পরিচয়েই তাকে জানতুম!...সে যাক গে, তুই বোস, কিছু খেয়ে যা—'

'না, থাকগে। দেরি হয়ে যাবে।'

'কিছু দেরি হবে না।' একরকম ধমক দিয়ে ওঠে হেমন্ত, 'ঘরে মিষ্টি আনা আছে, দুটো গালে ফেলে যা।'

মিষ্টির সঙ্গে একবাটি দুধও এনে, জোর ক'রে খাইয়ে দিলে একরকম।

শিবু বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কোন-মতে খেয়ে নিলে। খাওয়া শেষ হতে হেমন্ত ওর হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, 'যাবার সময় আর হেঁটে যেও না, তাড়াতাড়ি যাওয়াও তো দরকার। এই মোড়েই গাড়ি পাবে—একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে চলে যাও। দেড় টাকার বেশি নেবার কথা নয়—বেশী নেয় বেশীই দিও। হেঁটে যেও না কিন্তু!'

শিবু কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। টাকাটা হাতে নিয়ে একটু অবাক হয়েই চেয়ে থাকে—বলে, 'কে জানে তোকে যেন ঠিক বুঝতে পারি নে দিদি। ওরা যদি কেউই নয়—তাহলে আমার ওপরে এত টান কেন? সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে ঝোঁকের মাথায় এতটা দৌড়ে এসে, বুকের মধ্যেটায় টান লাগছে কেমন—'

করুণ হাসে হেমন্ত। বলে, 'সে তো তুই-ই সেদিন বলেছিলি, ওরা মরে গেছে, কিন্তু তুই তো এই সেদিন জন্মালি আমার কাছে!'

আর কিছু বলে না শিবু।

সেদিনের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে নয়—আস্তে আস্তেই নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।

॥ ৪ ॥

এর পর অবশ্য আর অনেকদিন কেউ আসে নি।

ও বাড়ি বেচে শাঁখারিটোলায় চলে আসাও তার একটা কারণ হতে পারে। নতুন পাড়া, তাছাড়া কিছুদিন ঘোরাঘুরিটাও বন্ধ আছে। ঠিকানাটা ঠিক যোগাড় করতে পারে নি সবাই।

কেবল শিবুই আসে মধ্যে মধ্যে। এখানেও এসেছে। দৈবাৎ এখানে আসার আগে দেখা হয়েছিল—ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিল হেমন্ত।

সেও আসে বছর ছ'-মাস অন্তর। উল্কার মতো হঠাৎ এসে পড়ে, হয়ত কোনদিন ভাতও খায় এসে কিংবা একটু মিষ্টি, দুটো-একটা টাকা নেয়, চলে যায় আবার। কোথায় থাকে কি করে তা বলে না, বাড়িতে থাকে না বেশির ভাগ সময়ই। চেহারা যা হচ্ছে, বাঁচবেও না বেশী দিন মনে হয়। তবু ফেরাতেও পারে না। কোন কথাই শোনে না, হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, 'বেঁচে কি হবে আমার? কার কি কাজে আসব বলো! শিগগির শিগগির শেষ হয়ে যাওয়াই তো ভাল।' দেখেশুনে হাল ছেড়ে দিয়েছে হেমন্ত। আর সবাই যখন গেছে, ওর জন্যেই বা ভেবে কি হবে? ছেঁড়াচুলে খোঁপা-বাঁধতে যাওয়া!

বাইরে ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে হয়েছে নানা কারণে।

দেশে শান্তি বা স্থিতিশীলতা নেই। অতবড় স্বদেশী আন্দোলন গেল—অত হ্যাঙ্গাম-হুজ্জৎ দেশব্যাপী একটা অশান্তির তরঙ্গ—তাতে অত ক্ষতি হয় নি। এখন এই কোথায় যেন একটা খুব গোলমাল—লড়াই বাধবে নাকি—তা সেই লড়াই বাধবার সূচনা বা উপক্রমণিকা থেকেই টাকার বাজারে বড় টালমাটাল যাচ্ছে। বাড়ি জমি যাদের আছে তারা বেশী দাম চাইছে—অথচ বাজারে খদ্দের কম। দু-একটা লেনদেনে কোনমতে কেনা দাম উঠেছে, একটাতে কিছু লোকসানও দিতে হয়েছে। তাই দেখে পূর্ণবাবুই পরামর্শ দিয়েছেন, 'এত হাঁকড়পাঁকড় করার দরকারই বা কি! যা ক'রে নিয়েছো তাতে তিন জন্ম বসে খেতে পারবে। বরং বেশী লোভ করতে গেলেই হয়ত অতি-লোভে-তাঁতি-নষ্ট—সেই কম্ম হবে। দিনকতক একটু চুপ ক'রে বসে থাকো দিকি। একটু জিরোও। খাটলেও তো কম নয়। বসে বসে দেশের হাওয়া কোন্ দিকে যাচ্ছে একটু লক্ষ্য করো। এই যে লড়াই বাধল—এর কি ফলাফল হয় তাও ভাখো। সবাই বলছে ইংরেজ হারবে, তাহলে তো ঘোর অরাজকতা।

যাওয়ার আগে মরণ-কামড় দেবে হয়ত ইংরেজ, টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়াও আশ্চর্য নয়। খুব টাকা রোজগার হচ্ছে এ দুর্নাম এখন না হওয়াই ভাল, হ্যাঁ—যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ধন-অপবাদ ভাল নয়। যুগে যুগেই—এই রকমের হানাহানিতে বড়লোক, ব্যবসাদাররা মার খেয়েছে, ডাকাত-লুটেরাদের পোয়া-বারো।···কাজ-কারবার বন্ধ ক'রে দিনকতক হাত গুটিয়ে বসে থাকো।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। শোনেও।

টাকার জন্যেই যে এই কারবার শুরু করেছিল—বা করছিল, তাও তো ঠিক নয়।

আসলে কিছু একটা কাজ ছাড়া থাকা সম্ভব নয় বলেই আরও এই ভূতের মতো উদয়াস্ত পরিশ্রম। ভেতরের শূন্যতা ও হাহাকার ভোলার জন্যেই দিনরাত মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখা। এটা এখন নেশা নয়, একটা জীবনের অবলম্বনও। চুপচাপ বসে থাকলেই কেবল মনে পড়ে যে, ওর কেউ কোথাও নেই। জীবনে কোন আশা বা আশ্বাস নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই। একেবারেই নিঃসঙ্গ, নিরাত্মীয় সে।

কিন্তু তবু—কী আর করা যাবে! লোকসান দেওয়ার থেকে দু-চার দিন চেপে থেকে বাজারের হাবভাব দেখাই ভাল। দালালরা আসা-যাওয়া করছে—সেদিকে খোঁজ-খবর যে না রাখছে তা নয়। কিন্তু বুঝতে পারছে না ঠিক, মানুষের মনের আর পয়সার গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে।···

এমনি একটা কর্মহীনতা ও অবলম্বনহীনতার মধ্যেই—ওর পূর্ব-জীবনের একটা হারিয়ে যাওয়া অধ্যায় আবার যেন এক প্রেতমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে উঠে এল, বিস্মৃতির শ্মশান-শয্যা থেকে।···

সেদিন ঝি যখন এসে খবর দিলে, 'কে একজন লোক দেখা করতে চায়'—তখন স্নানাহার শেষ ক'রে সবে একটু শুয়েছে হেমন্ত, তন্দ্রার ভাবও এসেছে একটু, তার মধ্যেই জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম লোক?'

চারুর মা বললে, 'কোন দুঃখী লোক বলেই মনে হয়, কোরা

কাপড়ের ওপর একটা তালি দেওয়া ময়লা জামা, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো—হাতে একটা গামছায় বাঁধা কি পুঁটুলি—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে তেমনি নিদ্রালু কণ্ঠেই বলে উঠল, 'ব্যস, ব্যস, বুঝে নিয়েছি। আমার হিতেকাঙ্ক্ষী কেউ। বলগে যা, দেখা হবে না।' বলেই পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টা-দুই পরে ঘুম থেকে উঠতে চারুর মা খবর দিল, 'সেই লোকটা ঠায় বসে আছে দিদি, ঐ সামনের রকে—।'

বিরক্তিতে মনটা খিঁচড়ে যায় হেমন্তর।

এ পাড়াও ছাড়তে হবে দেখছি, না হলে আর শান্তি থাকবে না। শুরু হয়ে গেল এখানেও। কিন্তু কোন্ পাড়াতেই বা যাবে, যেখানে যাবে সেখানের খবর কি আর বার করতে পারবে না কেউ?

বিরক্তও হয়—তেমনি কৌতূহলীও হয় একটু।

উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ায়। আত্মীয় তো বটেই, সে তো বোঝাই যাচ্ছে—প্রশ্ন, কোন্ তরফের?

কিন্তু জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠল।

এ কে?···কে এ? এতকাল পরে কোথা থেকে এল?

মৃত্যুর কোন্ পার থেকে?

হরিচরণ!

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই আকার ও আকৃতি।

হাত-পা কাঠি-কাঠি, পেটটি ডাগর, পোড়া তামাটে-তামাটে রঙ; কেশবিরল একখানি মাথা, চোখ দুটি ঈষৎ হরিদ্রাভ—দুষ্ট যকৃতের লক্ষণ; কতকাল স্নান করে নি, সর্বাঙ্গে খড়ি উঠছে, যে ক'টি চুল আছে তাও শনের মতো শুকনো খাড়া-খাড়া। এক কথায় আপাদমস্তক হরিচরণ।

অবাক হয়ে তাকিয়েই আছে, ছেলেটি হঠাৎ চোখ তুলে এদিকে চেয়ে দেখলে একবার। চোখোচোখি হতেই বিনীত অপ্রতিভের

হাসি হেসে বললে, 'জ্যাঠাইমা, আমি গো, সাধুচরণ।···অনেকক্ষণ বসে আছি। সেই ভোরে বেইরেছি বাড়ি থেকে, পেটে একটুন্ জলও পড়ে নি।'

সাধুচরণ নাম মনে পড়ে না। শোনে নি অবশ্যই। শোনবার কথাও নয়। তবে জ্যাঠাইমা যখন বলছে—আন্দাজে বোঝা যায় —ছোট দেওরের ছেলে। সে যখন চলে আসে তখনই দেওরের বিয়ের কথা হচ্ছিল, সম্ভবত তার পরই সেটা হয়ে গেছে। আর, বছর-দুইয়ের মধ্যেই যদি ছেলে হয়ে থাকে তো—এই বয়সীই হবার কথা। তারকের থেকে বছর ছয়েকের কি আটের ছোট।

কী করবে, রূঢ় হবে, চিনতে না পারার ভাব করবে, কি বাড়িতে আসতে বলবে—মন স্থির করার আগেই সাধুচরণ রোয়াক থেকে গুটি-গুটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে ওপরে উঠে এল, তার পর পুঁটুলিটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে গড় হয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ও জিভে ঠেকিয়ে সেইখানেই বসে পড়ল।

'পায়ে আর কিছু নেই জ্যাঠাইমা, এতটা পথ হেঁটে আসা—ঘোরাঘুরি—তারপর ধরো দাঁড়িয়েই আছি অমন পাঁচ দণ্ড। দোর খুলবে না এখন, বুঝে—শেষে ঐ ওদের দাওয়ায় গে বসলুম। তাও ভয়—চোর বলে বুঝি বা পুলিশে দেয়।'

'তা এত কাণ্ড করার দরকারই বা কি ছিল? আমার কাছে কেন?' বিরসকণ্ঠেই প্রশ্ন করে হেমন্ত। এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে যেন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'কিছু না, এমনিই।' খুব সহজভাবেই উত্তর দেয় সাধুচরণ, 'শুনি তো তোমার কথা—দেখা তো হয় নি কখনও। আরও একবার এয়েছিনু কেউ জানত না—বাড়ি থেকে পাইলেই এয়েছিনু বলতে গেলে—সে অনেক দিনের কথা, তখন ছেলেমানুষ, তারক-দার খুব ভাল চাকরি হয়েছে বলাবলি করছেল জ্যাঠারা, ভালভাবে ডাক্তারি পাশ করেছে শুনে ত্যাখন থেকে দেখার ইচ্ছে, শরীল তো ভাল না—ভেবেছিনু যদি দাদা কৃপা ক'রে কাছে

রাখে—চাকর-বেয়ারাও তো দরকার হবে—তা ফাঁক পেয়ে আসব-আসব করছি, ইরিমধ্যে শুনন্নু দাদার ভারী ব্যামো; শোনামাত্তকই বেইরে পড়েছিন্নু দেশ থেকে—যা পাওয়া যায় ফল-ফলুরী নে—তা এসে শুনন্নু তোমরা বাইরে কোথায় কোন্ পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে গেছ। সে এবাড়ি নয়—এর চেয়ে বড় একটা বাড়ি ছেল—তা কী আর করব, দারোয়ান ছেল সে বাড়িতে, সে তো আর আমাকে চেনে না, ফল-পাকড়গুলো তাকেই দিতে—সে এক পাত ভাত ধরে দিলে, খেয়ে ফিরে গেন্নু। তার পরও একবার এয়েছিন্নু—তখন তুমি কোথায় থাকো কেউ বলতে পারলে না। তার পর তো দেখি বাড়িতে অপর নোক সব।'

এইবার হেমন্তর মনে পড়ল কথাটা।

দারোয়ান শিউপূজন বলেছিল বটে যে, কে একজন এসেছিল ওরা দার্জিলিং চলে গেলে খোঁজ করতে—ষোল-সতেরো বছরের ছেলে—কিছু ফলমূল হাতে নিয়ে।···তখন এ-সব কথায় কান দেবার মতো অবস্থা নয় মনের—দেয় নি। তার পরও মনে ছিল না যে, ভাল ক'রে জিজ্ঞেস করবে। তবু স্মৃতির কোন্ অন্ধ গুহায় কথাটা থেকেই গিয়েছিল। আজ মনে পড়ল।···

কানে গেল সাধুচরণ বলছে, 'শরীল ভাল না জ্যাঠাইমা, কাল-রোগ ধরেছে, এই গ্যাখো কথা কইছি ভাল মানুষের মতো, এখুনি হয়তো কম্প দিয়ে ভালুকের মতো জ্বর আসবে। ত্যাখন একেবারে জন্তু হয়ে যাব। তাছাড়া পেটও ভাল না, পিলেলিবর পেটজোড়া—ডাক্তাররা বলে। তা চিকেচ্ছে করানোর তো পয়সা নেই, যা করে ঐ হাসপাতালের ডাক্তার—দু'কোশ পথ ভেঙে হাসপাতালে গেলে এক শিশি মিক্‌চার মিলবে, তা সে ছুটি দিনের মতো, গোনা ছ' দাগ।···রোজ রোজ য্যাত্‌টা পথ হাঁটা যায়—তুমিই বলো না?···তাই বলি, বেশীদিন তো আর নয়, শেষই তো হয়ে এল—মানুষটাকে কখনও দেখি নি—মরার আগে চোখে দেখেই যাই একবার। আমি কিছু চাইতে আসি নি, বিধবাটাকে রেখে যাব, অল্প বয়েস আর ঐ

একটা গুয়ের গোবলা ছেলে—ত্যাখন যদি ছিচরণে আচ্ছুয় দাও একটু! ওখেনে থাকলে সেও বাঁচবে না!'

হেমন্ত শুনছিল কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই। সে চেয়ে ছিল সাধুচরণের চোখ দুটোর দিকে। ঠিক তেমনি চোখের চাউনিটা পর্যন্ত। অবিকল হরিচরণ একেবারে। মনে হচ্ছে, সেই আকার ধরে কোন আত্মা এসেছে, সবটাই অবাস্তব, অশরীরী ছায়ামূর্তি।

কী-ই বা বয়স ওর, তারকের থেকেও কত ছোট, এখনই মৃত্যুর কথা ভাবছে, বিধবা বৌ ও ছেলের কথা!

কেউই বাঁচবে না ও-বংশে, ঐ লোকগুলো নিজেদের পাপেই নির্বংশ হয়ে যাবে। একটার পর একটা বৌ বিধবা হবে। তারই মতো অবস্থা হবে হয়ত—শিশুসন্তান নিয়ে বিধবা বৌয়ের। হয়ত এর বিষয়ের অংশ নিয়েও তেমনি কামড়াকামড়ি করবে এর জ্যাঠারা।...

মন কোথায় চলে গিয়েছিল, কোন্ সুদূর অতীতে। নিজের দুর্ভাগ্যের স্মৃতিতে ডুব দিয়েছিল। হঠাৎ এক সময় যেন আবার বাস্তবে নেমে এসে দেখল, সাধু একটু অবাক হয়ে কেমন এক ধরনের উৎসুক দীন চোখে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

মায়াও হয়। কোনই কারণ নেই ও-বংশের কারও প্রতি মায়া হবার, ঝাড়বংশ সব সমান, সবাই পাজী; তা জেনেও মায়া হয়।

বলে, 'তা তোমার মা-বাবা?'

'হুঁ!' গলায় জোর দিয়ে হাসে সাধুচরণ। বলে, 'বাবাও তো অক্কা গো—এই বছর-চারেক হল। মা-টা ছিল, তা জানোই তো ও-বাড়ির হাল, এমন ক্যাচা-খেউ ক'রে লাগল সব্বাই—তবু তো ঠাকুমা নেই, ঠাকুমার কী হল জানো তো, গিরিণী অস্বস্তির ব্যামো, শেষকালটায়—যেমন পেছনে লেগেছেল তোমাদের—তেমনি শাস্তি; গুয়েমুতে সব্বাঙ্গে নোংরা মেখে পড়ে থাকত, কেউ উঁকি মারত না, কাঠি ক'রেও ছুঁত না—এই আমি, এই শম্মা, ত্যাখন আমার কতই বা বয়েস—তবু আমিই কাছে যেতুন, জলটা খাবারটা দিয়ে আসতুন

—য়্যাকো য়্যাকো দিন কঁ্যাথাকানিগুলো নে গে পগারের জলে ধুয়ে দিতুন—তা হ্যাঁ—কী যেন বলছিনু—মায়ের কথা, মাও ও-বাড়ির যে ধারা, সেই ধারায় গেল, আড়া থেকে গলায় দড়ি দে ঝুলল একদিন। রাতারাতি ওরা রাষ্ট দিলে যে, ওলাউঠো হয়ে মরেছে।···তা আমাদের ও-বাড়ির কথা জানে তো সবাই, কেউ কি আর এত ভদ্দরতামাক্কিক কথা সহজে বিশ্বেস করে? জানাজানি কানাকানি—শেষে থানা-পুলিশও হল—দারোগা এল বাড়িতে খোঁজ করতে, ত্যাখন এই শম্মার পায়ে ধরতে হল শেষকালে, কি করি—বংশের কেলেঙ্কার তো য্যাতই হোক, আমিই বনু, যে, হ্যাঁ—ওলাউঠোই ঠিক। তবে ঐ জ্যাঠা হারামজাদারা ছাড়া পায়!···'

চারুর মা এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ কি রকম অভ্যর্থনা হবে জানতে চায়। চোখে নীরব প্রশ্ন, জলখাবার দেব, না গলাধাক্কা?

হেমন্ত তবুও যেন মন স্থির করতে পারে না। কতকটা সময় নেবার জন্যেই বলে, 'সঙ্গে কি ও?'

'এই বাগানের দু-চারটে ফল—। আর গামছা একখানা।'

'ওতে আমার দরকার নেই বাবা, ও তুমি কাউকে ডেকে দিয়ে দাও। ও বাড়ির দুব্বো ঘাসে পর্যন্ত পাপ, ও আমি ছোঁব না।··· চারুর মা, ঠাকুরকে বল—কাঠের উনুনে একটু জল গরম ক'রে দিতে। চান করুক, একটু মিছরি ভিজিয়ে দে—শরবৎ খাক এখন। তারপর সকাল ক'রে চাটটি ভাত ক'রে দেয় যেন, নিরিমিষ কাঁচকলা পটলের ঝোল আর ভাত, তেল কম—লঙ্কা সর্ষে বাদ।··· কিন্তু পরবে কি, এ বাড়িতে তো ধুতির পাট নেই।'

সাধুচরণ একটু ইতস্তত: ক'রে বলে, 'তা দাদার কাপড়-চোপড় এক-আধখানা পড়ে নেই?'

'না, সে আমি রাখি নি। আর রাখলেও তোমাকে দিতুম না পরতে।···শাড়িই পরো এখন। আমার আগেকার সরু পাড় শাড়ির ক'খানা পড়ে আছে এখনও—।'

দৈবক্রমে সেদিনই পূর্ণবাবু এসে গেলেন। আজকাল আর রোজ এধারে আসতে পারেন না, কষ্ট হয়। সাত-আট দিন অন্তর একদিন হয়ত এক-আধ ঘণ্টার জন্যে এসে খবর নিয়ে যান।

সাধুচরণের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ শুনে খুব হাসলেন খানিকটা।

বললেন, 'য়্যাঁ, বলো কি! ওর বাপ-জ্যাঠারা যা পারে নি—ও তাই পারলে! বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। যাক, এতদিনে সাধুর আগমন হল তোমার বাড়িতে।···তা মন্দ কি! যদি ওদের মতো বদ না হয়, তোমাকে দেখাশুনো করে একটু—ভালই হবে। কৈ দেখি একবার চিজটিকে, ডাকো দিকি!'

সাধুচরণ এসে নমস্কার ক'রে একেবারে পায়ের কাছেই বসল পূর্ণবাবুর।

পূর্ণবাবু কিছুক্ষণ ধরে আপাদমস্তক দেখার পর ঝিকে ডেকে বললেন গাড়ি থেকে তাঁর ডাক্তারী ব্যাগটা আনতে। তারপর নাড়ি দেখে চোখের কোল দেখে, আঙুলের ডগাগুলো টিপে-টিপে দেখে ঐখানেই শুয়ে পড়তে বললেন। বুকে চোঙা লাগিয়ে বুক-পিঠ দেখলেন, পেটটা টিপে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে।

দেখতে দেখতেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। এখন কান থেকে চোঙা নামিয়ে ওকে উঠে বসতে বলে, হেমন্তর দিকে চেয়ে বললেন, 'এ তো সিরিয়াস অবস্থা দেখছি!···কাল একবার কাউকে দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও। আমি ইন্দুকে দিয়ে দেখিয়ে নোব ভাল ক'রে। ও ছোকরার জ্ঞান খুব—। আমি অবিশ্যি কিছু ভুল দেখি নি এতকাল পরে—তবু সেকেণ্ড ওপিনিয়ন নেওয়া ভাল।'

তারপর সাধুকে বললেন, 'রোগ তো বেশ পাকিয়ে তুলেছ দেখছি! যদি এখন থেকে ঠিক ধরাকাঠে না থাকো, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করো—তাহলে বেশীদিন আর জ্যাঠাইয়ের আদর ভোগ করতে হবে না। আমি তামাশা করছি না, কি মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছি না—সত্যিই অবস্থা খুব খারাপ। যদি খুব সাবধানে আর

নিয়মে থাকো তাহলে একটা চান্স আছে বাঁচার—নইলে ওষুধ যতই দিই, বাঁচতে পারবে না।'

সাধুচরণ কাঁদো কাঁদো হয়ে থপ্ ক'রে পূর্ণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে বললে, 'মাইরি বলছি—এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—যা বলবেন তাই শুনব, যেমনভাবে থাকতে বলবেন তেমনিভাবে থাকব। কচি বৌ, একটা ছেলে হয়েছে তার উপরি—জীবনে খুব মায়া, সত্যি বলছি আপনাকে। তবে আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম পেরায়—ওখেনে তো কোন চিকিচ্ছেই হয় নি ধরুন, আর খাওয়ার ধরাকাঠই বা করব কি, সাজার যা হয় বাড়িসুদ্ধু সবাইকার তাই তো খেতে হবে, ডাল চচ্চড়ি অম্বল—এই তো বাস্তুদেবতা বলতে গেলে—আমার জন্যে আলাদা ক'রে আর কে কি করছে! তুমিও যেমন।...এখেনে জ্যাঠাইমা দয়া ক'রে ঠাঁই দিলেন তাই, নইলে সত্যি কথা বলতে কি, শেষ দেখাই দেখতে এইছিনু—যদি বৌ-ছেলেটাকে একটুন্ কৃপা করেন এই আশায়। নিজের আশা আর রাখি নি। মাইরি বলছি!'

তারপর নিজের এই ভাবাবেগে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'ইস, পায়ে হাত দিয়ে ফেলনু, আপনি বামুন বটে তো? নইলে—মানে আপনার আবার পাপ হবে—সেই চিন্তা।...আপনার নামটি কি? খুব বড় ডাক্তার তা তো বুঝতেই পারছি—তবু আপনারা?'

'আপনারা' অর্থাৎ আপনি কি জাত!

হেমন্তর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। ধমক দিয়ে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, আর বামনাই ফলাতে হবে না। তোমরা আবার বামুন! তোমরা বামুন তো চাঁড়াল কে?'

কাঁচুমাচু মুখ ক'রে সাধুচরণ আরও খানিকটা বিনয় প্রকাশ ক'রে ফেলে। কি করা উচিত, কি করলে জ্যাঠাইমা খুশী হবে ভেবে না পেয়ে—পায়ে হাত দেওয়াই নয় শুধু, পায়ের ধুলোই নিয়ে নেয় এক খাবলা।

পরের দিনই ঠাকুরকে সঙ্গে দিয়ে সাধুচরণকে হাসপাতালে পাঠাল হেমন্ত। সেখানে দু-তিনজন ডাক্তারকে দেখিয়ে, পরামর্শ ক'রে পূর্ণবাবু প্রেসক্রিপশ্যন লিখে দিলেন, বড় বোতলের এক বোতল মিক্‌স্‌চার করিয়েও দিলেন। কিন্তু সব ডাক্তারই বার বার শাসিয়ে দিলেন, শুধু ওষুধে কোন কাজ হবে না—ধরাকাঠে না থাকলে বেশীদিন বাঁচবে না। ইন্দুবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন, শুধু ম্যালেরিয়া নয়, কোথাও থেকে কালাজ্বরের জীবাণুও ওর দেহে ঢুকেছিল, রক্তের অবস্থা খুব খারাপ।

নিজেই এসে বলে সাধুচরণ কথাগুলো।

সেই মতো হেমন্তও কড়া হাতে রাশ ধরে। কাঁচকলা ভাতে আর কাঁচকলা পটল দিয়ে কচি মাছের ঝোল—তৈলবর্জিত—দু' বেলা এই বরাদ্দ। জলখাবার পাঁউরুটি আর চিনি। কোন কোনদিন সুজির রুটি আর গুড়।

এদিকের কৃচ্ছ্রতা অন্যদিকে পুষিয়ে দেয় অবশ্য। নতুনবাজারে লোক পাঠিয়ে ভাল ভাল ফল আনিয়ে দেয়। বাতাবি-লেবু শশা কলা তো আছেই—আঙুর বেদানাও থাকে তার সঙ্গে। কিন্তু সাধুচরণ পাড়া-গাঁয়ের ছেলে, তার মুখে এসব রোচে না। খেতে বসে দু'বেলা কান্না আসে তার, ফল দেখলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। দু-চারদিন যেতে ভয়ে ভয়ে জ্যাঠাইয়ের কাছে মুড়ির কথাটা তুলেছিল—মুড়িতে দোষ কি? ও তো ধরো ভাতের মতোই। হাল্‌কা ক'রে অল্প একটু তেল-হাত বুলিয়ে—? ধমক খেয়ে চুপ ক'রে গেছে।

কিন্তু ওর যে ভাল লাগে না, মনমরা হয়ে থাকে সেটা হেমন্তর চোখ এড়ায় না। এই গুম খেয়ে থাকার অর্থ সে ভুল বোঝে। বৌ-ছেলে ফেলে এসেছে, না জানি তারা কি দুরবস্থার মধ্যে আছে—তাদের কথা ভেবেই এমন মন-গুমরে থাকছে নিশ্চয়। দু-চারদিন

দেখে সে বলল, 'তা বৌমাকেও এখানে আনিয়ে নাও না! তোমারই বা এত কন্না করে কে! তাছাড়া ওখানে থাকলে ছেলেটা বাঁচবে না এই তো বলো—হু'জনকেই আনিয়ে নাও।···চিঠি লিখে জানো, আসতে চায় কিনা—তারপর একদিন গিয়ে নিয়ে এসো।'

সাধু প্রথমটা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে খানিকটা, হাঁ ক'রে।

তারপর যখন বোঝে হেমন্ত তামাশা করছে না বা মনে ঢিল মেরে ওর মনের কথাটা বোঝার চেষ্টা করছে না—তখন লাফিয়ে ওঠে একেবারে।

গলা থেকে এই ক'দিনের চিঁ-চিঁ ভাব এক নিমেষে কেটে গিয়ে বেশ জোর দিয়েই বলে ওঠে, 'আসতে পারবে কিনা, মত নেওয়া—মানে?—কি আমার একেবারে মান্যবর ঘরামী! আসতেই হবে। এ কি তার খুশীমতো কাজ নাকি? আমি হুকুম করব—আসবে না! ইঃ, তার বাপ আসবে—সে তো ছেলেমানুষ!'

তারপর এক মিনিট চুপ ক'রে থেকেই আবার বলে, 'আমি তাহলে কালই চলে যাই জ্যাঠাইমা, কি বলো? গে ঝুঁটি ধরে নে আসি—।'

হেমন্ত সেই প্রজ্বলন্ত উৎসাহে এক ঘড়া জল ঢেলে দেয়। বলে, 'না, আগে চিঠি লেখো, তৈরী হয়ে থাক। হঠাৎ আনতে গেলেই কেউ ঘর-সংসার থেকে অমনি হু'ঘণ্টায় বেরিয়ে আসতে পারে না।·· আর ঐ ছুতোয় যে তুমি সেখানে গিয়ে বসে আবার হু'দিন তিনদিন ধরে নানান অখেচড় খেয়ে আসবে—তাও হবে না। অনেক কাণ্ড ক'রে সারানো হচ্ছে, হু'দিনের অত্যেচারে সে-সব নষ্ট করা চলবে না।··· যেদিন যাবে—ভোরে দুটি ভাত খেয়ে চলে যাবে—সন্ধ্যের আগে এখানে এসে পৌঁছবে। না হলে আর এ বাড়ি ঢোকা হবে না, সে আমি সাফ বলে দিচ্ছি।'

মুখটা বেজার ক'রে বসে থাকে সাধু। এতটা বন্দীদশা কারুরই, বিশেষ পাড়া-গাঁয়ের ছেলের পছন্দ হবার কথা নয়, হয়ও না। নেহাৎ অনেক তোয়াজে আছে, তাছাড়া তিন-তিনটে প্রাণীর ভার নিতে

চাইছে একটা লোক—তাকে চটাতেও ইচ্ছা করে না। জ্যাঠাইয়ের কত টাকা—তা সঠিক না জানলেও অনেক টাকা যে আছে—তার একটা আঁচ পেয়েছে সে। ভবিষ্যতে ওরই ছেলে এই সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক হবে, এটা কল্পনা ক'রে হর্ষ-রোমাঞ্চ হয় ওর।

অগত্যা একটা চিঠি লিখতে হয়, চিঠির উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে হয়।

মনোরমা—সাধুর স্ত্রী তো পা বাড়িয়েই ছিল বলতে গেলে, ও-বাড়ির নিরন্তর দুঃখ ভোগ এমনিতেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অভাব তো আছেই, তার ওপর নিরন্তর কলহকেজিয়া, পরস্পরকে ছোবল মারা—এ আর তার সহ্য হচ্ছিল না, তার ওপর—রুগ্নই হোক আর যা-ই হোক—স্বামী একটা ছিল, সেও নেই, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল তার। জ্যাঠশাশুড়ীদের অত্যাচার ও বাক্যযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সেও শাশুড়ীর পন্থা অনুসরণ করবে কিনা যখন ভাবছে সত্যি সত্যিই—তখনই এই চিঠি গিয়ে পড়ল।

মনোরমা নিজে লিখতে জানে না, পাড়ার একটি ইস্কুলের ছেলেকে ধরে, একটা পয়সা দিয়ে পোস্টকার্ড আনিয়ে তাকে দিয়েই চিঠি লেখাল, 'তুমি আমাকে সত্বর লইয়া না গেলে আমি অবশ্য অবশ্যই কাঁটাপুকুরে ডুবিয়া মরিব। কোনমতেই তাহার অন্যথা হইবে না জানিবে।'

সাধু পরের দিন ভোরবেলাই রওনা হয়ে গেল, জ্যাঠাইমার নির্দেশমতো আলু-পটলভাতে আর দই দিয়ে ভাত খেয়ে। তবে সেদিনই আর ফিরতে পারল না। সম্ভব নয় তা হেমন্তও জানত, তবে আরও বেশী দেরি না করে সেই জন্যেই কড়া রকমের কড়ার করিয়ে নেওয়া। পরের দিন বিকেলেই মনোরমা আর ছেলে গৌরকে নিয়ে চলে এল। জ্যাঠাইরা নাকি আসার সময় খুব বাঁকাবাঁকা কথা বলেছে, 'যা রে গৌর, যা যা। এবার তোর কপাল ফিরল। ছেঁড়া ক্যাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখা লোক কথায় বলে, তোর অদেষ্টে দেখি সেই স্বপনই সত্যি হয়ে গেল রে ছোঁড়া।···যা যা, লুটে

নিগে যা—যা পারিস।···তবে বুঝব বরাতজোর, যদি টিঁকে থেকে ওর পয়সা ভোগ করতে পারো তবেই। ও বাবা পিচেশে-পাওয়া মেয়েমানুষ—তুই ওর পয়সা খাবি কি, ও তোর জীবনটা চুষে খাবে —তাই দেখগে যা। যাচ্ছিস তো নাচতে নাচতে!'

কথাটা গৌরকে বলা অনর্থক। সে তখন নিতান্তই শিশু, এসব কথার অর্থ বোঝা সম্ভব নয় তার। তাকে ওরা বলেও নি অবশ্য। আসলে সাধু আর মনোরমাকে উদ্দেশ করেই বলা। ঈর্ষার বিষ—কোনমতেই ঢাকা যাচ্ছে না।

সবটা ঠিক বলা না গেলেও সাধুচরণ এর অনেক কথাই বলল এসে। শুনে শুধু হেমন্তর মুখের কঠিন ভঙ্গীটা কঠিনতর হল। এর কোন উত্তর দেবার চেষ্টাও করল না। প্রতিপক্ষ যেখানে অনুপস্থিত—সেখানে বাদানুবাদ করতে গিয়ে নিঃশ্বাস নষ্ট ক'রে লাভ কি?···

মনোরমা কালো রঙের ওপর মন্দ দেখতে নয়। আর—ও গ্রাম কি ও অঞ্চলের মেয়ে নয় বলেই বোধ হয়—বেশ স্বাস্থ্যবতী। ওর বাড়ি এদিকে—ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে। এদের বাড়ির এমনই 'সুনাম' রটে গেছে চারিদিকে যে, কাছাকাছি কোথাওকার মেয়ে এদের ঘরে দিতে চায় না। দূর-দূরান্ত থেকে আনতে হয়। ছেলেটাও, মায়ের স্বাস্থ্যের জন্যেই বোধহয়—খুব একটা রুগ্ন বা পুঁয়ে-পাওয়া নয়, হাত-পাগুলো মোটাসোটা গোলগাল।

দু-চারদিন দূরে দূরে রাখলেও বেশীদিন ছেলেটাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারল না, গৌর শিগ্‌গিরই 'গৌরসুন্দর' 'গোরা' হয়ে ওর বুকে উঠল এবং একরকম হেমন্তর কোলেই মানুষ হতে লাগল। মনোরমার তাতে খুব একটা আপত্তিও দেখা গেল না, সে যেন বরং নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সুখী ও নিশ্চিন্ত হবারই কথা সাধুচরণের, কিন্তু তা হতে পারল না সে।

এই শাসন আর বন্ধন তার ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল। এই

খাওয়া রোজ খাওয়া যায় না। জলখাবার বলতে দুধ-সাবু, আর নয় তো কাঁচকলা-সেদ্ধ মিছরির গুঁড়ো দিয়ে। বড়জোর তাতেই কোন কোনদিন মিছরির বদলে নুন আর মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখা হয়। আগে পাঁউরুটি খাচ্ছিল, বামুনের কারখানায় তৈরী পাঁউরুটি, তাতেও অম্বল হতে লাগল—সেই জন্যেই নতুন এই ব্যবস্থা। একটু তেল না, একটু ঘি না—দুটো ভাজাভুজি কিচ্ছু খাবার উপায় নেই। সকালে সেদ্ধ মাছের ঝোল ভাত, রাত্রে সেই রকমই ঝোল আর রুটি। বড়জোর রকমফের হিসেবে—কোন কোনদিন একটু পলতা বা উচ্ছের সুক্তো হয়, তাও তাতে সর্ষে বাদ, শুধু ধনেবাটা দিয়ে সুক্তো—মানুষ কেন গোরুতেও তো খেতে পারে না। খেতে বসলে চোখে জল এসে যায় তার, মনে হয় এমন ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও তো ঢের ভাল।

আরও মুশকিল হয়েছে এই, পুরনো রোগ—সারতে দীর্ঘ সময় লাগছে। এত ধরাকাঠে থেকেও উন্নতির গতি এত মন্থর যে, ঠিক কতটা কি হচ্ছে, আদৌ কোন উন্নতি হচ্ছে কিনা সেটা বোঝা যায় না। মানে হিসেবে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। দৃষ্টিগোচর হওয়ার মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নয় সেটা। তাতেই সাধুচরণ ও মনোরমার ধারণা হয়েছে যে, এসব অকারণ, এই এত কড়াক্কড়ি। কিছুতেই কিছু হবে না। আর সারবেই না যখন, তখন যে ক'দিন বাঁচে একটু ইচ্ছেসুখে খেয়ে নিতে দোষ কি? এক-এক সময় আড়ালে কপাল চাপড়ায় সাধু, এই জন্যে কি এত মতলব খেলিয়ে সে এই ঐশ্বর্যের মধ্যে এসেছিল! চারিদিকে ভোগের বস্তু থরে-থরে সাজানো, ভাল ভাল সুখাদ্যের আয়োজন চারিদিকে, তার মধ্যে সে-ই সবেতে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? তাহলে আর এত দীনতা স্বীকার ক'রে এখানে পড়ে থাকার প্রয়োজন কি?...

আহারের কষ্ট ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে এটা বুঝেছিল হেমন্ত—তাই বলে শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে সে যে এমন কাণ্ড ক'রে বসবে তা সে কেন, সাধুচরণ নিজেও বোধহয় ভাবে নি।

কথাটা তাকে একদিন চারুর মা-ই বললে।

'দিদি, বৌটো বোধহয় ওর বরকে বাইরে থেকে এটা-ওটা এনে খাওয়াচ্ছে!'

গত ক'দিনের মধ্যেই হঠাৎ যে খুব দ্রুত একটা অবনতি ঘটেছে তা হেমন্তও লক্ষ্য করেছিল।

চোখ দুটো আবার হলদে হয়ে উঠেছে, পাইখানার চেহারাও ভাল নয়, হাত-পা দুটো ফুলো-ফুলো বোধ হচ্ছে। বোধহয় গাও গরম হয় বিকেলের দিকে। লক্ষণ সব দিকেই খারাপ।

কিন্তু, শঙ্কিত বোধ করলেও, কারণটা কি আন্দাজ করতে পারছিল না। এক-একবার মনে হচ্ছে এই রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়ে স্ত্রীর কাছে থাকতে দেওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, আবার ভাবে তার সঙ্গে যকৃতের অবনতি ঘটার কি কারণ থাকতে পারে!

তবু হেমন্ত অবাক হয়ে যায় চারুর মার কথা শুনে।

'সে কি রে! দূর! বৌমানুষ কোথা থেকে কি নিয়ে আসবে? ও বাইরে বেরোয় নাকি?'

'হ্যাঁ গো দিদি, বললে বিশ্বেস করবে নি, আজ স্বচক্ষে দেখলুম যে! দুপুরবেলা এদিক-ওদিক দেখে টুপ ক'রে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই পেট-কাপড়ে ক'রে কি নে'সে বরের ঘরে ঢুকল। এই তো মোড়েই তেলেভাজার দোকান, কতটুকুই বা, যেতে আসতে তিন-চার মিনিটের বেশি লাগে না। ওরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—ফাঁকে বেরিয়ে দোকান-দানি করা ওদের খুব রপ্ত আছে। আর···মায়ের যা চেহারার ছব্বা, আর যা কাপড়-চোপরের ছিরি—এখানেও কেউ অবাক হবে না দেখে। কোন ভদ্দরবাড়ির বৌ কেউ ভাববে না, মনে করবে কোন বাড়ির চাকরাণী।'

ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় হেমন্ত চারুর মাকে।

চেহারা নিয়ে এত ব্যাখ্যানা করার কি আছে! যতই হোক, ওর শ্বশুর-বংশের বৌ, চারুর মার সমান কেউ নয়।···

বিশ্বাস হয় না—তবু কথাটা উড়িয়েও দিতে পারে না ঠিক।

অসুখ যে আবার বাড়ার দিকে যাচ্ছে—সেটারও অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু, তখনই কিছু বলে না। চুপ ক'রে সুযোগের অপেক্ষা করে। নিজের চোখে না দেখলে কিছু বলা উচিত নয়।···শুধু সন্ধ্যেবেলা মনোরমা যখন তেল গরম ক'রে এনে ওর গায়ে মাখাতে বসল—এটা ওদের দেশের দিকে গুরুজনকে সেবার প্রধান অঙ্গ বলে পরিচিত, তা জানে বলেই প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি করলেও খুব বেশী বাধা দেয় নি—তখন হেমন্ত কথাবার্তার মধ্যে মোড় ঘুরে ইচ্ছে ক'রেই সাধুচরণের অসুখের প্রসঙ্গে চলে এল। ওর অসুখ যে কত গুরুতর —এ থেকে কত কী অনিষ্ট হতে পারে, মহা সর্বনাশ ঘটাও আশ্চর্য নয়—তা বুঝিয়ে, কিছু বা সত্য কিছু কাল্পনিক এ রোগের অশুভ পরিণতির দৃষ্টান্ত দিয়ে—সাধুচরণের পরমায়ু কত সূক্ষ্মসূত্রে ঝুলছে তাই বোঝাবার চেষ্টা করল। ওষুধ নয়—ওষুধে বিশেষ কিছু করতে পারবে না আর, শুধু পথ্যের ওপরই ওর নিরাময় হওয়া নির্ভর করছে। সাবধান না থাকলে বাঁচার কোন আশাই নেই—এই কথাটাই বার বার নানারকমভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলল মনোরমাকে, যাতে মাথার মধ্যে চিন্তাটা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

'যদি নোলার সাধ ভাল ক'রে মেটাবার ইচ্ছে থাকে, অনেকদিন ধরে ইহজগতের ভাতমাছ খাওয়ার সাধ থাকে—তাহলে এখন কিছুদিন বাপু নোলাটি সামলাতে হবে—এইটে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও তোমার বরকে। মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে হবে। এই যা খাচ্ছে মনে করবে এইটেই ওষুধ, এর ওপরেই জীবনমরণ নির্ভর করছে।'

শান্তভাবে মুখে ঘোমটা টেনে বসে বসে শুনল মনোরমা, সায়-সূচক ঘাড়ও নাড়ল বারকতক, ভাব দেখে মনে হল কথাটার গুরুত্ব ভাল ক'রেই বুঝেছে।

হেমন্ত কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। যদি বা একটু-আধটু অত্যাচার ক'রে থাকে—না-জানতে, এবার আর করবে না।

তবু পরের দিন একটু সতর্ক রইল।

দুপুরবেলা সে দরজা ভেজিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল প্রতিদিনের মতোই। মনোরমাদের খাওয়ার পাট তো আগেই চুকে গেছে, ঠাকুরও ঝিয়ের ভাত বেড়ে রেখে নিজে খেয়ে রান্নাঘর ধুয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ল দ্বিপ্রাহরিক আড্ডায়। চারুর মা রান্নাঘরের সামনের রকে খেতে বসেছে সদরের দিকে পেছন ফিরে।

এই উত্তম সুযোগ, যদি বাইরে যেতে হয় তো এখনই যাবে।

হেমন্ত পা টিপে টিপে বাইরে এসে দাঁড়াল। সাধুদের ঘরও দোতলায়, তবে সিঁড়ির ওধারে, দরজাটা চট ক'রে দেখা যায় না এঘর থেকে। কিন্তু হেমন্তরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—একটা ডুরে কাপড়ের আভাস ত্বরিৎগতিতে সিঁড়ির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সেটা ওর নজর এড়াল না। তার পরই অতি মৃদু একটা শব্দ পাওয়া গেল সদর দরজা ভেজিয়ে দেবার। শব্দ না করারই প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছে—তবু সামান্য যেটুকু আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

হেমন্ত এবার এগিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল, এদিকের ঘরের দরজার খাঁজে। একটু পরেই আবার সেই অতি মৃদু শব্দ—এবার অবশ্য আগের চেয়ে একটু বেশী—কেউ ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল নিশ্চয়। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই। পা টিপে টিপে সাবধানে উঠলে আওয়াজ পাওয়াই বা যাবে কেন?…

সিঁড়ির মুখে এসে নিজেদের ঘরের দিকে বেঁকে যাবে মনোরমা—ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল হেমন্ত ওর ওপর। কোঁচড়ের কাপড়টা একটা থলির মতো ক'রে কোমরে গোঁজা—সেটা ধরে টান দিতেই চারিদিকে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মুড়ি-বেগুনি, ডালবড়া-ফুলুরি, তেলেভাজা-কচুরি। কোন ঠোঙা নেয় নি পাছে জিনিসটা ফুলে থাকে—লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কাপড়ে তেল লাগার আশঙ্কা গ্রাহ্য না ক'রে কোঁচড়েই নিয়েছে। এগুলি এখন হয় সাধুচরণ একা—নয় তো দু'জনেই বসে বসে খাবে। শেষেরটাই বেশী সম্ভব।

রাগ সামলাতে পারল না হেমন্ত। টেনে একটি চড় বসিয়ে দিল মনোরমার গালে। মনোরমা সে আঘাতের বেগ সামলাতে পারল না। টাউরি খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল মেঝেতে। তবু তখনও নিরস্ত হতে পারল না হেমন্ত, তখন চণ্ডালক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে প্রায়, তার ওপরই একটা লাথি কষিয়ে দিল মনোরমার মাজায়।

'হারামজাদী! তোমার পেটে পেটে এত বজ্জাতি! আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি! আমার কাছে উড়ে যাবে!...তোর বাপ-জ্যাঠা শ্বশুররা পারবে না, তিন পুরুষ এলেও না, তুই তো কোন্ ছার! এই সব হচ্ছে ভেতরে ভেতরে—সেইজন্যে দেখি আবার চোখ হলদে হচ্ছে ছোঁড়ার, নলিখলি পাইখানা শুরু হয়েছে। আর তুমি মাগ হয়ে নিজে হাতে ক'রে বিষগুলো এনে খাওয়াচ্ছ!... তাই তো বলি, আমার এত যত্ন এত ওষুধ সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে কেন! তুমি এই কাজ করছ বসে বসে তার হবে কি!...সেইজন্যে তোমাকে আনালুম এখানে ঝকমারি ক'রে!'

চেঁচামেচিতে চারুর মা ছুটে এসেছে নিচে থেকে ভাত ফেলে—কিন্তু সাধুচরণ ঘর থেকে বেরোল না। জ্যাঠাইয়ের এই রণচণ্ডী মূর্তি সে এর আগে দেখে নি। লাথি মারার আওয়াজটাতেই বুঝেছে পায়ের জোর। নিজে এখন বেরিয়ে বাঘের মুখে পড়তে রাজী নয় সে। ঐ লাথি সে খেলে আর বাঁচবে না।

চারুর মা-ই একহাতে মনোরমাকে ধরে তুলল। খুবই লেগেছে তার, উঠতে পারছে না। কোনমতে চারুর মার হাতে ভর দিয়ে বেঁকেচুরে উঠে ঘরের মধ্যে গেল। কথা বলার শক্তিও নেই তার, আর বলবেই বা কি!

চারুর মা পুরনো ঝিয়ের অধিকারে একটু তিরস্কার করল হেমন্তকে।

'উ কি বাপু! যা-ই করুক, এত বড় বৌটোকে নাথি মারা তোমার উচিত হয় নি। মেয়েছেলের পা চলা বড় খারাপ। তার ওপর বামুনের সধবা! সাক্ষাৎ দুগ্‌গার অংশ ওরা। এমন চণ্ডাল রাগ

রাখা ঠিক নয়। স্থানে-অস্থানে লেগে গেলে কি হত!···আর তোমার বা এত মাথা-ব্যথা কিসের? তাদের ছাগল তারা যদি ন্যাজের দিকে কাটে! মরবার শখ হয়েছে, মরুক না! তারা যদি নিজে হাতে ক'রে বিষ খায় তো তোমার কি! তুমি বড়জোর বলতে পারো যে, যেখেন থেকে এয়েছ সেখেনে যাও, আমার সামনে বিষ খাওয়া চলবে না।···ব্যস্। চুকে গেল ন্যাঠা!'

সে গজগজ করতে করতে নিচে নেমে গেল। ততক্ষণে হেমন্তরও লজ্জা বোধ হয়েছে, সেও চুপ ক'রে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। রুদ্ধ ক্রোধে তখনও সর্বাঙ্গ কাঁপছে তার—তবু এতখানি করা উচিত হয় নি, তাও বুঝেছে।

আবার সব চুপচাপ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই কানে গেল—কে একজন কোঁকাচ্ছে আস্তে আস্তে।

বোধহয় মনোরমা।

একবার ভাবল গিয়ে একটু দেখে কোথায় কী লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এ-ধরনের প্রশ্রয় পেলে ভবিষ্যতে কোন শাসনেরই মূল্য থাকবে না। এ-শাসনও অনর্থক হয়ে পড়বে।

ওর তরফ থেকে যথেষ্ট ইতরতা প্রকাশ হয়েই গেছে, তার যে সামান্য সুফল হতে পারে—মিছিমিছি সেটুকুও নষ্ট ক'রে লাভ নেই। তাছাড়া এ তো একরকম মানুষ খুন করাই। ঐ রুগীকে এই সব অখাদ্য যোগানো, এর সাজা কঠোর হওয়াই উচিত।

সেদিন মনোরমা আর উঠল না। ওঠার শক্তি নেই অথবা অভিমান—তাও খোঁজ করল না হেমন্ত। সাধুচরণও ওর সামনে এল না, এড়িয়ে এড়িয়ে গেল। সেটা রাগ নয়—ভয়। বৌয়ের যে পরিমাণ শাসন দেখল—না জানি ওর অদৃষ্টে কি আছে!

হেমন্ত পরের দিন চারুর মাকে হুকুম দিয়ে দিল, বেশ জোরে, সবাইকে শুনিয়েই—ঠাকুর যখন থাকবে না, সদর দরজায় ভেতর থেকে চাবি দিয়ে রাখতে। আর ঠাকুরকেও বলে দিল—সাধু আর সাধুর বৌয়ের ওপর যেন কড়া নজর রাখে।

দিনকতক শান্তিতেই কাটল। মনোরমাও তার অভ্যস্ত তেলের বাটি নিয়ে দেখা দিল আবার। হেমন্তও সম্ভবত অনুতপ্ত কুণ্ঠাতেই আর ও প্রসঙ্গ তুলল না। সাধুরও স্বাস্থ্যের সে-অবনতিটা বন্ধ হয়েছে, সেটাও বোঝা গেল ঐ ক'দিনেই।

আট-দশদিন পরে সাধু একদিন ভোরবেলা চোখের জল মোছার ভাব করতে করতে এসে জানাল, সে এই ভোরবেলা স্বপ্ন দেখেছে— ছোট ভাইটার খুব অসুখ। ভোরের স্বপ্ন তো বলে সত্যিই হয়, তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। জ্যাঠাইমা যদি একটা দিনের ছুটি দেন তাকে—তাহলে সে একবার গিয়ে বাপ-মা-মরা ভাইটাকে একটিবার চোখের দেখা দেখে আসে!

হেমন্ত বলল, 'ছুটির কথা বলছ কেন বাবা? তুমি এখানে চাকরিও করো না, জেলখানাতেও নেই। সে-ক্ষেত্রেই ছুটির কথা ওঠে। তুমি নাবালকও নও, ইচ্ছে হলেই চলে যাবে। তবে আমার সাফ কথা, যদি আজই ফিরে না আসো, তাহলে আর এখানে আসার চেষ্টা ক'রো না। আমি একগাদা টাকা খরচ ক'রে তোমার চিকিচ্ছে করাব, দু'বেলা দাঁড়িয়ে থেকে ঘড়ি ধরে পথ্যি খাওয়াব—আর তুমি দু'দিনের জন্যে সেখানে অখাদ্যি-কুখাদ্যি খেয়ে সবটা বরবাদ ক'রে দেবে—বারে বারে এ-ধাষ্টামো আমি সহ্য করতে রাজী নই। যে মরবে আপনার দোষে, কী করবে তার হরিহর দাসে! মরার ইচ্ছে থাকে স্বচ্ছন্দে মরোগে যাও, তবে তার মধ্যে আর আমাকে জড়িও না!'

সাধু তখন তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে প্রতিবাদ করল বটে, কিন্তু না-যাওয়ার কথা কিছু বলল না।

হেমন্ত ভেবেছিল যে, এই কঠিন কথার পর সাধু যাওয়া স্থগিত রাখবে। ভাইয়ের শরীর কেমন আছে একখানা এক পয়সার পোস্ট-কার্ড লিখলেই জানা যায়। তার জন্য দেশে যাওয়ার কোন দরকার নেই, সেজন্যে যাচ্ছেও না। নিতান্ত মরণদশায় ধরেছে বলেই পতঙ্গের মতো মৃত্যু-আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

কর্তব্যবোধে কথাটা মনোরমাকেও বলল একবার। মনোরমা মাথা নিচু ক'রে মেঝেতে পায়ের নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে জবাব দিল, 'কী জানি কি বুঝছে! আমিও তো তাই বলছিলুম— মিছিমিছি এত কাণ্ড ক'রে হুড়তে-পুড়তে যাওয়ার কি দরকার! স্বপন তো কত কি দেখছে লোকে!'

ওর কথা বলার ধরনে আর নিরুদ্বেগ গলার আওয়াজেই বোঝা গেল যে, এ-যাওয়াতে ওর সায় আছে। কে জানে সবসুদ্ধ চলে যাওয়ারই ভূমিকা কিনা! সাধুচরণ না ফিরলে জ্যাঠাইমা মনোরমাকে নিশ্চয় তাড়িয়ে দেবেন, অথবা ভালয় ভালয় পাঠিয়েই দেবেন।...

তাতে কোন আপত্তিও ছিল না—কিন্তু ঐ ছেলেটা। গৌরটা যে ওকে পেয়ে বসেছে। মনোরমাকে তাড়ালে ওকেও ছেড়ে দিতে হয়, তাতে তেমন রাজী নয় হেমন্ত।

॥ ৬ ॥

সাধুচরণ সেদিন তো নয়ই, পরের দিনও এল না।

তার পরেও বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, না এল মানুষটা, না এল তার কোন খবর। কিন্তু মনোরমা যেরকম নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত— তাতে মনে হয় সাধু যে আর আসবে না, অন্তত এখন কিছুদিন আসবে না, সে তা বিলক্ষণ জানে।

হেমন্তও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করল না এ নিয়ে— মনোরমাকেও কিছু বলল না, যেন সাধুচরণ বলে কেউ এখানে ছিল না, থাকার কথাও নেই—এইভাবে চলতে লাগল। একবার ওর নামও উচ্চারণ করল না।

দিন সাত-আট পরে একদিন দুপুর নাগাদ—সাধুচরণ নয়— আর এক মূর্তি দেখা দিল।

সাধুর ভাই নিমাইচরণ।

বিস্মিত হেমন্ত 'কে' বা 'কী চাই' প্রশ্ন করবার আগেই মনোরমা 'ওমা, এ যে ঠাকুরপো!' বলে ঘোমটা টেনে দিল এবং আগন্তুক ছেলেটি একেবারে ঠাকুর-প্রণামের মতো হেমন্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ও জিভে ঠেকাল।

উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে। ঠিক হরিচরণ বা সাধুচরণের ছাঁচ নয়—তবু চেহারা ও মুখের ধাঁচে ও-বংশের আদল আছে পুরোপুরি। বরং একে দেখে, আকারে-প্রকারে ছোটভাই শিবুর কথাও মনে পড়ে। তার মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, উস্‌কো-খুস্‌কো রুক্ষ—এর সে জায়গায় তৈলসিক্ত বিপুল টেরি। আর বিড়ি খেয়ে খেয়ে এই বয়সেই ঠোঁট ও দাঁত কালো।

নিমাইচরণ অমায়িক হাসির সঙ্গে বললে, 'আমি নিমাইচরণ জ্যাঠাইমা, সাধু আমার দাদা, বললে বিশ্বাস যাবেন না—আপন বড় ভাই।'

হেমন্ত ততক্ষণে প্রাথমিক বিস্ময় সামলে নিয়েছে। নিরাসক্ত-ভাবে জবাব দিলে 'অ, তা হবে!···তা এখানে কি মনে ক'রে? আমি তো ডাকি নি!'

এ-নিরাসক্তি গায়ে মাখল না নিমাইচরণ, আত্মীয়তার সুরে বলল, 'দাদা—মানে, সেখানে গিয়ে খুব আত্যচার চালাচ্ছে। পান্তাভাত, ডাল-চচ্চড়ি, তেলেভাজা, পঁ্যাজের বড়া—যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। বলে কি, বলে মরব তো জানা কথাই, তাহলে আর জেলখানায় লপ্‌সি খেয়ে মরি কেন!···তার ফল যা হবার তাই হয়েছে—হাত-পা ফুলে ঢোল। কাল থেকে রক্ত-পাইখানা রক্তপেচ্ছাপ শুরু হয়েছে!'

আবারও সেই শীতল কঠিন কণ্ঠ শোনা গেল, 'ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। এছাড়া কোন কাজের কথা যদি থাকে, বলে চলে যাও। আমার অনেক কাজ আছে। অকারণ ভ্যাজ-ভ্যাজানি শোনার সময় নেই। বৌমাকে যদি নিয়ে যাওয়ার মতলব থাকে, স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই। তার যাবার ইচ্ছে থাকলেই চলে যেতে পারে।'

থতমত খেয়ে গেল নিমাইচরণ। আমতা আমতা ক'রে মাথাটাথা চুলকে বলল, 'আপনি—মানে আপনি হুট্ ক'রে ছেড়ে দিলেন কেন? কী রকম পাজী জানেন না? ওকে ছাড়াটাই ঠিক হয় নি আপনার!'

'ধরেই বা রাখব কেন? আমার কি গরজ? আমি এরে-বেরে তাকে আনতেও যাই নি, সে এখানে থেকে আমার কোঠাবালাখানাও তুলে দিচ্ছে না। নিজের ইচ্ছেতে এসেছে, নিজের ইচ্ছেতে চলে গেছে।···ব্যস্। ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে, আপদের শাস্তি হয়েছে। আমি তোমাদের আত্মীয় বলে মানিও না, তার কথাও নেই। আমার অত টানও নেই, জোরও খাটাতে চাই না। এত কাণ্ড করবই বা কিসের জন্যে—নাকে-কান্নায় ভুলে ক'দিন ঠাঁই দিয়েছিলুম, সেইটেই আমার অন্যায় হয়ে গেছে!'

জ্যাঠাইয়ের কথাবার্তার যেন খেই ধরতে পারে না নিমাইচরণ। হতাশার ভঙ্গীতেই বলে, 'এত করলেন আপনি, প্রাণটা বাঁচাতে পারলেন না!'

'যার প্রাণ সে যদি বাঁচাতে না চায়, অপরের এত মাথা-ব্যথা কি? ছেলেমানুষও নয়, নাবালকও নয়। যা করছে বুঝেই করছে নিশ্চয়। যাক গে, তুমি এখন একা ফিরবে, না তোমার বৌদিকে নিয়ে ফিরবে?'

তারপর নিমাইচরণের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই চারুর মাকে ডেকে বলল, 'একে একটু জল খেতে দে চারুর মা। রুটি-পরোটা যা হয় ক'রে দিতে বল। ময়দা না থাকে রোলার আটা আছে, তাতেই করতে বলে দে। ভাত খেতে চায় কিনা জিজ্ঞেস ক'রে জানিস। আর বৌমাকে এখানে আসতে বল।'

মনোরমা সামনে এসে নতমুখী হয়ে দাঁড়াতে বলল, 'সব শুনেছ তো?···এই জন্যেই তো পাঠিয়েছিলে! বিধবা হবার এত শখ—তা সেটার ব্যবস্থা তো শুনছি প্রায় হয়ে এসেছে। তা সে যাক গে, এখন যদি লোকদেখানো একবার যেতে চাও, অনায়াসে চলে যেতে পারো। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে আবার চলে আসতে চাও, চলে

এসো। কিন্তু এখানে যদি থাকতে হয়—এই শেষ যাওয়া, আর কখনই যাওয়া চলবে না। গেলে একেবারে যেতে হবে।…আর ছেলেকে নিয়েও যাওয়া চলবে না। সে গেলেও চিরকালের মতো যাওয়া—এ-দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলের ভার যদি আমাকে নিতে হয়, ঐ অস্বাস্থ্য আর কুশিক্ষার মধ্যে আমি ওকে যেতে দোব না। ওখানের মূলসুদ্ধ উপড়ে না আনলে এখানে বাঁচাতে, বড় করতে পারব না।…ভ্যাখো, যা ভাল মনে করো, বুঝে দেখে ঠিক করো।'

আর সেখানে দাঁড়াল না হেমন্ত। ভেতরে নিজের ঘরে চলে গেল—ওদের কথাবার্তা ও পরামর্শের সুযোগ দিয়ে।

কিছুক্ষণ গুজ-গুজ ক'রে নিমাইচরণের সঙ্গে কি পরামর্শ হল, তারপর গলা খ্যাঁকারি দিয়ে নিমাইচরণ ঘরের মধ্যে ঢুকল।

'তাহলে ঐ আপনার কথাই রইল জ্যাঠাইমা। শুধু বৌদিকেই নিয়ে যাচ্ছি আমি। বলতে গেলে দাদার শেষ সময় তো—ওর একবার যাওয়া দরকার। গৌর এখানে থাক। যদি ভগবান নিয়েই নেন দাদাকে, তাহলে কাজকর্ম চুকে গেলে আবার বৌদিকে এনে আপনার পায়ে ফেলে দোব, আর—আশা নেই-ই অবিশ্যি, যদি একটু ভালর দিকে যায়ই—তাহলে তো দু-চার দিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছি। বাস্তবিক, আপনি যা করলেন—। ছেলেটা যদি মানুষ হয়, আপনার কাছে থাকলেই হবে। আর তো কেউই হল না মানুষ। আমাদের ওখানে যারা থাকবে তারা এমনি আমাদের মতো বাঁদরই তৈরী হবে এক-একটি। দাদার এধারে ভাগ্যিটা ভালই ছিল, ঠিক জায়গায় এসে পড়েছিল—কিন্তু সুখভোগ করার বরাত আলাদা। নইলে এমন দুর্বুদ্ধিই বা হবে কেন?'

এই বলে আবারও হাঁটু গেড়ে বসে, ভক্তিভরে ওকে প্রণাম করল নিমাইচরণ।

হেমন্ত হাসল একটু। আর যা-ই হোক—নেশাখোর বথাটে ঠিকই, নির্বোধ নয় ছেলেটা। সম্ভবত ও-ই এতক্ষণ ধরে বলে বুঝিয়ে রাজী করিয়েছে গৌরকে রেখে যাওয়ার প্রস্তাবে। আখেরটা নিজে

বুঝেছে, বৌদিকেও বুঝিয়েছে। নইলে এই কঠিন শর্তে মনোরমার রাজী হবার কথা নয়।

তখনই ভাত খেয়ে নিয়ে ওরা দু'জনে রওনা হয়ে গেল।

চিঠি এল দিন-কয়েক পরেই।

একখানা নয়, দু'খানা।

একটি লিখেছে নিমাইচরণ, সম্ভবত নিজেই লিখেছে, কারণ হাতের লেখা দুষ্পাঠ্য—হরফ পড়াও যায় না সব—এত আঁকাবাঁকা—আর বানান ভুলে প্রায় দুর্বোধ্য।

তাতে শুধু সাধুচরণের মৃত্যু-সংবাদটুকুই দেওয়া হয়েছে। ওরা গিয়ে পৌঁছবার আগেই শ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, হুঁশও ছিল না। ওরা যাওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেছে। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলেই বৌদিকে নিয়ে সে চলে আসবে। পরম পূজনীয়া জ্যাঠাইমার শ্রীচরণ দর্শনের জন্যে তাদের উভয়ের প্রাণই ব্যাকুল হয়েছে···ইত্যাদি।

দ্বিতীয় চিঠিটা লিখিয়েছেন হেমন্তর মেজজা।

মানে তাঁর জবানীতেই লেখা, সম্ভবত পাড়ার কোন ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে লিখিয়েছেন, হাতের লেখা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং বানান-ভুলও কম।

তিনি প্রথমেই ডাইনী পিশাচী রাক্ষসী প্রভৃতি প্রীতিবর্ধক ও শ্রুতিসুখকর সম্বোধন জানিয়ে লিখছেন: 'পরে লিখি, এখনও কি এ-বংশের রক্তভক্ষণ করিয়া তোমার সাধ মেটে নাই? তুমি কি সেই সাতশো রাক্ষসীর ঝাড় হইতে আসিয়াছ, তোমার শ্বশুর-বংশের এই ভিটাকে শ্মশান না করিয়া ছাড়িবে না? আরও কত জোয়ান ছেলের রক্ত খাইতে চাও তুমি? আরও কতগুলি মানুষ খাইলে তোমার ক্ষুধা মেটে? এখনও বড় ক্ষুধা—তাই বুঝি আর একটাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছ জিওল মাছের মতো?···ছিঃ! অতিবড় পাষাণ-হৃদয়ও কোন মানুষের মৃত্যুকালে তাহার একমাত্র পুত্রকে দূরে সরাইয়া

রাখে না।···আহা, বাছার প্রাণটা বুঝি ঐটুকু আশাতেই, একবার ছেলের মুখটা দেখিবে বলিয়া কোনমতে কণ্ঠনালীর কাছে ধুক-ধুক করিতেছিল। না জানি বাছা আমার কি গভীর দুঃখ লইয়াই প্রাণত্যাগ করিল! কেন, একবার শেষ দেখাটুকু দেখিতে দিতেও এত কি আপত্তি হইল তোমার? তোমার মুখের গ্রাস তো আর কেহ কাড়িয়া লইতেছিল না!' ইত্যাদি ইত্যাদি—

এসব ভাষা আর হেমন্তকে আঘাত করে না।

সামনে বললেও না, চিঠিতে লিখলেও না। সে পড়ে হেসে চিঠিটা একপাশে ফেলে দেয়, চারুর মাকে বলে, 'কুড়িয়ে রেখে দে, কাল আমার গৌরের দুধ গরম করতে লাগবে!'

তারপর গৌরকে বুকে তুলে নাচাতে নাচাতে বলে, 'কী রে ছোঁড়া, তোকে নাকি আমি জীইয়ে রেখেছি—পরে খাব বলে? কি বলিস তুই, সত্যি? বল না! আ খেলে যা, দেখছিস এসব কত কি শক্ত শক্ত কথা হচ্ছে, ছোঁড়া হেসেই গেল। বড় মজা পেয়ে গেছ না, বড্ড আদর! আবার নাচন হচ্ছে আমার বুকের ওপর! এটা তোমার নাচার জায়গা? এ কি পাথরের দেহ পেয়েছ? অবিশ্যি তোর আর এক দিদা তাই বলেছে।···নে নাম, ঢের হয়েছে।'

বলে, কিন্তু নামাতে পারে না, উল্টে বুকে চেপে ধরে অজস্র চুমো খায় ছেলেটাকে।

আরও দিন বারো-তেরো পরে নিমাইচরণ ও মনোরমা ফিরে এল।

যতই রাগ থাক মনোরমার ওপর, ঐটুকু মেয়ের বিধবার বেশ দেখে চোখ ফেটে জল এসে গেল হেমন্তর। নিমাইয়ের মাথা কামানো, সম্ভবত সে-ই শ্রাদ্ধ করেছে দাদার।

'এই এনে দিলুম জ্যাঠাইমা তোমার বৌকে। আর এই আমিও। আজ থেকে আমাকেও তোমার সন্তান বলে জেনো। মারো কাটো ফাঁসি দাও, লাথি মারো—একটি টুঁ শব্দ করব না। সে ছেলে আমি

নই। তোমার কোন হুকুম যদি কোনদিন গরমাল্যি যাই তো আমার এই জিব তুমি নিজে হাতে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ছিঁড়ে দিও, আমার নামে কুকুর পুষো।'

উদ্গত অশ্রু অতিকষ্টে সংযত ক'রে রুদ্ধ গাঢ়কণ্ঠে হেমন্ত বলে, 'না বাবা, ঢের হয়েছে। আর সন্তানে কাজ নেই আমার। এমনিতেই রাক্ষুসী ডাইনী পিশাচী শুনতে শুনতে কান পচে গেল, আবার কতকগুলোকে জড়িয়ে নিমিত্তের ভাগী হতে চাই নে।...আর, এই বলছি, সত্যিই যদি তোমাদের ধারণা হয়ে থাকে যে, আমি বসে বসে শ্বশুরকুলের সব ছেলে খাচ্ছি, তাহলে এখনও সময় আছে, গৌরকে নিয়ে চলে যাও। যা হবার—দেশে গিয়ে হোক—আমি আর দুর্নামের ভাগী হতে চাই না।'

নিমাইচরণ যেন নিমেষে জ্বলে উঠল।

'ঐ মেজ জ্যাঠাইটা লিখেছে বুঝি! কী এক চিঠি লেখাচ্ছিল বটে, আমি দেখিচি। হিংসে, হিংসে—রীষ; বুঝলে? ও আর কিছু নয়—লঙ্কাবাটার মতো জ্বলছে সব বুকে রীষের জ্বালা।...ঐ যে যাওয়া-মাত্তর শুনেছে খোকাকে তুমি ছাড় নি, ওখেনে গেলে শরীর খারাপ হবে বলে ধরে রেখেছ—অমনি মাথা ঘুরে গেছে সবাইকার। বলে, তবে ও তো পুষ্যি নিয়ে নিলে, ছেলে ক'রে নিলে ওটাকে। যথাসব্বস্ব যা কিছু আছে—পয়সা কড়ি—সব তো তাহলে ও পাবে। বাস, আর যায় কোথা, ঘরে ঘরে কপালচাপড়ানি শুরু হয়ে গেল। বলে কি, আমাদের ঘরে সব এমন চাঁদপানা ছেলে থাকতে কী দেখে ঐ কালো ভূতকে পছন্দ করলে! আবার বলে কি আমাদের নাতি-গুলোনকে চল গিয়ে একবার দেখিয়ে আসি, যদি কারুক্ষে চোখে লাগে।...বুঝলে এবার রীষের জ্বালাটা কী প্রেকার!'

তারপর চিঠির বয়ানটা সব শুনে বললে, 'ইঃ রে! দেখবার জন্যেই পেরান ধুক-ধুক করছিল!...হুঁশজ্ঞান ছিল কিনা দাদার! আমরা য্যাখন গিয়ে পৌঁছলুম ত্যাখন কি কিছু বোঝার মতো আবস্তা ছিল নাকি দাদার? এই যে আমরা গেছি—তাই কি টের পেয়ে গেল,

না চোখই খুলল একবার। ত্যাখনই তো হয়ে এয়েচে। তারপর যতটুকু বেঁচে ছিল সে তো নামে-মাত্তর।...তার আগেও তো শুনলুম যা, মাথাটায় গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, ঘোলাঘোলা বুঝছিল সব।... ও তুমি ওসব ছেঁদো কথায় কান দিও নি জ্যাঠাইমা, তুমি যদি একটা ছত্তরও জবাব দাও, তাহলেই হুড় হুড় ক'রে এসে পড়বে সব— দলকে দল!'

হেমন্ত আর কথা বাড়াল না।

এসব নোংরা কথা আলোচনা করার মতো অবস্থা নয় তার। ঐ যে থান-পরা শুধু-হাত সাশ্রুনতমুখী মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে—ও যেন তারই দুর্ভাগ্য নতুন ক'রে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছে—নতুন রূপ পরিগ্রহ ক'রে। একই দুর্ভাগ্য, একই ইতিহাস মনে হচ্ছে। ওর ঐ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া চোখের জলে নিজেরই সেই এক বিগত দিনের অসহায় অবস্থা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সে দু'হাত বাড়িয়ে মনোরমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার কাঁধে মাথা রেখে হু হু ক'রে কেঁদে উঠল।

॥ ৭ ॥

এই যাত্রাতেই নিমাইচরণের থেকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, পাকা-পাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার—কিন্তু হেমন্ত সে সাধে বাদ সাধল। দুটো দিন অপেক্ষা ক'রে থেকে, নিজে থেকে চলে যাওয়ার অবসর দিয়ে যখন দেখল নিমাই সে দিক-দিয়েই যাচ্ছে না, এবং খাওয়া-দাওয়ার এত জুৎ—হলই বা নিরিমিষ খাওয়া—ফেলে তার আশু যাওয়ার কোন ইচ্ছেও নেই, তখন, তিন দিনের দিন সকালে নোটিশ দিল।

'তোমার বৌদিকে পৌঁছে দেওয়া হয়ে গেছে, তুমি বাবা এবার সরে পড়ো। যদি কখনও দরকার মনে করি, ডেকে পাঠাব।'

একটু অবাক হয়ে যায় বৈকি নিমাইচরণ। থতমত খেয়ে গিয়ে আমতা আমতা ক'রে বলে, 'না, মানে আপনাকে এই বয়সে দেখা-শুনো করাও তো একটা কর্তব্য। তাছাড়া অনাথ ভাইপোটাকেও ছেড়ে যেতে ঠিক যেন প্রাণ চায় না। তাই ভাবছিলুম যে—আপনার শ্রীচরণেই যদি জীবনের বাকী দিন ক'টা—'

হেমন্ত ওর কথা 'শ্রী' ফাঁদাতেই থামিয়ে দিলে একরকম, 'এই বয়সে এখনও আমি তোমার মতো অনেক অপোগণ্ডকে দেখাশুনো করার হিম্মৎ রাখি। আমার কথা ভেবে তোমাকে অস্থির হতে হবে না। তাছাড়াও—আমাকে দেখবার ঢের লোক আছে। বোবা ছেলে আছে অনেকগুলি, তারা তোমার মতো বাজে বকে না, রোজগার ক'রে খাওয়ায়। আর অনাথ ভাইপোকে যদি মানুষ করার ক্ষমতা থাকে, তার মা যদি চায়—নিয়ে চলে যাও, চোখ-ছাড়া করতে হবে না। আমাকে যদি মানুষ করতে হয় তবে তোমাকে বাদ দিয়েই করব।—তোমার জীবনেরও এখনও অনেকদিন বাকী—আমার শ্রীচরণ এখন থেকে তোমার ভার বইতে রাজী নয়।'

নিমাইচরণ এত কথাতেও ক্রুদ্ধ হল না—অন্তত তার আচরণে সে ক্রোধ প্রকাশ পেল না—তর্ক করল না, ব্যস্ত হয়ে উঠে নিজের আন্তরিকতা প্রমাণ করতে চাইল না ; এক রকমের করুণ বিষণ্ণ মুখে মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল এবং দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরই—আবারও জ্যাঠাইমাকে একটা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে, গৌরকে চুমু খেয়ে বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

শুধু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, 'আমি কিন্তু মধ্যে মধ্যে আসব বাপু, তাইড়ে দিও না। আসব, আবার চলে যাব তোমাদের দেখেই।'

এর পর আর মনে মনে তারিফ না ক'রে উপায় থাকে না ছেলেটাকে।...

মনোরমার আদর-যত্নের কোন ত্রুটি রইল না।

নিজের প্রথম বৈধব্যের অসহায় দুঃখ-দিনগুলি মনে ক'রে এই

মেয়েটার সমস্ত বেদনা যথাসাধ্য মুছে নেওয়ার জন্যে কৃত-সঙ্কল্প হেমন্ত।

ওর স্বভাবের অসংখ্য দোষত্রুটি, স্বামীর সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার—সব ভুলে ওকে বুকে টেনে নিল সে, সেগুলোকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার দোষ বলে ধরে নিয়ে ক্ষমা করল। সেইসঙ্গে এ অবস্থায় যতটা সম্ভব—ওর অভাবগুলো পূরণের চেষ্টা করতে লাগল। মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেটার ক্ষতি দুধ দই ঘি দিয়ে পূরণের ব্যবস্থা করল। একাদশীর দিন জোর ক'রে সামনে বসিয়ে দুধ সন্দেশ খাওয়াল। বলল, 'পাপ হয় আমার হবে মা, নরকে যেতে হয় তো আমিই যাব। তুমি খাও, আমি বলছি এতে কোন দোষ হবে না।'

এছাড়াও একটা দুঃসাহসিক কাজ করল। যে থান দু'খানা সঙ্গে এনেছিল মনোরমা, সে দুটো চারুর মাকে বিলিয়ে দিয়ে নরুন পাড় ধুতি আনাল এবং সামনের হাতে পরার জন্য সেকরা ডেকে দু'গাছা চওড়া চুড়ি গড়িয়ে দিল, নিজের একটা সরু হারও বার ক'রে দিল বাক্স থেকে, বলল, 'ছেলের মায়ের শুধু-গলায় জল খেতে নেই, এটা পরে থেকো।'

হারে তত আপত্তি করার কারণ নেই, নরুন পাড় ধুতি ও চুড়ি পরতে মনোরমা নিজেই আপত্তি করেছিল; ভয়ে ভয়েই অবশ্য—ভয় তার দু'দিকেই, একদিকে জ্যাঠাইমা, প্রতিবাদ করলে হয়ত জ্বলে উঠবেন, আর একদিকে—বোধ করি এই ভয়টাই প্রবলতর—সামাজিক দুর্নামের আশঙ্কা। সে বলেছিল, 'দেশের দিকে যদি জানতে পারে খুব নিন্দে হবে মা। বলবে বেবিশ্যে হয়ে গেছি। ভদ্দরলোকের—বামুনের ঘরে পেড়ে-কাপড় কেউ পরে না উদিকে, হাতেও কিছু রাখে না।'

হেমন্ত সে আপত্তি কানে তোলে নি। বলেছিল, 'দেশের দিকে দুর্নাম হয় হোক, তুমি সেখানে যাচ্ছও না, সে বদনাম কানেও আসছে না। লোকে ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইনী বললে রাজার মায়ের তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তুমি শহরে আছ, সেখানকার চালে

চললেই হল, সেখানে না কেউ নিন্দে করে, সেইটেই দেখা দরকার। কলকাতায় এখন আস্তে আস্তে চল হচ্ছে, দু-একটা বেশ নামকরা লোকের বাড়িতে দেখে এসেছি নিজের চোখে, অল্পবয়সী বোয়েরা বিধবা হলে চুড়ি কি বালা একরকম কিছু হাতে রাখিয়ে দেয়— নরুনপাড় ধুতিও।···তাছাড়া আমার বাড়িতে কে-ই বা আসছে, কে-ই বা গিয়ে নিন্দে করবে তোমার!'

এর পর আর কোন কথা বলে নি মনোরমা।

সে তো পরতেই চায় এসব—পরার সাধ তো কিছুই মেটে নি। তার বাপের বাড়ি থেকে যা দু-এক ভরি সোনা দিয়েছিল তা বহু দিনই বেচে খেয়ে বসেছিল সাধুচরণ, শেষ যেটুকু ছিল—গলায় সরু গোট হার আর দু'গাছা পেটি—তাও বেচে শ্রাদ্ধ হয়েছে। কিছু কোথাও নেই বলেই আরও, অমন সর্ব-আভরণরিক্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।···

খাওয়া-পরা কোন দিকেই যত্নের কোন ত্রুটি রইল না, অবশ্য বিধবা—বিশেষ ব্রাহ্মণের বিধবার পক্ষে যতটা সম্ভব,—তার ফলে মনোরমার স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে উঠল আগের চেয়ে। যৌবন যেন এতদিনে পরিপূর্ণতা লাভ করে ওর দেহে। আগেকার সেই জবুথবু জড়ভরত হয়ে থাকা মলিন চেহারা ঘুচে গিয়ে যেন নতুন মানুষ বেরিয়ে এল—কালো রঙের ওপরই একটা শ্রী আর লাবণ্য ফুটে উঠল।

তবু মনোরমার মনে সুখ নেই। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে পাড়াগাঁয়ের বৌ—তাদের খাওয়া-দাওয়ার ধারণা আলাদা। গরমের দিনে তারা পান্তা খেতে চায়, গুড় তেঁতুল মেখে ভাত খাওয়ার লোভ; মুসুর ডাল মাসকলাইয়ের ডাল পুঁই শাক—এসব এখানে এসেই শুনছে বামুনের বিধবাদের পক্ষে অখাদ্য, দেশে এসবের বাছ-বিচার নেই। এগুলোও তার খেতে ইচ্ছে করে, আরও হয়ত খাওয়া নিষেধ বলেই এত প্রবল লোভ তার। পান্তা ভাত খেতে দেয় না হেমন্ত, বলে, 'ইচ্ছে হয় টাটকা ভাতে জল ঢেলে পরিষ্টি ক'রে খাও।' কিন্তু সে

পান্তায় মন ভরে না, আমলাটা গন্ধ ছাড়ে না তা থেকে। মুড়িও আগে খেতে দিত না, ওর ঐকান্তিক আকুতি বুঝে পরে অনুমতি দিয়েছে; শুকনো মুড়ি তাও, বলে, 'জল লাগলেই সকড়ি হয়ে যায় মুড়ি-চিঁড়ে—সে খেলে আর সেদিন ভাত খাওয়া চলবে না। এমন কি শসার সঙ্গেও খাওয়া চলবে না।'

সবচেয়ে কষ্ট হয় ওর বেগুনি-ফুলুরির জন্যে, সেটা একেবারে নিষিদ্ধ এ বাড়িতে। মনোরমার জন্যেই মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে দিয়ে তৈরী করায় আজকাল, কিন্তু তাতে মনোরমার মন ভরে না। বলে, 'বাজারের বেগুনি-ফুলুরিতে যে সুন্দর গন্ধ আর সোয়াদ—এতে তা নেই।'

হেমন্ত বলে, 'ওদের যত রাজ্যের ভেজাল তেল—খুঁজে খুঁজে সস্তায় কিনে এনে ঐসব ছাইভস্ম ভাজে। আর সেও খুব দোষ দেওয়া যায় না, কারবার করতে বসেছে ওরা, লাভটাই দেখবে বৈকি! আর তা ছাড়া সব বেগুনির দোকানেই পিঁয়াজের বড়া ভাজে—ছোঁয়া-নেপা একসা—জেনে-শুনে তোমাকে খেতে দিই কি ক'রে?'

অগত্যা চুপ ক'রে থাকে মনোরমা, সেই সুদূর সুদুর্লভ অখাদ্য বস্তুগুলির কথা মনে ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

সবচেয়ে যেটা অপছন্দ ওর, বাড়ি থেকে কোথাও বেরুতে পারে না।

কখনও কখনও, জ্যাঠাইমা যখন গাড়ি ক'রে বাইরে যান, বাড়ি দেখতে কি বাড়ি সারাতে, কি অন্য কোন বৈষয়িক কাজে উকিল-বাড়ি—তাও সব সময় নয়—সঙ্গে নিয়ে যান হয়ত। পালে-পার্বণে গঙ্গাস্নানেও নিয়ে যান সঙ্গে ক'রে, একদিন কালীঘাটেও নিয়ে গিয়েছিলেন—তবে এ যাওয়াতে তৃপ্তি হয় না। দেশে থাকতে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে অন্য বৌ-ঝিদের সঙ্গে গল্প করা, বড় জাঠশাশুড়ির ভাষায় 'থ্যাসড়া পাড়া'—কিংবা নির্জন দুপুরে বাগানে-বাগানে ঘুরে ডাঁশা কুল কি ডাঁশা পেয়ারা সংগ্রহ করা—মনে পড়ে ওর চোখে

জল এসে যায়। ওর খুব ইচ্ছে করে—অন্তত আশ-পাশের কারও বাড়ি গিয়ে প্রাণভরে খানিকটা বকে আসে, কিন্তু সেখানেও হেমন্তর কড়া নিষেধ—'একা কারও বাড়ি যাবে না, আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে'—অমান্য ক'রে যেতে সাহসে কুলোয় না।

শুধু ছেলের মুখ চেয়েই পড়ে থাকা এখানে—এই জেলখানায়।

ছেলের আখেরের কথা ভেবেই।

নইলে মনোরমা এই ভাল খাওয়া-দাওয়ার তোয়াক্কা করত না।

লুচি জলখাবার, দশমীর রাত্রে ঘনদুধের সঙ্গে লুচি খাওয়া——এসবে অরুচি ধরে গেছে ওর। এর চেয়ে গুড় তেতুঁল কি পুঁই-চচ্চড়ি কি সজনে-খাড়া ছেঁচকি দিয়ে পরিষ্টি ভাত খাওয়া ঢের সুখের।

কী যে ওর দেওরের এই খাওয়ার ওপর এত লোভ তা বুঝতে পারে না মনোরমা। তবু মাছ-মাংস ডিম এসবগুলো সে বোঝে। আজকাল, সে বিধবা হয়ে আসবার পর থেকে কোন কারণেই মাছ আসে না এ বাড়িতে আর। তবু ছুটে ছুটে আসে নিমাই এই খাওয়ার লোভেই। কত কড়া কড়া কথা বলেন জ্যাঠাইমা, কি হেনস্তা না করেন প্রতিবারই। কুকুর বেড়ালের মতো 'দূর দূর' 'ছেই ছেই' করেন প্রায়—তবু ছুটে ছুটে আসবে আর পড়ে থাকবে। শেষ পর্যন্ত ঘাড়-ধাক্কা দেবার মতো যখন করবেন শাশুড়ি তখন বাড়ি ফিরবে।

লজ্জা-সরম একেবারেই নেই, এমন বেহায়া যদি দুটি দেখেছে কেউ! এই অপমান লাঞ্ছনার মধ্যেই রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে ছানার ডালনা, ধোঁকার ডালনা ফরমাশ করবে আর সেই খাওয়া খাবে বসে বসে অম্লান বদনে। ঘেন্নাপিত্তির কোন চিহ্নও নেই ওর।···

নিমাইচরণের এই সহ্য-গুণ, বিনয় ও 'নেটিপেটি' ভাবে হেমন্ত ভেতরে ভেতরে যে একটু নরম না হয়েছে তা নয়, কিন্তু ওকে এখানে থাকতে দেয় না অন্য কারণে।

মুখ-চোখের চেহারা ভাল নয় ওর। যে উগ্র লোলুপতা ও ক্ষুধার্ততা ফুটে ওঠে ওর দৃষ্টিতে তার অর্থ বোঝে হেমন্ত, ভাল-ভাবেই। ওদের বংশের দোষ এটা। অর্থের লোভ যত না হোক—এই বয়সেই নারীদেহ সম্বন্ধে লোভ অত্যন্ত প্রবল। এই যে এত হেনস্তা সহ্য ক'রেও পড়ে থাকে, সে কেবল খাওয়ার জন্যে নয়। সুখাদ্য-লুব্ধতাটা ওর এখানে পড়ে থাকার একটা ছুতো।

বিশেষ ক'রে বছরখানেক এখানে কাটার পর যখন সুখাদ্য ও সুনিয়মে মনোরমার দেহ পূর্ণতর হয়ে উঠেছে, সাধারণ শ্যামাঙ্গী গ্রাম্য মেয়ের চেহারাতে লাবণ্য সঞ্চার হয়েছে—তখন থেকে নিমাইয়ের ছোঁকছোঁকানিও যেন বেড়ে গেছে। এটা হেমন্তর দৃষ্টি এড়ায় নি। কতই বা বয়স ওর, দু'জনে হয়ত এক বয়সীই হবে—এই বয়সে এতটা ক্ষুধা স্বাভাবিক নয়, এ ওদের বিশেষ রক্তের দোষ।

মনোরমা অতটা বোঝে না। তার এই নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনে একটি সমবয়সী—অল্পবয়সী ছেলের সাহচর্য ভাল লাগার কথা—তা যেমন ধরনেরই হোক না কেন। তাছাড়া সে এই ধরনের অশিক্ষিত বিড়িখাওয়া হ্যা-হ্যা ক'রে বেড়ানো ছেলে দেখতেই অভ্যস্ত। তাই জ্যাঠাইমার এই কুকুর-তাড়া করায় ক্ষুণ্ণই হয়।

কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারে না। করার প্রয়োজন আছে তাও বোঝে না। এটাকে শ্বশুর বংশ সম্বন্ধে স্বাভাবিক্ বিদ্বেষ বলেই মনে করে। হেমন্তও নিজে থেকে বলতে পারে না। সাবধান করতে গেলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে ব্যাপারটা। তবে এটা সে জানে, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বোঝে—কোন যুবতী মেয়ের একটি অল্পবয়সী ছেলের সাহচর্যের প্রতি আকর্ষণ সাধারণ ভাল লাগার স্তরে থাকতে পারে না বেশী দিন, অতি দ্রুত গভীরতর গাঢ়তর ভাল লাগায় গিয়ে পৌছবে। মনোরমার মতো স্বাস্থ্যবতী বলিষ্ঠ গঠনের মেয়ের জৈবক্ষুধা অবশ্যই সাধুচরণকে দিয়ে মেটে নি, সে ক্ষুধা তার তৃপ্তির পথ খুঁজে বেড়াবেই।

কারণটা বুঝতে পারে না বলেই মনোরমা ক্ষুণ্ণ হয়, ক্ষুব্ধ হয়। আজকাল সে নিমাইচরণের আসার দিনগুলির দিকে চেয়ে বসে থাকে। আর কিছু না, একটু গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা। তার মতো অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ের বোধগম্য আচরণ ও কথাবার্তা। জ্যাঠাইমার শাসন ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গণ্ডীকাটা উষর জীবন-মরুর মধ্যে দেওরের উপস্থিতিগুলোই যেন ছায়াশীতল স্নিগ্ধ মরূদ্যান।

এ অবস্থায় ভাল খাওয়া কি পরার লোভে—কী-ই বা ভাল তাই, মাছ বাদ দিয়ে খাওয়া আর শাড়ি গয়না বাদ দিয়ে পরাই বা কি মেয়েদের? সে সব তো ঘুচেপুচে গেছে চিরকালের মতো—সে কিছুতেই পড়ে থাকত না এখানে, পালিয়ে ঐ শ্বশুরবাড়িতেই চলে যেত। সেখানে ধান সেদ্ধ ক'রে ক্ষার ঠেঙিয়ে খাড়া-ছেঁচকি দিয়ে ভাত খাওয়াও ঢের ভাল, ঢের বেশী কাম্য। সেটা স্বাভাবিক জীবন, সেইটেতেই অভ্যস্ত সে। সেখানকার মানুষগুলো সাধারণ, ওর পরিচিত। দিন-রাত কলহকেজিয়া করে, পরের ভাল দেখলে তাদের বুক ফাটে, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ—তবু রক্ত-মাংসের মানুষ তারা। সেখানে এই দেওর থাকে, গল্প করার লোক, খুনসুটি করার লোক।

যেতে পারে না—শুধু ছেলেটার মুখ চেয়ে। ছেলেটাকে জ্যাঠাইমা যেন হাতের তেলোতে রেখেছেন। তাকে মা বলতে শিখিয়েছেন নিজেই। মনোরমাকে ডাকে বৌমা বলে। ভাল সাহেবী ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তাদের গাড়ি এসে নিয়ে যায়। সেই সব খরচ যোগান জ্যাঠাইমা, সেখানে উপযুক্ত দামী পোশাক-আশাক সব। তাতেই একটা স্বপ্ন দেখতে বাধে না যে, এই বিপুল ঐশ্বর্যের একদিন তার ছেলেই মালিক হবে, রাজা ছেলের মা হবে সে। সেদিন এসব শাসন কড়াকড়ি কিছু থাকবে না, যা খুশি তাই করতে পারবে।

ঐশ্বর্য যে ঠিক কত তা জানে না, তবে অনেক যে—এটা ধারণা করতে পারে। মাঝে মাঝে বুড়ো পূর্ণবাবু আসেন, ওদের সরিয়ে দিয়ে কি সব হিসেব-নিকেশ হয়, খাতাপত্র কত কি বেরোয়, টাকাও

গোনাগাঁথা হয়। জ্যাঠাইমা একটা কারবার করেন, সে জানে—বাড়ি কেনাবেচা, জমি কিনে বাড়ি তৈরী করা। আগে নাকি খুব জোর ছিল ব্যবসা, এখন বিলেতে না কোথায় কি এক তুমুল লড়াই হয়ে গেল ক' বছর ধরে—সে লড়াই থামবার পর বাজার নাকি খুব মন্দা যাচ্ছে, দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে—কারবার আর তত জোর চলছে না। দু-একটা লেনদেনে নাকি কিছু লোকসানও খেয়েছেন। তৎসত্ত্বেও, এখনও অনেক আছে। মধ্যে মধ্যে সাবধানে কিছু কিছু বেচাকেনাও করেন, তাছাড়া তিন-চারটে বাড়ির ভাড়াও তো আসে, সেও বড় কম নয়।

এই জন্যেই দাঁতে দাঁত চেপে সুখে থাকার এই কষ্ট সহ্য ক'রে মনোরমা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে খুবই কষ্ট হয়। এক-আধবার—যখন জ্যাঠাইমা কাজে একা কোথাও যান—তখন নতুন ঝিয়ের প্রায় হাতে-পায়ে ধরে খোশামোদ ক'রে একটু-আধটু বেরিয়ে পড়ে সে। তবু ভাগ্যিস চারুর মা নেই, শরীর খারাপ বলে দেশে চলে গেছে, দেশেই থাকবে—জ্যাঠাইমা মাসে তিন টাকা ক'রে পাঠান তাতেই চলে যায় নাকি তার, সেদিক দিয়ে তবু সোয়াস্তি খানিকটা। চারুর মার বড় কড়া নজর ছিল, আর সে বড় বেশী মনিবের পোঁ-ধরা। সে থাকতে একটু কিছু করার উপায় ছিল না শাশুড়ির হুকুম না নিয়ে। তাহলেই আগে গিয়ে বলে দেবে অমনি কুট ক'রে। এ নতুন ঝিয়ের তবু দয়ামায়া আছে। জ্যাঠাইমারই খরচের বাক্স থেকে দু-এক পয়সা ক'রে সরানো সিকিটা-আধুলিটা দিয়ে তাকে হাত করেছে মনোরমা। এটা-ওটা আনিয়ে খেতেও পারে জ্যাঠাইমার অনুপস্থিতিতে, বাইরেও বেরোতে পারে। অবশ্য কারও বাড়ি যেতে ভরসা হয় না—কে কখন কথায় কথায় বলে দেবে ওঁকে—শুধুই একটু বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি-ঘোড়া দেখা যায়।

তবু তাতেই যেন খানিকটা মুক্তি।

আর শাশুড়িকে ফাঁকি দেবার একটা আনন্দ।

সে বছর শেষা শীতে পূর্ণবাবু খুব অসুখে পড়লেন।

প্রথমটা অতকিছু বোঝা যায় নি—কিন্তু সামান্য তিন-চারদিনেই রোগটা বাড়াবাড়িতে দাঁড়াল। একটু অত্যাচারও হয়ে গিয়েছিল, তবে সে এমন কিছু নয়। বাইরে থেকে এসে গরম বোধ হওয়াতে হঠাৎ জামা-টামা সব খুলে ফেলেন, মায় গেঞ্জি পর্যন্ত। ঘামের ওপরই ঢকঢক ক'রে ঠাণ্ডা জল খান খানিকটা। তাতেই—প্রথমে একটু সর্দি হল, সঙ্গে জ্বর—দেখতে দেখতে সেই সাধারণ সর্দিজ্বরই প্রবল আকার ধারণ করল, বেহুঁশ অচৈতন্য হয়ে পড়লেন একেবারে।

ডাক্তার বন্ধুরা এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন, 'নিউমোনিয়া, বুকের অবস্থা খারাপ, বাঁচার আশা কম।'

এ রোগে চিকিৎসার চেয়ে শুশ্রূষা বেশী দরকার। পূর্ণবাবুর স্ত্রীও বুড়ো হয়ে পড়েছেন, ছেলের বৌ চিররুগ্ন, মেয়েরা সবাই বিদেশে। এ অবস্থায় কে দেখে সে-ই সমস্যা। ডাক্তাররা বললেন, 'ভাল নার্স রাখা দরকার, মেডিকেল কলেজে খবর দিন, তারাই ভাল লোক পাঠাবে।'

ওঁরা নিজেরাই খবর পাঠাচ্ছিলেন মেডিকেল কলেজে, পূর্ণবাবুর স্ত্রী শরৎসুন্দরী নিষেধ করলেন। বললেন, 'ভাল নার্স আমার সন্ধানে আছে, আমি নিয়ে আসছি!'

পূর্ণবাবুর এক ছাত্র সম্প্রতি খুব নাম করেছেন, বিলেতফেরৎ ডাক্তার—তিনিই অগ্রণী হয়ে দেখছিলেন, তিনি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন।

'আপনি আর কেন কষ্ট করবেন, বলুন না কে, কাকে ডাকতে হবে, আমরাই খবর পাঠাচ্ছি।'

শরৎসুন্দরী একটু ম্লান হেসে ঘাড় নাড়লেন। সে হাসি একটু রহস্যময়ও—মর্মান্তিক কোন কৌতুকের হাসি—অন্তত বিধানবাবুর তাই মনে হল।

কথাটা শরৎসুন্দরী ক'দিন ধরেই ভাবছেন, পূর্ণবাবু এই অসুখে পড়া থেকেই।

স্বামীর মন কোথায় পড়ে আছে—তা তিনি জানেন। আগে বিদ্বেষ ছিল বৈকি, বিছের জ্বালার মতো সে বিদ্বেষ ঐ বিশেষ ব্যক্তিটি সম্বন্ধেই।

এদিক-ওদিকের নানা প্রণয়-ঘটনা তিনি জানতেন—দীর্ঘকাল ধরেই জানেন, ভাল ক'রে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই।

সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর—পূর্ণবাবুর বয়স তখন ষোল। খেলাধুলো ক'রে বেড়াতেন যখন তখনকার কথা আলাদা কিন্তু ষোল-সতেরো বছর বয়সে—যখন স্বামী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, তখনই বুঝলেন আর যাই হোক—স্বামীর জীবনে তিনি প্রথম রমণী নন, একমাত্র তো ননই।

তারপর বহু এসেছে, গেছে। এতে কতকটা তাঁরা অভ্যস্তও ছিলেন সেকালে। স্বামীকে একা পাওয়া প্রায় কারও অদৃষ্টেই ঘটত না। তবু তো ইনি আর একটা কি দুটো বিয়ে ক'রে সতীনের প্রতিষ্ঠা করেন নি বাড়িতে।

কিন্তু সে-সব ছুটকো-ছাটকা ক্ষণস্থায়িনীদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও হেমন্ত সম্বন্ধে থাকতে পারেন নি। এটা যে শুধুই দৈহিক আকর্ষণ নয়—গভীর ভালবাসা—তা তিনি স্ত্রীর মন দিয়ে বুঝেছিলেন। স্বামীপ্রেমের সুরে বাঁধা হৃদয়ের তারে সে আঘাত ধরা পড়েছিল—যেমন বহুদূরবর্তী ভূমিকম্পের সংবাদ সিস্‌মোগ্রাফে ধরা পড়ে।

রাগ করেছেন, ঝগড়া করেছেন, অশান্তি করেছেন—কিন্তু জেদী ও কর্তৃত্ব-সচেতন পূর্ণবাবুকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি, তিনিই বরং স্ত্রীকে শাসন ক'রে দিয়েছেন। বেশী বিরক্ত করলে সরিয়ে দিয়েছেন বা নিজেই সরে গেছেন, কিছুদিন অন্যত্র গিয়ে বাস করেছেন।

তারপর, কমলাক্ষ-পর্বেও আর একদফা কান্নাকাটি কলহবিবাদ করে স্বামীকে সতর্ক সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন—তবে তার

আর প্রয়োজন রইল না।···তারপর তো দীর্ঘকাল সম্পর্কই ছিল না কোন, যাওয়া-আসা মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু শরৎ-সুন্দরী নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি—স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কী হাহাকার আর কি বিপুল তৃষ্ণা তাঁর অন্তরে তখনও।

বুঝেছেন, সেই প্রথম যে, ইতিমধ্যে ঐ অবাঞ্ছিত বাইরের স্ত্রীলোকটি কখন তাঁর স্বামীর মনের অধিকাংশ অধিকার ক'রে নিয়েছে—তিনি তা টেরও পান নি। সেখানে আজ শরৎই অতিরিক্ত, একটা দায় মাত্র।

এটা প্রচণ্ড আঘাত। এই আঘাতেই তিনি আরও বুড়ো, আরও অথর্ব হয়ে পড়েছেন—স্বামীর চেয়ে ঢের বেশী। বেদনার সেই দুঃসহ বোঝাই এত দ্রুত তাকে অন্তরে বাইরে পঙ্গু ক'রে দিয়েছে।

তার পরও সে যন্ত্রণা কমে নি।

দৈহিক সম্পর্ক আর নেই, থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাতেও কোন সান্ত্বনা পান নি শরৎসুন্দরী। আগেকার সকাম তৃষ্ণার প্রবল তরঙ্গ আবেগোর্মি মিলিয়ে গেছে ঠিকই—এখন তা নিস্তরঙ্গ সরোবরের গভীরতায় প্রবেশ করেছে, পূর্ণবাবুর রূপজ আসক্তি এখন সুগভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে।

পরস্পরের প্রতি এই নির্ভরতা, পরস্পরের সাহচর্যে—সূক্ষ্মমাত্র সান্নিধ্যেই প্রীতি, তৃপ্তি বোধ—এ প্রেম তিনি স্বামীর কাছ থেকে কোন দিনই পান নি, এটা ভুলতে পারেন কৈ ?···

তবু, আজ স্বামীর এই জীবন-সঙ্কটের মুহূর্তে—তাঁরও প্রেমই বড় হয়েছে—ঈর্ষা ও বিদ্বেষের চেয়ে। পূর্ণবাবু এই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে, অর্ধচেতন অবস্থাতে কার সঙ্গ কার সেবা চাইছেন—তা শরৎসুন্দরী জানেন ; এও জানেন যে, কোন ভাড়া করা নার্সই সেই মানুষটির মতো আন্তরিকভাবে সেবা করবে না।···তাই যদি হয়, হয়ত বা স্বামীর জীবনের এই শেষ ক'টি দিন—এইটুকু শান্তি ও তৃপ্তি লাভের হন্তারক হবেন না তিনি, সংসার থেকে শেষ বিদায়ের কালে ওঁর প্রাণের পাত্র অমৃতেই পূর্ণ ক'রে দেবেন। হলাহল যেটুকু তা তাঁরই

থাক—ভাগ্যের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য—তার বদলে সুধাই তুলে দেবেন তিনি স্বামীর তৃষ্ণার্ত মৃত্যুহিম ওষ্ঠাধরে।

পূর্ণবাবুর বন্ধু বা ছাত্র কোন ডাক্তারেরই নিষেধ কানে তুললেন না তিনি। ছেলের ভ্রূকুটিও গ্রাহ্য করলেন না। কোচম্যানকে গাড়ি বার করতে বলে নিজেই বেরোলেন শুশ্রূষাকারিণী ডেকে আনতে।

ছেলে বললে, 'আহা, তা না হয় আমরাই যাচ্ছি কেউ, তোমার আবার এই শরীরে—কোথায় পড়ে-টড়ে যাবে—গাড়ি পাঠালেও তো হয়—ডাকলেই আসবে, এর জন্যে এত হীনতা স্বীকারের দরকারটা কি? কী এমন মান্যমান লোক!'

মা যে কাকে ডাকতে যাচ্ছেন পরেশ তা অনুমান করতে পেরেছে বৈকি! তাতেই আরও বিস্মিত ও বিরক্ত সে।

কিন্তু শরৎসুন্দরী তেমনিই রহস্যময় মৃদু হাসির সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন, বললেন, 'ডাকলে সে আসবে না। এমনিই একাজ এখন আর করে না। এখানে তো আরও আসতে চাইবে না।···তোরা ব্যস্ত হোস নি বাবা, আমি যা করছি ভেবে বুঝেই করছি। এখন এসব ছোট-খাটো মান-অপমান মর্যাদার কথা ভাবার সময় নয়।'

ঠিকানা শরৎসুন্দরীর জানার কথা নয়—তবে কোচম্যানরা বাড়ি চিনবে এটুকু তিনি জানতেন। কিন্তু গাড়িতে উঠে যখন বললেন, 'হেমন্তমার বাড়ি চলো'—তখন তারও কথাটা বুঝতে কিছু সময় লাগল।

সে বোকার মতো খানিকটা ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'হেমন্তমার বাড়ি? মানে—সেই বহুবাজারে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কানে কম শুনছিস নাকি?'

'হাপনি যাইবেন—সেইখানে?' আবারও বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করে সে।

এবার বিরক্ত হয়ে শরৎসুন্দরী মুখ ঘুরিয়ে বসলেন।

এরপর আর সন্দেহ রাখার কোন অবকাশ থাকে না। আপন

মনেই, না-বোঝার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে—সহিসের দিকে চেয়ে হাত ও চোখের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে কোচবক্সে চড়ে বসে পেয়ার আলি কোচম্যান···

পূর্ণবাবুর অসুখের কথা হেমন্ত শুনেছিল। সহিস-ই এসে খবর দিয়ে গেছে, সেও ঠাকুর পাঠিয়ে খবর নিয়েছে। তবে তাতে স্থূল খবরটা—অর্থাৎ বুকে সর্দি বসে জ্বর হয়েছে—এর বেশী কিছু জানা যায় নি। বিস্তারিত সংবাদের জন্যে সেও ছটফট করছিল মনে মনে। পূর্ণবাবু আগের চেয়ে অনেক বেশী আপন হয়ে গেছেন এই ক' বছরে। প্রীতি ও সখ্যের বন্ধন কামজ আসক্তির থেকে অনেক বেশী নিবিড়, অনেক বেশী ঘাতসহ। অন্তরঙ্গ তো বটেই। তাই তখনকার বিদ্বেষ ও ঘৃণার লেশমাত্রও নেই আর মনে। এখনকার উৎকণ্ঠা একেবারেই নির্ভেজাল ও সত্য।

তবু এই আগমন আর আহ্বান বহু দূর কল্পনাতেও ভাবা যায় না।

দরজার কাছে একটা গাড়ি এসে থামতে ঝি যখন এসে বলল, বুড়ো-মতো একজন মেয়েছেলে এসেছে এবং 'হেমন্ত আছে বাড়িতে?' বলে নাম ধরে খবর নিচ্ছে—তখনই যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিল—কিন্তু নিচে এসে মানুষটাকে দেখে একেবারে নির্বাক, স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর যাকেই হোক—শরৎসুন্দরীকে দেখার আশা করে নি সে, এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। অন্য যে কোন লোক—এমন কি স্বয়ং মহারাণী মেরী এসে দাঁড়ালেও সে এত বিব্রত ও বিস্মিত হত না।

কীভাবে অভ্যর্থনা জানাবে এই অপ্রত্যাশিত অনাহূত অতিথিকে—'আপনি' বলবে না 'তুমি' বলবে, কী মনে ক'রে এসেছেন উনি, অপমান করতে, কলহ করতে—অথবা স্বামীরই খবর দিতে, কেবল মাত্র গুরুতর কোন দুঃসংবাদ জানাতেই—কিছুই বুঝতে না পেরে, জীবনে এই প্রথম বোধ হয় নির্বোধের মতো শূন্য মূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইল—কোন সৌজন্য প্রকাশ করতে বা সাদর সম্ভাষণ জানাতে পারল না।

সেজন্য অবশ্য অপেক্ষাও করলেন না শরৎসুন্দরী।

এ দৃশ্য উপভোগ করারই কথা তাঁর, অন্য সময়ে হলে এই সাক্ষাতের কৌতুকটুকু নিঃসন্দেহে আনন্দ দিত তাঁকে—কিন্তু এখন সে সময় নয়, সে কথা মনেও পড়ল না।

এমন কি, ওর এই বিমূঢ়তাও বোধ করি ভাল ক'রে লক্ষ্য পড়ল না—শরৎসুন্দরী নিজেই এগিয়ে এসে হেমন্তর হাত দুটি ধরে বললেন, 'ভাই, শুনেছ তো—ওঁর খুব অসুখ। ভাল হয়ে যে উঠবেন—এটুকু আশা করতে সাহস হচ্ছে না, কোন ডাক্তারও ভরসা দিতে পারছেন না। বোধ হয়…বোধ হয়—শেষ অবস্থাই এটা। তোমার একবার এসময়ে যাওয়া দরকার যে! তোমার জন্যে তাঁর প্রাণটা ছটফট করছে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে—তাছাড়া, আর কেউ তো নেই, এসময় তাঁর ভারই বা কে নেবে তুমি ছাড়া? আর তো কেউ এমন প্রাণ দিয়ে ওঁর মন বুঝে করতে পারবে না!'

বলতে বলতেই দু' চোখের কূল বেয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়ল তাঁর।

কে জানে, এটা স্বামীর অসুখের জন্য উদ্বেগ, আসন্ন বৈধব্যের আশঙ্কা—না এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করার—করতে বাধ্য হওয়ার বেদনা এটা! রিক্ততার, নিঃস্বতার অশ্রু এটা!

প্রথম বিস্ময়ের বিহ্বলতা হেমন্তর কেটে গেছে ততক্ষণে। বুদ্ধি ও বিবেচনা ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব সক্রিয়তা।

সে ওঁর মুঠির মধ্যে ধরা নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁর হাত দুটোই চেপে ধরে, বলে, 'এর জন্যে আপনি এই শরীরে আবার নিজে আসতে গেলেন কেন দিদি? আমাকে একটা হুকুম ক'রে পাঠালেই তো যেতুম। সইসটাকে বলে দিলেই হত। চলুন চলুন, ভেতরে বসবেন চলুন!'

'আজ থাক ভাই। এখন আর অপেক্ষা করা চলবে না।

ভগবান যদি দিন দেন, তাঁর দয়ায় অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে—তাহলে অবশ্যই আর একদিন আসব, বসবও। বসার কি গল্প করার সময় আর হাতে নেই। এখন সবাই মিনিট গুনছেন সেখানে। সেই জন্যেই তো ছুটে আসতে হল—যদি ভাবো এ ডাকের মধ্যে কোন অসম্মান আছে, যদি না যাও সে ঝুঁকি আর নিতে রাজী নই।'

'তাহলে চলুন দিদি, এখনই চলে যাই—এই সঙ্গে।'

'এই অবস্থায়—?' এবার বিস্মিত হবার পালা শরৎসুন্দরীর, 'কাপড়টা বদলাবে না? অন্য কাপড়-চোপড়—চাদর?'

'না, কাপড় বদলাবার দরকার হবে না। কী এমন উৎসবের বাড়ি যাচ্ছি যে, সেজেগুজে যেতে হবে? তবে কাপড় একখানা নিতে তবে বটে। থান কাপড় পরি তো—। সে ওখানে মিলবে না—ঈশ্বর করুন কোন দিনই না মেলার দরকার হয়।...চলুন আপনাকে গাড়িতে বসিয়ে দিই আগে, তারপর ঠিক এক মিনিটের মধ্যে চলে আসছি—'

এক মিনিট না হোক, দু-তিন মিনিটের মধ্যেই নেমে আসে হেমন্ত। একটা গামছা ও থান-দুই থান ধুতি নিয়ে—তার মধ্যে একটা তসরের কাপড় পূজোর জন্যে—আঁচলে চাবিটা বাঁধতে বাঁধতেই এসে গাড়িতে চেপে বসে।

সেই যে গিয়ে রোগীর পাশে বসল হেমন্ত দীর্ঘ দিন আর উঠতে পারল না।

কঠিন অসুখ, এ বয়সে এ রোগী কেউই বাঁচে না—নিতান্ত পূর্ণবাবুর কঠিন প্রাণ বলেই বোধকরি যুঝে যেতে লাগলেন। জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাওয়া যাকে বলে—তাই চলতে লাগল তাঁর—যমে-মানুষে টানাটানি ঠিক যাকে বলে। কোন সংজ্ঞা নেই রোগীর, বেহুঁশ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। হেমন্ত যখন আসে তখন একবার চোখ চেয়ে দেখেছিলেন, চিনতেও পেরেছিলেন বোধ হয়—কারণ হেমন্ত হাতের ওপর হাত রাখতে দুর্বল হাতেই ঈষৎ

একটু চাপ দিয়েছিলেন একবার—তারপর সেই যে যেন-নিশ্চিন্ত-হয়ে চোখ বুজেছিলেন পূর্ণবাবু আর একবারও চোখ খোলেন নি।

তাঁর এই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই দেখে ছাত্র বিধানবাবু সুদ্ধ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'মাষ্টার মশাইয়ের ঐটুকু দেহে যে এতটা শক্তি ছিল তা কখনও ভাবাও যায় নি—না? অদ্ভুত ফাইট দিচ্ছেন কিন্তু! এই দেখে মনে হচ্ছে বাঁচানো হয়ত একেবারে ইমপসিব্‌ল নাও হতে পারে।'

তিনি অবশ্য যা করবার সবই করলেন। অন্য প্রবীণ ডাক্তার দু-চারজন আসা-যাওয়া করলেও বিধানবাবুর মতেই চিকিৎসা হতে লাগল। নীলরতনবাবু অজিতবাবু এঁরা রোজই আসতেন, কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা পালটান নি কখনও। আসলে ওঁরা হাল ছেড়েই দিয়েছেন—ভাবটা এই রকম—'ছোকরার খুব সর্দারী করার শখ—করুক, কেমন বাঁচাতে পারে দেখাই যাক না!'

এর মধ্যে এক মিনিটও বিছানা ছেড়ে ওঠা যায় নি বলেই বাড়িতেও আসা যায় নি আর। স্নান ও আহারের ছুটি পেয়েছে ক্ষেপে ক্ষেপে। হয় ডাক্তারবন্ধু কেউ এসে বসে আছেন, সেই ফাঁকে একবার উঠে স্নান ক'রে এল, আহ্নিক করতে হয় রোগীর মাথায় আইসব্যাগ ধরেই, মনে মনে—খাওয়া সেও ঐখানে পাশে বসেই, একটা চোখ রোগীর দিকে রেখেই। ঘুমটা অবশ্য চলে পালা ক'রে। প্রথম রাত্রে শরৎসুন্দরী এসে বসেন, দশটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত। তিনি আপিংখোর মানুষ, তাঁর সহজে ঘুম আসে না—তিনি আরও জেগে থাকতে পারেন, কিন্তু হেমন্ত দেয় না। ওর এমনিতেই পর পর রাতজাগা অভ্যাস আছে, ছেলেকে দিয়ে সে অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে বলতে গেলে—তার দু-তিন ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। সে একটা নাগাদ উঠে পড়ে—জোর ক'রে শরৎকে পাশে তাঁর শোবার ঘরে পাঠিয়ে দেয়—আর কারও জেগে থাকার দরকার হয় না।

এতদিন লাগবে হেমন্তও ভাবে নি, মনোরমাও না। সে পড়ে গেল এ বাড়িতে সম্পূর্ণ একা। খালি, অভিভাবকশূন্য বাড়িতে ওর

সঙ্গে প্রায়-ছোকরা উড়ে ঠাকুরকে রাখা সঙ্গত হবে না বলে, এখান থেকেই তাকে ডেকে পাঠিয়ে ছুটি দিয়েছে হেমন্ত। ঝি আর মনোরমা—এবং গৌর এই তিনটি প্রাণী থাকে। হেমন্ত আসার সময় খরচের মতো টাকা মনোরমার কাছেই রেখে এসেছিল। একটা আন্দাজী হিসেব ক'রে—এক মাসের মতো খরচ। তাছাড়া কিছু ওর সঙ্গেও থাকে—টাকা রাখার জন্যে ক্রুশে বোনা পশমের একটা থলি সর্বদা কোমরে থাকে, গোপালীর নিজে হাতে বুনে দেওয়া —হেমন্ত বলে, 'হাতিয়ার, কলিযুগে টাকাই যথার্থ হাতিয়ার।' এই থেকেই সে একদিন অন্তর পূর্ণবাবুর সইস রামধনকে দিয়ে বাজার করিয়ে পাঠায়। সে অমনি সেই সময়ই আর কোন দরকার আছে কিনা, কে কেমন আছে সেই খবর নিয়ে হেমন্তকে এসে বলে যায়।

সেদিক দিয়ে অসুবিধে কিছু নেই। সহস্র দুশ্চিন্তা ও একাগ্র পরিশ্রমের মধ্যেও সে চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঠিক থাকে ওর। মাসকাবারী উটনো তোলা থাকে—তবু দু-চার পয়সার কোন জিনিস যদি দরকার হয় রামধনই এনে দেয়। 'ঝি যেন বৌমাকে একা ফেলে একপা-ও কোথাও না যায়'—কড়া হুকুম দিয়েছে হেমন্ত, 'যা কিছু দরকার হবে বাইরের কাজ রামধনই ক'রে দেবে।'

তা করেও রামধন। দু'বেলাই এসে খবর নিয়ে যায়।

ওদিকটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে রোগীর দিকে মন দিতে পারে হেমন্ত।

॥ ৯ ॥

একেই শহরের বন্দী জীবনে অস্থির হয়ে উঠেছিল মনোরমা, হেমন্ত ও ঠাকুর—দু-দু'জনের অনুপস্থিতিতে হাঁপিয়ে উঠল একেবারে। ওর যেন ডাক ছেড়ে কান্না পায় এক-একসময়। জনহীন শব্দহীন বাড়িটা গিলতে আসে ওকে। ছেলে থাকলেও তবু একরকম ক'রে

অনেক। দুটো বিয়ে করেছিল, একটা আট বছর বয়সে, সে বৌ সোমত্থ হবার আগেই মরে যায়, আরেকটার সঙ্গে তবু বছর-দুই ঘর করতে পেরেছিল, ছেলেও হয়েছিল একটা—তারপর সবসুদ্ধ ওলাবিবির দয়ায় শেষ, যাকে বলে ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন।

না, আর বিয়ে করে নি। এই তো বারোটি টাকা মাইনে এখানে, এর মধ্যেই নিজেকে খেতে হয়—কী-ই বা থাকে! দেশে মা নিজে হাতে মাটি কুপিয়ে যা পারে চাষবাস করে—জমি কিছুই নেই, বিঘেখানেক বড় জোর ঠেঙিয়ে-বাড়িয়ে—তাতে তার কোন মতে চলে যায় ভিক্ষে দুঃখু ক'রে। রামধন এখন আর একটা বিয়ে করলে দেশে রীতিমতো টাকা পাঠাতে হবে। চার-পাঁচ টাকার কম পাঠানো চলবে না। এই মাইনের থেকে খাওয়া-পরা চালিয়ে মাসে চার-পাঁচ টাকা বাঁচানো খুব কষ্টের কথা। তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ আছে, ছেলেমেয়ে হতে থাকবে—পেটও বাড়বে—কী বা নিজে খাবে আর কী বা ওদের খাওয়াবে।

না না, ছেলেমানুষ ছিল যখন—বিয়ের ফুর্তিতে বিয়ে করেছে—অত কিছু ভাবে নি। মা দাদা দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছে। এখন চোখ-কান খুলেছে—আর সাহস হয় না। দাদা ছিল যখন এতটা ভয়ও ছিল না। সে 'জন' খাটত, তাতেই সংসার চলে যেত। সেও 'নিউদ্দিশ' আজ চারবছর, কেউ বলে ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে 'পুলিপোলাও' খাচ্ছে আন্দামানে বসে, কেউ বলে খুন হয়েছে। দাদার 'পরিবার' আর একজনকে ধরে তার ঘরে গিয়ে উঠেছে ছেলেপুলে সুদ্ধ—ঝামেলা মিটে গেছে।

মনের মতো শ্রোতা পেয়ে রামধন সোৎসাহে বলে যায়—অতি অসাধারণ এইসব সাধারণ কাহিনী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে মনোরমাও। এখানকার পোশাকী জীবন নতুন পাম্পশু জুতোর মতোই অসহ হয়ে চেপে বসেছে, রামধনের এইসব গল্পের মধ্যে যেন মুক্তির স্বাদ পায় সে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।...

খুশি হয় তাতে, নিশ্চিন্ত হয়ে এদিকে-ওদিকে যেতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়াতে 'পারে। মনোরমাও ঝিয়ের' অনুপস্থিতিতে অনেকটা স্বাধীনতা পায়। এটা-ওটা খাওয়ায় রামধনকে, চা ক'রে দেয় লুকিয়ে। এদের বাসনেই দেয়। শাশুড়ী জানতে পারলে জ্যান্তে পুঁতবে, এসব বাসন ব্যবহারযোগ্য তো থাকবেই না—সে কথা একবারও মনে পড়ে না। রামধনকে দিয়েই বেগুনি-ফুলুরি আনিয়ে খায় দু'জনে বসে। মনোরমার অত বামনাই নেই, ছোট জাতের ছোঁয়া লাগলেও জাত যাবে—একথাটা ওর মাথায় ঢোকে না অত। তাছাড়া লুকিয়ে খেতে দোষ কি?

বেগুনি-ফুলুরি তো বটেই—রামধন প্যাঁজের বড়া খাওয়াবার জন্যও জেদ করে, কিন্তু অতটা আবার সাহসে কুলোয় না মনোরমার। পিঁয়াজের বড় দীর্ঘস্থায়ী গন্ধ, দূর থেকেও নিঃশ্বাসে পাওয়া যায়। ঝি যদি ধরে ফেলে? সে বড় লজ্জার কথা। বামুনের বিধবা পিঁয়াজ খেয়েছে—তার ওপর রামধনের নিয়ে আসা খাবার! হয়ত ঐ ঝিই আর তার কাজ করতে চাইবে না।

দিনের বেলায় এখানের উপস্থিতিটা দীর্ঘায়িত করতে রামধনেরও সাহসে কুলোয় না। হেমন্ত মার হুঁশ বড় 'টন্‌কো'—চারদিকে চোখ-কান খোলা থাকে তাঁর। রামধন কখন যায় কখন ফেরে—বাড়ির আর কেউ অত লক্ষ্য না করলেও তিনি ঠিক খেয়াল ক'রে রাখেন। এত বড় অসুখের সেবা-শুশ্রূষার মধ্যেও একফাঁকে বেরিয়ে এসে জেরা করেন। তখন নানা রকম মিথ্যে বলতে হয় বানিয়ে বানিয়ে—কল্পিত কাজের ফিরিস্তি দিতে হয়, কোন কোনদিন হঠাৎ আত্মীয়ের সঙ্গে-দেখা-হয়ে যাওয়ার গল্প ফাঁদতে হয়।

না, সে বড় গোলমাল, দিনমানে দেরি হয়ে গেলে।

তাই—হেমন্তমা না পাঠালেও, অন্য কাজের ফাঁকে, কিংবা কাজ না থাকার অজুহাতে বেড়াতে যাবার নাম ক'রে পালিয়ে চলে আসে

সে আজকাল। সন্ধ্যার পরই সে অবসর মেলে বেশির ভাগ। প্রথম প্রথম ছেলের জন্যে একটু অসুবিধা হত, রামধন ইঙ্গিত বুঝে আর একটু রাত ক'রে আসতে লাগল। তখন ঝি থাকলেও, সে বসে বসে ঢোলে কিংবা সোজাসুজি মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে শুয়েই পড়ে। নইলে—'বড্ড ঘুম পাচ্ছে বাপু বসে বসে, ঐ নোকটা তো আছে—আমি বৌদি ত্যাতক্ষণ একটু পাশের বাড়ির হরিদিদির কাছ থেকে একটুন্ পান-দোক্তা খেয়ে আসি' বলে বেরিয়ে পড়ে।

এই উভয় পক্ষেরই বাঞ্ছিত—একান্ত সাহচর্যের ফল যা ফলবার ফলল।

দ্রুতই ফলল বলতে গেলে।

একদিন—যথেষ্ট কাছাকাছিই বসে ছিল দু'জনে—তবু বাতাস করার অছিলায় আর একটু কাছ ঘেঁষে বসল মনোরমা। রামধনের সইস-জীবনে এ অভিজ্ঞতা অভিনব শুধু নয়—অবিশ্বাস্য। এমনিও তার দেশে থাকতেও এ কেউ করে নি কখনও। এর অর্থও তার না বোঝবার কথা নয়।…বিশেষ পাখার অভাবে যখন আঁচল দিয়ে বাতাস করতে হয়—হাতটা ওঠা-নামার ভঙ্গীগুলো তখন বিশেষ আমন্ত্রণ জানায়, আশ্বাস ও অভয় দেয়, স্পর্ধা ও সাহস যোগায়। আঁচল গায়ে এসে পড়ে স্পর্শের প্রশ্রয় দেয়—কাজটা এগিয়ে রাখে অনেকটা। ঘন নিঃশ্বাসের শব্দটাও শুনতে কোন অসুবিধা নেই। সেটাও এক ধরনের উৎসাহ, প্ররোচনা।

অতএব রামধন যদি কিছুক্ষণের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে খপ্ ক'রে আঁচল সুদ্ধ হাতটা চেপে ধরে তো তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আর—ওপক্ষ থেকে যদি মুখ নত হওয়া ছাড়া কোন প্রতিবাদ না জাগে তাহলে সে হাত ধরে আরও কাছে টানবে রামধন—এও স্বাভাবিক।…

মরুভূমিতে তৃষ্ণার সময় থকথকে পাঁকও লোভনীয়, জীবনরক্ষক বলে মনে হয়, পোকা-বিলবিলে পচা জল দেখেও তৃষ্ণার্ত পথিক সাগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মনোরমাও নিদারুণ তৃষ্ণায় এই পঙ্কে ঝাঁপ দেবে—এতেই বা আশ্চর্য কি ?

পূর্ণবাবুকে মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনতে পুরো দুটি মাস সময় লাগল।

এই দু' মাস কোনদিকে তাকাবার, অন্য কোন কথা চিন্তা করার অবসর মেলে নি হেমন্তর।

প্রথম যেদিন চোখ খুলে চাইলেন পূর্ণবাবু, হেমন্তকে চিনতে পারলেন, প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কখন এলে ? তোমাকে কে খবর দিলে ?'

হেমন্ত হেসে বলল, 'কখন কি বলছ, কবে এলে তাই জিগ্যেস করো! এই তো প্রায় দু' মাস হল—এখানে বসে আছি, এই এক ঘরের মধ্যে!'

'দু' মাস! এতদিন ভুগছি!'

এই বলে—সম্ভবত এত কথা বলা ও অসুখের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব অনুভব করার ক্লান্তিতেই চোখ বুজলেন আবার। খানিকটা পরে—আবার যখন কথা বলার মতো অবস্থা হল তখন প্রশ্ন করলেন, 'তার পর ? তোমার ঘর-সংসার দেখছে কে ?'

'গোবিন্দ দেখছেন। আর কে দেখবে! এখান থেকে রামধন গিয়ে খবর নেয়, বাজার-দোকান করে দেয়—ঝি আছে আর বৌমা আছে, রাঁধে বাড়ে খায়-দায়। বাড়িঘর যা হয়ে আছে, বুঝতেই পারছি—এক হাঁটু। এইবার তুমি একটু ভালর দিকে—এখন দিদিই দেখতে পারবেন, এবার আমি ছুটি নোব। সত্যিই—কী যে হচ্ছে!'

আরও খানিকটা চোখ বুজে থেকে শক্তি সঞ্চয় করেন পূর্ণবাবু, তারপর বলেন, 'আর দুটো-একটা দিন থেকে যাও। বসতে পারি একটু আগে—। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, দু-একদিনে বেশী কি ক্ষতি হবে!'

আর একটু থেমে বলেন, 'কিন্তু তুমি এখানে—সেইটেই বুঝতে পারছি না। খবর পেয়ে এলে বুঝি ? এরা কিছু বললে না ?'

'না, খবর পেয়ে আসি নি। দিদি নিজে গিয়ে ডেকে এনেছেন।'

'কে ডেকে এনেছে—মেজবৌ? 'নিজে গিয়ে ডেকে এনেছে! আশ্চর্য!' অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না এর পর।

দুর্বল মস্তিষ্কে এতখানি বিস্ময়ের আঘাত সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল।

অবিশ্বাস্য বিস্ময়। সেই সঙ্গে বুঝি একটু অনুতাপও।

বুদ্ধিমান বহুদর্শী পূর্ণবাবুর সেই রোগাচ্ছন্ন চিন্তা-শক্তিতেও কার্য-কারণ যোগাযোগটা বুঝে নিতে দেরি হয় না। কতখানি ভালবাসায় এতটা ঔদার্য, এতটা আত্মত্যাগ সম্ভব হয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। মেয়েদের এই ঈর্ষাটা জয় করা সহজ নয়, কঠিন পরীক্ষা এটা—চূড়ান্ত অসম্মান ও আঘাত ভুলে গিয়ে বহুদিনের বহু আঘাত ও অপমান—এই দীনতা ও পরাজয় স্বীকার করা।

বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বড়ই অবিচার করেছেন স্ত্রীর প্রতি, জীবন-সঙ্গিনীর প্রতি। দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী।

শরৎসুন্দরীর প্রতি অবিচারই ক'রে গেছেন জীবনভোর। কখনও তার দিকটা বোঝবার চেষ্টা করেন নি—তার জ্বালাটা বোঝবার চেষ্টা করেন নি। নিজের সুখের কথাই ভেবেছেন, শুধু নিজের প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যুগিয়ে গেছেন—বিচার বিবেচনা বিবেকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে। ক্ষীণতম প্রতিবাদ সামান্যতম বাধাতেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন স্ত্রীর প্রতি।···

হেমন্তও বুঝি বোঝে এই নীরব থাকার অর্থ।

ওঁর মনের তরঙ্গ ওঠা-পড়ার শব্দ শুনতে পায় নিজের মনে।

আস্তে আস্তে বলে, 'আমার আর না থাকাই ভাল—বুঝলে? এবার দিদিই বসুন কাছে, তাঁর সেবাই নাও দু'দিন।···আর তো খুব একটা মেহনতের কাজ রইল না—যেটুকু দরকার হবে, উনিই পারবেন চালিয়ে নিতে।'

'তাই যেয়ো।' পূর্ণবাবুও ধীরে ধীরে জবাব দেন, কথাগুলোর অর্থ উপলব্ধি করতে করতে, 'কাল-পরশুই চলে যেয়ো। বরং মধ্যে মধ্যে

এসে খবর নিয়ে যেয়ো এক-আধবার। গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে। গাড়িরও তো বিশেষ কাজ নেই, বসেই তো আছে। চলেই যাও। তোমারও ঘরবাড়ির কি হাল হচ্ছে কে জানে!…এর মধ্যে একদিনও যাও নি?…কে জানে কী হবে! বৌটাকে একা রেখে আসা ঠিক হয় নি। ওটা আস্ত বুনো—পোষ মানতে এখনও ঢের দেরি।'

'কী করব বলো! ওদিকে আর তাকাবারই যে অবসর পাই নি। তোমার কথা ভাবব, না সংসারের কথা ভাবব!'

অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে পূর্ণবাবুর। বলেন, 'আশ্চর্য! তোমারও—। তোমাকেও এতকাল চিনতে পারি নি।… কাউকেই। নিয়েই গেলাম জীবনভোর, দেওয়ার কথাটা আর ভাবা হয়ে উঠল না।…এত পাষণ্ড—তবু তো তোমরা আমাকে—। এটা ভগবানের অহেতুক আশীর্বাদ, আমি এর যোগ্য নই।'

বলতে বলতে দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে পূর্ণবাবুর।

এই শরীরে এতটা আবেগের আঘাত সহ্য হবে না বুঝে হেমন্ত 'আসছি' বলে উঠে ভেতরের দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। সে যতক্ষণ কাছে থাকবে পূর্ণবাবু চুপ ক'রে থাকতে পারবেন না, আর এখন যে সব কথা হবে—এই ধরনের আবেগ ঘেঁষেই চলবে তার বক্তব্য।

॥ ১০ ॥

পরের দিন রামধনকে দিয়েই খবর পাঠাল হেমন্ত: এই দুটো দিন পর পর সংক্রান্তি আর মাস পয়লা পড়ল, তার ওপর বেস্পতিবার—এগুলো কাটিয়ে তরশু শুক্রবার সে বাড়ি ফিরবে। এখান থেকে খেয়ে-দেয়েই যাবে অবশ্য, বেলা দুটো-তিনটে হবে পৌঁছতে। ঝি যেন ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে রাখে, আর একফাঁকে

ধনন ঠাকুরকে খবর দেয়—যাতে সে শুক্রবার বিকেলে এসে পড়ে। পাশের বাড়ির দত্তবাবুদের ঠাকুরকে বললেই সে খবর পাঠিয়ে দেবে।

সেই যে গেল রামধন আর ফিরল না। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর ক্রমশ বিকেলে গড়িয়ে গেল—মানুষটাও এল না, কোন খবরও না।

হেমন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এমনি সাধারণ উদ্বেগ নয়—কেমন এক ধরনের অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তা। রামধনকে যখন কথাগুলো বলে দিচ্ছে তখনই মনে হয়েছিল যেন মুখটা শুকিয়ে গেল তার। হেমন্তর মুখের দিকে চাইতে পারল না, এদিক-ওদিক—মাটির দিকে—তাকাতে লাগল, বার-দুই 'আজ্ঞে' 'যে আজ্ঞে' বলে একরকম পালিয়েই গেল সামনে থেকে।

ঠিক তখনই অতটা ভাবে নি। লক্ষ্য করা যাকে বলে তা করে নি। আচরণটা কেমন যেন—এইটুকু শুধু মনে হয়েছিল। তাও খুব অস্বাভাবিক বলে তখনই অতটা বুঝতে পারে নি। ক্রমশ অনুপস্থিতিটা যখন কোনরকম সম্ভাব্য কারণ ছাড়িয়ে দীর্ঘ হয়ে উঠল, জানাশুনো তার সমস্ত আড্ডাতে খোঁজ ক'রেও কোন খবর পাওয়া গেল না, তখনই সে সময়কার আচরণের দুর্বোধ্যতাটা মনে পড়তে লাগল। আস্তে আস্তে মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে মনে হল ভাবভঙ্গীটা আদৌ স্বাভাবিক নয়, এবং সেটা বুঝে তখনই একটু সচেতন হয়ে ওঠা উচিত ছিল।

শেষে সন্ধ্যা হয়ে আসতে বাড়ির অপরাপর লোকও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। পূর্ণবাবু শুনে বললেন, 'মোহনকে তোমাদের বাড়ি পাঠাও আগে, ছাখো সেখানে কোন বিভ্রাট বেধে বসে আছে কিনা!'

মোহন ওঁদের পুরনো চাকর, এখন দারোয়ান-বাজারসরকারের পদে উন্নীত হয়েছে।

মোহন খবর নিতে গেল, কিন্তু সে ফিরল না।

সে জায়গায় কাঁদতে কাঁদতে এল হেমন্তর ঝি। মোহনকে বসিয়ে সে এসেছে। গোরা এসেছে ইস্কুল থেকে, সে কার কাছে থাকবে—তাই এতক্ষণ আসতে পারে নি।

আসল কথা, মনোরমাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

রামধন সকালে গিয়েছিল একবার—অনেকক্ষণ কী সব কথা হয়েছে তা ঝি জানে না—সে তখন কলতলায় ছিল—তার পর দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু আঁচলটা বিছিয়ে চোখ বুজেছে, উঠে দেখে নিচের সদর দরজা ভেজানো—মনোরমা নেই। কোন ঘরেই নেই। সেই থেকে এখনও তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি। ছেলেটা এসে খিদেতে কাঁদছিল—কে রাঁধে কে খেতে দেয়—ঝিই সামনের দোকান থেকে দুটো মিষ্টি কিনে এনে খাইয়েছে, তারও পয়সা দেওয়া হয় নি—টাকা-পয়সা তো সব বৌদির কাছে থাকে, কোথায় থোয় কি করে ঝি সে সব জানে না। ইত্যাদি—

হেমন্তর মুখ শুনতে শুনতে অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছিল। ক্রমশ তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ওর মেজাজ সম্বন্ধে এতদিনে কিছু ধারণা হয়ে থাকলেও এ চেহারা কখনও দেখে নি ঝি, সে ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগল।

হেমন্তর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার জেরাতে বলেও ফেলল সে অনেক কথা।

অন্তর্যামীর মতো প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উত্তরটা এগিয়ে দেয়—সেখানে মিথ্যা কথা বলাও যায় না বেশীক্ষণ।

'এর মধ্যে ওদের খালি বাড়িতে রেখে তুই ক'দিন গিয়েছিলি পাড়া বেড়াতে? সন্ধ্যেবেলা পানদোক্তার ছুতো করে মল্লিকবাড়ির গিন্নি ঝিয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতিস কতক্ষণ ধরে? ঠিক ক'রে বলবি, সত্যি কথা—এসব কথা ছাপা থাকবে না—গিয়ে আমি বার করবই, কোথায় কতক্ষণ ক'রে থাকতিস—তার পর তোর একদিন কি আমারই একদিন, জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নোব, কোন বাবা তোর রুখতে পারবে না।...ভাল চাস তো সত্যি কথা বল!'

এর পর আর মিথ্যে কথা বলতে সাহস হয় না। সত্যি কথাই বলে সে। সব স্বীকার করে।

একদিন-দু'দিন নয়, এর মধ্যে অমন অনেকদিনই বেরিয়ে গেছে সে। বাবুর বাড়ির লোক, পুরনো বিশ্বাসী লোক—তাকে রেখে

নিশ্চিন্ত হয়েই গেছে। এর মধ্যে কোন বিপদের কথা আছে ভাবে নি। বামুনের মেয়ের এত ছোট পিরবিত্তি হবে তাও মনে করে নি। এখন কিন্তু সব মনে পড়ছে ওর—কোন কোন দিন মনোরমাই পাঠিয়েছে ওকে—নানা ছুতোনাতায়। কিংবা ওর ওপর 'আত্তিশো' দেখিয়ে—'যাও না একটু, পানদোক্তা কেনাও হবে, অমনি ফাঁকে একটু ঘুরেও আসা হবে। দিনরাত বন্দী হয়ে থাকা তো!'—তখন অত কিছু বুঝতে পারে নি ও, আজ বুঝছে যে, সবটাই ওকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবার ছুতো।

আরও বলে।

কবে কি ধরনের কথা কানে গেছে, টুকরো টুকরা কথা, কী রকমের রসিকতা হাসিবটকেরা, চোখে চোখে ইশারা। তখন অত কিছু ভাবে নি সে সত্যি-সত্যিই। এমন যে সম্ভব, এও যে হতে পারে, তাও মাথাতে যায় নি। ছোট জাত ছোট কাজ করে—উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলে যাওয়ার কথা যার, ভদ্দরলোক বামুনের ঘরে যার রোয়াকে ওঠার অধিকার নেই, তার সঙ্গে যে—না না, একথা কী ক'রে বুঝবে সে?

'মাইরি মা, এই কালীঘাটের কালীর দিব্যি, সত্যি বলছি!'

কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে হেমন্তর দুই ঠোঁটের ভঙ্গী।

শানিত ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'না, তুমি তা বুঝবে কেন, তুমি এক বছরের শিশু—তোমার মাথাতে এসব কথা ঢোকে কখনও! এই তো এখন যে সব কথাগুলো বলছ—এই ধরনের কথা হয়েছে—তুমি কিছু বুঝতে পারো নি? এত সরল তুমি? সবে জন্মেছ, না? তবে আজ বুঝলে কি ক'রে যে কথাগুলো গর্হিত? আজ যে মানেটা মাথায় যাচ্ছে সেদিন তার কিছু বুঝতে পারো নি? কোন মনিবের ঘরের বৌ, তায় চাকর—তাও বাড়িতে কাজ করার লোক নয়—আস্তাবলের সইসের সঙ্গে এইভাবে কথা কয় শুনেছিস কখনও? তুই-ই তো বলছিস ওদের রোয়াকে উঠতে দেয় না। তবে? এতেও তোমার সন্দ হল না?—আসলে তুমিই কুটনীগিরি ক'রে জুটিয়ে দিয়ে

মজা দেখেছ।—দাঁড়াও, বাড়ি যাই আগে, তোমার মায়াকান্না বার করছি।'

তারপর ঘরে ঢুকে পূর্ণবাবুকে বলে, 'শুনলে তো সব ? এখুনি তো যেতে হয়। বেস্পতিবার মানতে গেলে তো আর চলবে না!'

'না, না, তুমি যাও, রাত্তিরে বার-দোষ থাকে না। বরং মোহনকে নিয়েই যাও, দরকার হয় এক-আধদিন রেখেও দিতে পারবে। মনে হয় এখানে তার জন্যে কিছু আটকাবে না।...ও ঝিকে যে আর রাখবে না সে তো বুঝতেই পারছি।'

'ওকে আবার রাখব! গিয়েই বিদেয় করব ঝ্যাঁটা মেরে। তবে সে জন্যে মোহনকে আটকে রাখার দরকার হবে না। ও শুধু যদি গিয়ে একবার ক'রে সকাল-বিকেলে খোঁজ নেয় তাহলেই হবে। তারপর—দু-একদিনেই লোক ঠিক ক'রে নোব। ঠাকুর তো আছেই।'

যাবার আগে পূর্ণবাবু আর একটি উপদেশ দিলেন, 'যদি ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে থাকে, ওকে পালতে চাও, এখানে বাড়িতে রেখো না। কোন মিশনারী ইস্কুলের হোস্টেলে রেখে দেবার ব্যবস্থা করো। ঝি-চাকরদের ওপর ভরসা ক'রে থাকলে ছেলে মানুষ হবে না। তুমি তো এখন রোজগেরে বেটাছেলে—বিশেষ ব্যবসাদার, তুমি পারবে না দেখতে, ঝি-চাকরের কাছেই থাকবে বেশির ভাগ—একেবারে বাঁদর তৈরী হবে।'

'দেখি! তুমি তো ওঠো আগে। যা ব্যবস্থা করতে হয় তোমাকেই করতে হবে। আমি আর কি জানি বলো, কোথায় কি খোঁজখবর করতে হবে না হবে সে-সব তুমিই জানো।'

পূর্ণবাবুই ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সম্পূর্ণ সেরে ওঠা পর্যন্ত—অপেক্ষাও করতে হল না। কারণ তাতে অনেক দেরি লাগবে, এই বয়েসে, এতবড় অসুখটার ধকল সামলে ওঠা সময়সাপেক্ষ, সেটা ডাক্তার হিসেবে উনি নিজেই বুঝেছিলেন। একটি ছাত্র—এখন বড়

ডাক্তার—তাকে বলে দিলেন, সে-ই বাছাবাছা কয়েকটা ইস্কুলে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করল।—

হেমন্ত চেয়েছিল কলকাতার কাছাকাছি কোথাও রাখতে, তেমন কোন ভাল ইস্কুল পাওয়া গেল না। দার্জিলিং আর রাঁচী, এই দু' জায়গা থেকে উত্তর এল, তাঁরা নিতে রাজী আছেন। দুটোই ভাল ইস্কুল। এ ছাড়া যা পাওয়া গেল—পূর্ণবাবুর পছন্দসই নয়। উনি এসব ব্যাপার হেমন্তর চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন—সুতরাং সে কোন তর্ক করল না বা জেদ ক'রে কলকাতাতেই রাখার চেষ্টা করল না।

তবে দার্জিলিং সে পাঠাবে না কিছুতেই। ঐ নামটাই তার কাছে অপ্রীতিকর—সেখানে পাঠানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং রাঁচীতেই পাঠাবে স্থির করল। মাস চারেক পরে সেসন্‌স্ শুরু হবে—সেই সময় কেউ গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এই ক' মাস গৌরকে নিজের কাছে রেখে হেমন্ত বুঝল পূর্ণবাবুর উপদেশ কত মূল্যবান। এখন একেবারে শিশু নেই, বছর সাত-আট বয়স হয়েছে—তবু দায়িত্ব অনেক। ইস্কুলের সময়গুলো ছাড়া অষ্টপ্রহর বাড়িতে আটকে থাকতে হয়। নতুন ঝি বা ঠাকুর কারও ভরসাতেই একা রেখে যাওয়া যায় না। একদিন বিশেষ কাজে বেরোতে হয়েছিল, যাতায়াতে মাত্র ঘণ্টা-দুই সময় গেছে। তার মধ্যেই বাড়ি এসে দেখল হৈ-হৈ কাণ্ড। মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগে ঠাকুর বেরিয়েছিল সামনের বাড়ির ঠাকুরের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে আসতে—তারই মধ্যে কখন কোন ফাঁকে ভেজানো কপাট খুলে গৌর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, কেউ লক্ষ্যও করে নি।

অনেকক্ষণ পরে ঝিয়েরই প্রথম লক্ষ্য হয়েছে যে, খোকা নেই। সে উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে খবর দিয়েছে ঠাকুরকে—ঠাকুর ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি ক'রে সময় নষ্ট করেছে খানিকটা—তারপর পাড়ার ছেলেদের জানিয়েছে। তারা চারিদিকে ভাগ হয়ে বেড়াজালের মতো খুঁজতে খুঁজতে চাঁপাতলার বাজারের কাছে এক ময়রার দোকানে দেখতে পেয়েছে বসে থাকতে।

তারাই ধরে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু তখনও যায় নি, সম্ভবত হেমন্ত এলে সব জানিয়ে জিম্মা ক'রে দিয়ে যাবে বলেই দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। সেই সময়েই হেমন্ত ফিরেছে। দরজার সামনে অত ভীড় দেখে প্রথমটা ভয়ে বুক কেঁপে গিয়েছিল তার। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, আর ঘটলে কারই বা ঘটবে—গৌরের ছাড়া? যাই হোক—ব্যস্তভাবে ভীড়ের মধ্যে উঁকি মেরে, তাকেই শুকনো মুখে আসামী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—একটু তবু আশ্বস্ত হল। পরে ভেতরে এসে শুনলও সব ব্যাপারটা। তখনই আগে দু' টাকার রসগোল্লা আনিয়ে ছেলেগুলোকে প্রাণপুরে মিষ্টি খাইয়ে দিল।* তারপর ঝি-ঠাকুরকে খুব একচোট বকাবকি করল।

এর বেশী কিছু করার নেই। কী-হাত এই ধরনের ঘটনায় তাড়িয়ে দিতে গেলে কিছুদিন পরে আর কাজ করার লোকই পাওয়া যাবে না। ঝি-চাকরের ওপর ভরসা ক'রে থাকলে এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে, তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী দায়িত্বজ্ঞান আশা করা ঠিক হবে না। তাদের কি গরজ? যাদের নিজেদের প্রাণের টান নেই—সে সদাজাগ্রত সদাসতর্ক হয়ে বালক কি শিশুকে পাহারা দিতে পারবে না কিছুতেই। কোন অর্থ বা পারিশ্রমিকের বিনিময়েই না। যার গরজ আর দায়িত্ব থাকার কথা—সেই তো অনায়াসে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল ছেলেটাকে, নিতান্তই রিরংসা চরিতার্থ করতে।

এর মধ্যে মনোরমার খবরও পাওয়া গেছে।

হেমন্ত অবশ্য খবর নিতে যায় নি—কিন্তু এসব খবর আপনিই আসে—যেন বাতাসে ভর দিয়ে এসে যথাস্থানে পৌঁছয়।

হেমন্তদের পাশের বাড়ির ঝিয়ের কে এক বোন কাজ করে

* সে সময়, সে সময় কেন, ১৯৪০ পর্যন্ত কলকাতায় সাধারণ দোকানে এক পয়সায় একটা ভাল আকৃতির রসগোল্লা পাওয়া যেত। আর দু' পয়সারগুলো (বর্তমান ৩ পয়সা) এখনকার পঁচিশ পয়সা সাইজের থেকেও বোধ করি বড় হত।—লেখক

বালিগঞ্জের দিকে—হেমন্তর বালিগঞ্জের বাড়ির পাড়াতেই—সে-ই খবর এনেছে, ঝিয়ের মুখে মুখেই এসেছে—সেখানে নাকি এক বিরাট দীঘি কাটানো হচ্ছে, ওদের ভাষায় 'অজগর পুকুর' একটা—রামধন নাকি সেইখানে মাটি কাটার কাজ করে, 'রোজ' পায়। রীতিমতো সংসার পেতেছে ওরা, পূর্ণবাবুদের বাগানবাড়ির কাছে রেল লাইনের ধারে এক বস্তির মধ্যে জমি ভাড়া ক'রে নিজেদের খরচায় মাটির ঘর বেঁধেছে।

সম্ভবত মনোরমার গলায় যে সোনার হারটা ছিল, তাছাড়া চার গাছা চুড়ি—হেমন্তই দিয়েছিল, সেইগুলো বেচেই ঐ ঘর উঠেছে। হয়ত তাছাড়াও দেনা কিছু হয়েছে, কারণ শোনা যাচ্ছে যে, ভারী পেট নিয়েও মনোরমা পাড়ায় কাদের বাড়ি ঠিকে কাজ করতে যায় —বাসনমাজা ঘর মোছার কাজ—মাসিক আড়াই টাকা মাইনেয়।

প্রথমটা অস্পষ্টভাবে, উড়ো উড়ো কথায়—মানে ওর ঝি ওকে সোজাসুজি খবরটা দিতে সাহস করে নি, ইশারায়-ইঙ্গিতেই একটু-আধটু যা জানিয়েছে—নতুন ঝি, মনিবের কড়া মেজাজ, কতদূর কড়া এখনও তার হিসেবটা পুরো বোঝে নি—তারপর সব কথাই কানে গেছে হেমন্তর। কিন্তু কে জানে কেন, কুরুচির জন্যে একটু ঘৃণাবোধ হলেও খুব একটা উষ্মা বোধ করে না সে। এই প্রবৃত্তি যে কত প্রবল তা ওর থেকে বেশি আর কে জানে! কার বিচার করতে যাবে সে নিজের লজ্জাজনক ইতিহাস নিয়ে! তাছাড়া—এতদিনে এটা বুঝেছে, সংসার পাতার ইচ্ছা আরও প্রবল। কামের থেকে সেই কামনার আকর্ষণ অনেক, অনেক বেশী।

সেটা যে কত প্রবল তা নিজের আচরণেই আরও একবার বুঝল।

হঠাৎ—গৌরকে রাঁচী পাঠাবার মাস-কতক বাদে—কোথা থেকে নিমাইচরণ আবার এসে হাজির হল।

সেই রকমই বেশভূষা—আধময়লা কাপড়ের ওপর ফরসা লংক্লথের

পাঞ্জাবি একটা। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, খড়িওড়া চামড়া হাত-পায়ের—তফাতের মধ্যে এবার আর হাতে গামছায় বাঁধা পুঁটুলি নয়, একটা নতুন ক্যাম্বিসের ব্যাগ। তাতে এক প্রস্থ কাপড়-জামা, একখানা গামছা এবং কয়েকটা চালতা ও গোটাকুড়ি সুপুরি।

তবে সে তো পরের কথা, থিতিয়ে জিরিয়ে বসে ব্যাগ খোলার পর বোঝা গেল তার রহস্য। তার আগে তার আসাটা এবং সেটা যেমন আকস্মিক তেমনি নাটকীয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেই, কোন কথা বলা কি কুশল-প্রশ্নের অবসর পাবার আগেই, ব্যাগটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে একেবারে হেমন্তর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল বলতে গেলে।

'এই এলুম মা-জননী জ্যাঠাইমা, তোমার চরণে চিরদিনের মতো। মারো কাটো ফাঁসি দাও, লাথি মারো জোড়া জোড়া—একটা কথাও বলব না, তোমার পা ছেড়ে নড়ব না কোথাও। খেতে না দাও, না খেয়ে মরি, এখানেই মরব। এইখেনেই আমার আসল আছ্রয় বেশ বুঝেছি।'

মুখ চলছে বলে হাত বসে নেই—কথা বলতে বলতে হেমন্তর দুই পা সজোরে চেপে ধরেছে ততক্ষণে।

ঘটনাটার আকস্মিকতা সামলাতে ও সম্যক বুঝতে যেটুকু দেরি হয়েছিল, তারপরই—আরও এই নাটুকেপনায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল হেমন্ত। ইদানীং মেজাজ ও রসনা দুই-ই যথেষ্ট উগ্র ও রুক্ষ হয়ে উঠেছিল—শ্বশুরকুল সম্বন্ধে তিক্ততাও বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন—সুতরাং যা মুখে এল তা-ই বলল ওকে—কোন গালাগালি দিতে কোন কটু কথাই বোধহয় বলতে বাকী রইল না, দৈহিক আঘাত ছাড়া সব লাঞ্ছনাই বর্ষিত হল সেই শ্বশুর বংশের প্রতীক ও প্রতিনিধি এই নিমাইচরণের ওপর,—কিন্তু নিমাই মূর্তিমান সহিষ্ণুতার মতো সমস্তই সহ্য করল। তাও বাধ্য হয়ে ম্লাননত মুখে নয়—যেন গালিগালাজ ও কটূক্তির মালা নয় ফুলের মালা পরিয়ে ওকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে।

এমনি সপ্রতিভভাবেই শুনে গেল সব, মুখের স্মিত প্রসন্নতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হল না।

বহুক্ষণ ধরে নিজের শ্বশুরকুলের ঝাড়গুষ্টি সম্বন্ধে বাছাবাছা বিশেষণ প্রয়োগ করতে করতে নিজেই একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। উপরন্তু এই ছেলেটার শান্ত প্রতিরোধের বর্মে প্রতিহত হয়ে শেষের দিকে গালাগালগুলোর ধারও কেমন যেন ভোঁতা হয়ে এল—সেটা বুঝেই আরও একসময় চুপ ক'রে গেল, বাধ্য হল চুপ করতে।

তবে, এত কথা বললেও, 'দূর হয়ে যাও' বা 'তোমাকে থাকতে দোব না' একথাটা একবারও বলতে পারল না। আর তা বলতে পারল না বলেই নিমাইচরণের নিশ্চিন্ত প্রশান্তিও নষ্ট হল না। সে রয়েই গেল, সেদিন থেকে, বরং দিন-দুই পরে হেমন্তকেই বেরোতে হল তার জন্যে একজোড়া ধুতি ও একটা নতুন জামার ব্যবস্থা করতে।

অর্থাৎ অবাঞ্ছিত আগন্তুক পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল সংসারে। অতিথিও নয়—গৃহস্বামীর আত্মীয় সম্পর্কেই।

পূর্ণবাবু সব বিবরণ শুনে বললেন, 'আবার ঐ জঞ্জাল জড়াচ্ছ! এখনও তোমার চৈতন্য হল না!'

'চৈতন্য হল না কে বললে? এ আমার জ্ঞান পাপ। এই তো আমার আসল শোধ। যে শ্বশুরবাড়ি থেকে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই শ্বশুরবাড়ির লোকই অন্নদাস হয়ে থাকছে।'

পূর্ণবাবু হাসলেন শুধু একটু।

অশান্তির ভয়েই আসল কথাটা বললেন না। নইলে অনেক-বারই মুখের কাছে এল কথাটা যে, 'আসলে তোমার সংসার পাতারই শখ!'

তবে তিনি না বললেও ও হাসির মর্ম হেমন্তর কাছে অজ্ঞাত রইল না।

নিজের কাছেই কি ছাপা ছিল কথাটা?

এ পৃথিবীকে ও অনেকদিন দেখছে, অনেক রকম করে। নিজের মনের কথাটা নিজের কাছে ধরা না পড়ার কোন কারণ নেই।

তবু, নিমাইচরণ যে বেশীদিন টিকবে তা মনে করে নি হেমন্ত। বরং কিছু হাতিয়ে নিয়ে একদিন সরে পড়বে—এই কথাই ভেবেছিল। কিন্তু সে-সব আশঙ্কা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে নিমাই টিকে গেল। বরং বেশ জেঁকে বসল, বলাই উচিত।

শুধু তাই নয়, সে যা বলেছিল—'মারো কাটো ফাঁসি দাও—কোথাও নড়ব না, চরণ ধরে পড়ে থাকব' তাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করল সে।

হেমন্ত যেন ওকে তাড়াবার জন্যেই—অথবা যাচাই ক'রে বাজিয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই—একটু বেশী রকমের দুর্ব্যবহার করে, ভূতের মতো খাটিয়ে নেয় তো বটেই, সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। 'ভূতগতো খাটুনী' যাকে বলে। বিনামাইনের কেন, কোন মাইনের চাকরও এত খাটতে রাজী হত না। তার ওপর উঠতে বসতে দুর্বাক্য—অশ্রান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার। এতটুকু ভুল-ত্রুটি—পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষা নেই।

হেমন্তর বাড়ির ঠাকুরই পূর্ণবাবুর কাছে গল্প করেছে, 'সকাল বেলা উঠে মা ওর চোদ্দপুরুষকে নরকে না পাঠিয়ে এক ফোঁটা জল খেতে দেন না।···গালাগালে ঘুম ভাঙে দাদাবাবুর, গালাগাল শুনতে শুনতে শুতে যায়। যা মুখ মার, তাতে ভূতও পালাত য়্যাদ্দিন—এ ভূতের বেহদ্দ!'

কিন্তু সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। এতটা বাড়াবাড়িরও প্রতিক্রিয়া হবে বৈকি!

আস্তে আস্তে হেমন্তরও মন ভেজে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত। কখন যে নরম হয়ে আসে, কবে থেকে যে নিমাইকে—নিজের ছেলে না হোক, বাড়ির ছেলে, আত্মীয়ের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে—তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

একদিন, ঝিয়েরই কী একটা অসম্ভ্রমকর উক্তিতে (ঝিয়ের দোষ কি, সে এতকাল যে ব্যবহার দেখেছে এবং তার যে ব্যবহার সহ্য করতে দেখেছে মনিবকে, তাতে এই ব্যবহারই মনিব চান— এই কথা যদি সে মনে করে তো সেটা অস্বাভাবিক ভাববার কোন কারণ নেই) অকস্মাৎ জ্বলে উঠে 'দাদাবাবু কি এ বাড়ির চাকর-বাকর?' বলে তিরস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই চমকে উঠে প্রথম এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে সে!

নির্ভরতাও এসেছে বৈকি! আবার একটু একটু ক'রে ঘর-বাড়ির কাজ শুরু করেছে, সে কাজে এমনিই একটি বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন ছিল, মনে মনে তাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকটা দায়িত্বের আর ঝঞ্চাটের ভার লাঘব হয়েছে এই ছেলেটার দ্বারা। হেমন্তর কাছে ফাঁকি দিয়ে পার পাওয়া বা চুরি করা শক্ত—তবু সে চেষ্টাও যে করে না নিমাই, এটা খুব লক্ষ্য ক'রে দেখেছে সে।

তার মানে ছেলেটা চালাক, খুবই চালাক।

যে গাছে বসে থাকবে বলে ভেবেছে, বসে আছেও—তার ডাল কাটতে চায় না, মূলোচ্ছেদ করে না। যার অনেক পয়সা আছে, উত্তরাধিকারী নেই—তার মন যুগিয়ে চলে সুনজরে পড়লে এককালে এই সবই পেতে পারবে—এ জ্ঞানটা আছে।

তবে নিমাইচরণ যতই বশম্বদ হোক, তার ওপর আশা বা ভরসা বিশেষ ছিল না, ভবিষ্যতের স্বপ্নে সে নায়ক নয়—আর যা-ই হোক।

যেখানে আবার নতুন ক'রে আশা অঙ্কুরিত হয়েছে, অনেকখানি আশা—সেখানেই ক্রমে হতাশ হতে হয় ওকে।

তারকের মৃত্যুর পর গৌরের মতো আর কাউকে ভালবাসে নি ও, আর কাকেও কেন্দ্র ক'রে এমন আশার প্রাসাদ গড়ে তোলে নি। ইতিমধ্যেই বিগত জীবনের বিপুল আশাভঙ্গের দুঃস্মৃতিগুলো বিবর্ণ হতে চলেছে, সে জায়গা অধিকার করেছে কল্পনা—সুদূর ভবিষ্যতের অনেক সুখ-সৌভাগ্যের রঙীন চিত্র আঁকতে শুরু করেছে।

গৌর বড় হবে, পাস করবে—ডাক্তারী নয়—ডাক্তারী পাস

করার কথা মনে হলেই ভয় করে ওর—ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াবে শিবপুরে কি রুড়কীতে রেখে, বিয়ে দেবে, ছেলেপুলে হবে, ওরই নাতি-নাতনী।…হ্যাঁ, নাতি-নাতনীই। গৌরকে কে—বোধ হয় সাধু কি মনোরমাই—মা বলতে শিখিয়েছিল হেমন্তকে, হেমন্তও তার প্রতিবাদ করে নি, বরং এখন তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এই সম্পর্ককেই স্বাভাবিক বোধ হয়—আস্তে আস্তে কখন সত্যিই ছেলে বলে ভাবতে শিখেছে।

চেষ্টা বা আয়োজনেরও কোন ত্রুটি নেই অবশ্য—

কবিদের ভাষায়, আশাতরু-মূলে বারি সিঞ্চনের।

বড় মিশনারী ইস্কুলের খরচ ও ঝঞ্ঝাট দুই-ই বেশী। বাঁধা পোশাক, হরেক রকম বাড়তি খরচ। শিক্ষার সমারোহ বলা চলে। সে-সব হাসিমুখেই বহন করে হেমন্ত, হয়ত প্রয়োজনের বেশিই করে।

বড়লোকের ছেলের মতোই মানুষ হয় গৌর—সেইভাবেই মানুষ করার চেষ্টা করে হেমন্তও। তারকের বেলায় যে সব সাধ মেটে নি—কতকটা নিজের অক্ষমতার জন্যেও বটে, তখন আদৌ স্বচ্ছল ছিল না অবস্থা, কতকটা তারকের অনিচ্ছার জন্যেও—মা যে তার জন্যেই এত নিচে নেমেছে, এই কাজ করছে, সেজন্যে তার কুণ্ঠা ও বেদনার অবধি ছিল না, যত কম খরচ ক'রে পারে ততটাই করার চেষ্টা করত—সেই সব সাধ গৌরকে দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করে।

এখান থেকে রাঁচী বহুদূর, সবটা ট্রেনে যাওয়াও যায় না—একটু হাঙ্গামা ক'রেই যেতে হয়, তবু দু'মাস-তিনমাস অন্তরই হেমন্ত গিয়ে দেখে আসে। পুজো ও গরমের ছুটির আগে নিজে গিয়ে নিয়ে আসে। সে সময়ও ওকে ভাল ভাল খাবার ক'রে খাওয়াবার, ওকে নিয়ে উৎসব করার ধুম পড়ে যায়। আর সেই আড়ম্বরের মধ্যে যে নিমাইচরণের প্রতি কিছুটা অবিচার ও অসম্মান করা হয়—সেটাও মোহাচ্ছন্ন হেমন্ত বুঝতে পারে না। কাকা চাকরের মতো খাটে, তাই নয়—চাকরের মতো ভাইপোরও খেজমৎ খাটতে হয় তাকে, ফাইফরমাস পালন করতে সদা তটস্থ ত্রস্ত থাকতে হয়।

হেমন্তর মতো বহুদর্শী বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকেরও এই বিসদৃশ আচরণ চোখে পড়ে না—এটাই আশ্চর্য। গোয়া তাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে, মানুষের সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিও আর কাজ করছে না।

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে নিমাইচরণকে তবু কিছুটা রক্ষা করেন পূর্ণবাবু।

সে-ই বোধকরি এ সংসারে তাঁর শেষ কর্তৃত্ব, শেষ হস্তক্ষেপ।

নিউমোনিয়ার পর থেকে বৃদ্ধ পূর্ণবাবু আর কোনদিনই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি, আগেকার সে পরিশ্রমের শক্তি কিছুই প্রায় ফিরে পান নি। সুতরাং এ-বাড়িতে আসাটাও তাঁকে কমাতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু'মাস-তিনমাস অন্তর এক-আধঘণ্টার জন্যে আসতেন—চাকরদের নামাতে হত গাড়ি থেকে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ও তাদের সাহায্য দরকার হত—সেটা চিরদিনের কর্মঠ পূর্ণবাবুর ভাল লাগত না। সে জন্যে আসতেও চাইতেন না আর।

বেশির ভাগ সময় হেমন্তই ওঁর খবর নিত তাই। পূর্ণবাবুর বাড়াবাড়ি অসুখের সময় থেকে ও-বাড়ির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। পূর্ণবাবুর স্ত্রীই খুলে দিয়েছেন সে দরজা। সুতরাং কোথাও কোন কাজে যাতায়াতের সময় বা এমনিই, খবর নিতেই—শরীর খারাপের খবর পেলে—হেমন্তই যেত ওঁর কাছে। প্রয়োজন বুঝলে এক-আধদিন থেকেও যেত। শরৎসুন্দরীও আসতেন কখনও কখনও, তবে তিনি বেশ অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর সঙ্গেও লোক থাকা দরকার হত।

এমনি এই দুর্লভ অবসরেই পূর্ণবাবু এসে পড়েছিলেন, দেখেছিলেন নিমাইচরণের হেনস্থাটা।

তিনিই আড়ালে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন হেমন্তকে, 'এ কী করছ! বিষয়ের লোভে ছোঁড়াটা হয়ত সব সহ্য করছে, করবেও—কিন্তু ভাইপোটা যে বিষ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। যতই হোক, এতটা খ্যাংলানো কখনও কোন মানুষের বরদাস্ত হয় না। কেনই বা

অমন করছ ? এতে বড় আকোচ বেড়ে যায়—শুধু শুধু একটা শত্রু তৈরী করছ কেন ? এ রকম অকারণ মার খেতে খেতে একদিন না একদিন সাপ ফণা তুলবেই—তখন পারবে সে বিষের ধাক্কা সামলাতে ? পাড়াগাঁয়ের লোক ওরা—না পারে এমন কাজ নেই, কখন কোথা দিয়ে কি অনিষ্ট ক'রে বসবে তা টেরও পাবে না। একটা কিছু হয়ে গেলে কি ফেরাতে পারবে ? হাজার কপাল চাপড়ালেও ফিরে আসবে না সময়টা। ছিঃ! তোমার মতো মানুষ এমন অন্ধ হয়ে যায় কি ক'রে তা বুঝি না।···আদর করতে চাও আদর দেখাতে চাও তার হাজারো পথ খোলা—তার জন্যে ও ছোঁড়াটার ওপর এমন অত্যেচার চালাতে হবে কেন ?'

তাতেই কাজ হয় খানিকটা। হেমন্ত সাবধান হয়।

কাকা যে কাকা—বাড়ির চাকর-বাকর নয়—হঠাৎ সেই জ্ঞানটা গৌরের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দেরি হয়ে গেছে বহুদিক দিয়েই।

এত আদরে ও আড়ম্বরে মানুষ করার আগে বা মানুষ করার কথা চিন্তা করার সময়ই একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল বোধ হয়।

বিলাসে ঐশ্বর্যে মানুষ করতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অমানুষ হয় ছেলেমেয়েরা।

তাছাড়াও হেমন্ত নিজেই শ্বশুরদের 'ঝাড়গুষ্টির'—যাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ করত, তাদের গুণের ব্যাখ্যানা ক'রে—গৌরও যে সেই ঝাড়-বংশেরই একজন, সেই ক্ষেত্রেই তার জন্ম—একথাটাও স্মরণ রাখতে পারত। আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলে না—এ তো অবিসম্বাদী সত্য।

কারণ যা-ই হোক—আসল কথা যা, হেমন্তর এত চেষ্টা সত্ত্বেও গৌর মানুষ হল না।

রাঁচীতে পাঠাবার পর একবছর বেশ ছিল। হয়ত বেশ থাকতও—যদি না হেমন্ত বার বার দেখতে যেত।

কে জানে—হেমন্তর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আবহাওয়া, কলকাতার বহুবিধ উৎসব-সমারোহ তার সহস্রবিধ প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হত কিনা! সেই স্মৃতিই হয়ত তাকে চঞ্চল অস্থির গৃহাভিমুখী ক'রে তুলত। কিন্তু এখানে এলে সুবিধা হবে না, এটুকুও সে জানত, কঠোর তিরস্কার সইতে হবে এবং কঠোরতর ব্যবস্থায় আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। তাই সে অন্যত্রই পালাতে চেষ্টা করল।

এই শ্রেণীর ছেলেরা প্রায়ই নির্বোধ হয়। নির্বোধ না হলে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে নষ্ট করবে কেন? কেউ কেউ হয়ত কিছু ধূর্ততা বা চাতুর্যের পরিচয় দেয়—এইভাবে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা করার সময়—কিন্তু সেটা বুদ্ধির নিদর্শন নয় আর যা-ই হোক।

বাড়ি থেকে কি হোস্টেল থেকে পালাবার সময় এরা আপাত-ভবিষ্যতের কথাটাও চিন্তা করে না। পালিয়ে কি করবে, কি খাবে, ক'রে-খাবার কোন যোগ্যতা বা সম্ভাবনা আছে কিনা—এসব কথা ভাবার শক্তি, হয়ত বা ইচ্ছাও থাকে না এদের, অপ্রীতিকর চিন্তার এই দিকটাতে চোখ বুজে থাকে জেনেশুনেই—আপাতত এই নিয়মের কড়াকড়ি শাসন বা লেখাপড়ার হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পাবে—এই কথাটাই মাথায় থাকে শুধু।

গৌরও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। হয়ত বা আরও বেশী নির্বোধ। সাধুচরণের ছেলে সে, কতকটা সেইরকমই হবে বৈকি!

সেও কিছু না ভেবেই পালাল।

তবে মিশনারী পাদ্রী সাহেবরাও এসবে অভ্যস্ত। এর জন্য কতকটা প্রস্তুতই থাকেন তাঁরা, একটা ব্যবস্থাও ঠিক থাকে। প্রয়োজন হলেই যন্ত্রের মতো কাজ করে সেটা। সুতরাং ধরে ফেলতে বা ফিরিয়ে আনতেও বেশী দেরি হল না। ফিরিয়ে এনে কড়া পাহারায় রেখে তাঁরা হেমন্তকে জানালেন সংবাদটা।

বলাবাহুল্য হেমন্ত খবর পেয়েই ছুটে গেল।

ইস্কুলের কর্তারা বিরক্ত, ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁদের কাছে বহু মিনতি ক'রে—মা-বাপ-মরা অনাথ ছেলে, তাঁরা দয়া না করলে মানুষ হবে না—ইত্যাদি বলে নিরস্ত করল। তাঁদের ব্যবস্থায়ও কিছু ত্রুটি আছে, ছোট ছোট ছেলেদের ওপর নজর রাখাও তাঁদের দায়িত্ব—একথাটাও যথাসম্ভব মোলায়েম আবৃত ভাষায় ভদ্রভাবে মনে করিয়ে দিল। তাতেই কাজ বেশী হল হয়ত। তাঁরা ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

ওদিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে গোরাকে নিয়ে পড়ল।

কিছু মিষ্টি কথায় বোঝাল, কিছু তিরস্কার করল। ভয়ও দেখাল কিছু। এইভাবে পালিয়ে এই বয়সে কী ক'রে খাবে সে? হয় ভিক্ষে করতে হবে, কোন বদ-ভিখিরীর পাল্লায় পড়লে কানা-খোঁড়া ক'রে দেবে, জোর ক'রে হাত-পা ভেঙে দেবে হয়ত ভিক্ষে করবার জন্যে—নয়তো চায়ের দোকানে কাপ-ডিশ ধুতে হবে। কি বিড়ি পাকানো শিখতে হবে। তাও সে কাজও শিখতে হবে, সে সময়টা খাবে কি? আর সে-ই কি খুব ভাল লাগবে? কেউ তো কোথাও নেই তিনকুলে। দেশের বিষয়-আশয় তো জ্যাঠা-কাকা-ঠাকুর্দার দল দখল ক'রে বসে আছে—পাত্তাও দেবে না। আর সে-সব জমিজমা ভাগ হতে হতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, সারা বছরের শুধু ভাতও মিলবে না। তাহলে কী করবে সে, কিসের আশায় পালিয়েছিল?

প্রথমটা মুখ গোঁজ ক'রে বসেছিল গোরা—হয়ত একটু বুঝল, হয়ত ভয়ও পেল। দীর্ঘ বক্তৃতার ফল কিংবা এতক্ষণের বকুনিতে ক্লান্ত হয়ে অব্যাহতি পাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিল এমন কাজ আর সে করবে না। মন দিয়ে পড়াশুনো করবে।

নিশ্চিন্ত হতে পারল না পুরোপুরি, ঠিকই—তবু আর কী-ই বা করার আছে? এতেই খুশী হয়ে ফিরতে হল। আরও দু'দিন থেকে, গোরাকে আরও একটু বুঝিয়ে—ভবিষ্যতের অনেক মনোহর

প্রলোভন দেখিয়ে—পাত্রী-সাহেবদের কাছে আর এক দফা মিনতি জানিয়ে হেমন্ত ফিরে এল।

এবার যাওয়া-আসা অর্থাৎ দেখতে যাওয়াটা অনেক কমিয়ে দিল। যেটা আগে প্রায় দু'মাস অন্তর ছিল সেটাই পাঁচ-ছ'মাস অন্তর হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে অনেকেই কথাটা বলেছে ওকে। এত বার বার বাড়ির লোক দেখতে গেলে হোস্টেলে মন বসে না, সেইজন্যেই আরও পালাতে চায়। স্বাভাবিক সেটা।

অপরে যতই বলুক অত গ্রাহ্য করত না হয়ত—স্বয়ং পূর্ণবাবুও ঐ এক কথাই বললেন। হেমন্তর পরিচিত সকল লোকের থেকেই পূর্ণবাবুর সাংসারিক জ্ঞান বেশী, এ পরিচয় বার বারই পেয়েছে সে।

বহু অভিজ্ঞতা ও পরাজয় স্বীকারের পর ইদানীং হেমন্ত নিজের কাছেই কথাটা মানতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু কে জানে, হয়ত এতেই আরও অনিষ্ট হল খানিকটা, হিতে বিপরীত হল। এবার এই দেখতে আসার বা খবর নেবার সময়গুলোর মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘতর হওয়াটাকে সে উপেক্ষা বা অবহেলা বলে মনে করল। আর সম্ভবত সেই অভিমানেই—পড়াশুনো ভবিষ্যৎ—সমস্ত তিক্ত অর্থহীন মনে হল। বছরখানেক না যেতে আবারও পালাল সে একদিন।

এবার আর খবর পেয়ে হেমন্ত ছুটে গেল না আগের মতো।

গেল না—তার কারণ, এখানে খুব কাজ পড়ে গেছে সেই সময়। বাড়ি-ঘরের কাজ। ইদানীং নিমাইচরণকে পাওয়ায় ওর কাজের উৎসাহ কিছু বেড়ে গিয়েছিল। ভূতের মতো খাটতে পারে--খাটার মধ্যে টো-টো ক'রে ঘোরাই বেশী—অথচ বিশ্বস্ত, এমন লোক পাওয়া সহজ নয়। আর এরকম লোক না পেলে একা মেয়েছেলের পক্ষে এই ধরনের ব্যবসা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু ওরই দুর্বুদ্ধি—হাতের লোককে উদ্যোগী হয়ে ও-ই খুইয়ে বসে রইল।

নিমাইচরণই কথাটা পেড়েছিল প্রথমে, খুব সাধারণভাবে, কতকটা বাজে কথার মতোই।

'বসেই তো আছি, ডাক্তারবাবুকে বলে একটা কোথাও কাজকর্ম যোগাড় ক'রে দিন না জ্যাঠাইমা !···আপনার আর এ কতটুকু কাজ, ফাইফরমাশ খাটা বই তো নয়—বাকী সব সময়ই তো বসে হাপুগেলা বলতে গেলে !'

'কি কাজ করবি তুই ? কি জানিস ?'

প্রশ্নও যেমন উত্তরও তেমন। সমান তাচ্ছিল্য আর ঔদাসীন্যের সঙ্গে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল হেমন্ত।

'কুলীগিরি ! মিস্ত্রী ! আবার কি !' আত্মধিক্কারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল নিমাই, 'বামুনের ঘরের গরু, শাঁকে ফুঁ কি কানে-ফুঁরও তো যুগ্যি নই যে, সে কাজ করব—এক আছে উনুনে ফুঁ, রাঁধুনী বামুনের কাজ করতে হয়। বামুনের কাজ তো ঐ পর্যন্ত ইতি। তা নইলে সোজাসুজি মোট বওয়া কি লোকের বাড়ির উঠোন ঝাঁট দেওয়া। তবে তুমি যেকালে চরণে ঠাঁই দিয়েছ (নিমাইচরণের 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে বারংবার যাতায়াত ঘটে—হেমন্তকে সম্বোধন করার সময়), সেকালে—একেবারে তো ভাতের দুঃখু ঘটে নি—অত ছোট কাজ আর করব না। নইলে আমি সে বান্দা নই, ঐ যে ভোরবেলা পাইপে ক'রে রাস্তায় জল দেয়—সে কাজও আমি করতে রাজী আছি। খাটুনি তা সে যা-ই হোক—কোনটাতেই আমি পিছ্‌পা নই। তবে অততে দরকারই বা কি, আমাদের উদিক থেকে কত লোক তো সব নানান্ কারখানায় কাজ করতে আসে এই কলকেতাতে। সে কাজ নাকি মেলেও, একটু খোঁজ করলে। বেশিরভাগই নোয়া পেটার কাজ, অন্যরকম মিস্তিরীর কাজও করে কেউ কেউ। নেলোর কারখানায়* যায়। আমার এক জ্ঞাতিকাকা বুড়ো বয়সে বলতে গেলে—মানে সত্যি কি আর বুড়ো—এই তিরিশ-বত্তিরিশ হবে পেরায়, নেলোর কারখানায় ঢুকেছে। বারো আনা রোজে ঢুকেছেল, এখন আঠারো আনা

* লিলুয়ার ওয়ার্কশপ। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের অন্যতম কারখানা ছিল। এখন ইস্টার্ণ রেলওয়ের।

ক'রে পাচ্ছে।···এলেক্টার কোম্পানীর কারখানাতে ভাল মাইনে দেয় শুনেছি—এক টাকা পাঁচসিকে রোজ পায়—ওদের ওখেনে কুলীও বলে না, বলে মিস্তিরী।···আমার এক বোনাই ঢুকেছে ওখেনে, মাসে পেরায় তিরিশ-একতিরিশ টাকা রোজগার করছে!'

এমনি কত কি বকে যায়—কিছু শোনে কিছু শোনে না হেমন্ত, অন্যমনস্ক হয়ে বসে হিসেব লেখে শেলেটে।

নিমাইচরণ অবশ্য এ ঔদাসীন্যে দমে না। সে অপেক্ষা করতে জানে। খুব কড়া তাগাদা করে না—তবে মধ্যে-মধ্যেই কথাটা তোলে। হয়ত বলে, 'হ্যাঁ গো জ্যাঠাই, তুলেছিলেন কথাটা ডাক্তারবাবুর কানে? বসে বসে যে শেকড় গইজে গেল পেছনে!'

নয়তো বলে, 'সন্তানকে একেবারে ভুলে বসে রইলে জননী! বুড়োটা থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও না!'

তাই বলে সত্যিই কিছু বসে থাকে না সে। খাটুনী খুবই তা হেমন্ত নিজেই স্বীকার করে। সেইজন্যেই আরও—ওর এই বিনয়ে খুশী হয়। এ খাটুনিটা নিমাইয়ের গায়ে লাগছে না এতে তার গোপন অপরাধবোধ অনেকখানি সান্ত্বনা পায়।···ভূতের মতো খাটছে শুধু পেটভাতায়—এ তথ্যটা ওর বিবেককে পীড়া দেয় বৈকি মধ্যে-মধ্যে।

এইভাবে কথাটা শুনতে শুনতে একদিন পূর্ণবাবুকে বলেছিল হেমন্ত। পূর্ণবাবু এখন প্রায় শয্যাশায়ী—শুয়েই থাকেন বেশির ভাগ—চলাফেরা করা কি রুগী দেখতে বেরনো ন'মাস-ছ'মাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখনও বহু লোকই ওঁর কাছে আসে, ডাক্তার ছাড়াও বহু গণ্যমান্য লোক। সুতরাং এখনও তাঁর সুপারিশের দাম আছে।

পূর্ণবাবু শুনে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'ছোকরা চালাক আছে তো!···সত্যিই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ক'রে কাজটা শিখছে ঠিকই—কিন্তু টাকা না থাকলে নিজে কোনদিনই এ কারবার করতে পারবে না। তুমি তো করছ কতকটা শখ ক'রে—না করলে ভাতভিক্ষে

জুটবে না এমন তো নয়—খেয়াল হলেই কোনদিনই টপ ক'রে সব বন্ধ ক'রে দেবে—তখন ও কি করবে ? নিজের সেই ভবিষ্যৎটাই চিন্তা করছে আর কি !...তা ভালই। তোমার মর্জি-মেজাজের সঙ্গে চিরদিন যে তাল রেখে চলতে পারবে, তারও তো ঠিক নেই। দিন থাকতে থাকতে দিন-কিনে নেওয়াই দরকার। আচ্ছা, দেখি !'

আর এ প্রসঙ্গ ওঁর কাছে তোলে নি হেমন্ত। অত মনেও ছিল না। পূর্ণবাবু যে সত্যি-সত্যিই কিছু ক'রে দিতে পারবেন তা ভাবে নি, সেরকমভাবে সুপারিশ করার মতো ক'রেও বলে নি। কতকটা কৌতুকছলেই বলেছিল।

কেবল নিমাইচরণকে কথাটা বলে ফেলেছিল একবার।

তাগাদাটা অনেকদিন অন্তর অন্তর দিত নিমাই—মেজাজ বুঝে—পাছে বিরক্ত হয়ে ঝেঁঝে ওঠে, সেজন্যে অতি সাবধানে। এমনিই একটা তাগাদার মুখে হেমন্ত কতকটা দায়-এড়ানোর ভাবেই বলে ফেলেছিল, 'ডাক্তারবাবুকে বলেছি তোর কথা। তিনি চেষ্টা করবেন বলেছেন।'

আর কিছু বলে নি নিমাইচরণ। তাগাদা করে নি আর। মানে হেমন্তকে করে নি। করেছে যথাস্থানে। যাতায়াতের পথে ওদিকে কোন কাজ থাকলে—পূর্ণবাবুর খবর নিত সে। হেমন্তই বলে রেখেছিল। সেই সুযোগটাই নিয়েছে নিমাইচরণ।

আগে কোনদিনই নিজের কথা বলে নি, আইন বাঁচিয়ে চলেছিল—হেমন্ত কথাটা ওঁকে বলেছে শোনার পর তাগাদাটা ঐখানে শুরু করেছে—যথাসম্ভব দীনতা ও বিনয়ের সঙ্গে। তাতে কাজও হয়েছে। এক বন্ধুকে বলে টেলিফোন কোম্পানীর এক সাহেবকে ধরিয়ে সেখানেই শিক্ষানবীশ মিস্ত্রীর কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন পূর্ণবাবু, আঠারো টাকা বারো আনা মাইনেতে। একবছর পরে কাজ শিখলে চাকরি পাকা হবে, মাইনেও হবে চব্বিশ টাকার মতো।

হেমন্ত যখন কথাটা জানল তখন কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। চাকরির চিঠি এসে যেতেই জানল সে। তার হাতেই চিঠি এসে

পড়ল। তখন আর বাধা দেওয়া যায় না, দিতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়, প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, এই আয়টা পুষিয়ে দেবে সে।

তাছাড়া, তখন অতটা বোঝেও নি। চাকরির মধ্যেই ওর কাজটাও কতক দেখতে পারবে—মিস্ত্রী খাটাতে পারবে না ঠিকই, তবে, ভোরে কি অফিসের ফেরৎ ইটসুরকির বায়না দেওয়া, তাগাদা করা অর্থাৎ মাল আনার যাবতীয় ঝঞ্ঝাট বইতে পারবে—এইটেই ভেবেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বিশেষ কিছুই আর তার দ্বারা হচ্ছে না। সকাল সাতটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় সে—তার মধ্যেই বাজার ক'রে নিজের ভাত নিজে রেঁধে খেয়ে যায়। আজকাল এক মেয়েছেলে রাঁধুনী হয়েছে হেমন্তর—সে বুড়োমানুষ, অত সকালে ভাত দিতে পারে না। হেমন্তই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, রাত্রের তরকারী আলাদা ঢাকা থাকে, ভোরে উঠে উনুনে আঁচ দিয়ে একটা বাঁটলোয় শুধু চাট্টি ভাত চাপিয়ে দেয় নিমাই। চান সেরে ভাত নামিয়ে রেখে বাজার চলে যায়, সেখান থেকে ফিরে কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজেই বেরিয়ে পড়তে হয়, সকালে আর কোন কাজেই পাওয়া যায় না।

বিকেলে ফেরে—যেদিন খুব সকালে হয়—পাঁচটায়, নইলে সাতটায়, কোন-কোনদিন বাইরে দূরপাল্লার কাজ থাকলে রাত আটটা-ন'টাও বেজে যায়। তখন আর তাকে কোন কাজের কথা বলা যায় না। বললেও কোন কাজ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। অত রাত অবধি কে ওর জন্যে বসে থাকবে দোকান-দপ্তর খুলে?

এক শুধু রবিবারগুলোতেই যেটুকু কাজ পাওয়া যায় নিমাইচরণকে দিয়ে—শনিবারের বিকেল আর রবিবার। অবশ্য এই দেড়দিন ভূতের মতোই খাটে নিমাই, অবিরাম—তবু সাড়ে পাঁচদিনের ক্ষতি তাতে পোষানো যায় না।

এই প্যাঁচে পড়েই হেমন্ত হিমসিম খাচ্ছিল—যখন গোরার দ্বিতীয়বার পালানোর খবর এসে পৌছল। অনেক কাজ হাতে, অনেক কাজে হাত দিয়ে ফেলেছে—এখন তিন-চারদিন বাইরে

কাটিয়ে এলে বিস্তর ক্ষতি হয়ে যাবে। পুরুষ মানুষের মতো দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটাতে হয়—সে না থাকলে মিস্ত্রী-মজুর নিজেরা তো ফাঁকি দেবেই, সেও এক কথা—আবার মালপত্র ঠিকমতো না যোগাতে পারলেও কাজ পড়ে থাকবে, শুধু শুধু ওদের রোজ গুনতে হবে। তার ওপর—উনো কর্ম দুনো—একরকম ও বলে যাবে তারা আর একরকম ক'রে রাখবে, একে আবার হয়ত ভেঙে নতুন ক'রে করাতে হবে। এতকাল মিস্ত্রী খাটিয়ে এবিষয়ে তার এ অভিজ্ঞতা বার বারই হয়েছে, সেই ভয়ই তার সবচেয়ে বেশী।

সে জন্যেও বটে—হয়ত আবার পাদরীদের কাছে গিয়ে মাথা হেঁট ক'রে অনুনয়-বিনয় করতে হবে, সেটাও খুব রুচিকর মনে হল না—সে ইস্কুলে চিঠি লিখে দিল, তাঁরা যেন যেমন ক'রে পারেন ধরে আনেন—দরকার হয় পুলিশের সাহায্য নিয়েও—খরচা যা লাগে সে দিতে প্রস্তুত আছে। তবে এ ব্যাপারে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব যে ওঁদেরই—একথাটাও চিঠির শেষে মনে করিয়ে দিতে ভুলল না।

॥ ১২ ॥

কিন্তু শুধুই নিজের স্বার্থের জন্যে হেমন্ত যায় নি রাঁচীতে—একথা বললে বোধ হয় সত্যের একটু অপলাপই হয়।

আর একটা কারণ ছিল।

রাঁচী থেকে যেদিন চিঠি আসে সেই দিনই সকালে পূর্ণবাবু ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাঁচীর চিঠি বিলি হবার অনেক আগেই।

ডেকে পাঠানোর মধ্যেও একটু বিশেষ ছিল। একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছিল কোচম্যান। প্রথমটা চমকে উঠেছিল হেমন্ত, বেশ একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল—অত সকালবেলা ও-বাড়ি থেকে গাড়ি

এসে দাঁড়াতে—কিন্তু কোচম্যান যে চিঠিটা দিলে সেটা পূর্ণবাবুর নিজের হাতের লেখা দেখে একটু আশ্বস্ত হল।

সামান্যই, এক লাইন চিঠি।

'পারো তো একবার এখনই একটু ঘুরে যাও। খুব বিশেষ দরকার।'

কোন স্বাক্ষর নেই না ইংরেজী না বাংলা—কোন সম্বোধনও নেই। তার দরকারও নেই। হাতের লেখাটা এত পরিচিত যে, কার লেখা বা কাকে লেখা—বুঝতে দেরি হয় না।

হাতে জরুরী কাজ ছিল, তবু হেমন্ত তখনই রওনা হয়ে গেল।

এরকম আহ্বান এই প্রথম—এতকালের মধ্যে। খুব জরুরী দরকার না থাকলে এমনভাবে ডেকে পাঠাতেন না পূর্ণবাবু।

বাড়ি ঢুকতে সিঁড়ির মুখেই শরতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'কি ব্যাপার দিদি ? এমন জোর তলব ?'

তখনও ভাল ক'রে শরতের মুখের দিকে চায় নি সে। ঐদিক থেকেই আলোটা এসে পড়েছে বলে দেখাও যাচ্ছিল না ঠিক। আর কয়েক ধাপ উঠে কাছে এসে দেখতে পেলে খুব ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছেন শরৎসুন্দরী। ঠিক কাঁদছেন না, কিন্তু চোখের কোণে কোণে জল—যে কোন মুহূর্তে ঝরে পড়বে হয়ত। চোখ অনেকটা ভেতরে বসে গিয়েছে, চারিদিকের চামড়া কুঁচকে বেড়ার মতো হয়ে আছে বলেই জলটা বাঁধে বাধা পাওয়ার মতো আটকে আছে সম্ভবত, নইলে অনেক আগেই ঝরে পড়ত।

শরৎসুন্দরী প্রায়-বুজে-আসা গলায় বললেন, 'কি জানি ভাই! এমনি তো দেখি বেশ সুস্থ সহজ মানুষ, হঠাৎ কাল রাত্তিরে আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে—বিষয়-আশয় কোথায় কি আছে—কোন্‌টা কার নামে—কত টাকা কোথায় কিভাবে লগ্নী আছে—এই সব বোঝাতে লাগলেন।···যত বলি, "কেন এখনই এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে, এত কি তাড়া"—ততই বলে, "তুমি বোঝ না, মানুষের কি কারও মাপা পরমায়ু আছে, কার কখন দিন ফুরিয়ে যাবে তা কেউ বলতে

পারে না। আর এমনিও তো অনেক দিন হয়ে গেছে, এতদিন আর কে বাঁচছে আজকাল? ভগবানের দেওয়া ছুটি ফুরিয়ে গেছে, এখন যাকে বলে জাঁকড়ে থাকা—তাই আছি, কখন ফেরৎ নেবে তা কেউ জানে না। এসব বড় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, একটু বুঝে জেনে রাখো। ছেলে জানে সব—তবে তোমারও একটু জেনে রাখা ভাল, এখনকার দিনে—বিশেষ যেখানে টাকা-আনা-পাইয়ের গন্ধ আছে—কোন ব্যাটা-বেটিকে বিশ্বাস করি না।"···বলি যে, "আমিই বা আর কতকাল বাঁচব, কদ্দিনের ইজেরা নিয়ে এসেছি তুমি মনে করো?" তার বেলায় জবাব দেয়, "তারও কি কিছু ঠিক আছে? বুড়ো হয়েছ ঠিকই—তাই বলে যে আরও তিরিশ বছর বাঁচবে না এও কেউ বলতে পারে না। আর কি জানো, হাতে টাকা থাকলে বুড়ো বয়সে লোকে দেখবে—নইলে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী সকলেই দূরছাই করবে, বেশীদিন ভুগলে তো কথাই নেই—কেউ ঘরে উঁকিও মারবে না। সেবা করা তো দূরের কথা। তেষ্টার এক ফোঁটা জলও পাবে না।" এই সব যত বাজে কথা। শরীর খারাপ হলে কেউ এভাবে এত কথা গুছিয়ে বলতে পারে? তুমিই বলো ভাই?···এ তো মনে হচ্ছে সহজ মানুষ, সেই আগের মতো।···অথচ কেন যে হঠাৎ এমন তাড়া পড়ে গেল—এইভাবে বিদেয় নেবার মতো ক'রে—'

কথা শেষ হয় না, বলতে বলতেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলেন এবার শরৎসুন্দরী।

'কাঁদবেন না দিদি, ছিঃ!' হেমন্ত নিজের আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়ে দেয় ওঁর, 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। হয়ত ওঁরই বোঝার ভুল, শুয়ে থেকে থেকে রোগা মানুষের অনেক রকম ঝোঁক চেপে বসে, মনে হয়েছে হয়ত এবার তৈরী হওয়া দরকার—তাই! ···আর সে যা-ই হোক, প্রিয়জনের নিঃশ্বেস থাকতে মা স্ত্রী এদের শোকের জল ফেলতে নেই চোখ থেকে—তাতে অকল্যাণ হয়। আপনি স্থির হোন, অদৃষ্টে যদি থাকে কেউ খণ্ডাতে পারবে না—তবে আগে থাকতে এসব ভেবে মন খারাপ ক'রে লাভ কি?'

বোধ হয় এমনি বলিষ্ঠ আশ্বাসেরই প্রয়োজন ছিল, শরৎসুন্দরী নিজেকে সামলে নিলেন আস্তে আস্তে। চোখের জল মুছে অনেকটা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন, পূর্ণবাবু যে ঘরে ছিলেন তার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন হেমন্তর সঙ্গে। তবে ঘরে ঢুকলেন না, বললেন, 'তুমি যাও ভাই, তোমাকে নাকি আলাদা কি বলতে চান। আমি একটু ওদিকটা দেখি—তোমার জন্যে চা-জলখাবার নিয়ে আসি গে বরং—'

মুখে শরৎকে যা-ই বলুক, আশঙ্কা একটু ছিলই মনে মনে। পূর্ণবাবুকে এর আগে দু-একবার রুগীর চেহারা দেখে 'নিদান হাঁকতে' শুনেছে সে। তখন মনে হয়েছে মাথা খারাপ হয়ে গেছে পূর্ণবাবুর, রুগীর মরার কোন কারণই ঘটে নি। কিন্তু পরে মিলিয়ে দেখেছে পূর্ণবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিক ফলে গেছে, সত্যিই সে রুগী আর বাঁচে নি। পূর্ণবাবু হয়ত বলেছেন, 'আজ রাত কাটে কিনা সন্দেহ' সে রুগী হয়ত বড়জোর পরের দিন ভোর অবধি টিকেছে। একটা ঘটনা তো বেশ মনে আছে, উনি সময় দিয়েছিলেন বারো ঘণ্টা—দশ ঘণ্টার মুখেই সে রুগী মারা গেছে।

অবশ্য ঘরে ঢুকে পূর্ণবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হল সে। শরৎসুন্দরীর কথাই ঠিক। বেশ সহজ মানুষ—বরং এ ক'দিনের থেকে আরও ভাল, বেশী সুস্থ। বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়েই থাকেন আজকাল বেশির ভাগ—আজ সোজাসুজি একটা তাকিয়া কোলে নিয়ে উঠে বসেছেন। মুখের চেহারা চোখের দৃষ্টি দুই-ই স্বাভাবিক, বরং ওকে দেখে অনেক দিন পরে, সেই আগের মতোই চোখ দুটি প্রসন্ন-কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'এসো। বসো। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে তা ভাবি নি!'

'তা ভাববে কেন? তুমি কি ভেবেছিলে ঐ রকম চিঠি পাবার পরও আমি চুপ ক'রে বসে থেকে এড়িয়ে-গড়িয়ে আটঘণ্টা পরে আসব? তা এত জরুরী তলবই বা কেন, ছিষ্টির কাজ ফেলে চলে

আসতে হল! কোনমতে দশবার জপ সেরেই চলে এসেছি—পুজো-আশ্রা কিচ্ছু হয় নি—মুখে একটু জলও পড়ে নি এখনও।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে জল এখানেও পড়তে পারবে। আর ঠাকুর? সে তাঁরা অবস্থা বুঝে মনের পুজো মনে মনে ঠিক নিয়ে নেবেন'খন। বসো তুমি—অনেক কথা আছে।'

চেয়ারখানা খাট থেকে একটু দূরে ছিল—বোধ হয় শরৎসুন্দরী বসে ছিলেন এতক্ষণ—হেমন্ত সেইখানেই বসতে যাচ্ছিল, পূর্ণবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'উঁহু। ওখানে নয়, এই কাছে টেনে নিয়ে এসো, সেই যেমন অসুখের সময় বসতে এখানে—'

তারপর, হেমন্ত অভ্যস্ত জায়গায় চেয়ারখানা টেনে এনে বসতে বললেন, 'জরুরী তলবের মানে আছে। নিজের দেহের মধ্যে আরও ঢের জরুরী তলব একটা শুনতে পাচ্ছি কাল থেকে। কতটা আর দেরি করা যাবে তা বলা কঠিন। চিত্রগুপ্ত মানুষটি বড় সোজা নন, তিনি আমার মর্জির জন্যে অপেক্ষা করবেন না—হঠাৎ একসময় পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবেন। তাই হাতের কাজগুলো সেরে নিতে চাই জলদি জলদি।'

বুকের মধ্যেটায় একটু কেঁপে ওঠে বৈকি!

অকারণেই চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হতে চায়—শরৎসুন্দরীর মতো।

তবু জোর ক'রেই মুখে হাসি এনে, প্রায়-স্বাভাবিক গলাতেই বলে হেমন্ত, 'হঠাৎ এ পাগলামি চাপল কেন মাথায়? কি হয়েছে তোমার যে, এরই মধ্যে জোর তলব শুনতে পেলে?...বরং তোমায় তো আগের ক'দিনের থেকে ঢের ভাল দেখাচ্ছে!'

হাসেন পূর্ণবাবুও। বলেন, 'পাগলামিই যদি মনে করো—তাহলে এ বয়সে সেটা তো ভীমরতি। আর ভীমরতিও তো মরবার আগেই দেখা দেয় মানুষের—মৃত্যুরই পূর্বলক্ষণ। ভীমরতির বয়সও অবিশ্যি আমার হয়েছে—আশি পেরিয়ে গেছি তো কবেই, আর কি! তবে তা নয়, তুমি বুদ্ধিমতী, দেখলেও অনেক—এই বেশ ভাল-থাকাটাও এ বয়সে ভাল নয়—তা কি জানো না?'

আবারও বুকটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে হেমন্তর।

মনে পড়ে যায়, অনেক দিন আগেকার একটা কথা—যা প্রাণপণে ভোলার চেষ্টা করেছে কাজেকর্মে, পয়সার নেশায়—অথচ যা ভোলা যায় নি—সেই তারকের মৃত্যুর কথাটা।

দীপ নেভার আগে একবার—শেষবারের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে দীপ্তি আসন্ন অন্ধকারেরই আগমনবার্তা মাত্র—পূর্বাভাস।

আশঙ্কাটা চকিতেই দেখা দেয়, চকিতের জন্যেই স্মৃতিটা খেলে যায় চিন্তার মধ্যে, এক লহমার বেশি স্থায়িত্ব নয় তার। তবু, বোধ করি সেইটুকু সময়ের জন্যেই মুখে যে আশঙ্কা ও দুঃস্মৃতির ছায়া খেলে গেল তা পূর্ণবাবুর চোখ এড়ায় না। তিনি যেন সে ছায়ার অর্থ ছাপার হরফের মতোই পড়তে পারেন। এ অতিমানবিক শক্তি এর আগেও লক্ষ্য করেছে হেমন্ত। পূর্ণবাবু হেসে বলেন, 'তাই। শেষ হওয়ার আগে একবার শেষবারের মতো জ্বলে ওঠা। অন্তত আমার তাই ধারণা। আর এ ধারণা আমার বিশেষ ভুল হয় না, তা তো তুমি জানোই।···আমার মনে হচ্ছে, বেশীক্ষণ আমার মাথা এমন পরিষ্কার থাকবে না, বেঁচে থাকলেও অজ্ঞান হয়ে একটা তন্দ্রার মতো পড়ে থাকব—তাই সময় থাকতে থাকতেই সেরে নিই কথাগুলো। তারপর—বেঁচে থাকি, ভালই। তৈরী হয়ে রইলুম, যখন খুশী ডেকে নিয়ে যাও, কোন আপত্তি নেই।···না, কি বলো?'

হেমন্ত এই একটু আগেই শরৎসুন্দরীকে কি সব উপদেশ দিয়ে এসেছিল না?

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—না কি সব বলেছিল?

এই গত কয়েক বছর ধরে একটা আত্ম-অহমিকাও ওর মনে গড়ে উঠেছিল না—যে, কোন শোক-দুঃখই আর তাকে বিচলিত করতে পারবে না—পাথরের মতোই শক্ত হয়ে গেছে তার বুকটা, পাথরের মতোই নির্জীব—কোন আঘাতই আর তা ভেদ করতে পারে না?

তবে এ কি হল তার, কোথা থেকে এতখানি অবুঝ চোখের জল

অকারণে তার দুই চোখ অন্ধ ক'রে দিল। কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারল না বুদ্ধি-বিবেচনার আগড় দিয়ে।

'এই ছ্যাখো। তুমিও ঐ দলে চলে গেলে! মেজবৌয়ের খাতায় নাম লেখালে··আরে, শোন, শোন, পাগলামি ক'রো না, কাঁদবার ঢের সময় পাবে এর পর—কাঁদবেই তো, সেইটুকুই তো আশা করি, যাওয়ার সময়ে সান্ত্বনা, আবার ভুলেও যাবে তা জানি—ভুলে না গেলেও সামলে নিতে পারবে। স্বামী-শোক, পুত্র-শোক সবই এক সময়ে সামলে নেয় মানুষ, দেখছই তো—। কিন্তু কথাগুলো আমাকে শেষ করতে দাও, লক্ষ্মীটি! মনে হচ্ছে হাতে একদম সময় নেই আর। তুমি অন্তত ওদের মতো অবুঝ হয়ো না। অনেক মৃত্যু তো দেখলে, অনেককে হারালে—তুমি একটু শক্ত হবে সাধারণ মেয়েদের থেকে এইটেই আশা করেছিলুম!'

জোর ক'রেই সামলে নিতে হয়, শক্ত করতে হয় মনটা।

অনেক দিন, অনেক বছর দেখছে এ লোকটাকে। এ যখন এত জোর ক'রে বলছে—তখন হয়ত সত্যিই আর সময় নেই। শোকের সময় ঢের পড়ে রইল সেও সত্যি—এখন যদি সম্ভব হয় একটু কাজে লাগাই উচিত।

তার, এতকালের শুশ্রূষাকারিণীর শিক্ষাই তাকে সাহায্য করে। চোখ মুছে, অপেক্ষাকৃত সহজ মুখেই চায় সে পূর্ণবাবুর দিকে।

পূর্ণবাবু বলেন, একটু যেন দ্রুতই বলতে থাকেন, 'তোমার কথাটাই আগে সেরে নিই। তোমাকে অনেক কিছুই আমার দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, অবসর মেলে নি। তুমি নিজের উপার্জনেই বেশ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছ, আর বোধ হয় দরকারও হবে না কিছু। তবু—যদি মনে করো যে, কিছু টাকা পেলে ভাল হয়, লজ্জা ক'রো না, স্বচ্ছন্দেই বলো। চাই কিছু?'

'না।' প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে হেমন্ত, 'কি হবে? এই যা করেছি—দিয়ে যাবার লোক নেই। ঐসব অমানুষগুলোর জন্যে কেন নোব তোমার কাছ থেকে হাত পেতে? তাই হয়ত রামকৃষ্ণ

মিশন কি কোন হাসপাতালকে দিয়ে যেতে হবে।···না, টাকার দরকার নেই। বেঁচে থাকতেই নিলুম না, মরবার সময় তোমার টাকা নোব কেন?'

'এ আমি জানতুম—তোমার এ উত্তর। তবু কর্তব্য একবার জিগ্যেস করা—তাই করলুম।···কোন শখ যদি থাকে! আমি অবশ্য উইলেও মেনশান করেছি, তুমি যদি কখনও বাস করতে চাও আমার বাগানবাড়ির দোর খোলাই থাকবে, যতদিন খুশি যখন খুশি গিয়ে বাস করতে পারবে। তোমার অনুমতি না নিয়ে ও বাড়ি বিক্রি কি দান করতে পারবে না ছেলে। আর—নগদ টাকা যা রইল, তার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা তোমার মৃত্যু পর্যন্ত বা পনেরো বছর জমাই থাকবে—যদি কখনও দরকার হয়, চাইবা মাত্রই পাবে, নইলে ঐ সময় কেটে গেলে আমার পুত্রবধূতে অর্শাবে।'

'না না না!' যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে হেমন্ত, 'ও বাগান-বাড়িতে আর নয়, আর কোনদিনই আমি থাকতে চাই না।'

অনেক দিনের অনেক দুঃখের স্মৃতি ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

কমলাক্ষ। পূর্ণবাবু। হ্যাঁ—পূর্ণবাবুও।

পুত্রশোক ভোলার জন্যে ওখানে এসে উঠেছিল, সে স্মৃতিও পুত্রশোকের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মনের মধ্যে।

'সে তোমার ইচ্ছে। আমার দিক থেকে পরিষ্কার রইল। আজ যতটা অসহ্য মনে হচ্ছে ততটা নাও হতে পারে দশ বছর পরে। সে যাক গে—এখন দু' নম্বর কথা। আমার স্ত্রী। কখনও ভাবি নি যে, তোমাদের দু'জনের এমন সামনা-সামনি দেখাশুনো মেলামেশা ভাবসাব হবে। যখন হয়েই গেছে তখন তার সুবিধেটা নিতে ছাড়ি কেন।···ওকে আমি কখনই সুখী করতে পারি নি, ঐকান্তিক ভালবাসা যাকে বলে তা আমার স্বভাবেই নেই,—ওর সঙ্গে ঘর করেছি ঠিকই, যেটুকু নেবার ওর কাছ থেকে তা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা আদায় ক'রে নিয়েছি—কিন্তু কখনও ওর দিকটা তাকিয়ে দেখি নি। দেখার দরকার মনে করি নি। ভেবেছি

ছেলেপুলে হয়েছে—ঘরবাড়ি সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে আছে—আর কি চাই ? দীর্ঘকালে মেয়েছেলে তো কম আসে নি জীবনে, সে সবই ও জানে, ঠিক চোখে না দেখলেও বুঝতে পেরেছে ঠিকই, আর আমিও গোপন করার চেষ্টা করি নি কোনদিন—তোমার তো কথাই নেই, তোমাকে ভালবেসেই প্রথম ভালবাসা কাকে বলে বুঝলুম—সে কথাটাও ওর জানতে বাকী নেই, ব্যভিচার যদি বা সহ্য করেছে, দেহের ভাগ দিয়েছে—এই ভালবাসাটা, মনের দাবী ছেড়ে দেওয়াটা অসহ্য হয়েছে নিশ্চয়, মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছে—সেটা আজ বুঝি, সেদিন বুঝি নি।···ও যে আমাকে কতটা ভালবাসে ঐ অসুখে পড়ার পর বুঝলুম—নিজে গিয়ে তোমাকে ডেকে আনাতে বুঝলুম, চোখ খুলে গেল আমার।···আজ অনুতাপ হয়, কিন্তু সেও বৃথা, প্রায়শ্চিত্তর আর উপায় নেই। কে জানে পরজন্ম আছে কিনা, হয়ত সামনের জন্মে এই পাপের দেনা শোধ করতে হবে কড়ায়-ক্রান্তিতে।'

বলতে বলতে কি গলা ধরে আসে পূর্ণবাবুর ?

পূর্ণবাবুরও ?···

একটু, কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'হ্যাঁ, যা বলছিলুম, শরতের কথা। বেশীদিন আর বাঁচবে না বলেই মনে হয়, আমার থেকে অনেক জবুথবু হয়ে পড়েছে এই বয়সেই—হয়ত সেজন্যেও আমিই দায়ী—মনের অসুখে শরীর তাড়াতাড়ি ভাঙে, তবে বলাও তো যায় না। তুমি ওকে একটু দেখো। যদি পারো—যদি এখানে থাকো, অসুখ-বিসুখ হলে কি মরার সময় একটু সেবা ক'রো। ···এতটা জোর তোমার ওপর আমার কিসের তা জানি না, কোন অধিকারই নেই হয়ত—বিশেষ ক'রে এই ধরনের দায় চাপিয়ে দেওয়ার—তবু কে জানে কেন কেবলই মনে হয় যে, তুমিই পারবে এ দায় বইতে, আর এ জন্যে রাগও করবে না... টাকা-কড়ি ওর নামে আলাদা করা রইল, ওর পক্ষে ঢের—মোদ্দা শেষ সময়ে তা কতটুকু কাজে লাগবে কে জানে!···ছেলেটা খারাপ নয়, তবে আমারই ছেলে তো, বেশ স্বার্থপর হয়ে উঠেছে, পয়সা চিনেছে খুব।

…বৌমাও—এমনি মন্দ নয়, অবশ্য শাশুড়ি-বৌয়ের সম্পর্ক তো জানই—বিশেষ ক'রে এর পরে যদি আরও খিটিমিটি বাধে, মানুষ বুড়ো হলে একটু বেশী অবুঝ হয়ে পড়ে—তাই কেবলই ভয় হয়, হয়ত ওর মরার সময় মুখে জল দেবারও থাকবে না কেউ।… আমি যাওয়ার আগে ও গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম—এতকাল তো দেরিও করলুম—কিন্তু ওর বরাতে দুঃখ-ভোগ আছে আমি কি করব? দুঃখ আছে বলেই বেঁচে রইল—'

হেমন্ত বাধা দিয়ে অসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, অত ব্যাখ্যানা করতে হবে না। যদি বেঁচে থাকি আর খবর পাই—তাহলে যেখানেই থাকি না কেন, ছুটে আসব আর দেখবও, যতটুকু সাধ্যে কুলোয়। তার জন্যে অত ক'রে বলতে হবে না। মানুষ যে যার পরমায়ু নিয়ে আসে—তোমার সুবিধে মতো সে মরবে কেন?'

'আঃ! বাঁচলুম! এবার আমি নিশ্চিন্ত। জানি—তুমি এ কথার খেলাপ করবে না।'

তার পর হঠাৎই যেন পূর্ণবাবুর এতক্ষণের প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে, ঈষৎ বুঝি বা একটু ম্লানও। মিনিট খানেক চুপ ক'রে থেকে, আস্তে আস্তে, কেমন একটু কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলেন, 'আর একটাই কথা বাকী আছে। অনেক দিন ধরে বলব বলব ভাবছি, ঠিক সাহসে কুলোয় নি। মানে—তুমি রাগ করবে সে ভয় নয়—কথাটা মনে পড়লে অনেক তিক্ত স্মৃতি মনে পড়ে গিয়ে দুঃখ পাবে, সেই ভয়ে বলতে পারি নি।…কথাটা মানে—কমলাক্ষর কথা। তুমি—তুমি কেন অনেকেই তখন ভেবেছিল, হয়ত আজও ভেবে রেখেছ যে, ওকে আমি মেরে ফেলেছি, ইচ্ছে ক'রে ওষুধের নামে বিষ দিয়ে—'

বাধা দিয়ে আকুলভাবে কি বলতে যাচ্ছিল হেমন্ত, বোধ করি বলতে যাচ্ছিল—এতকাল পরে সে মরা মানুষটাকে টেনে এনে আজকের দিনের এ বিদায়ক্ষণটিকে বিষাক্ত ক'রে কাজ নেই—যা ভুলে গেছে তা মনে করতে চায় না আর; বহুকাল—দুই যুগ কি

আরও—আগে যা ঘটে গেছে তাকে আর কবর খুঁড়ে বার ক'রে লাভ নেই—কিন্তু ওকে একটা কথাও বলতে দিলেন না পূর্ণবাবু। প্রবলতর বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'উঁহু উঁহু, শেষ করতে দাও, আর মোটে সময় নেই আমার—মাথার মধ্যে কেমন করছে, বুকটাতেও —শোন, মরবার সময় মিথ্যে বলছি না তোমাকে, এটা বিশ্বাস করো আজ, মেরে ফেলা যাকে বলে তা ফেলি নি, জেনে-শুনে বিষও দিই নি। কোন ভাল ডাক্তারই বোধহয় তা পারে না—কোন ভাল গাইয়ে যেমন চেষ্টা করলেও পারে না বেসুরো বেতালা গাইতে—তবে হ্যাঁ, এও ঠিক—হয়ত আর একটু চেষ্টা করলে বাঁচানো যেত, সেরকম প্রাণপণ চেষ্টা করি নি—হয়ত অন্য ডাক্তার ডাকাও উচিত ছিল আমার, নিজের হাতে রাখা ঠিক হয় নি। হয়ত—আজ আর মিছে বলব না—ভগবানকে ঠকানো যাবে না ঠিক, আর তাঁর দরবারেই তো চলেছি—হয়ত মনে মনে মৃত্যু কামনাই করেছিলাম সেদিন তার—'

আর কথা শেষ করতে পারেন না পূর্ণবাবু, বলতে বলতেই কথাগুলো যেন গলায় জড়িয়ে যায়—তারপর একেবারেই কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে কি রকম একটা অস্ফুট শব্দ বেরোতে থাকে গলা দিয়ে, দুই কষে যেন ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে দেখতে দেখতে—চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—তারপরই ঘাড় নুয়ে পড়ে তাকিয়ার ওপর মুখ গুঁজড়ে ঢলে পড়েন।

হেমন্ত লাফিয়ে উঠে ওঁকে ধরে শুইয়ে দেয়, তার চিৎকারে আরও লোকজন ছুটে আসে, ওঁর ছেলে, এক জামাই—শরৎসুন্দরী, অনেকেই। জামাইও ডাক্তার, সে গিয়ে নাড়ি ধরে, চোখের পাতা খোলার চেষ্টা করে—বৌমা যান নীলরতনবাবুকে টেলিফোন করতে —তবে কিছুতেই যে কিছু আর হবে না, হেমন্ত তা বুঝতে পারে। পক্ষাঘাত হয়েছে—ডান দিকের হাত-পা দুই-ই পড়ে গেছে, জ্ঞানও আর নেই। বোধ হয় আর কোনদিন তা ফিরবেও না।···

সেই জন্যেই আরও রাঁচী যাওয়া হয়ে ওঠে নি হেমন্তর।

কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে দেওয়া ছাড়া কোন খোঁজ-খবরও করতে পারে নি।

এবার আর হেমন্তর ওপর সেবার ভার ছিল না—ছেলে-জামাইরা হাসপাতাল থেকে দু'বেলার মতোই নার্স আনাবার ব্যবস্থা ক'রে ছিল —তবু এ সময় ওর পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে শরৎসুন্দরী—এই আসন্ন সর্বনাশের মুখে—বোধ করি পূর্ণবাবু তাঁকেও এই আশ্রয়ের ভরসা দিয়ে গিয়ে থাকবেন, ওকেই যেন একমাত্র অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন, সম্পূর্ণভাবে ভরসা ক'রে বসে আছেন।

তাই এর পর যে মাস-দুই পূর্ণবাবু বেঁচে ছিলেন—জীবন-মরণের মাঝামাঝি অবস্থায়, মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু বেরিয়ে জরুরী কাজগুলো সেরে আসা ছাড়া—দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময় এই বাড়িতেই কাটাতে হয়েছে তাকে—শরৎসুন্দরীকে আগলে।

কে জানে আরও কতকাল বাঁচবে বুড়ি! এইভাবেই ওকে জড়িয়ে থাকবে নাকি?

কিন্তু সে সব কথা ভেবেও লাভ নেই। সে বাক্যদত্ত আছে, আর তা না হলেও—শরৎসুন্দরী ওকে ত্যাগ না করলে ও পারবে না তাঁকে ত্যাগ করতে।

॥ ১৩ ॥

পূর্ণবাবুর মৃত্যুর পর হেমন্ত আস্তে আস্তে ওর জমি-বাড়ির ব্যবসা গুটিয়ে আনে। ঠিক মন-ভেঙে-যাওয়া যাকে বলে তা হয়ত নয়—কেমন যেন সাহস হারিয়ে ফেলে—মনের জোরটা কমে যায়।

রোজ দেখা হোক না হোক, উঠে দৌড়ঝাঁপ ক'রে কোন সাহায্য করতে পারুন বা না পারুন—পূর্ণবাবু বেঁচে আছেন, দরকার হলেই

ছুটে তাঁর কাছে যেতে পারবে, অতি বিচক্ষণ ও বিষয়ী লোক, প্রতিপত্তিশালীও বটে, ঠিক ঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন; তেমন প্রয়োজন হলে, বড় বড় লোক বন্ধুবান্ধব, রোগশয্যায় শুয়েই কাউকে চিঠি লিখে বা টেলিফোন ক'রে বলে দিলে কোন সাহায্যেরই অভাব ঘটবে না—এইটেই ছিল মস্ত বড় ভরসা। প্রথম বয়সের সেই পরিশ্রম করার অমিত শক্তি এবং উৎসাহ থাকা সম্ভব নয়—জেদও আর নেই। ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ-উদ্যম কমে গিয়েছিল। কিন্তু জেদটা ছিল। সে যে কারুর থেকে কম নয়—কর্মশক্তিতে কোন পুরুষ মানুষের থেকে কোন অংশে ন্যূন নয়, এইটে দেখিয়ে দেওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছাই তাকে তখন ঠেলে নিয়ে গেছে। বিপুল শূন্যতা-বোধ ও হাহাকার ভোলবার উপায় হিসেবেই কতকটা অবিশ্রাম কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখত নিজেকে।

এখন আর তার কিছুই নেই। বহু—বহু বছর কেটে গেছে তারপর—ফলে হাহাকারটাও কমেছে। জেদ বজায় রাখা, জেতবার ইচ্ছা—কোনটার মধ্যেই আর সে আগের তৃপ্তি নেই। কাজকর্ম উপার্জন সবই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। পরিচিত যারা ছিল, যাদের সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক—যাদের নিয়ে তবু এই চারিদিকের সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে নিজের একটু জগৎ (হয়ত সেও ভুয়ো, ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা) তৈরী ক'রে নিয়েছিল—তারাও একে একে সব সরে পড়ল। শুধু সে-ই রয়ে গেল একা, এই অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন আশাহীন জীবনটা বইতে।· তারই শুধু মৃত্যু নেই। শরীর খারাপও হয় না একটু, বরং দিন দিন যেন শক্তি স্বাস্থ্য বাড়ছে আরও—এই বয়সেও।···

হাতে যেসব কাজ ধরা ছিল, সেগুলো যথাসম্ভব দ্রুত সেরে নিয়ে কারবার বন্ধ ক'রে দেয় সে। যেগুলো বিক্রী করার মতো তাড়াতাড়ি বেচে দেয়, লাভ-লোকসানও অত হিসেব করে না। শুধু নিশ্চিন্ত হতে চায় সে, লাভের হিসেব অত না কষলেও তার চলবে। অনেক আছে তার—এসব বাদেও তিনখানা বাড়ি রইল

কলকাতায়; কোম্পানীর কাগজ, ইলেকট্রিক কোম্পানীর শেয়ার, টেলিফোনের শেয়ার, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার। এগুলো পূর্ণবাবুই কিনিয়ে দিয়েছিলেন জোর ক'রে। এখন এর আয় দেখে বুঝছে তিনি কত উপকার ক'রে গিয়েছেন। এছাড়া নগদ টাকাও রইল কিছু হাতে। যত দিনই বাঁচুক—অভাব হবে না তার—ফেলে ছড়িয়ে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে।

কেবল নিমাই গজ গজ করে খুব। এই কারবার গুটিয়ে ফেলাটা তার পছন্দ নয়। যত আয় হবে তত জমবে—ততই তাদের জন্যে থাকবে—বোধহয় এই রকম তার একটা আশা। সে বলে, 'ইরি মধ্যে হাত গুটোচ্ছ কেন বাপু, কী হয়েছে কি! দেখাশুনো না করতে পারো—বলো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেগে পড়ছি। ভারী তো চাকরি—য়্যাদ্দিনেও যেকালে তিরিশ টাকা মাইনে হল না—সেকালে থাকলেই বা কি গেলেই বা কি! তোমার পায়ের ধুলো কুড়িয়ে পেত্যহ জড়ো করলে এর থেকে বেশী রোজগার হবে আমার।'

'না বাবা' দৃঢ়কণ্ঠে বলে হেমন্ত, 'সে ইচ্ছে থাকলে তোমাকে চাকরি নিতেই বা দোব কেন, আর নিলেও এর আগেই তো ছাড়িয়ে আনতে পারতুম।—না, তোমার ভরসায় এসব কাজ আমার চলবে না, মানে আমি চালাব না। আর তুমিও আমার ভরসায় চাকরি ছেড়ো না। তুমি এখানে গোড় ফেলেছ, আমার ফাইফরমাশ খাটছ বলেই আমি তোমাকে যথাসব্বস্ব লিখে দিয়ে চলে যাব—এ মনে ঠাঁই দিও না। আছ, বনিয়ে চলছ—চলছ, ভাল কথা। বেচাল দেখলেই পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দোব। আমার কাজের নাম ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে আর দিনে পঞ্চাশবার ক'রে আমাকে চোখ রাঙাবে—তোমার জন্যে আমি পাকা চাকরি ছেড়েছি, মাথা কিনে নিয়েছি তোমার—সেও চলবে না। আমি আর কোন কারবার করব না, ব্যস, চুকে গেল। আমার আর রুচি নেই, দরকারও নেই। কতকগুলো ভূত পোষবার জন্যে আমি এই বুড়ো

বয়েস পর্যন্ত ভূতের মতো খেটে যাব—এত ঝামেলা বইব—এত আহাম্মুক আমি নই। তোমার যদি তেমন কোন আশা-ভরসা-খোয়াব থেকে থাকে—মনে হয় অনেক পেতে পারতে তাতে ঘাটতি পড়বে—তো তুমি নিজেই ছাখো, অনেকদিন তো দেখলে—অনেকের সঙ্গে জানাশুনো হল—মাল ধারেও পাবে হয়ত, পারো নিজে কারবার করো। তবে আমি এক পয়সাও দোব না, সাফ কথা। আমার নাম ক'রেও কোথাও থেকে মাল আনার চেষ্টা ক'রো না—আমি সবাইকে বলে দিয়েছি, আমি যদি কোন মাল কিনি—নগদে কিনব কিংবা নিজে গিয়ে বলে আসব—এছাড়া কেউ কিছু নিলে আমি তার দায়ী হব না। আমি জামিন হব না কারও—যে যা দেবে নিজে বুঝে দেবে।'

অতটা ঠিক সাহসে কুলোয়ও না নিমাইয়ের।

তাছাড়া বাড়ির কারবারে জমিটা আগে দরকার। ইট চুন সুরকি বিলিতি-মাটি যদি বা ধারে পাওয়া যায়—জমি কেউ ধারে দেবে না। মিস্ত্রী খাটাতে গেলেও নগদ টাকা চাই কিছু—তাদের অন্তত খোরাকীটা 'বুঝ' দিয়ে যেতে হবে।

না, সে হবে না। অথচ এদিকে এই হাত গুটিয়ে বসে থাকাটাও খারাপ লাগে। কোন কাজ না থাকলেও কি তাকে পুষবে হেমন্ত?

জ্যাঠাইয়ের মেজাজের যেন তল পায় না নিমাইচরণ। চাকরি ক'রে এনে মাইনের সব টাকাটাই হেমন্তকে ধরে দেয় সে, হেমন্তও মাত্র বারটি টাকা নিজে রেখে সবটা ওকে ফিরিয়ে দেয়। এ-বাড়ির যা খাওয়াদাওয়া, ঠাট—ঝি-চাকর-রাঁধুনী রেখে সংসার—তাতে ঐ বারো টাকাতে ওর খোরাকি চলে না সেটা নিমাইও বোঝে। বাড়তি খরচটা অম্লানবদনেই বহন করে হেমন্ত, বাড়ির ছেলের মতোই রেখেছে তাকে—কিন্তু তবু তার স্নেহের আসনটিতে যে আজও ঠাঁই পায় নি, সে সম্বন্ধেও ও দস্তুরমতো সচেতন—কোন ভ্রান্ত দুরাশা বা আশামিশ্রিত সংশয়ও নেই ওর মনে।

এ এক বিচিত্র সম্পর্ক ওদের। ওরা পরস্পরকে সহ্য করে এই

মাত্র। কোন পক্ষেই কোন আন্তরিক টান নেই। নিমাইয়ের এ সহ্য করায় স্বার্থ আছে—কিন্তু হেমন্ত কেন যে সহ্য করে, কেন যে তাড়িয়ে দেয় না, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। স্নেহ প্রীতি কোনদিনই কিছুমাত্র ছিল না, নেইও—বরং এক একসময় নিমাইয়ের ভাবভঙ্গী কথাবার্তা অসহ্যই মনে হয়—ছেলের মতো ভাবা তো দূরের কথা—গৌরের ওপর যেটুকু মায়া, তার শতাংশও বোধ করে না কখনও, তবু চলে যেতেও বলতে পারে না। সে যে কাজে লাগে বলে—তাও নয়। এমনিই, কি কারণ কে জানে! যত্নই করে বরং, স্নান খাওয়াদাওয়া এগুলোর ওপর কড়া নজর রাখে, তখন মনে হয় আপনার জনই, রক্তের সম্পর্ক—হাড়ভাঙা খাটুনী খাটতে হয় বলে দুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, ওর জন্যেই মাছ আসে আজকাল—ঝি-চাকররা যাতে ভাবে আশ্রিত অনুগ্রহপ্রার্থী নয়, বাড়ির ছেলেদের মতোই সম্মান দেয়, সেদিকেও লক্ষ্যের ত্রুটি নেই—অসুখ করলে সেবা করে, পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তার ডাকে—অথচ পান থেকে চুন খসলেই নির্মম কটু কথা বলে, গালিগালাজ দেয়—তখন যে ঝি-চাকররাও শুনছে এসব কথা, তাও খেয়াল রাখে না।

হয়ত এটা নিমাইচরণের ধৈর্যেরই পুরস্কার—এই সহ্য করা, যত্ন-আত্তি করাটাও। এতদিনের এত রূঢ় আচরণ, এত দুর্বাক্য সহ্য ক'রে—প্রথম দিকে তো নির্যাতনই করেছে বলতে গেলে—নিমাই যে টিকে আছে, কোথাও চলে যায় নি, কি কখনও কোন প্রতিবাদ করে নি—সম্মান শ্রদ্ধা যথেষ্ট করে, অন্তত লোক-দেখানোও—এর জন্যেই মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারে না সে। এই একটা বিষয়ে ছেলেটা যে ওদের দল-ছাড়া গোত্র-ছাড়া—এটুকু মানতে বাধ্য হেমন্তও। সেইজন্যেই নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত ছেলেটার উপস্থিতি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—ছাড়তেও পারে না ঠিক।

কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে—এবার ভগবানে মন দেওয়াই উচিত। মন দিতে চায়ও সে, কিন্তু কে জানে কেন ঠিক সেভাবে

মনটাকে বাইরের চিন্তা থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে আর দিতে পারে না।

সেই তারকের মৃত্যু থেকেই কোথায় একটা অবিশ্বাস বা অভিমানের ভাব দেখা দিয়েছে ওর মনের মধ্যে—পূজো করার চেষ্টা করে, অভ্যস্ত মুখ কলের মতো মন্ত্র পড়ে যায়, হাত সময়মতো ফুলচন্দন গঙ্গাজল ব্যবহার করে—কিন্তু সে সঙ্গে মনটাকে শান্ত ক'রে তাঁর পায়ে সংহত করতে পারে না।

কেউ আর নেই, কেউ রইল না—এই চিন্তাটাই যেন বেশী পেয়ে বসেছে ওকে। আসলে এখনও মানুষের চিন্তাটাই যেন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে ওর মনকে—ঘর বাঁধার কল্পনা, সংসারের সাধ। এটা ঠিক স্পষ্ট ক'রে বোঝে না—নিজের কাছে স্বীকার তো করেই না—অথচ কেন যে এখনও ঠাকুরঘরে ইষ্টদেবতার ছবির সামনে বসে তাঁকে ভাবতে পারে না—হারিয়ে-যাওয়া মানুষগুলোকেই খোঁজে—তাও বুঝতে পারে না।

খোঁজে অনেককেই। অনেকের কথাই মনে পড়ে আজ—অনেক স্মৃতি, অনেক তিক্ততা, অনেক অনুতাপ ভাবনাকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে। বাবার সম্বন্ধে বিষাক্ত মনোভাব এখনও সমান আছে, কিন্তু দাদার কথা মনে পড়ে একটু লজ্জাই পায় এখন। বেচারী দাদা! অসহায়, ভাগ্যবিড়ম্বিত, পিতৃতাড়িত। তার দোষ কি! ওদের মা-ই এজন্যে দায়ী—স্বামীকে গুরুর আসনে বসিয়ে ইষ্টের আসনে বসিয়ে পুজো ক'রে গেলেন চিরকাল—নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে থেকে ভয়ে ভয়েই কাটিয়ে গেলেন সারাজীবন। সেই শিক্ষায় সেই আদর্শে দাদা যদি ভয় করতেই শিখে থাকে তো তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। সেজন্যে অত অপমান, অত লাঞ্ছনা না করলেও চলত। হেমন্তর অত টাকা ছিল, ওদের তুলনায় অনেক—তা থেকে দু-চার দশ-বিশ দিলে কেউ টেরও পেত না।

দিলেই হত। বেচারী ভাইপো-ভাইঝিগুলো তো কোন অপরাধ করে নি—তাদের কোন একটাকেও যদি নিয়ে কাছে রাখত

হয়ত মানুষ হত সে, মানুষ করা চলত, হাজার হোক তার পিতৃকুলের রক্ত, শ্বশুর বংশের মতো নয়। মানুষ হয়ে উঠতে না পারে হয়ত—এমন পশুর চেয়ে হীন জীব হবে না। তাদের লেখাপড়া শেখালে নিশ্চয় শিখত। সে জন্যেও যদি কিছু ক'রে দিত দাদাকে! মাসে দশটা ক'রে টাকা দিলেও হয়ত ওদের লেখাপড়াটা হত। পিতৃবংশের জন্যে এটুকু করা উচিত ছিল ওর।

অনুতপ্ত হয়ে খোঁজ যে পরে না করেছে তা নয়—কিন্তু কোন খবরই পায় নি।

খবর দেবার একটি লোকই ছিল—ও সংসারের সঙ্গে যোগসূত্র—ছোটভাই শিবু। সেও হারিয়ে গেছে কোথায়। মধ্যে মধ্যে দু-পাঁচ মাস অন্তর ধূমকেতুর মতো এসে উদয় হত—লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে চেহারা, উপবাসে ও নেশাভাঙে শীর্ণ, ক্লান্ত—তবু মনটায় ছিল ব্রাহ্মণ। সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ। নির্লোভও। পরবর্তীকালে এক-একদিন বেশী টাকা দিতে চেয়েছে হেমন্ত, শিবু নেয় নি। তার তখনকার প্রয়োজনের মতো দু-এক টাকার বেশি কিছুতে নিতে রাজী হয় নি। আসতও না ঘন ঘন, সেই যে বলেছিল যখন-তখন এসে বিরক্ত করব না, একেবারে না ঠেকলে আসব না—সে-কথা চিরদিন বজায় রেখে গেছে।

এই ভবঘুরে বৃত্তির মধ্যেই কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে নিজের ধরনে একটা আত্মসম্মানজ্ঞানও ছিল শিবুর। শেষের দিকে নরম হয়ে এসে ওর হাতে দাদা-বৌদির জন্যে কিছু টাকা দেবার চেষ্টা করেছিল হেমন্ত—শিবু নেয় নি।

সোজাই বলেছে মুখের ওপর, 'না। বাবা মরবার সময় এক পয়সাও দাও নি, দাদা নিজে এসেছেন, তাকে রাস্তার কুকুর-বেড়ালের মতো ক'রে তাড়িয়েছ—খুবই দুর্দিনে এসেছিলেন বেচারী—তোমার টাকা আর তাদের নিয়ে কাজ নেই। হয়ত সামনে নিয়ে গেলে লোভে পড়ে অভাবের তাড়নায় হাত পেতে নেবে—তবে সেটা মানুষের কাজ হবে না। বামুনের একরকম ক'রে চলেই যাবে, না

হয় বামুনের ছেলে হাতে পৈতে জড়িয়ে ভিক্ষে করবে, তাতে দোষ নেই—তোমায় ও অচ্ছেদ্দার ভিক্ষে আর না-ই নিল !'

তারপর বলেছে, 'আর সত্যিই—বাপের ওপরই যেখানে তোমার কোন ছেদ্দা নেই—সেখানে তার বংশের উপ্‌গার আর না করলে !···না না, আমি এ কোন রাগ বা অভিমানের কথা বলছি না—এ আমার পষ্টাপষ্টি, হক কথা। আমারও তো বংশের ছেলেমেয়ে তারা—এত ছোট হতে না-ই দিলাম !—আর কি জানো, দুঃখ-কষ্ট পাওয়া একরকম ভাল, বসে খেলেই ছেলেপিলে নষ্ট হয়ে যায়। পরের দয়ার ওপর বরাৎ দিয়ে বসে থাকা—গুরুবংশের এই একই তো ব্যাপার। তার ফল তো নিজের চোখেই দেখলুম, তোমারও নিশ্চয় দেখতে বাকী নেই !'

ঠিকানা পর্যন্ত দেয় নি শিবু, পাছে খোঁজ ক'রে নিজেই যায় হেমন্ত। বাবার মৃত্যুর পর দেনার জ্বালায় ওদের বাড়ি বিক্রী ক'রে দিতে হয়েছিল—সে সময় গড়পার অঞ্চলে কোথায় ভাড়াবাড়িতে উঠে এসেছিল। তার কিছুদিন পরে শুঁড়োর কোন এক শিষ্যের পড়ো বাগান বাড়িতে এসে উঠেছে। প্রথমটা এমনি বিনাভাড়ায় থাকতে দিয়েছিল—পরে নাকি দানপত্রও ক'রে দিয়েছে একেবারে। লোকালয় থেকে অত দূরে, জঙ্গলের মধ্যে, শুয়োরের পাল শুধু চারদিকে, দিনের বেলায় মশা—প্রথম প্রথম নাকি কারও মন বসে নি, কেউ রাত্রে ঘুমোতে পারত না, ছেলেমেয়েগুলো ডাক ছেড়ে কাঁদত—অনেক লাঞ্ছনাই সহ্য করেছে বেচারীরা—নিহাৎ নাচার বলেই বাদল সব সহ্য করেছে। বিনাভাড়ায় আর কোথায় থাকতে পাবে ?

'তা—তাবলে ঐরকম জঙ্গলে থাকতে হবে ?' প্রশ্ন করেছিল হেমন্ত।

'নইলে এমনি এমনি দেবেই বা কেন ? দাদার তো দশটা টাকাও ভাড়া দেবার ক্ষ্যামতা নেই সব মাসে। এ না পেলে তো বস্তিতে এসে উঠতে হত।···এ বড় বাড়ি, দেদার খোলা, দু-চারটে

ফল-ফুলুরীর গাছও আছে, একটা ডোবামতো পুকুর—সবদিক দিয়েই ভাল। আর ও জায়গা কি চিরকাল অমনি পড়ো থাকবে নাকি? কলকাতায় আর জমি কৈ, ঐসব দিকেই এবার সকলে ঠ্যালা মারবে দেখো। এ একরকম ভালই হল দাদার। ভিটে গিয়ে যা হোক একটা ভিটে তো পেলে! থাক-না-থাক বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকতে পারবে।'

শিবুকে দিয়েই হেমন্ত তার মার মৃত্যুতিথিটা জেনে নিয়েছিল। শিবুর ওসব মনে থাকে না, দাদার কাছে জেনে এসে বলেছিল। এখনও সেই তিথিতে হেমন্ত একটি ব্রাহ্মণ ও একটি ব্রাহ্মণের সধবাকে খাওয়ায়। ধুতি শাড়ি সিঁদুর আলতা দেয়। বাবার মৃত্যুতিথি ও-ই জানে—শিবু যেদিন ছুটে এসেছিল, সে তারিখটা তো মনেই আছে—কিন্তু তাঁর জন্যে কিছুই করতে ইচ্ছে হয় না ওর।

ঠিকানাটা জানা থাকলে হয়ত এখনও কিছু করা যেত।

হয়ত শিবুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ থাকলে সে হারিয়ে-যাওয়া যোগসূত্রটা আবার খুঁজে পাওয়াও একেবারে অসম্ভব হত না। কিন্তু শিবুই গেছে হারিয়ে। কোথায় যে গেছে, বেঁচে আছে কিনা—কিছুই জানে না হেমন্ত। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে আর তার দেখা পাওয়া যায় নি—হঠাৎই যেমন এসেছিল ওর জীবনে, তেমনি হঠাৎই হারিয়ে গেল। প্রথম প্রথম দু-চার মাস অত কিছু ভাবে নি, আসার তো কোন নির্দিষ্ট সময় নেই—হয়ত আর তেমন দরকার পড়ে নি বলেই আসে নি, আবার একদিন ঠিক এসে হাজির হবে। কিন্তু মাস কাটতে কাটতে যখন বছরও কেটে গেল, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। খোঁজ-খবরও করার চেষ্টা করল। কিন্তু 'শুঁড়ো' এইটুকু মাত্র ঠিকানার ওপর নির্ভর ক'রে তাদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তেমনভাবে কে-ই বা পথে পথে দোরে দোরে ঘুরে খোঁজ করবে? পূর্ণবাবুর সাহায্যে দু-একজন ঐ পাড়ার লোককেও ধরেছিল—তাঁরা কেউই কোন খবর দিতে পারেন নি।

তারপর থেকে আর তার দেখা পায় নি হেমন্ত।

কোথাও যেতে আসতে পথে গাড়ি থেকে উৎসুক দৃষ্টি মেলে কত খোঁজ করে, চেয়ে চেয়ে দেখে—চারিদিকের অসংখ্য মুখের মধ্যে সেই চেনা অত্যাচারশীর্ণ বিশেষ মুখখানা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা —কিন্তু কোনদিনই আর চোখে পড়ে না। কলকাতা শহরের এই বিপুল জনারণ্যে সেই একটি উড়ো শুকনো পাতা কোথায় উড়ে যায়, প'ড়ো পাতার রাশি থেকে তাকে খুঁজে বার করা যায় না।

॥ ১৪ ॥

অকস্মাৎ দীর্ঘকাল পরে সেই হারিয়ে-যাওয়া পিতৃকুলের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় একটা। হারানো ছেঁড়া সুতোর খেইটা আবার কুড়িয়ে পায় হেমন্ত।

চলা-পা আর বলা-মুখ নাকি বন্ধ হয় না। প্রবাদটা কতদূর সত্য তা না জানলেও বন্ধ করার চেষ্টাতে যে বিষম কষ্ট—সেটা নিজেকে দিয়েই মর্মে মর্মে অনুভব করল সে।

কর্মহীনতা—মানে বাইরের বৃহত্তর কাজের অভাব যে এত ভয়াবহ রকমের যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে তা জানা ছিল না। পূর্ণবাবু একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ওর সম্বন্ধেই বলতেন, 'ও, অমনি বুঝি চড়ুকে পিঠ সুড়-সুড় ক'রে উঠল!' তারপর ব্যাখ্যা করতেন কথাটার মর্মার্থ—চড়কে যে সন্ন্যাসীরা মার খায়—কাঁটাতে বঁটিতে—তারা ফের পরের বছর গাজনের বাজনা শুনলেই অস্থির হয়ে ওঠে, চুপ ক'রে থাকতে পারে না, যেন মার খাবার জন্যে তাদের পিঠের সেই পুরনো ঘাগুলোর জায়গা সুড়-সুড় ক'রে ওঠে।

অর্থাৎ যে কাজে সে অভ্যস্ত, এতকাল যে কাজ ক'রে এসেছে—পুরুষের কাজ ঠিকই, হয়ত সেই জন্যেই আরও এত আকর্ষণ, বিজয় গর্বের নেশা একটা বোধ করে সে কাজে—আজ সেই কাজের অভাবে নিজেকে বড় অসহায় অপদার্থ বলে মনে হয়। মনে হয় জীবনের

সবকিছু ফুরিয়ে গেছে তার, বেঁচে থাকারই কোন অর্থ নেই। কাশী বৃন্দাবনের সেই উপেক্ষিতা আত্মীয়-পরিত্যক্তা বুড়িদের মতো মরণের দিন গোনা ছাড়া অথবা মৃত্যুর ভয়ে সর্বদা সিঁটিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজই নেই জীবনে। সব শেষ ক'রে ঘুচিয়ে বসে বসে শেষদিনের প্রতীক্ষা করা।

অন্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে ভোলবার চেষ্টা করেছে বৈকি! ইষ্টের পায়ে মনকে সংহত করতে চেয়েছে,—নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করতে না পারুক—পুজোর সময় বাড়িয়ে দিয়েছে, রাঁধুনী ছাড়িয়ে দু'বেলা রান্নার কাজ নিয়েছে নিজের ওপর—শেষরাতে উঠে নিজেই নিমাইকে রেঁধে ভাত দেয় আজকাল—তবু মনে হয় কোন কাজ নেই, কিছু হচ্ছে না, জীবনটাই বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেছে।

শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে স্থির করল কিছুদিন আবার একটু ঘুরতে বেরুবে। সেবারের তীর্থযাত্রার পিছনে একটা শোকের ছায়া লেগে ছিল। পুত্রশোক ভোলবার জন্যে তীর্থে বেরিয়েছে—এই চিন্তাটা বিড়ম্বিত ক'রে রেখেছিল সেই যাত্রাটাকে। এবার একবার এমনিই খেয়াল-খুশি মতো বেরিয়ে পড়বে কোথাও—তীর্থ না হলেও ক্ষতি নেই, বরং হয়ত না হলেই ভাল হয়—অন্য বেড়াবার জায়গা যে-সব আছে—যেমন মধুপুর, শিমুলতলা, কি দূরে কোথাও পাহাড়ের ওপর, মুসৌরী-দেরাদুন কি নৈনীতাল কিংবা শিলং। এগুলোর নাম বহুবার শুনেছে—গোপালীর মুখে, পূর্ণবাবুর মুখে, অন্য অন্য মক্কেলদের মুখেও—কোথাও যাওয়া ঘটে ওঠে নি। আরো যায় নি, পাহাড়ের ওপর ঠাণ্ডা জায়গার কথা মনে হলেই দার্জিলিং-এর কথাটা মনে পড়ে যায়—সমস্ত কল্পনাটা বিষাক্ত হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

এখন অনেকটা নিজেকে শক্ত করেছে সে। দার্জিলিং যাবে না ঠিকই—তাই বলে ওখানকার মতো অন্য কোন জায়গাতেও যাবে না এমন কোন দুর্বলতা নেই আর।···

ভ্রমণের সঙ্কল্পটা যত সহজে নেওয়া গেল—তত সহজে ব্যবস্থা ঠিক হল না।

প্রথম প্রশ্ন—সঙ্গে কে যাবে? সেবার পূর্ণবাবু লোক দিয়েছিলেন, এবার পূর্ণবাবু নেই। সেই একটি লোকের স্নেহ ও প্রশ্রয় যেন সর্বদা সমস্ত শোক-তাপের মধ্যে বনস্পতির মতো স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার ক'রে রেখেছিল মাথার ওপর, ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল সংসারের সমস্ত দুঃখ ও আঘাত থেকে।

এককালে এই পূর্ণবাবু সম্বন্ধেই তার মনোভাব বিরুদ্ধ তো বটেই, অনেকটা বিদ্বিষ্টও ছিল। স্বার্থপর, কামুক, লোভী, মতলববাজ—কত কি মনে হত প্রথম প্রথম।...হায় রে, তখন কে জানত আজ তাঁরই অভাব এমন প্রতিপদে অনুভব করতে হবে—প্রতিহাত অসুবিধা ভোগ করতে হবে তাঁর বিহনে। অসুবিধাটা বাইরের, মনের শূন্যতাবোধটাও:কম নয়। এও এক বিস্ময়কর অনুভূতি তার। ছেলের মৃত্যুতে বা কমলাক্ষের মৃত্যুতে দুঃখের যে তীব্রতা ছিল, যে হাহাকার—এক্ষেত্রে ততটা নেই, কিন্তু এ বেদনা যেন আরও দীর্ঘস্থায়ী, আরও অন্তঃপ্রসারী। জীবনের সত্যকারের সাথী, বহুদিনের সঙ্গী ও আশ্রয় হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ যেন অনেক বেশী। এ নিঃসঙ্গতা ও অসহায়বোধ সে মর্মান্তিক শোকের মতো দুঃসহ বিহ্বলকর না হলেও—দুর্বহ যে তাতে সন্দেহ নেই।...

চিন্তাটা অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে ছিল, কাউকে বলে নি। বিশেষ ক'রে নিমাইকে বলার কথা আদৌ মনে হয় নি। মনের মধ্যেই সম্ভাব্য সেথোকে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎই একদিন কী একটা কথাপ্রসঙ্গে বেরিয়ে গেল। নিমাই কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

'ও হরি! এর জন্যে এত ভাবছ! বলি আমি আছি কী করতে—তোমার কেনাকেলে নফর! বা রে! বলে এই তালই তো আমি খুঁজছি, তোমার সেথো হয়ে না গেলে তো আর এই জীবনেই যাওয়া হবে না—পিরথিমীটা যে কত বড় তা জানাও হবে না। ও তুমি ভেবো নি, আমাকে নে যেতেই হবে সঙ্গে যেকালে, সেকালে অন্য লোকের ভাবনা বাদ দাও। আমাকে ফাঁকি দে

কোত্থাই যেতে দোব না, না নে যাও—পা জড়িয়ে ধরে আড় হয়ে পড়ে থাকব, গোহত্যে বেম্মহত্যে হব তোমার সামনে। যাও দিকি একা কী ক'রে যাবে!'

'তা তোর আপিস?' হঠাৎ যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে হেমন্ত, কণ্ঠস্বর সেই কারণেই কোমল হয়ে আসে, 'আপিস নেই?'

'আপিস তা কি! আপিসও যেমন আছে, তেমনি ছুটিও পাওনা আছে। আমি তো এর ভিত্‌রি একদিনও ছুটি নিই নি গো। ছ'মাস তো হেসে-খেলে অক্‌কেলেশে নিতে পারব। তারপরও পারি, পাওনা আছে—তবে য়্যাদ্দিন একসঙ্গে নিতে গেলে গাঁইগুঁই করবে—দিতে চাইবে না।...তবে আছে, তারও অন্তর আছে। এক মিটিকেল ছাড়ব কোনো ডাক্তারকে দে—বাপ বাপ বলে ছুটি দেবে। একটা টাকার মামলা।'

'মিটিকেলটা কি?' হেমন্ত মুখ টিপে হেসে প্রশ্ন করে।

'ঐ যে ডাক্তাররা নিখে দেয় গো—যে এর ভারী অসুখ এ এখন যেতে পারবে না।...আহা, তুমি যেন জানো না—এতকাল ডাক্তারদের সঙ্গে মিশলে! ঐ তো হাসছ মিচকি মিচকি।'

'আমি যা জানি তা হচ্ছে মেডিকেল সার্টিফিকেট।'

'ঐ হল!৷ যার নাম ভাজাচাল তার নাম মুড়ি। তুমি বুঝতে পারলেই হল। আমি মুখ্‌খুর ডিম, অত কি গুচ্চে বলতে পারি!'...

যাওয়ার সঙ্গী এইভাবে—অপ্রত্যাশিতভাবেই ঠিক হয়ে গেল। এখন রইল যাওয়ার স্থান ও তারিখের প্রশ্ন।

দেখা গেল, সঙ্গী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত হেমন্তর কিছু স্বাধীনতা ছিল—তার পরের যা কিছু স্থির করা—তার দায়িত্ব নিমাইচরণ নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। শিলং কি মুসৌরী কেমন জায়গা সে জানে না। পাহাড় কোনকালে সে দেখে নি—এই গরমে সেখানে লেপমুড়ি দিয়ে শুতে হবে—কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। প্রাণ-পণে ভুরু কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ধারণায় এল না ব্যাপারটা।

সুতরাং—যা বোঝে না তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বা আগ্রহ নেই ওর। অজ্ঞাত ব্যাপার সম্বন্ধে বরং একটা আতঙ্কের ভাব আছে। তীর্থ টা বোঝে, কাশী-গয়া-পৈরাগ-জগন্নাথ—এগুলোর নাম শুনেছে, তাদের দেশ থেকে গেছে কেউ কেউ। খুব বড় তীর্থ, ওসব জায়গায় গেলে ভগবানের দর্শন মেলে। সে বললে, 'ওসব পাহাড়-পব্বত থাক জননী, সে বরং অন্য একসময় যেয়ো। তার চেয়ে চলো একটু তীথ্যি-ধম্ম ক'রে আসি।…কাশীই কেন চলো না—কাশী গয়া পৈরাগ শুনেছি ঐ একদিকেই পড়ে। আর একটু এগিয়ে অমনি বভ্যিনাথ না বভ্যিনারাণ কী আছে তাও—'

বাধা দিয়ে বলে ওঠে হেমন্ত, 'রক্ষে করো। এই গরমে কাশী-গয়া! পুড়ে ঝল্‌সে যাব নাকি!'

একটু দমে যায় নিমাই, ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'তা—জগন্নাথ? সে কেমন জায়গা—এখন যাওয়া যায়?'

'জগন্নাথ—মানে পুরী? হ্যাঁ, তা যাওয়া যায়। এ সময় সমুদ্দুরের হাওয়া খুব মিষ্টি লাগে। যায়ও অনেকে। কিন্তু তাহলে শুধুই পুরীতে গিয়ে বসে থাকতে হয়। আর তাই যদি থাকি—যে জায়গায় যাই নি কখনও, নতুন জায়গা—পাহাড়ে-টাহাড়ে গেলে ভাল হত। তোরও শরীর সারত। সে কি জিনিস তা তো দেখলি না কখনও, দেখলে বুঝতে পারতিস!'

'হেই জ্যাঠাই, তোমার পায়ে পড়ি, ওসব পাহাড়-পব্বত মাথায় থাক—তুমি না দয়া করলে জগন্নাথ বিশ্বনাথ দর্শন আমার কোন জম্মে হবে না। তুমি একটু ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে মনটা স্থস্থির ক'রে ফ্যালো। আর ধরো, তুমিই তো বলছ তোফা সমুদ্দুরের হাওয়া—রথ-দেখা কলাবেচা—আহার-ওষুধ দুই-ই হবে।'

'দেখি, হয়ত তাই-ই হবে শেষ পর্যন্ত।' এমনি নিমরাজী গোছ-ভাবে অর্ধেকটা মত দেয় হেমন্ত।

তখনও একটু দ্বিধা ছিল হয়ত—তখনও ভেবেছিল আর কোন ভাল জায়গার কথা মনে পড়বে সেইখানেই যাবে—সেই মতোই

ব্যবস্থা করবে—কিন্তু এই অর্থ-সম্মতিকেই কাজে লাগাতে একবিন্দু দেরি করল না নিমাই। এমনি ঘোর উৎসাহে তোড়জোড় শুরু ক'রে দিল, এমন স-কলরবে যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগল যে, তারপর আর হেমন্ত 'না' বলতে পারল না। এতখানি উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে মায়া হল ওর শেষ পর্যন্ত। অন্য কিছু ভাববারও সময় পেল না অবশ্য, নিমাইয়ের প্রচণ্ড উদ্যম আর কর্ম-ব্যস্ততার ঘূর্ণিতে ওরও বুদ্ধি-সুদ্ধি-কল্পনা যেন গুলিয়ে গেল।

শেষে সত্যিই একদিন এখানের বাড়িতে তালা বন্ধ ক'রে—ভাড়াটেদের একটু দেখাশুনো করার অনুরোধ জানিয়ে পুরীর গাড়িতে গিয়ে উঠতে হল।

কে জানে—যেদিন এ যাত্রায় প্রথম জগন্নাথ দর্শন করতে গেল—সেদিন কোন্ চিন্তাটা মনের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল!

লোকে বলে জগন্নাথ অন্তর্যামী, যার যেমন চিন্তা তাকে সেই রকমই সিদ্ধি দেন—সেইভাবেই দেখা দেন বা ধরা দেন তার কাছে। কোন বুড়ি একমাচা পুঁইশাক ফেলে এসেছিল, পাড়া-প্রতিবেশীরা এতদিনের অনুপস্থিতিতে সব লুটেপুটে খাবে এই সম্ভাবনাতেই কণ্টকিত ছিল তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা—সে বেচারীর নাকি জগন্নাথ দর্শনই হয় নি, সে যতবার দেখার চেষ্টা করেছে পুঁই-মাচাই দেখেছে।

এ বহুদিনের গল্প। এমন কাহিনী অজস্র আছে।

কলিতে দারুভূতো মুরারি—জগন্নাথদেবই নাকি সাক্ষাৎ ভগবান। একমনে তাঁর কাছে কোন প্রার্থনা জানালে তো তা তিনি পূরণ করেনই—অনেক সময় নিজে থেকে মন বুঝেও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

হয়ত হেমন্তরও সেই বাঞ্ছাই পূর্ণ করলেন।

পুরীতে পৌঁছে—স্টেশন থেকে নেমেই ধুলো-পায়ে দর্শন করার রেওয়াজ আছে, তবে গাড়ির কাপড়ে কেউ মণিকোঠা স্পর্শ করে

না, গর্ভদেউলে ঢোকে না। সে দর্শন শুধু বাইরে থেকে একবার 'থানাদারকে সেলাম জানিয়ে' দেখা দিয়ে আসা। দেহ ক্লান্ত, মন উদ্বিগ্ন, তখনকার সে দেখাকে কেউই রীতিমতো দর্শনের মধ্যে গণ্য করে না। হেমন্তও করে নি। বাসা কিছু ঠিক করা ছিল না, পাণ্ডার বাড়িতে উঠে স্নান-আহ্নিক শেষ ক'রে মুখে একটু জল দিয়েই বাড়ি খুঁজতে বেরোবে—কোথায় কি মেলে তার ঠিক নেই। মানুষটানা ছইওলা গাড়িতে ঘোরা—দেরিও হবে, এই রোদ্দুরে বালি তেতে আগুন হয়েছে, হেঁটে ঘুরতে পারবে না। এইসব চিন্তাই সেই দর্শনের সময় অগ্রগণ্য ছিল মনের মধ্যে।

পরের দিনের দর্শনটাই আসল। স্বর্গদ্বারে সমুদ্রের ওপর বাসা ঠিক হয়েছে, ভাল ঘর, বাড়িতে কুয়া আছে—ঘরে শুয়ে সমুদ্র দেখা যায়। সুতরাং মনটাও শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ছিল সেই অনুপাতে। তবু একমাত্র ভগবানের চিন্তাটাই মনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল, ঈশ্বর দর্শনের তৃষ্ণাই প্রবল ছিল—এমনও মনে করার কোন কারণ নেই। ঠিক কোন্ কথাটা ভাবছিল সে সময় তা হয়ত হেমন্তও জানে না—হয়ত যেমন শূন্য মস্তিষ্কে নানা ধরনের চিন্তা জড়িয়ে মিশে তাল-পাকিয়ে থাকে—তেমনিই ছিল।

গতবারে এখানে আসা, ছেলের মৃত্যু, পূর্ণবাবু—তার সঙ্গে নিজের জীবন—বাপ-ভাই-স্বামী সব চিন্তাগুলো একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রেই ছিল, একটা থেকে আর একটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ধরাও শক্ত। বিশেষ যুধিষ্ঠির যে বলেছিলেন বাতাসের থেকেও দ্রুতগামী মন—সেটাও সত্য নয়, মন আলোকের চেয়েও দ্রুতগামী কিংবা শব্দের চেয়েও—বললেই ঠিক বলা হয়—একটা চিন্তা থেকে আর একটায় আলোর চেয়েও ত্বরিৎগতিতে পৌঁছয়—সেক্ষেত্রে ঠিক কখন কোন্ কথাটা ভাবছিল তা নিশ্চিত ক'রে বলা শক্ত।...

রত্নবেদী প্রদক্ষিণের সময় কিংবা জগন্নাথের সামনে 'মাথা' করার সময় অবশ্যই ভগবানের চিন্তা ছিল মনে, প্রার্থনাও ছিল—মন শান্ত করার, তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা ফিরিয়ে আনার—তবু হয়ত

তার মধ্যেই শিবুটার কথাও কখন ভেবে ছিল। যাই হোক—দর্শন শেষ ক'রে বেরিয়ে বিমলার মন্দিরে ঢুকতে যাবে—ঠিক ভূত দেখার মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই, জীবনে প্রথম বোধহয়, দেহ শুধু নয়, মনটাও ক্ষণিকের জন্য জড়, বিহ্বল হয়ে উঠল।

ভূত দেখার উপমাটা অবশ্য ঠিক হল না। ওটা কথার কথা। ভূত দেখলে কার কি হয় বা হতে পারে, আমাদের কারুরই জানা নেই। কারণ আমরা কেউই ভূত দেখি নি। হয়ত এক-একজনের এক-এক রকম হয়। ভয়ে কেউ চিৎকার ক'রে ওঠে, কেউ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাছাড়াও নিজের ভূত নিজে দেখলে কেমন অবস্থা হয়—তা কেউ জানে না। কোন বইতেও পড়া যায় নি। কেউ দেখেছে বলেও শোনা নেই।

হেমন্ত কিন্তু সামনে যা দেখল তাকে নিজের ভূতই বলা উচিত। অন্তত ভূতপূর্ব। কারণ, মনে হল সামনে বিমলার মন্দির থেকে যে মানুষটা বেরিয়ে আসছে—সে আসলে বহু বছর আগের হেমন্তই। যেন আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে কোন যাদুমন্ত্র-বলে পঁচিশ কি আটাশ বছর বয়সের নিজের চেহারাটা দেখতে পেল। যমজ বোনও বলা চলত যদি বয়সের এতটা তফাৎ না থাকত। বয়সের তফাতে চেহারার তফাৎ যতটা হয়—ততটা তফাৎও।

সেই কারণেই, সামনে যে আসছিল দেবী-দর্শন ক'রে—তার বিস্ময় অতটা নয়। সে হয়ত অত লক্ষ্যও করত না, যদি না অমনভাবে চমকে থমকে দাঁড়িয়ে যেত হেমন্ত স্থানুর মতো হয়ে, ওর চোখ-মুখে যদি অমন বিস্ময়-বিহ্বলতা ফুটে না উঠত।

তার কারণ হেমন্ত ওর পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়েসের চেহারাটা দেখেছে—এ মেয়েটি, পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে তার কি চেহারা হবে তা দেখে নি। দেখা সম্ভব নয় বলে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সে এই হঠাৎ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া থেকেই নিজেও দাঁড়িয়ে গিয়ে—সংকীর্ণ প্রবেশপথে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েই—অবাক হয়ে ওর

মুখের দিকে চেয়ে দেখল এবং সাদৃশ্যটা লক্ষ্য করল, তা থেকে চিনতেও পারল।

দেখা বা কল্পনা করা সম্ভব নয় নিজের বহু দূর ভবিষ্যতের চেহারাটা—তবু চিনতে পারল, তার কারণ সাদৃশ্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট। চামড়া কুঁচকে গেছে, বলি-রেখা ফুটে উঠেছে এককালের ভেলভেট-মসৃণ ললাটে—সুগৌর বর্ণ রোদে ঘোরাঘুরিতে, পরিশ্রমে, চিন্তায়, সর্বোপরি শোকে হতাশায় তার সঙ্গে বয়সের যোগে—পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তত্রাচ চোখ-মুখ-চিবুকের গঠনে এমন আশ্চর্য মিল, মায় ডান কানের নিচের ছোট্ট আঁচিল দুটোয় পর্যন্ত—এগুলো চোখে না পড়ার কথা নয়।

সে মেয়েটিও খানিকটা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, 'সেজপিসী—মানে হিমি-পিসীমা ?'

হয়ত সেই বিহ্বল অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘাড়টা একটু নড়েছিল। মেয়েটি হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গেল। এইবার কিছুটা সম্বিৎ ফিরল হেমন্তর, কিন্তু এবার অন্য মনোভাব কাজ ক'রে উঠল, বহুদিনের নিরুদ্ধ আবেগে—আত্মীয়ের জন্যে স্বাভাবিক ক্ষুধার সঙ্গে একটা অপরাধ-বোধের সংযোগে—বাধা দিয়ে মেয়েটিকে একেবারে বুকে চেপে ধরল। বলল, 'দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে দেবতা আর এক নিজের দীক্ষাদাতা গুরু ছাড়া কাউকে প্রণাম করতে নেই মা। কিন্তু—এদিকে সরে এসো, অন্য লোকের অসুবিধে হচ্ছে।'

সেইভাবে বুকে জড়িয়ে রেখেই, মেয়েটিকে বাইরে জগমোহনে সরিয়ে নিয়ে এল হেমন্ত। তারপর—অকস্মাৎ কোথা থেকে কি কারণে চোখে জল এসে গিয়েছিল, প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'আমি তোমার হতভাগী হিমি-পিসীই হব নিশ্চয়—কিন্তু তোমার তো পরিচয় পেলুম না মা—অবিশ্যি পাবই বা কী ক'রে! কখনও তো দেখি নি, ভগবান এমনভাবে একছাঁচে ঢালাই না করলে দেখলেও চিনতে পারতুম না, তুমিও পারতে না'—বলতে বলতে

স্বগতোক্তির মতো বলে ওঠে, 'ষাট ষাট। তাই বলে একছাঁচে না কপালও ঢালাই হয়, আমার বরাতের বাতাস পর্যন্ত না লাগে—কিন্তু তুমি—বিয়ে তো হয়ে গেছে দেখছি। তা আর সব কই? তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি, আমাদের জামাই?'

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে মাথা হেঁট করল মেয়েটি, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এঁরা এই যে—আমার মা আর বাবা—'গলাটা আরও নিচু ক'রে বলল, 'মানে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি। তোমার জামাই আসতে পারেন নি—দেশেঘাটে কেউ না থাকলে চলে না—একসঙ্গে বেরোনো যায় না—তাই—'

তাঁরাও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় একজন, কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি, পিছনে মহিলাটি বোধ করি অকালেই বুড়ো হয়ে পড়েছেন—দেখলে মনে হয় স্বামীর চেয়েও বয়স বেশী হয়ে গেছে—রঙ এককালে খুবই ফরসা ছিল—এখন অনেকটা পাকা আমের মতো অবস্থা হয়েছে।

তাঁরাও বিস্মিত। আত্মীয়তার চিহ্ন এত স্পষ্ট, সাদৃশ্যটা এত সুপ্রত্যক্ষ যে, তাঁদেরও চোখে না পড়ার কথা নয়। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাঁরা অবাক হয়ে একবার হেমন্তর আর একবার তাঁদের পুত্রবধূর মুখের দিকে চাইলেন।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার পিসীমা। সেই যে—ছোট্‌কা যার কথা বলতেন, কলকাতায় থাকেন—বাড়ির কারবার—মানে কেনাবেচা করেন, সেই যে বলতেন না—বিধবা হয়েও কারও কাছে মাথা হেঁট করেন নি—কারও দ্বারস্থ হন নি—নিজের চেষ্টায় ক'রে খাচ্ছেন, যে শ্বশুরবাড়ি থেকে ষড় ক'রে পেছনে লেগে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাদেরই পুষছেন সাতগুষ্টিকে—মনে নেই? এই ইনিই সেই বেয়ান আপনাদের।'

তারপর একটু থেমে, মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে, 'দেখা-সাক্ষাৎ তো নেই, জন্মের পর এই প্রথম দেখা—বাপের ওপর অভিমান ক'রে বাপেরবাড়ির সঙ্গেই

সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন তো।—মুখখানা দেখে চেহারা দেখে চিনলুম।'

হেমন্ত ইঙ্গিতটা বুঝল।

ওর পরিচয়ের লজ্জাজনক অংশটা যে এঁরা জানেন না—ওর প্রথম জীবনের মুখ্যবৃত্তির ইতিহাসটা—সেইটেই ওকে কৌশলে বুঝিয়ে দিল মেয়েটি, যাতে কথাবার্তায় না সেটা প্রকাশ ক'রে ফেলে হেমন্ত।

সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করল সে, অনেকটা নিশ্চিন্তও হল।

অনেকটা হেঁট হয়ে ওঁদের নমস্কার ক'রে অপ্রতিভভাবে হেসে বলল, 'খুবই অন্যায় হয়ে গেছে আমার—বাবার ওপর অভিমান ক'রে এদের সুদ্ধ দূরে রেখেছিলুম। যখন ভুল ভেঙেছে তখন অনেক চেষ্টা ক'রেও খোঁজ পাই নি। শিবু—শিবুই আসত, খোঁজ-খবর পেতুম তবু—তা সেও তো আসে না আর। অনেকদিন আসে নি। তা হ্যাঁ রে, সে—সে বেঁচে আছে তো?'

মেয়েটি আস্তে আস্তে ওর হাত ধরে ঈষৎ টান দিয়ে বলল, 'এত কথা কি আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়! চলো বাইরে যাই। দর্শন তো হয়েছে? কোথায় উঠেছ তোমরা? স্বর্গদ্বারে হলে তো গোল চুকেই গেল—আমরা ঐ শ্মশানের ধারেই উঠেছি।'

বলতে বলতে হেমন্তকে একরকম টেনেই বাইরে নিয়ে এল। সেইভাবেই লক্ষ্মীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল।

নিমাই যে সঙ্গে আছে, সে যে এই আকস্মিক নিকটাত্মীয়-সমাগম দেখে মুখ কালো ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে—এদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে সেকথা মনেও রইল না হেমন্তর।

দেখা গেল মেয়েটির স্বভাব যেমন মিষ্টি—দৃষ্টি সেই পরিমাণেই তীক্ষ্ণ। বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই দিতে কার্পণ্য করেন নি ভগবান।

হেমন্তর খেয়াল না থাকলেও তার ছিল। পিসী নিশ্চয় একা আসে নি, আর ঐ যে ছোকরা মুখ গোঁজ ক'রে পিছু পিছু আসছে সে-ই নিশ্চয় ওর বাহন—এটা অনুমান ক'রে বেশ শ্রুতিগোচরভাবেই পরিচয়টা জিজ্ঞাসা ক'রে নিল, 'ইনি—পিসীমা ?'

'ও, ওটি ? ও আমার এক দেওরপো, নিমাই। ওর ভরসাতেই তো আসা।'

'বাঃ, তাহলে তো আমার দাদা হলেন।' এই বলে নিমাই কিছু বোঝার কি বাধা দেবার আগেই হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম ক'রে বসল। সেই সঙ্গে রীতিমাফিক হেমন্ত আর শ্বশুর-শাশুড়িকেও।

নিমাইয়ের এ অভিজ্ঞতা এই-ই প্রথম। সে এতই হকচকিয়ে গিছল যে, হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠা তো দূরের কথা—সাধারণ সৌজন্যসূচক কথাগুলোও তার মুখে যোগাল না। তাকে কেউ এত সম্মান দিচ্ছে, বিশেষ এক-গা গয়না-পরা এমন সুন্দর চেহারার একটি মেয়ে—এ যেন তার দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছে না।

সে বোকার মতো—সত্যি-সত্যিই হাঁ ক'রে (সে মুখ বুজতে বহু বিলম্ব হওয়ায় বিস্ময়টা সকলেরই দৃষ্টিগোচর এবং হাস্যকর হয়ে উঠল) খানিকটা তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'বা বা—আমি একটা বোন পেয়ে গেলুম ফাঁকতালে। তা তাহলে আমিই বা কম যাই কেন, আঁবুইমাদের পেন্নামটা সেরে নিই।'

এই বলে সে সেইখানেই, আনন্দবাজারের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ঢিব ঢিব্‌ ক'রে সবাইকে একদফা প্রণাম ক'রে নিল। ঝোঁকের মাথায় সদ্য-পাওয়া বোনটিকেও ক'রে ফেলত হয়ত—যদি না সে সম্ভাবনা অনুমান ক'রে সে যথাসময়ে খানিকটা পিছিয়ে যেত।

সিঁড়ি দিয়ে মন্দির থেকে নামতে নামতে হেমন্ত কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলল, 'পাতানো নয় রক্তের সম্পর্ক—একথা বলতেও মাথা কাটা যায়—যাবারই কথাও—তবু লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, তোমার নামটাই আমার এখনও জানা হল না।'

মেয়েটি হাসল। বলল, 'ওমা, এতে আর লজ্জার কথা কি আছে! ছাখো নি কখনও—জন্মে-এস্তকই ছাখো নি—আসা-যাওয়া খোঁজ-খবর নেই—খামোকা নাম জানতে যাবে কি জন্যে, কে-ই বা বলবে! আমার নাম নিভা। ছোটবেলায় ঠাকুরদা এক উদখুট্টে নাম রেখেছিলেন—ভুবনেশ্বরী না কি যেন—মাতঙ্গী কি ছিন্নমস্তা রাখেন নি এই আমার ভাগ্যি—তা সে নাম এখনও কাগজেপত্তরে কাজে লাগছে—কিন্তু মা আমাকে নিভা বলে ডাকত, সেই নামেই চেনে সবাই। তুমিও আমাকে নিভাই ব'লো।'

তারপর একটু হেসে—'বাট-জগন্নাথের'* কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন—মুচকি হেসে বলল, 'ছোট্‌কার তো সবেতেই রঙ্গ-রস করা—ছোট্‌কাই শুধু নামটা উল্‌টে ডাকত—ভানি। বিচ্ছিরি!'

হেমন্ত আবারও যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উদ্বিগ্ন, ঈষৎ করুণকণ্ঠে বলে, 'ডাকত বলছিস কেন রে? তোর ছোট্‌কা—? তার কথা কেবলই চেপে যাচ্ছিস কেন? সে—সে বেঁচে আছে তো? মাথা খাস—লুকোস নি, সত্যি ক'রে বল্‌!'

হাসিটা একেবারে মিলোয় না বটে, কিন্তু নিভার মুখও ঈষৎ বিষণ্ণগম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, 'ডাকত বলেছি—ওটা কথার দোষ। মানে ছেলেবেলায় ডাকত। বে'র পর কি আর ও নামে ডাকতে পারে—সেই জন্যেই। না, মরে নি, বেঁচেই আছে। তবে সে না থাকার মধ্যেই। চলো না, এই তো বেরিয়েই পড়েছি। আমাদের

* সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে ডানহাতি যে একটি জগন্নাথ মূর্তি আছেন, আগে তাঁকে বলা হত 'বাট-জগন্নাথ'—বাট অর্থে রাস্তা—এখন অনেকে বলেন 'পতিত-পাবন'। যাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই—তারা বাইরে থেকে এঁকে দেখেই উদ্ধার পাবে এই জন্যেই।

গাড়ি যাওয়া-আসা ভাড়া করা দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা কোথায় আছ বললে? ও, কাঁচকামিনীর বাড়ির কাছে?—সে তো আমাদের ওখান থেকে বড় জোর এক-রশি পথ হবে। চলো চলো, একসঙ্গেই যাই। তোমরা একটা গাড়ি ক'রে নাও—পুরুষরা একটা গাড়িতে ওঠো—আমরা আর একটা গাড়িতে যাই গল্প করতে করতে। আমাদের ওখানে নেমে জলটল খেয়ে তবে যেয়ো।'

নিভা যেন ওদের কিছু ভাববার অবসর দেয় না, তার অনুরোধের মধুর আন্তরিক ভঙ্গী আর প্রবল ইচ্ছা-শক্তির বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

এপক্ষেও অবশ্য বাধা দেওয়ার ইচ্ছা বা কারণ ছিল না। এমন কিছু বেশী বেলা হয় নি। তাছাড়া হেমন্তর অনেক কথা এখনও শুনতে হবে, অনেক কথা জানা দরকার। এই মেয়েটাকেও ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, ও যেন দশ মিনিটে রাজ্যের মায়া নিয়ে এসে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনের পরিচয়; মাঝে কিছুদিন দেখা হয় নি, অনেকদিন ওর পথ চেয়েই ছিল।

সে তাই নিমাইকে একটা গাড়ি ঠিক ক'রে নিভার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে আসতে বলে নিভা আর তার শাশুড়ির সঙ্গে ওদের ছইওলা গরুর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে আর একটি ছোট মেয়েও ছিল দশ-এগারো বছরের, বোধ হয় নিভার ননদ, তাকে পুরুষদের সঙ্গে ঐ গাড়িতে যেতে বলল, কিন্তু সে প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে একেবারে বৌদিকে জড়িয়ে ধরল, তাকে ছেড়ে সে যাবে না। অগত্যা চারজনেই উঠল ওরা এক গাড়িতে। একটু ঠাসাঠাসি হল, কিন্তু তখন ওদের সেটা খারাপ লাগার কথা নয়। হঠাৎ-পাওয়া আত্মীয়ের সঙ্গে এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা বরং ভালই লাগল।

এর ভেতর নিভা কথা বলেই যাচ্ছে। সহজ অন্তরঙ্গ কথা।

'চলো, ওখানে বসে দু'দণ্ড জিরোও তো। খুব হাওয়া বাড়িটায়, উড়িয়ে নিয়ে যায় একেবারে। চাইকি, রান্নার ব্যবস্থা যদি করা না থাকে—আমি যেয়েই ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি, দুটো ডাল-ভাত খেয়েই

খাও একেবারে। আমার দীক্ষা হয়ে গেছে—খেলে দোষ হবে না। বাড়িতে নারায়ণ আছেন, ভোগ রাঁধতে হয় বলে বাবা বে'র সঙ্গে সঙ্গেই মন্তর দিয়ে দিয়েছেন—নইলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না তো।··· বাবা এখানে পেসাদ ছাড়া কিছু খান না—বলেন মাসখানেকের জন্যে এসে আর পুরী পোড়াব না—তা পেসাদ আসতে তো সেই ধরো যার নাম বেলা একটা-দেড়টা—ছেলেমেয়েরা কি ততক্ষণ টাঙিয়ে থাকতে পারে? তাছাড়া—আমাদের পেসাদ ভালই লাগে—কিন্তু আঝালা আতেলা ওরা বেশীদিন হয়ত খেতেও চাইবে না। আবার শুনছি তো মহাপেসাদের সঙ্গে তেলের তরকারী মাছ-মাংস ঠেকাতে নেই। কাজেই আমাদের জন্যে উনুন জ্বালতেই হয়।'

ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে ওরা, গাড়ি চলতে শুরু করেছে স্বর্গদ্বারের দিকে—দক্ষিণ-মুখো। আস্তে আস্তে চলছে—দু'দিকে ভিখিরির ভিড় বাঁচিয়ে সঙ্কীর্ণ গলিপথের মধ্যে দিয়ে চলা, দ্রুত চলার উপায়ও নেই। মানুষটানা নয়—এখনও যা দু-একটা বলদে টানা গাড়ি আছে, এ তারই একটা। তবে হেমন্তর পরিচিত ওদের দেশের গো-গাড়ির মতো নিচের বসার জায়গা শক্ত এবড়ো খেবড়ো বাঁশে তৈরী নয়, বেশ মসৃণ কাঠ দেওয়া, তাতে পুরু চেটাই পাতা, বসতে কোন অসুবিধা নেই।

হেমন্ত বলল, 'তাও তো বটে। আমার কপাল! কথাটা এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি। তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি? কই, তাদের মন্দিরে আনো নি?'

'আমার ঘেটের দুটি। একটি ছেলে একটি মেয়ে। এসেছে তারা। এর আগে দু-তিনদিন দর্শন ক'রে গেছে। তাই রোজ আর আনি না। তারা ছোট্‌কাকে ছেড়ে আসতেও চায় না। ওর সঙ্গেই তাদের জমে বেশী।'

'ছোট্‌কা—মানে শিবু? তোমার সঙ্গে এসেছে? এখানে আছে?'

যেন বিশ্বাসই হতে চায় না কথাটা হেমন্তর।

'হ্যাঁ গো, তাই তো আরও টেনে নিয়ে যাচ্ছি তোমায়!' তার পর চোখে একটু কৌতুকের ভঙ্গী ক'রে বলে, 'ইচ্ছে ছিল হঠাৎ দেখা করিয়ে চমকে দোব। তাই কথাটা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলুম।... কথার পৃষ্ঠে কথাটা এসে পড়ল বলেই—'

শুধু এখানে বা এখন নয়, অনেকদিন ধরেই নিভার কাছে আছে শিবু।

যেতে যেতে সংক্ষেপে শিবুর অনেক খবরই দিল নিভা।

ওর নিজের প্রসঙ্গেই বেশী অবশ্য।

যাকে বাঙাল দেশ বলে সেইখানেই বিয়ে হয়েছে নিভার। জেলা হিসেবে নদীয়া হলেও আসলে ফরিদপুরের প্রান্তে ওদের গ্রাম। ওর শ্বশুর-শাশুড়ির কথাতে সেই টানটাই স্পষ্ট।

সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ওঁরা, জোতজমা যথেষ্ট। লেখাপড়াও শিখেছে, পয়সা আছে বলে বসে খায় না কেউ। নিভার স্বামী বি-এ পাশ, ওখানকার ইস্কুলে মাস্টারী করে। তবে সেটা নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। দেশের জমিজমা ক্ষেতখামার দেখাশুনো করার জন্যেই কলকাতায় চাকরি নেয় নি, অন্য কোথাও বা অন্য কোন কাজ পাওয়ার চেষ্টা করে নি। নিভার একটি মাত্র দেওর, সে ডাক্তারী পড়ে, তার পক্ষে বিষয়-আশয়ের কাজ দেখা সম্ভব নয়। গুরুদাসবাবু বহুদিন ধরেই সংসারবিমুখ, পূজাপাঠ নিয়েই থাকেন—বৈষয়িক ঝামেলায় আর যেতে চান না। সুতরাং ওদিকের সমস্ত দায়িত্বই নিভার স্বামী অতুলপ্রসাদের।

এই সম্বন্ধ নাকি শিবুই আনে।

সে হতভাগা ভবঘুরে—তার নিজের ভাষাতেই 'ভ্যাগাবেন', কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবদের সবাই ও-শ্রেণীর নয়। তার নিজের মতো একটা সততা ও আত্মসম্মান-জ্ঞানের জন্যে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরেই যাতায়াত ছিল ওর। অবস্থাপন্ন বন্ধুবান্ধবরা

তো ওকে ভালবাসতই—তাদের অভিভাবকরাও স্নেহের চোখে দেখতেন।

এই রকম একটি বন্ধু-পরিবারের সূত্রেই গুরুদাসবাবুর সঙ্গে ওর পরিচয় হয় এবং তিনি বড় ছেলের বিয়ে দেবেন এই খবর পেয়ে—পাত্রটিকে দেখে ও তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভাল ছেলে বুঝে—নিভার কথাটা পাড়ে, শুধু তাই নয়—গুরুদাসবাবুকে একরকম পাকড়াও ক'রে ধরে এনে মেয়ে দেখিয়ে দেয়।

মেয়ে অপছন্দ হওয়ার কোন কারণ ছিল না, হয়ও নি।

পাত্রপক্ষ বিশেষ কোন কামড়ও করেন নি। নগদ টাকা তাঁরা চান নি একটিও—হয়ত মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছিল আর পাত্রীর বাবার অবস্থাও বুঝেছিলেন, সেইজন্যেই চান নি, পাছে বেশী টানতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে যায়—শুধু 'গা-সাজানো গহনা ও সাধারণ দানসামগ্রী যা হয় দেবেন' এই কথাই বলে দিয়েছিলেন। এছাড়া আর একটি মাত্র শর্ত ছিল—দেশ থেকে জনকুড়ি বরযাত্রী আসবে, তাদের দু'দিন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিভার অভিভাবক অদ্বৈত বা বাদল চিরদিনের ভালমানুষ মুখচোরা লোক, সেই হিসেবে একটু বোকাও—সে এককথায় রাজী হয়েছিল– সম্মত হওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব না বুঝেই। হয়ত তার ধারণা ছিল শিষ্যশ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন ক্ষীয়মাণ হলেও এখনও যা আছে, কন্যাদায় জানালে তাদের মধ্যে থেকেই এ-টাকাটা অনায়াসে উঠে যাবে।

তাও উঠত হয়ত—যদি তেমন চেষ্টা করা যেত। সে উদ্যম ও বুদ্ধি বাদলের নেই। সুতরাং বিশেষ কিছুই ওঠে নি, যা প্রয়োজন তার অর্ধেকও ওঠে নি নাকি। বাদল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধুই আশা ক'রে বসেছিল, আর কোন চেষ্টা করে নি। দিনের পর দিন কেটেছে—না পেরেছে অন্য কোন ব্যবস্থা করতে—না পেরেছে সমস্যার কথাটা কাউকে জানিয়ে সুপরামর্শ চাইতে।

বলেছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। বরযাত্রী এসে পৌঁছবার যখন

আর মাত্র দুটি দিন বাকী। বলেছে শিবুকেই, কিন্তু সে কোন উপায় করতে পারবে বা কোন সদ্‌যুক্তি দিতে পারবে এ-ধরনের কোন আশায় নয়—যেহেতু শিবুই ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, সেইহেতুই শিবুর কাছে বিপদের কথাটা জানিয়েছে—বিয়েটা বন্ধ করা কিংবা পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা, শিবু সেদিক দিয়ে কিছু করতে পারে কিনা সেই উদ্দেশ্যেই।

সে-সময় নাকি একবার হেমন্তর কথাও তুলেছিল বাদল। শিবুকে তো ভালবাসে। সে গিয়ে চাইলে কি আর এই তিন-চারশো টাকাটা দেবে না হেমন্ত? দান নয়—ধার হিসেবেই চাইবে।

শিবু বলেছিল, 'না। সে আমি চাইতে পারব না। আর সে দিদি দেবেও না। তোমাদের তো একেবারে গুড়পানা ভালবাসে—তা জানো না? মিছিমিছি মুখ নষ্ট। আর ধার বলে চাইবে—শোধ দেবে কোথা থেকে? এই তো এতদিন দেখলে, কোন আয়ের পথ কি করতে পেরেছ একটা? তবে আবার ধার চাও কোন্ আক্কেলে? সে জানে আমি কথার ঠিক রাখি, আমি চাইলে হয়ত দেবে – কিন্তু আমি সেইজন্যেই চাইব না। অত টাকা শোধ দেওয়া আমার হাড়ে হবে না। আর আমি যখন পারব না জানি—তখন সে-দায়িত্ব ঘাড়ে নোব কোন্ ভরসায়?'

এ-কথার কোন উত্তর দিতে পারে নি বাদল। মাথা হেঁট ক'রে বসে থেকেছে শুধু।

শেষ পর্যন্ত শিবুই নাকি অসাধ্য সাধন করেছে। পুরনো নতুন সব পাড়া ঘুরে ওর আলাপী বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেই নাকি ঐ বিপুল টাকাটা তুলেছে সে। বেশি কারও কাছ থেকে নেয় নি, কোন একজনের বোঝা না হয়ে পড়ে। দশ-পনেরো-বিশ ক'রে নিয়েছে—তাও ধার বলে নয়, দান বা সাহায্য হিসেবেই চেয়ে নিয়েছে। স্পষ্টই বলে দিয়েছে চাইবার সময়—'আমার যে শোধ দেবার ক্ষমতা নেই সে তো তোমরা জানোই, আর আমার দাদা আমার মতো বকাটে-বাউণ্ডুলে না হলেও তার অবস্থাও আমার থেকে ভাল নয়।

শোধ দিতে পারব না কোনদিনই—এ বুঝে যে দিতে পারবে সে দাও।'

তাই দিয়েছে—যাদের যাদের কাছে গিছল তাদের প্রায় সবাই। পাঁচ দশ কুড়ি পর্যন্ত দিয়েছে এক-আধজন। তিনদিনের মধ্যেই উঠে গেছে টাকাটা।

সেই ঋণটাই নিভা ভোলে নি। স্বামী শ্বশুরবাড়ি—যাকে ঘর-বর বলে—পেয়ে পূর্ণ তৃপ্ত সে। নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে। শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদরা তাকেই সর্বময়ী কর্ত্রী ক'রে রেখেছে—সচ্ছল উপ্‌চে-পড়া সংসার, দেবতার মতো স্বামী। যে অবস্থায়, যে অভাব-অনটন এবং সেই কারণেই অপমানের মধ্যে দিন কেটেছে বাপেরবাড়িতে, সে-দারিদ্র্য সে-সব দিনের কথা ভাবলে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তা থেকে যে মুক্তি পেয়েছে, এই অভাবনীয় সুখের মধ্যে এসে পড়তে পেরেছে, সে তো শুধু ঐ সকল-সুখসৌভাগ্যের আশাহীন, সর্ববঞ্চিত হতভাগ্য কাকাটার জন্যেই। শুধু শেষ মুহূর্তে টাকাটা তুলে দিয়ে বিয়েটা সম্ভব করেছে বলেই নয়—সম্বন্ধটাও সে-ই এনেছিল। নইলে বাদলের সাহসেই কুলোত না এমন পাত্রের দিকে হাত বাড়াবার। হয়ত কোন পাত্রের জন্যেই যথেষ্ট সক্রিয় হতে পারত না, আদৌ যে তার পক্ষে মেয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করা সম্ভব তাই হয়ত মাথায় যেত না তার।

সেইজন্যেই যেদিন শুনেছে যে, শিবুর শরীরের অবস্থা ভাল নয়, বোধহয় আর বেশীদিন বাঁচবেই না—প্রকৃতি এইবার এতদিনের অনাচার-অবহেলার শোধ নিতে শুরু করেছেন—সেদিন আর স্থির থাকতে পারে নি। আগে স্বামীকে বলেছে, তাঁর মত নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়িকে বলেছে। তাঁরা যে শুধু আপত্তি করেন নি তাই নয়, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, নিজেরাই তৎপর হয়ে লোক সঙ্গে দিয়ে নিভাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন শিবুকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সঙ্গে বেশী ক'রে টাকা দিয়ে দিয়েছেন যে, অবস্থা যদি খুব খারাপ দেখে তো ভাল বড় কোন ডাক্তার দেখিয়ে

তবু কিছু সংশয় ছিল, নীলরতনবাবুরই পরামর্শে বিধানবাবুকে এনেও দেখিয়েছে। তিনি অভয় দিয়েছেন, এ জ্বর যক্ষ্মার জ্বর নয়, দূষিত লিভারের জন্যেই এ জ্বর হচ্ছে। তবে এও বলে দিয়েছেন, হার্ট বা ফুসফুসের অবস্থা খুব ভাল নয়। অচিরেই হাঁপানির মতো টান দেখা দিতে পারে। যত শীঘ্র হোক কলকাতার বাইরে কোন স্বাস্থ্যকর—নিদেন ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করাই উচিত, তাহলে কিছুটা অন্তত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

মাসখানেক চিকিৎসা চালিয়ে, খানিকটা আশার দিকে মোড় ফিরছে দেখেই, নিভা ওকে নিয়ে নিজের শ্বশুরবাড়ি ফিরে এসেছে। এর মধ্যে আরও টাকা পাঠিয়েছেন গুরুদাসবাবু, শিবুর বন্ধুদের ভেতরও দু-একজন এসে কিছু কিছু টাকা দিয়ে গেছে। সুতরাং চিকিৎসার কোন অসুবিধা হয় নি—ত্রুটি ঘটে নি। কিন্তু যার দেহে একেবারেই কিছু নেই—শুধু ওষুধপত্রে তাকে কতটা চাঙ্গা করা যায়? আল্‌গা বালির ওপর ভিত ক'রে বিশাল ইমারত তৈরীর মতোই অবাস্তব সে-চেষ্টা।

বলা বাহুল্য ওর জন্যে চিকিৎসার এই ঘটা—বিশেষ নিভার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি করেছিল শিবু। শেষের দিকে তো একেবারেই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। হাঁটাচলার অবস্থা থাকলে পালিয়েই যেত বোধহয়—কিন্তু নিভাও নাছোড়বান্দা, ওর সামনে ঢিব ঢিব ক'রে মাথা খুঁড়ে ওকে রাজী করিয়েছে।

সেই থেকেই নিভার কাছে আছে শিবু। গোড়ায় গোড়ায় খুব ছটফট করেছে, চলে আসতে চেয়েছে, তারপর ক্রমে পোষ মেনেছে, খুব বেশী আপত্তি করে নি আর। পল্লীগ্রামের জীবন, নিভাদের আদরযত্ন—সবচেয়ে নিভার ছেলেমেয়ে দুটোর মায়া—এসব কাটিয়ে চলে যেতে পারে নি। ঐ কুঁচো দুটোর টানেই আরও, পুরী আসতে রাজী হয়েছে। ওরা যেন শিবুর গায়ের পোকা, সর্বদা ঘিরে আছে। অবশ্য ওকে আনার জন্যেই আরও নিভাদের পুরীতে আসা, সমুদ্রের হাওয়া লাগলে বুকটা সহজ হবে, এই আশায়।...

সংক্ষেপে বললেও অনেকটা সময় লেগেছে।

গোরুর গাড়ির মন্থর যাত্রাও এক সময় শেষ হয়েছে, গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ, এদের খেয়ালও হয় নি। শেষ পর্যন্ত পিছনের গাড়িওলার তাড়নায় জোয়াল থেকে বলদ দুটোকে খুলে সরিয়ে দিতে যখন গাড়িটা সামনের দিকে হেলে পড়েছে—তখন চৈতন্য হয়েছে ওদের। তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে।

শ্মশানের ওপরই বলতে গেলে, একতলা বাড়ি একটা—নিভারা ভাড়া নিয়েছে। 'প্রিয়ধাম' নাম, বাড়িটা নতুন, হাওয়া-বাতাস আছে। সামনেই চওড়া বারান্দা খানিকটা। হেমন্ত নামতে নামতেই লক্ষ্য করেছে, এক অতি শীর্ণ পলিত-কেশ বৃদ্ধ বাইরের বারান্দায় বসে দুটি ছোট ফুটফুটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলছে। কে তা কে জানে, হেমন্তর মন এবং চোখ তখন শিবুকেই খুঁজছে। একবার মাত্র বারান্দার দিকে চোখ বুলিয়ে শিবু নেই দেখে উৎসুক চোখে ঘরের ভেতরটা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে বারান্দার দিকে এগোচ্ছে—সেই বৃদ্ধটি মুচকি হেসে বলে উঠল, 'আমার মন কেমন যেন বলছিল দিদি যে, তুইও আসবি এখানে—তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জগন্নাথ যে বলে অন্তর্যামী হয়ে সকলের মনের খবর জেনে বাঞ্ছা পূরণ করেন—তা কথাটা দেখছি নিহাৎ মিথ্যে নয়।'

পাথরের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল হেমন্ত। এই রুগ্ন অতি-বৃদ্ধ লোকটাই শিবু? তার অনেক পরের ছোট ভাই?

॥ ১৬ ॥

কথাটা সহজভাবেই বলেছিল শিবু, হেমন্তর ওপর যে এতখানি প্রতিক্রিয়া হবে তা ভাবে নি।

যার চেহারা খারাপ হয়ে যায়, স্বাস্থ্য ভাঙে, সে নিজে বুঝতে পারে না, ঠিক কতটা খারাপ দেখতে হয়েছে তাকে। আয়নায়

মুখ দেখার সময় হয়ত একটু চমকে ওঠে—কিন্তু অন্য সময় অভিজ্ঞতাটা অত মনে থাকে না। সে নিজের চোখ দিয়ে যখন আর সবাইকে দেখে, দেখে তাদের চিনতে পারে—তখন আশা করে যে, তাকে দেখেও সবাই চিনবে, কেন চিনতে পারবে না!

শিবুরও সেই অবস্থা। হেমন্তর যে তাকে চিনতে পারার কোন অসুবিধা আছে—তা ওর মাথাতেই যায় নি। সে সাধারণভাবেই কথাটা বলেছিল, দিদি ওকে দেখে খুশী হবে, বড়জোর এতদিন ডুব মারার জন্যে তিরস্কার করবে—এই ধরনের কিছু কিছু প্রতিক্রিয়ার কথাই ভেবেছিল। এমন স্তম্ভিত অবস্থা হবে, এতটা সশঙ্ক বিস্ময় বোধ করবে তা ভাবে নি। কে জানে, হয়ত হেমন্তর এই বিহ্বল দৃষ্টিতে নিজের অবস্থাটা সম্বন্ধেই নতুন ক'রে সচেতন হয়ে উঠে সেও আঘাত পেল একটা। আস্তে আস্তে বলল, 'কী হল? ভূত দেখলি নাকি?'

তাতেও, তখনই উত্তর দিতে পারল না হেমন্ত। তারপর সেও গাঢ় ধীরকণ্ঠে—এখন তার পক্ষে এতখানি হৃদয়াবেগও কতকটা অস্বাভাবিক—বলল, 'না, ভূত তো শুনেছি মানুষের দেহ ধরেই আসে। চিনতে কোন অসুবিধে হয় না। আমি ভাবছি অন্য কেউ। তোমার মধ্যে শিবুর চেহারার মিল কিছু আছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করছি।'

শিবু হেসে বলল, 'ভাবছিস অন্য কেউ এসে শিবুর পরিচয় দিয়ে এদের আদরযত্ন খাচ্ছে কিনা?...তা একরকম তাই বটে। যে শিবুকে তুই চিনতিস—মানে ওদিকে ক'দিন দেখেছিলি—সে শিবু আমি নই। এই দু-তিন বছরের মধ্যে কোন নেশা করি নি—শুনলে অবাক হয়ে যাবি!'

ততক্ষণে নিভার শাশুড়ি ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি একটা শতরঞ্চি এনে পেতে দিয়েছেন। বসে পড়তে পেয়ে যেন বেঁচে গেল হেমন্ত। পায়ের জোরটা হঠাৎ আশ্চর্য-রকমভাবে কমে গেছে তার, দাঁড়িয়ে থাকার বা চলার ক্ষমতা নেই। এখনও যে মনের মধ্যে এতখানি উদ্বেগ আর আবেগ আছে কারও জন্য, ওর পক্ষে এতখানি

বিচলিত হওয়া সম্ভব, তা কিছুক্ষণ আগেও ভাবতে পারত না সে। সেই আবেগেই আরও এই দুর্বলতা বোধ করছে—বুকের মধ্যেটা হঠাৎ যেন খালি হয়ে গেছে।

এতখানি বয়সে অনেক দেখল সে। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। এই যে অকালবৃদ্ধ লোকটি তার সামনে বসে হাসবার চেষ্টা করছে—যে হাসির চেষ্টায় ওর অস্বাস্থ্যবিকৃত মুখটা বিকৃততরই হয়ে উঠছে শুধু—মানুষের মুখের যে হাসি অধিকাংশ সময় দর্শকদের মনে আনন্দ বা কৌতুকের প্রতিধ্বনি জাগায়—এ সে হাসি নয়, এ হাসি দেখলে বুকের মধ্যেটায় কেমন যেন গুর-গুর ক'রে ওঠে। ওকে যতই যত্ন করা হোক, যতই চিকিৎসা করানো হোক, এ আর বেশীদিন বাঁচবে না। এই জীবন-চঞ্চলা পৃথিবীতে এর অবস্থিতির কাল সীমিত হয়ে এসেছে, এর পরমায়ু তার নির্দিষ্ট পরিমাণের শেষ প্রান্তে পৌঁচেছে, সেটা বুঝেই হঠাৎ এমন দুর্বল, অসহায় বোধ করছে।

অনেকক্ষণ পরে অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে শিবুই আবার প্রশ্ন করল, 'কী দেখছ অমন অবাক হয়ে? ভয় পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে?···বাঁচব না বেশীদিন আর—এই তো?···তা এতে আর ভয় পাবারই বা কি আছে, অবাক হবারই বা কি কারণ?···কেনই বা বাঁচব? বাঁচার জন্যে যা করা দরকার কিছুই তো করি নি কোনদিন। এখন হঠাৎ বাঁচতে চাইলে চলবেই বা কেন? আর সত্যি কথা বলতে কি, আমার বাঁচার কোন অধিকারও নেই আর—চলে যাওয়াই উচিত। মিছিমিছি, যতদিন বাঁচব নিজের ভোগান্তি, পরকেও বিব্রত জ্বালাতন করা। খেটেখুটে নিজের ভাত নিজে রোজগার ক'রে খাওয়ার মতো অবস্থা আর কোনদিনই হবে না। আমি গেলে এই ভাতটা অন্য একটা লোকের কাজে লাগবে—যার প্রাণের দাম আছে।'

আবারও হাসে সে, কথা শেষ ক'রে।

অর্থাৎ হাসির ভঙ্গীতে মুখটা বিকৃত হয় আর একবার।

এতক্ষণে ভাল ক'রে তাকাতে পেরেছে হেমন্ত। সাহস সঞ্চয়

হয় না ?…অনেক অনাচার অনেক পাতক জমা আছে, সেইটেই ক্ষ্যায় ক'রে নিচ্ছি—যাতে মরার সময় নিভ্‌ভয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে চলে যেতে পারি !'

বলতে বলতে—ওদিক থেকে কড়া শাসানির ভয়েই বোধহয় চুপ ক'রে গেল। নিভা এতক্ষণে তালপাতার ঠুঙ্গিতে ক'রে মিষ্টি-প্রসাদ সাজিয়ে এনে হাত দিয়ে জায়গাটা মুছে হেমন্ত, নিমাই আর শিবুর সামনে দিয়েছে। গুরুদাসবাবুর জন্যে ভেতরে ব্যবস্থা। তাঁর স্ত্রী আল্‌তো একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে একঘটি জল খেয়ে—একখানা পাখা হাতে ক'রে ওদের সামনে এসে বসলেন। হাওয়া করার দরকার নেই—হু-হু ক'রে ঝড়ের মতো বইছে সমুদ্রের হাওয়া—এটা শুধুই অভ্যাস—সৌজন্য রক্ষার অঙ্গ একটা।

খাবার নামাতে নামাতে কৈফিয়ৎ দিল নিভা, 'মাছ-খাওয়া বাসনে মহাপ্রসাদ দিতে নেই—এখানে আর পুজোর বাসন কোথায় পাব—তাই তালপাতার এই বাটিই আনিয়ে রেখেছি। বাবা অন্নপেসাদ খান পাতায়।'

'তুমি নিলে না ? বেয়ান—?' হেমন্ত প্রশ্ন করে।

নিভার আগে বেয়ানই উত্তর দেন, 'আপনাদের হোক তারপর আমরা শাশুড়ি-বৌ খাব নিশ্চিন্তি হয়ে। নইলে—আমাকে খাওয়াবার দায় না থাকলে ও যা বৌটি আমার, দাঁতে কুটো কাটবে না, রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসে যাবে। মন পড়ে আছে ওর সেইখানেই। উনুন ধরে গেছে তো। ছোট বেয়াই উনুন ধরিয়ে রেখে দেন যে—ফেরার সময় আন্দাজ ক'রে।'

এমনি টুকরো-টাকরা কথাবার্তা—প্রীতির ছোট ছোট আদান-প্রদান। হেমন্তের বুকটা ভরে যায়। সেই সঙ্গে কোথায় যেন একটু দুঃখও অনুভব করে, অতৃপ্ত তৃষ্ণার বেদনা একটা। এদের সে-ই পর ক'রে দিয়েছে, দিয়ে পাজীর বংশ ওর শ্বশুরবাড়ির ঝাড় এনে পুষছে—অকৃতজ্ঞ বেইমান অমানুষের ঝাড়।…যা হবে না, হবার নয়—সেই ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা তার।…

এরাই ওর আপন হতে পারত। এই মেয়েকে আপন মেয়ের মতোই কাছে রেখে মানুষ করতে পারত। মেয়ের মতোই দেখত শুনত। ঐ ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটোকে দিয়ে নাতি-নাতনীর অভাব মিটত।

আবার পরক্ষণেই শিউরে ওঠে মনে মনে।

দরকার নেই, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। তার যা অভাগা কপাল, ভাল কিছু সইত না। এদের মানুষ করতে গেলে, এরাও বাঁচত না হয়ত। সংসার পাতা তার কপালে লেখেন নি ভগবান, হুতাশনী মেয়েমানুষ সে, যেদিকে চাইবে জ্বলে-পুড়েই যাবে।

তন্ময় হয়েই ভাবছিল কথাগুলো, মন চলে গিয়েছিল কোন্ সুদূরে—নিজের অতীত জীবনের অগণিত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে —হঠাৎ কানে গেল নিভার শাশুড়ি বলছেন, 'আপনে কবে আসছেন আমাদের ওখানে তাই বলেন। চলেন না কেন এই যাত্রায়ই আমাদের সাথে। বেশ আনন্দ করতে করতে যাওয়া যাইব!'

যেন চমকে ঘুম ভাঙল হেমন্তর।

'আপনাদের ওখানে? যাব বৈকি! নিশ্চয়ই যাব। তবে এ যাত্রায় হবে না ভাই। আপনাদের ওখানে যাব যখন, বেশ কিছুদিন থাকব, নিশ্চিন্তি হয়ে আপনাদের আদরযত্ন খাব।'

আস্তে আস্তে, দন্তবিরল মুখে পাকলে পাকলে খাচ্ছিল শিবু, খাওয়া শেষ ক'রে প্রসাদের হাত মাথায় মুছে বলল, 'উঁহু উঁহু—এখন না দিদি, বলে রাখলুম। যখন ঠেকবি, শরীর ভাঙবে, দেখার কেউ লোক থাকবে না—তখন একেবারে গিয়ে আশ্রয় নিস। স্বচ্ছন্দে—কিছু ভাবিস নি, কোন সঙ্কোচ করিস নি। তোরও তো কেউ নেই, মরণকালে দেখার কি সেবা করার, এই মেয়ের কাছেই যাস—মাথায় ক'রে রাখবে। ওকে ভগবান ঐ একরকম ক'রে তৈরী করেছেন, ওর ওপর যা খুশি, যত খুশি বোঝা চাপানো যায়—এতটুকু 'কিন্তু' হওয়ার দরকার নেই।...তেমনি গিয়ে পড়েওছে—যেমন আমার জামাইটি, তেমনিই বেয়াই-বেয়ান। বৌ যদি দুনিয়ার

সমস্ত হা-ঘরে, ভবঘুরে বাউণ্ডুলেকে খাইয়ে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেয়—
—তাও কিছু বলবে না। বলবে, বেশ করেছ বৌমা, বেশ করেছ। ভালই তো। ভাল বুঝেছ করেছ। তোমারই তো সব মা—আমাদের জিজ্ঞেস করার কোন দরকার নেই। আর তুমি তো কোন অন্যায় করছ না। কুণ্ঠিত হওয়ারই বা কী আছে এতে?' গলাটা নকল করার চেষ্টা করে বেয়ানের।

'ছ্যাখো ছ্যাখো, কথার ছিরি ছ্যাখো ছোট্‌কার!' নিভা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'কোথাই কিছু নেই, মরণকালের কথা টেনে আনল! কবে মরণকাল ঘনাবে, অক্ষ্যাম হয়ে পড়বে—তবে পিসী যাবে ভাইঝির বাড়ি বেড়াতে।···কেন এমনি বুঝি যেতে নেই, দরকার না পড়লে? বেশ তো, এখন থেকে গিয়েই তো থাকলে পারে—আর কলকাতায় পড়ে থাকার দরকারটা কি?'

বেলা হয়েছে এই অজুহাতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হেমন্ত।

কতকটা যেন নিজেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে উঠতে হয়। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে নেশা লেগে যাবে। তাছাড়াও, সে না যাওয়া পর্যন্ত মেয়েটা রান্নাঘরে যেতে পারছে না; মনে মনে হানটান করছে, রান্না এখনো চাপাতে পারল না, ছেলেমেয়েগুলো—রোগীর হয়ত দেরি হয়ে যাবে খেতে।···

টেনে ছিঁড়ে চলে গেল বটে কিন্তু দূরে থাকতেও পারল না। এরপর যে ক'দিন নিভারা রইল এই বাড়ি এই বারান্দা যেন অমোঘ আকর্ষণে টানতে লাগল। ওদের শান্তির সংসারটাই যেন তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। দেখে দেখে তাই যেন সাধ মেটে না।

রোগা মৃত্যুপথযাত্রী ভাইটাও তার একটা আকর্ষণ। এমন ক'রে কাছে কখনও পায় নি। ওর মনটা যে এত ভাল, এত কোমল—তাও বোঝে নি এর আগে। কোমল বলে, মানুষের প্রতি মানুষের অবিচারে ক্ষুণ্ণ বলেই—আর ওর বাবার আচরণে, দাদার মূঢ়তায়, ওদের পরনির্ভরতার চেহারা দেখে—নিদারুণ অভিমানেই সে

নিজেকে অমনভাবে নষ্ট করেছে। ভালবাসে সবাইকে—কারও ভাল করতে না পেরে তাই নিজের ভালর পথটা বন্ধ করেছে।

অনেক কথা ওর মুখ থেকে শোনে হেমন্ত। বোনদের কথা, তাদের ইতিহাস, বাবার কথা—বাবা নাকি বৃদ্ধ বয়সে আর একটা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, এক শিষ্যকে আদেশ করেছিলেন তার কন্যাকে দান করতে। নিহাৎ সে শিষ্যর মেয়ে গলায় দড়ি দিতে চেয়েছিল, আর শিবু রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল বলেই পেরে ওঠেন নি। তারপর আর বেশীদিন বাঁচেন নি অবশ্য।

আরও অনেক খবর পায় সে আস্তে আস্তে।

নিভার ইতিহাসটাই তো অবিশ্বাস্য এক কাহিনী। নিভা নাকি ওর দাদার আপন মেয়ে নয়। ওদের এক পিসতুতো দাদা থাকতেন ভাটপাড়ায়—তাঁকে দেখেছে হেমন্তও ছেলেবেলায়, ছায়ার মতো মনে আছে। রামধন ভট্চায নাম, আপন পিসতুতো ভাই ওদের—তাঁরা নাকি এক চৈত্রমাসে সপরিবারে তারকেশ্বর গিয়েছিলেন কী মানসিকের দণ্ড খাটতে। সেখানেই কোন অনিয়ম হয়ে থাকবে—ফিরেই ওলাউঠো হয়—এশিয়াটিক কলেরা যাকে বলে—একদিনে স্বামী-স্ত্রী, বড় ছেলে, এক বিধবা দিদি—সব শেষ। শুধু বেঁচে ছিল ঐ নিভাই। ছ'মাসের শিশু, মুখে জল দেবার কেউ নেই, কলেরার ভয়ে তাকেও কেউ ঘরে আনতে সাহস করে নি।…খবর পেয়ে বাদলই ছুটে যায়, মেয়েটাকে নিয়ে চলে আসে। এতেও তাদের পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন, মন্দভাগ্য মেয়েকে বাড়িতে রাখলে সকলের অমঙ্গল হবে—অনাথ আশ্রমে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু এই একটা আদেশ তাঁর কিছুতেই শোনে নি বাদল—নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছে নিভাকে। নিভা এখনও ওদেরই মা-বাবা বলে জানে, ওরাও তাকে নিজের মেয়ে বলে মনে করে—বোধহয় আর কেউই এখনও জানে না যে, নিভা বাদলের আপন মেয়ে নয়।

বাদলের খবরও পায় কিছু কিছু। বলতে চায় না শিবু, হেমন্তর অনুগ্রহের দান তাকে নিতে হয়—সেটা ওর আজও পছন্দ নয়।

শুধু অতিকষ্টে এইটুকু জানতে পারে যে—ওদেরই এক শিষ্যবংশ কিছু জমিজমা দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রামে বসত করিয়েছে, এখন সেখানেই আছে তারা, কোনমতে দিন চলে যাচ্ছে। একটি ছেলে, লেখাপড়া তেমন না শিখলেও কোনমতে রেলে একটা চাকরি যোগাড় করেছে—বিহারের দিকে কোথায় সাহেবগঞ্জ, না কোথায় থাকে, তার বিয়ে-থাও হয়ে গেছে। সে সেইখানেই থাকে। আর এক ছেলে কলকাতায় কি সামান্য কাজ করে। ছোট ছেলেটিই চাষবাস দেখে, লেখাপড়ার চেষ্টাও করে তারই ফাঁকে ফাঁকে; এছাড়া একটি অবিবাহিতা বোন আছে।

সসঙ্কোচেই দেয় খবরটা, খবর দিয়েও শিবু বলে, 'একটা কথা বলব দিদি? ওদের দিন চলে যাচ্ছে, এতকাল যেভাবে কেটেছে, সেইভাবেই কেটে যাবে। তুই আর ওদের সাহায্য করার চেষ্টা করিস নি। ও ছেলেটাও হয়ত তাহলে অমানুষ হয়ে যাবে। খেটে খেতেই শিখুক, সে-ই ঢের সম্মানের। ঢের সুখের।'

এ কথার কোন উত্তর দেয় নি হেমন্ত, কোন প্রতিবাদও জানাতে পারে নি।

হেমন্তর খুব ইচ্ছে ছিল ওদের সকলকে রেঁধে খাওয়ায়। কিন্তু গুরুদাসবাবু তো প্রসাদ ছাড়া কিছু খাবেনই না, নিভার শাশুড়িকেও বলতে ভরসা হল না। জেনে-শুনে ওর এই হাতের জল খাওয়াবে না সে। আজ ওঁরা সম্পূর্ণ পরিচয় জানেন না ওর, একদিন হয়ত জানতে পারবেন—সেদিন ক্ষুণ্ণ হবেন, নিভাকেও দু দশ কথা শোনাবেন। একদিন একবেলা খাওয়াতে গিয়ে নিভার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য লাঞ্ছনার কারণ হতে পারবে না সে!

তাই শুধু নিভা আর ছেলে-মেয়েদেরই খেতে বলল, সেই সঙ্গে শিবুকেও। শিবু অবশ্য কিছুই খায় না প্রায়—খাওয়ার উপায়ও নেই—পায়েসটাই যা একটু তৃপ্তি ক'রে খেল। শিবুকে দু-একটা দিন রাখতে চেয়েছিল নিজের কাছে, শিবু রাজী হল না।

বলল, 'ওদের বাড়ি ওদের আশ্রয় সয়ে গেছে। ঐখানেই বেশ

থাকি, শান্তি পাই।…এখন থাক, যদি সত্যি-সত্যিই কোনদিন ঐ আবাগীর ইচ্ছেটা ফলে—একটু অন্তত উঠে-হেঁটে বেড়াবার মতো জোর পাই—সেদিন কলকাতায় এসে তোর বাড়িই উঠব, কিছুদিন থাকব বরং। এখন না। ছেলেমেয়ে দু'টোও ভারী বন্ধন হয়েছে আমার—ওদের ফেলে থাকতেও পারি না কোথাও গিয়ে। ওরাও আমার—যতই হ্যাওটা হোক, মাকে ফেলে থাকতে পারবে না।'

আর জোর করে নি হেমন্ত। ক'দিনই বা আছে আর! যেখানে থেকে শান্তি পায় সেখানেই থাক।

মুশকিল হল নিভাদের যাওয়ার সময় এগিয়ে আসতে।

ওরা হেমন্তদের অনেক আগে এসেছিল—ওদের ফেরার সময়টাও এদের আগেই পড়া উচিত। মাস হিসেবে বাড়িভাড়া নেওয়া—দু-তিনটে দিনও বেশি থাকার জো নেই, পুরো একমাসের ভাড়া দিতে হবে তাহলে আবার। কে জানে, হয়ত আগে থেকে অন্য ভাড়াটেও ঠিক হয়ে আছে পরের মাসের—সেক্ষেত্রে তো টাকা দিলেও থাকা চলবে না।

নিভারা চলে যাওয়ার পর আর এক মিনিটও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল না।

মেয়েটা ওকেই শুধু মায়ায় জড়িয়ে ফেলে নি—নিজেও জড়িয়েছে। কেন তা হেমন্তও জানে না, এই তো প্রথম দেখাশুনো, ক'দিনের মাত্র পরিচয়। এমন কিছুই করতে পারে নি আদর-যত্ন—স্নেহের কোন পরিচয় দেবার সুযোগ পায় নি। উপকারে তো লাগার কথাই ওঠে না। বোধহয় নিভার সম্বন্ধে শিবুর হিসেবটাই ঠিক, দুনিয়ার যত অভাগার ওপরই মেয়েটার অহেতুক স্নেহ। হেমন্তর দুর্ভাগ্যের বিবরণই নিভার অন্তরে মমতার আসন দখলে প্রবেশ-পত্রের কাজ করেছে। মায়াটাই বেশী ওর। নিমাইয়ের নিজস্ব ভাষায়—'আমার এই নতুন বোনটা খুব মায়াবী—কী বল গা জ্যাঠাই?'

বিদায়ের সময় প্রণাম করতে গিয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিল নিভা। হেমন্ত ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, অনেক বলে, অনেক আদর ক'রেও থামাতে পারে নি। কে জানে কেন, বেয়ানের চোখ দু'টোও ছলছল ক'রে এসেছিল। ভালবাসা সে পেয়েছে বৈকি—এর আগে, কমলাক্ষর কাছ থেকে পরিপূর্ণ প্রেমই পেয়েছে সে—কিন্তু এমন অহেতুক স্নেহ জীবনে এই বোধ করি প্রথম পেল। আত্মীয়ের স্নেহ, আত্মীয়তার প্রীতি, বন্ধন। তার কাছে প্রত্যাশী অনেকে, দেয় না কেউই। এই প্রথম একজন দিল—কিছু পাওয়ার আশা না রেখেই।

তার ফলে, নিভারা চলে গেলে, ওর মনে হল—এই শহর কেন, ওর জীবনটাই যেন নতুন ক'রে অন্ধকার হয়ে গেল; এবার এখানের বাস যথার্থ প্রবাস হয়ে উঠল—আর জগন্নাথের কাছে, মনে মনে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। ঠাকুর অন্তর্যামী, তিনি জেনে-বুঝে মাপ করুন। আর, ওর এই মনোভাবের জন্যেও কি তিনিই দায়ী নন?

আরও সেই জন্যেই জোর ক'রে রইল পাঁচ-সাতটা দিন।

দু'দিনের মায়া—সে মায়ায় জড়িয়ে পড়ে নিজেকে এমন দুর্বল ক'রে লাভ নেই। জোর ক'রে কাটিয়ে ফেলাই ভাল। সত্যিই সেখানে গিয়ে কিছু থাকতে পারবে না। আট-দশ দিনের পরিচয়ের জোরে আত্মীয়তার দাবীতে কুটুমবাড়ি গিয়ে ওঠা যায় না। উঠলেও দু-চার দিনের বেশি থাকা সম্ভব নয়। ওসব চিন্তা ত্যাগ করাই দরকার। তার যে জীবন, যে জীবনের পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে—সেই জীবনই তাকে বহন করতে হবে পরমায়ুর শেষ দিন পর্যন্ত—বজ্রদগ্ধ, মরুভূমিতুল্য—মিছিমিছি স্নেহ মায়া প্রীতি—এসব সুখের স্বপ্ন দেখে লাভ নেই।···অকারণে যন্ত্রণা ভোগ। এ লোভ, এ দুরাশা দূর করাই মঙ্গল।···

নিমাইয়েরও এ ক'দিনে খুব মায়া বসে গিয়েছিল। সেও এত আদর-যত্ন, এমন খাওয়া-দাওয়া বহুকাল পায় নি। তবু নিভাদের

অভাবে তার যে পুরী থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা হয় নি, তার কারণ নিজের স্বাস্থ্য। তার ধারণা এখানে বেশীদিন থাকলে শরীর বেশী ভাল হবে। তাই সে আর ক'টা দিন থেকে যাবার জন্যেই বরং পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

এর মধ্যে বাড়িওলার এজেন্টের সঙ্গে কথাও কয়ে এসেছে। তিনি আরও পনেরো দিনের ভাড়া নিয়ে আট-দশ দিন থাকতে দিতে রাজী হয়েছেন। কারণ, এর মধ্যে আর কোন ভাড়াটে আসার সম্ভাবনা নেই। যা আসবে সেই রথের সময় একেবারে। তখন এই উদারতার দাম পুষিয়ে নিতে পারবেন তিনি।...

আর যা অন্য বাধা—বাড়তি ছুটি, তার জন্যেও কোন দুশ্চিন্তা নেই নিমাইয়ের। মাত্র দু'টি টাকা খরচ ক'রে—ওর ভাষায় একটা 'মিটিকেল' ছাড়লেই পাওয়া যাবে—তারা বাপ-বাপ বলে ছুটি দিতে পথ পাবে না। কথাটা হেমন্তকে জানিয়েও দিয়েছে সে। জ্যাঠাইয়ের 'শরীলটা' ভেতরে ভেতরে গুমরে দুর্বল হয়ে গেছে—সুতরাং ক'টা দিন এখন থাকা দরকার—বার বার এই কথাটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিল জ্যাঠাইকে।

হেমন্তও হয়ত রাজী হত শেষ পর্যন্ত, তার কাছে পুরীও যা, কলকাতাও তাই—সেখানে গিয়েই যে ভাল লাগবে তার কোন মানে নেই। স্মৃতিটা অত পীড়া দেবে না এই পর্যন্ত। এখানে যেমন স্বর্গদ্বারের রাস্তা দিয়ে আসতে গেলে বাড়িটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আসতে হয়, অনেক সময় হরিদাস মঠের পথে ঘুরে গৌরবাটশাহী দিয়েও যায়, একআনা বেশী ভাড়া কবুল ক'রেও—সেইটে থাকবে না। তবে—এ মায়া যখন ভুলতেই হবে, এইখান থেকেই ভোলা ভাল, এমন ক'রে পালিয়ে যাওয়ারও কোন অর্থ হয় না।

দোনামনা ক'রে নিমাইয়ের প্রস্তাবের দিকেই ঝুঁকেছে একটু—ওর জন্যে নিমাইয়ের যে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই তা বুঝতে বাকী ছিল না অবশ্যই, এমনিই নিজেকে শক্ত করার জন্যেই রাজী

হচ্ছিল—অকস্মাৎ জগন্নাথই বুঝি বাদ সাধলেন। জ্যেঠাইকে সুমতি দেওয়ার জন্তে নিমাইয়ের মণিকোঠায় বার বার মাথা ঠোকাতেও কোন উপকার হল না। কলকাতা থেকে ঠিকানা বদল হয়ে একখানা চিঠি এসেই সব গোলমাল ক'রে দিল।

চিঠিটা এসেছে গোরাদের ইস্কুল থেকে। গতবছর থার্ড ক্লাসে (ওদের ওখানে কি ক্লাস এইট না কি বলে) ফেল করেছিল গোরা। তখনই রেক্টর চিঠি লিখে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—পড়াশুনোয় ছেলেটির একেবারেই মন নেই, হেমন্তর অনুরোধে ওঁরা যে কোচিং-এর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন সেখানের রিপোর্টও খুব খারাপ—বিষম অমনোযোগী ও ফাঁকিবাজ—এই কথাই প্রতি সপ্তাহে জানাচ্ছেন তাঁরা—যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তো তাঁরা আর রাখতে পারবেন না। এর পরের পরীক্ষা পর্যন্ত দেখতে পারেন—তবে সেই-ই শেষ সুযোগ, তখনও যদি এই রকমই ফল দেখা যায় তো তাঁরা সেসন-এর মধ্যেই ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবেন। সুতরাং অভিভাবিকার ইচ্ছা থাকলে এখনই ছাত্রকে নিয়ে যেতে পারেন।

সেই সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন যে, ওঁরা নানা রকমে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, ছাত্রটির মাথা একেবারে নিরেট নয়—অমনোযোগ ও পাঠে বীতস্পৃহাই এই রকম ফল হওয়ার প্রধান কারণ।

হেমন্ত সে চিঠির কোন জবাব দেয় নি। নিয়ে এসে কি করবে? কোথায় দেবে? গোরাকেই একটা কড়া চিঠি দিয়েছিল যে, এখনও যদি তার চৈতন্য না হয়, পড়ায় মন না দেয় তো অতঃপর পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খেতে হবে, অথবা বিড়ি পাকাতে কি কোচোয়ানী করতে হবে—হেমন্তর কাছে আর স্থান হবে না।

যার মন একেবারেই লেখাপড়ার দিকে পিছন ফিরেছে, সম্পূর্ণ বিরূপ—সে এই হুঁশিয়ারীতে হঠাৎ মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করবে তা সম্ভব নয়। হেমন্তও তা আশা করে নি। তবু সত্যি-সত্যিই যে স্কুলের কর্তৃপক্ষ বছরের মাঝখানে ছাড়িয়ে দেবেন তা ভাবে নি। হয়ত এও মনে ক'রে ছিল যে—একেবারে যখন গবেট নয়, তখন

সামান্য কিছুও উন্নতি করতে পারে—দশ নম্বর বেশী পেলেও আইনে বাঁচে। তাও হয় নি। রেক্টর জানিয়েছেন যে, বর্তমান 'পিরিয়ডিক্যাল' পরীক্ষায় গোরা আরও কম নম্বর পেয়েছে। তিনটি বিষয়ে তো একেবারেই শূন্য, তার মধ্যে দু'টি বিষয়ে স্রেফ সাদা খাতা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই। তা ছাড়াও ওর স্বভাবে এবং চরিত্রেও নানা রকম দোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আর কোনমতেই তাঁরা ওকে স্কুলে রাখতে রাজী নন, অভিভাবক-পক্ষ যেন সাত দিনের মধ্যে এসে ছেলেকে নিয়ে যান। এর বেশী সময় তাঁরা দিতে পারবেন না কোনমতেই।

অতঃপর পুরীতে আরও ক'টা দিন থেকে যাওয়ার কথা বলতে নিমাইয়েরও সাহসে কুলোল না।

॥ ১৭ ॥

মুখে যতই যা বলুক বা চিঠিতে ভয় দেখাক যে—ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে এ বাড়িতে আর স্থান হবে না, বিড়ি পাকিয়ে অথবা কোচোয়ানী ক'রে খেতে হবে, কার্যত সে ব্যবস্থা করা গেল না, বাড়িতেই এনে তুলতে হল। তবে নিজে আর গেল না, সেখানে গিয়ে স্কুল-কর্তৃপক্ষকে মুখ দেখাতে লজ্জা করল। ভাড়াটে ভদ্রলোকের দু-তিনদিন ছুটি ছিল, তাঁকেই গাড়িভাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিল—সেই সঙ্গে কিছু বেশী টাকাও দিয়ে দিল—হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে আসতে।

গৌরকে কিন্তু বিশেষ লজ্জিত কি অনুতপ্ত বোধ হল না। দুঃখিত তো নয়ই। কে জানে, লজ্জা ঢাকতেই হয়ত, বাড়ি ঢুকল সে আস্তে শিস দিতে দিতে; সে যে বেপরোয়া এটা বুঝিয়ে দিতেই।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওর চেহারারও। বয়সটা—

মনে মনে হিসেব ক'রে দেখল হেমন্ত—আঠারো বছর পার হতে চলেছে। গোঁফের রেখা ঘন হয়ে উঠেছে। দাড়ির লক্ষণও সুস্পষ্ট। গায়ের রঙ বা চেহারার আদলটা বংশের ধারায় গেলেও সে পিলে-রোগা ভাবটা নেই। বোধ হয় স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার জন্যেই বেশ জোয়ান হয়েই উঠেছে।

এতদিন ধরে প্রায়ই দেখছে বলে বোধ হয়—কখন যে বালক গৌর তরুণবয়সীতে পরিণত হয়েছে তা লক্ষ্য করে নি হেমন্ত। এই তো মাসকতক আগেও দেখেছে। এবার হঠাৎই যেন পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। বুঝল, এই বয়সে থার্ড ক্লাসে অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা বোধ হচ্ছে বলেই পড়াটা আরও অরুচিকর হয়ে উঠেছে। একেই বেশী বয়সে পড়াশুনো শুরু করেছে—তার ওপর সঙ্গী অন্য ছেলেরা ওপরের ক্লাসে উঠে গেছে, সে আরও লজ্জার কারণ। লজ্জা থেকেই বিতৃষ্ণার উৎপত্তি।···হয়ত ভুলই করেছে সে জোর ক'রে ওখানে ফেলে রেখে—প্রথম ফেল করার পরই এখানে আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

নিমাই সৎ-পরামর্শই দিতে গেল, 'আর ও চেষ্টায় দরকার নেই জননী, এ আমড়াগাছে ন্যাংড়া কেন—টোকো আমও ফলবে না। আমাদের বংশের যা বিদ্যের দৌড়, তার বেশীই গেছে তবু। ঐখানেই ইতি করো। তোমার এত জানাশুনো, কাউকে ধরে চাকরিতে ঢুকিয়ে দাও। পড়ালেখা আর ওর দ্বারা হবে না। দেখছ না—জোয়ান হয়ে উঠেছে, চনমন করছে—। বে' দিলে এখনই ছেলেপুলে হতে শুরু করবে। ঐ দিকেই এখন ঝোঁক যাবে ওর। আর এ তো হতেই হবে, তোর পিছে কেন খাড়া—না বংশাবলীর ধারা! মিছিমিছি ওর পেছনে আর পয়সা ঢেলো না।··· যা হোক তো কিছু শিখেছে, আমাদের মতো মুখ্‌খু—ক-অক্ষর-গো-মাংস তো নয়, নোহা-ঠেঙানো কাজ করতে হবে না, চেষ্টা করলে কলম-পেষার কাজই পেতে পারবে।'

কথাটা হেমন্তর পছন্দ হল না। আস্তে আস্তে আবারও একটা

আশা হয়ত গড়ে উঠেছিল গৌরকে কেন্দ্র ক'রে, সেটায় প্রবল আঘাত লেগেছে, তার গোড়াটা গেছে আল্‌গা হয়ে—তাতে মনে মনে একটা বিপুল ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, সেইটেই একটা উপলক্ষ পেয়ে বেরিয়ে এল এবার, জ্বালাটা গিয়ে পড়ল নিমাইয়ের ওপর।

'অ! ল্যাজকাটা শেয়াল—ওরও ল্যাজটা কাটতে না পারলে চলছে না বুঝি! এখনই ওর লেখাপড়া ঘুচিয়ে কোথাও একটা নিজের মতো কুলী-মিস্তিরীর কাজে ঢুকিয়ে না দিলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না—না! কেন, ও কি খেতে পাচ্ছে না—না আমারই ভাত জুটছে না?...না কি ওর পেছনে পয়সা না ঢাললে সে পয়সা তোমার ভোগে লাগবে তাই এঁটে আছ!'

'ঐ লাও!' হতাশার ভঙ্গী করে নিমাই, 'বলে যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর! তবে আর কলিকাল বলেছে কেন! যার ভাল করতে যাবে সে-ই উল্‌টো বুঝবে!...পড়াও বাবা, পড়াও! যত পারো তেল ঢালো। পয়সা কুটকুট করছে বৈ তো নয়। খানিকটা বাজে-খরচ না হলে কুটকুটুনি সারবে কেন? তবে এখানে এনে শহরে রাখছ, কলকাতার ইস্কুলে দিচ্ছ—তাহলে কিছু কিছু ওর হাতেও দিও, হাতখরচা। নাতি তো বিড়ি-বার্ডসাইতে পক্ক হয়ে উঠেছে—ইরি মধ্যে ঠোঁটে দাঁতে কালো ছাপ—সেটা এট্টু তাকিয়ে দেখে ব্যবস্থা ক'রো। নইলে যা শিখেছে তা তো শিখেছেই, পয়সা না পেলে বাক্‌স ভাঙতেও শিখবে!'...

মারের বদলে এই চরম মার দিয়ে নিমাই দ্রুত সেখান থেকে সরে যায়, জ্যেঠাইয়ের ছড়াকাটানো গালাগাল—চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করা—শোনার জন্যে বসে থাকে না।..

কালো দাগ যে চোখে না পড়েছে তা নয়। তবে ওটা বয়সের ধর্ম ভেবেই গায়ে মাখে নি হেমন্ত। সব দিকে বাঁধতে গেলে চলবে না, দড়ি ছিঁড়তে চাইবে। আর সবাই যে তারক হবে তার কোন মানে নেই। নিমাইয়ের এই চোখে-আঙুল-দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াতেই সে বরং বিরক্ত হল। বড্ড গায়ের জ্বালা আসলে ওর। এই

ছেলেটাকে তাড়াতে পারলেই ষোলকলা আশা পূর্ণ হয়, সবটা ওর ভোগে লাগে—এই ভাবছে বসে বসে।....'দাঁড়াও, ভোগ করাচ্ছি। আর কিছু না হোক, গোরার ভাল দেখে একটা বিয়ে দিয়ে—ভাল ঘরের বৌ এনে পণটা তো পাল্টাতে পারব। ও মানুষ না হোক, ওর ছেলে মানুষ হবে। তাদেরই দোব। তাও না হয়—কুকুর-বেড়ালকে খাইয়ে যাব, তবু ও হিংসুটে কুচক্কুরেকে দোব না!'

ছেলেমানুষের মতোই মনে মনে গজরায় সে। আশাভঙ্গের আঘাতে বুদ্ধি-সুদ্ধি সব যেন কোথায় তলিয়ে গিয়ে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েদের পর্যায়েই পৌঁছে যায় এক নিমেষে।

কলকাতাতেও কোন কোন স্কুলের বোর্ডিং আছে, ওর ভাড়াটে দেবেনবাবু তার একটা তালিকাও সংগ্রহ ক'রে দেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বোর্ডিং-এ দেয় না হেমন্ত, বাড়িতেই রেখে পড়ার ব্যবস্থা করে। ওখানের ফলাফল দেখে কোন ভাল স্কুল ছেলেকে নিতে চায় না, বিশেষ বছরের অর্ধেক কেটে গেছে—অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্কুলেই দিতে হয়। তাও অনেক বলা-কওয়া ধরাধরির পর রাজী হন তাঁরা। হেডমাস্টার মশাইয়ের পরামর্শক্রমে দু'টি প্রাইভেট টিউটর ঠিক করল—নইলে, তিনি বললেন, ভর্তি করাই সার হবে, আর মাইনের টাকা গোনা।

বললেন, 'যা ওর পড়াশুনোর অবস্থা হয়ে আছে দেখছি, এই চার-পাঁচ মাস পরে এগজামিন দিয়ে পাস করতে পারবে না। আবারও একটা বছর নষ্ট হবে। যদি পড়াতেই হয়—সেই মতো ব্যবস্থা করুন। তারপর কি জানেন—ছেলে বড় হয়ে গেছে, বেশী বাজে সময় হাতে না রাখাই ভাল, নইলে বদ ছেলেদের বাজে আড্ডায় গিয়ে পড়বে।'

ঠিক হল একজন সকালে পড়াবেন, শুধু অঙ্ক—আর একজন সন্ধ্যায়, ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়। সকালের মাস্টারমশাইকে দশ টাকা দিতে হবে, সন্ধ্যায় যিনি পড়াবেন তাঁকে পনেরো।

এতগুলো টাকা বাজে খরচ হচ্ছে দেখে নিমাইয়ের গা গসগস করে, আড়ালে-আব্‌ডালে তা নিয়ে টিটকিরিও দেয় সে, কিন্তু হেমন্ত এ খরচা গায়ে মাখে না। রাঁচীতেও যে কোচিং-এর ব্যবস্থা ছিল—তার জন্যে কুড়ি টাকা দিতে হত বাড়তি, এ যেমন পাঁচ টাকা বেশী যাচ্ছে, তেমনি অন্য অন্য খরচ ঢের কমে গেল। তাছাড়া ছেলে দু'বেলা আটকে থাকবে—সে-ই একটা বড় লাভ। তাও—হেডমাস্টার মশাই বলেছেন, 'যদি দেখেন এই এগজামিনেশ্যনে রেজাল্ট ভাল হয়—একজনকে ছাড়িয়ে দেবেন, ধরণীবাবুই সব সাবজেক্ট পড়াবেন তখন!'

অবশ্য সে আশা সুদূরপরাহত।

হেমন্তর এমনি লেখাপড়া কিছু নয়—তবে এতকাল বহু শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে এসে এ বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান তার হয়েছে। লেখাপড়ার আসল চেহারাটা ধরতে কোন অসুবিধা হয় না। আর সেই জন্যেই তোড়জোর ক'রে লেখাপড়ার পর্ব শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে যে, ফল তেমন কিছুই হচ্ছে না, হবেও না কোনদিন। সে মনই আর ছেলেটার নেই। ওর তরফে এতদিন ছাত্রগিরিতে বিতৃষ্ণা ছিল—এবার হয়ত, সেটা বিলম্বিত করার জন্যে, একটা বিদ্বেষ দেখা দেবে এদের ওপরও।

আর, সেটা বোঝে বলেই মনে মনে একটা হিম-হতাশার ভাব অনুভব করে। হার মানার গ্লানি একটা। ভাগ্যের কাছে হার মানাটা এতদিনে অভ্যেস হয়ে গেছে, নিমাইচরণের কাছে যে হার মানতে হচ্ছে—ওর ব্যঙ্গ টিটকিরি খেয়ে চুপ ক'রে যেতে হচ্ছে, সেইটেই আরও অসহ্য।

তবু হাল ছাড়ে না। দু'বেলা পড়ার সময় ঘরের বাইরে মাদুর পেতে বসে থাকে—যাতে মাস্টারমশাইদের না বেশী বিরক্ত করতে পারে, অথবা তিনিও ফাঁকি না দেন, কিংবা সকাল ক'রে না পালিয়ে যান। ঐ ইস্কুলেরই শিক্ষক ওঁরা—ওঁদের কাছে প্রত্যহ খবর নেয়, ছাত্র কেমন পড়াশুনো করছে, ক্লাসে ঠিকমতো থাকে কিনা—

ইত্যাদি। হাতখরচা দেয় কিছু কিছু, তবে এমন দেয় না যাতে বেশী কোন বদ খেয়ালে খরচ করতে পারে। টিফিনের পয়সা বলেই দেয়, টিফিন ক'রে দিতে চেয়েছিল, ওর নাকি স্কুলের মধ্যে বসে বাড়ি-থেকে-নিয়ে-যাওয়া খাবার বার ক'রে খেতে লজ্জা হয়, ছেলেরা উত্যক্তও করে, তাই গোরা রাজী হয় নি—তবে এমন হিসেব ক'রে দেয় যাতে খাবার খেয়েও দু-একটা পয়সা বাঁচে, এক-আধটা সিগারেট খাওয়ার মতো।

অবশ্য তাতে ওর কুলোয় না, পয়সার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে—এটাও লক্ষ্য করেছে। এক-আধবার যেচে বাজার ক'রে দিতে চেয়েছে, হেমন্ত রাজী হয় নি। সোজাই বলেছে, 'ঝি বাজার থেকে চুরি করে তাতে একটা, পয়সার লোকসান শুধু—তোমাকে দিলে ডবল ক্ষতি, পয়সাকে পয়সাও যাবে, হয়ত বেশিই যাবে, তোমাকেও একটা চোর বানানো হবে, বেশী ক'রে নেশাভাঙ করতে শিখবে, আলটপ্‌কা-পাওয়া বাড়তি পয়সার নেশা চাপবে তার ওপর। সে হবে না। যেমন আছ তেমনি থাকো।'

পরীক্ষার ফল অবশ্য একেবারে খুব খারাপ হল না। হেমন্ত যতটা ভেবেছিল ততটা নয় অন্তত। অঙ্ক আর ইতিহাসে মাত্র ফেল করেছে, ইংরেজীটায় টায়ে-টায়ে পাস (পরে জেনেছিল, প্রাইভেট মাস্টারমশাই ধরণীবাবুই ঐটুকু ক'রে দিয়েছিলেন নিজের চাকরিটা রাখতে, নইলে নাকি দশ নম্বরও পাওয়ার কথা নয়)—তবে ওখানকার মতো শূন্য কোন বিষয়েই পায় নি। দু'টো বিষয়ে ফেল হওয়া সত্ত্বেও, সকল দিক বিবেচনা ক'রে হেডমাস্টার মশাই ক্লাসে উঠিয়ে দিলেন। এই ক'মাসেই যেটুকু উন্নতি করেছে সেইটেই যথেষ্ট, তাছাড়া আবারও এই থার্ড ক্লাসে ফেলে রাখলে একেবারেই মন ভেঙে যাবে, জীবনে আর লেখাপড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না—এই ভেবেই। সেটা হেমন্তর সঙ্গে দেখা ক'রে বুঝিয়ে বলেও গেলেন। পাস করেছে ভেবে উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নেই, হাল ছেড়ে দিলেও চলবে না। এখনকার মতোই কড়া-হাতে রাশ ধরে রাখতে হবে।

তবু রাশ বোধ হয় একটু আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল। হেমন্তর এই বয়সে সদা অতন্দ্র থাকা হয়ত সম্ভবও নয়—অথবা, শুধু লেখাপড়ার দিকটাতেই কড়া নজর রেখেছিল, ইস্কুলের দৈনন্দিন জীবনের দিকেই —অন্য দিকের কথা অত ভাবে নি। অত মনেও হয় নি। ঘরেই আছে, ওর চোখের সামনে—এই তো যথেষ্ট। নিজের সজাগ-সতর্কতা সম্বন্ধেও একটু গর্ব ছিল, এখানে ওর চোখ এড়িয়ে কিছু করতে পারবে না। আর, তাছাড়া, বদখেয়ালের কোন উপকরণ বা মানুষও তো বাড়িতে নেই।

ওদিকটা অত ভাবে নি বলেই সম্ভাবনার কথাটা মনে পড়ে নি।

নইলে—ওদের নতুন ঝি হরিমতী যে একটু বেশী আগ্রহের সঙ্গে গোরার ফাই-ফরমাশ খাটে—এটা লক্ষ্য করতে পারত। গোরাও ইদানীং একটু বেশী খুন্‌সুটি করে ওর সঙ্গে—অকারণে হুকুম করে, খাটায়, ক্ষেপায়। কথাবার্তায় একটা কৃত্রিম কলহের সুরও বাজে মাঝে-মাঝেই।

অর্থাৎ অনভিপ্রেত ঘনিষ্ঠতার আভাস—একটু নজর করলেই দেখতে পেত হেমন্ত। পাওয়া উচিত ছিল। বাইরের দিকে চোখ খোলা ছিল বলে ঘরের দিকে চাওয়া হয়ে ওঠে নি।

হরিমতী সবে বছরখানেক বহাল হয়েছে এ বাড়িতে। সে গোরাকে এর আগে ভাল ক'রে দেখে নি। বড়দিনের ছুটিতে গোরা বাড়ি আসে নি—তার আগে পূজোর ছুটি শেষ হবার মুখে হরিমতী এসেছে। এবারই প্রথম দেখল বলা চলে। মনিবের আদরের নাতি, তাকে যত্ন করাই উচিত। যত্নটা একটু বেশী ক'রেই করবে—মনিবকে দেখিয়ে—সেটাও স্বাভাবিক। হেমন্তও তাই ভেবেছিল।

অস্বাভাবিকও মনে হয় নি—অশোভনও না। হরিমতীর বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়। গোরার আঠারো। দেখতেও এমন কিছু ভালো নয় হরিমতী। রঙটা অবশ্য ফর্সা-ঘেঁষাই, যাকে মাজা রঙ বলে তার চেয়েও দু'পোঁচ উজ্জ্বল, গড়নটাও পুরন্ত—কিন্তু মুখখানা

লেপা-মোছা মতো, দেখলে বিরূপতা জাগে না হয়ত, তবে আকর্ষণও বোধ করার কথা নয়।

ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেছিল একজন—এবং ক'রে খুশীই হয়েছিল।

নিমাইচরণের লক্ষ্য করার কারণও ছিল, সে কারণ ঈর্ষার জ্বালা। দু'দিকেই। হরিমতীর এই সেবা ও মনোযোগ সে-ই পাবে এমনি একটা ইচ্ছা ও আশা হয়ত তারও ছিল। পেলে মন্দ লাগত না, এই কথাই ভেবেছে। যে পেল, পাচ্ছে—তার সম্বন্ধে তো আরও জ্বালা, কাকার সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের মতো ব্যবহার ক'রে তার মাথার ওপর ভাইপোকে তুলে ধরা, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে—সে-ই এ বাড়ির, এ বিপুল সম্পত্তির ভাবী মালিক; কাকা আশ্রিত চাকর-বাকর শ্রেণীর একজন বৈ বেশী কিছু নয়—এতটা নির্বিকারে সহ্য করা কঠিন।

তবু, এতটা বিষ জমে থাকা সত্ত্বেও, অথবা সেই জন্যেই—নিমাই-চরণ এর বিন্দু-বাষ্প আভাস দেয় নি কাউকে। হেমন্তকে সতর্ক ক'রে দেওয়ার কোন কথাই থাকে না। গোরা সম্বন্ধে নিমাইচরণের কোন সৎ-পরামর্শই সে নেয় নি, উল্‌টে কটূক্তি করেছে, মর্মান্তিক রূঢ় কথা শুনিয়েছে। সেক্ষেত্রে তার কাছে এ তথ্য জানানোর দায়িত্ব আর যারই হোক, ওর নয়। তা ভিন্ন, জানাতে গেলেও গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়ার অবস্থা হবে হয়ত।

কেউ আভাস পায় নি, পাত্র-পাত্রী দু'জনেও তাই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোঝে নি।

নিমাইকে এ পরিবারের একজনের মধ্যে, এমন কি মানুষের মধ্যে গণ্য করার কথা কখনও ভাবতে শেখানো হয় নি গোরকে—তাকে হিসেবের বাইরে ধরাটা তাই অভ্যাস, ক্রমে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ওর। তার কাছে নিজের আচরণ আবরিত রাখার কি সতর্ক হওয়ার কোন কারণ আছে, তা-ই গোরার মাথাতে যায় নি। সে যে দেখতে পায়, লক্ষ্য করে—এবং একদিন সে লক্ষ্য করার ফলাফল অন্যত্র পৌঁছে দিয়ে বিপদের কারণ ঘটাতে পারে—তা কোনদিন মনে হয় নি। সে সতর্ক হয় নি বলেই হরিমতীও হতে পারে নি।

প্রথম প্রথম কাকাবাবুর সামনে একটু হুঁশিয়ার হয়ে থাকার চেষ্টা করত—গোরাই সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিল। ওর তাচ্ছিল্য ও অবহেলা দেখে হরিমতীরও একটু একটু ক'রে ধারণা হল যে, নিমাইচরণ এ বাড়ির আসবাবগুলোর মতোই প্রাণহীন—দৃষ্টিহীন।

নিমাইচরণও সেই ভাবটাই বজায় রেখেছিল। বোধোদয়ের সেই পুত্তলিকার মতোই—'কর্ণ আছে শুনিতে পায় না, চক্ষু আছে দেখিতে পায় না।' মাস্টারমশাই চলে গেলে, হেমন্ত পুজোর ঘরে ঢুকেছে, কিংবা পুজো সেরে বেরিয়ে এসে হিসেবের কাগজপত্র নিয়ে বসেছে টের পেলে—নিমাই বাড়ি ফিরলে পাহারা শিথিল ক'রে নিজের কাজে উঠে যায় আজকাল—গৌর পা ছড়িয়ে পড়ার-মাদুরে শুয়ে পড়ে বলে, 'এই মতি, পা টিপে দিয়ে যা।'

(হরি উচ্চারণ করতে নেই বলে হেমন্ত শুধু মতী বা মতি বলে—সেই থেকেই সংক্ষিপ্ত নামটা প্রচলিত হয়েছে এ বাড়িতে।)

ফরমাশ করা মাত্র হরিমতী এসে পা টিপতে বসে। পা-হাত-কোমর—উরুও। অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে নিমাই দেখে হরিমতীর সাগ্রহ সেবা। মনের দাহ প্রাণপণ চেষ্টায় সংযত রাখে সে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সোপানের পরবর্তী ধাপে পৌঁছনোর।

তার বিলম্বও হয় না অবশ্য। আড়ালে-আব্‌ডালে, সিঁড়ির নিচের অন্ধকারে—একটির পর একটি ধাপ পার হতে থাকে ওরা—অতি সত্বর, আশাতিরিক্ত দ্রুতবেগে।

এর পর রাতও জাগতে হয় বৈকি। অনুমানের ওপরই সে কষ্ট করা। তবে অনুমান মিথ্যাও হয় না। দু-তিন দিন জেগে বসে থাকার পরই সে কষ্টের 'কেষ্ট' মেলে। গোরা নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারেই বেরিয়ে এসে সিঁড়ির কোণে—হরিমতীর শয্যার দিকে চলে যায়—দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে ঘুমোয় নিমাইচরণ, ক'দিন পরে।

পরের দিন ইচ্ছে ক'রেই আপিস কামাই করে সে। শরীর

খারাপের অজুহাতে বিছানায় পড়ে থাকে। বিশ্রামের একটু প্রয়োজনও ছিল, ক'দিনের অনিদ্রা ও উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার পর। তবে তাই বলে বেলা চারটে পর্যন্ত ঘুমোয় না। হেমন্ত আড়াইটে নাগাদ উঠে চিঠিপত্র লিখতে বসে—চিঠির কাজ তেমন না থাকলে খবরের কাগজ পড়ে—কাজের কথা পাড়ার সেই উৎকৃষ্ট অবসর।

হেমন্তর চা খাওয়ার সময় সেটা নয়। গৌর স্কুল থেকে ফিরলে চা-খাবার তৈরি হয়। সেই সময়ই খায় সে। নিমাইয়ের আপিস যাওয়ার দৌলতে দুপুরবেলা চা খাওয়ার অভ্যেস হয়েছে, সে উঠে কেরোসিনের স্টোভ জ্বেলে নিজেই কলাইয়ের একটা মগ-ভর্তি চা তৈরি ক'রে এনে জ্যাঠাইয়ের সামনে জেঁকে বসল।

এ বসার ধরন হেমন্ত চেনে। কোন কাজের কথা আছে নিশ্চয়, মানে নিমাইয়ের নিজের তরফে কোন কাজের কথা, হয়ত কোন প্রার্থনা আছে, সেই জন্যে আজ আপিস যায় নি—এতক্ষণে বুঝতে পারে। সেও বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে সময় নষ্ট করে না, মিনিট পাঁচেক পরে হাতের চিঠিটা লেখা শেষ ক'রে সোজাসুজিই বলে, 'তা কী বলবে বলে ফ্যালো! আমার বিস্তর কাজ হাতে।'

'বলবার আর কি আছে বলো? বললেই বা শুনছে কে? বলে—অন্ধ জাগো, না আমার কিবে রাত্তর কিবে দিন! চোখ বুজে যে থাকবে বলে ঠাউরেছে—তাকে কি কিছু দেখানো যায়?'

বলার রকমটা ভাল লাগে না। অন্যদিন হলে হেমন্ত ধমক দিত। কিন্তু নিমাইয়ের গলার জোরটা কানে বেজেছে। তার সঙ্গে কথা বলার সময় গলার এতটা জোর দেওয়া স্বাভাবিক নয়। অনেকখানি বুকের বল নিয়েই এসেছে নিশ্চয়ই।

সে মিনিটখানেক ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে। তার পর মৃদু বিরক্তির সুরে বলে, 'তোমার ও হেঁয়ালির মানে ভাবার আমার এখন সময় হবে না বাবা, যদি কাজের কথা কিছু থাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলো।'

'পষ্টাপষ্টি বললে কি শুনবে তুমি—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে? অনেক

আগেই বলতে পারতুম। বলা হয়ত উচিতও ছেল—কিন্তু সাহসে কুলোয় না যে !···· পেয়ারের পুষ্যি এঁড়ের সম্বন্ধে যত হিতকথাই বলি না—তোমার কানে বিপরীত শোনাবে, নাম উচ্চারণ করলেই হয়ত দশবাই চণ্ডী হয়ে নাচতে থাকবে ধেই ধেই ক'রে। তোমায় চিনি তো !'

অর্থাৎ সেই পুরনো ঈর্ষার জ্বালা।

বিরক্তি আরও বেড়ে যায়, কঠিন হয়ে ওঠে হেমন্তর কণ্ঠ।

'তার মানে? তোমার ভাইপো আবার নতুন কি করলে! তার নামে চুকলি খাবার জন্যেই আপিস কামাই ক'রে ঘরে বসে আছ বুঝি! তার আড়াল না হলে সুবিধা হচ্ছে না বলে? যদি কোন দোষ ক'রে থাকে তার মুখের সামনে বলতে পারো না?'

'সব দোষ কি সকলের মুখের সামনে বলা যায় মা-ঠাকরুন! সব দোষের কথা বলারও নয়—দেখাতে হয়। বলি অত গরম হয়ো না। কথা আমি একটিও বলব না, বলতে চাইও না। বললে ঢের দিন আগে বলতে পারতুন। তুমি কানা বলে তো আর আমি কানা নই! তোমাকে চিনি বলেই সে আহাম্মুকী করি নি। তবে এবার আর কিছু না করলেই নয়, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—এর পর আমাকেই হয়ত নাতির দোলনা কিনতে বাজারে ছুটতে হবে, কিংবা দুধের জন্য গাই খুঁজতে—সেই জন্যেই মুখ খোলা। তবে আজও বলব না কিছু, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোব। আর আমাকেই বা দেখাতে হবে কেন? আজ রাতটা একটু চোখ-কান খুলে মটকা মেরে পড়ে থেকো—যা দেখার নিজেই দেখতে পাবে। তোমরা তো বোষ্টম, কীর্তনে যা কিছু ভগবান করেন তা গৌরচন্দ্র করছেন বলে গান শুরু করে না? তা তোমারও ধরগে রাসলীলার গৌরচন্দ্রিকা দেখে চক্ষু সার্থক হয়ে যাবে···হরি বলো, হরি বলো!'

আর সেখানে বসে না নিমাই, বসতে সাহস হয় না।···

সাহস হয় না দু' কারণে। জ্যেঠাইয়ের মেজাজ সে চেনে, হয়ত এখনই বোমার মতো ফেটে উঠে তার মরা-বাপের মুখে ময়লা দেবে, চাইকি দু'টো লাথি কষিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়।

আরও একটা কারণ—হরিমতী তার কোন্ দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিছল, এখনই ফিরে এসেছে। নিচে দোর খোলার আওয়াজ পেয়েছে। ঘর থেকে চলে এসেও ঠাকুর-ঠাকুর করতে লাগল, যা চণ্ডাল রাগ বুড়ীর—ওর সামনেই না গাল-মন্দ দিয়ে সব ফাঁস ক'রে দেয়!

কিন্তু হেমন্তর তখন রাগারাগি বা চেঁচামেচি করার অবস্থা নয়। সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল ঐ ক'টা কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। সবটা বুঝতে পারে নি তখনই—তবু মূল ইঙ্গিতটাই যথেষ্ট।

এমন কোন আশা রাখে নি গৌরের ওপর—এতদিন নিজেকে বুঝিয়েছে—শুষ্ক কর্তব্য মাত্র ক'রে যাচ্ছে, এই কথাই ভেবেছে বা বা ভাবার চেষ্টা করেছে। আজ বুঝল—এতখানি হতাশার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। আশা না থাকলে আশাভঙ্গের এতটা আঘাত লাগা সম্ভব নয়। আসলে নিজেকেই নিজে মিথ্যে বুঝিয়েছে এতকাল।

কিন্তু পাথর হয়ে থাকলে চলবে না। হরিমতী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। সাধারণত এ সময় এ ঘরে আসে না। তবে একেবারে আসা অসম্ভবও নয়, কোন কাজ থাকলেই আসবে। 'রাসলীলা' শব্দটা বৃথা উচ্চারণ করে নি নিমাই, রাসলীলা কিছু একাও হয় না। সঙ্গিনী একটা থাকা দরকার। হেমন্ত ছাড়া স্ত্রীলোক বলতে তো ঐ এক হরিমতী বাড়িতে। ভাড়াটেদের ঘরেও তেমন কমবয়িসী ঝি-বৌ নেই, তাছাড়া তাদের সঙ্গে তেমন লেপচোও নেই। সুতরাং—কথাটা যতই অবিশ্বাস্য অসম্ভব মনে হোক—হরিমতীকে একেবারে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।...

মনোভাব দমনের শিক্ষা বহুকালের, বহু আঘাতে পোড়-খাওয়া—আজও সেই শিক্ষাই কাজে লাগল। খানিকটা পরে হরিমতী যখন এ ঘরে এল তখন হেমন্তর কথায়, গলার আওয়াজে বা মুখভাবে কোন বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ পেল না। গৌরের ইস্কুলের কথা, পড়ার কথা জিজ্ঞেস করল। ওর এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে

নিমাই পর্যন্ত আড়ালে হাত তুলে নমস্কার করল। হাজার চেষ্টা করলেও তার দ্বারা—তাদের দ্বারা মনকে এতটা শাসন করা সম্ভব হবে না।

রাত্রে যখন ধরণীবাবু পড়িয়ে চলে গেলেন, তখন অন্য দিনের মতোই হেমন্ত কাগজপত্র নিয়ে বসেছে। উঁকি মেরে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েই পা টিপতে গেল হরিমতী। কিন্তু চোখ মেলে রাখা সম্ভব না হোক—কানটা এদিকে খাড়া ছিল, এই পদসেবার পর্বটা জানতে অসুবিধে হল না। ও এই প্রথম জানল ব্যাপারটা—হয়ত প্রতিদিনই এই কাণ্ড হয়। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরই গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছে করল ওর।··নির্বুদ্ধিতা নিমাইকে অকারণে—বিচার না ক'রে—রূঢ় কথা বলা, তাকে বিদ্বিষ্ট ক'রে রাখা, নইলে অনেক আগেই সে সতর্ক ক'রে দিতে পারত। আসলে সে গৌরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এটা ধরে না নিয়ে তার পরামর্শই শোনা উচিত ছিল—পড়ানোর চেষ্টা আর না ক'রে চাকরীর ব্যবস্থা করা। দেহে ও মনে যে সম্পূর্ণ সাবালক হয়ে গেছে—তাকে অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে পড়তে দেওয়াটাই বিরাট ভুল হয়ে গেছে।

ভুল হয়েছে অনেক, অনেক দিক দিয়ে। স্কুলের দিকেই সমস্ত নজরটা রাখতে গিয়েছিল। দিনকাল খারাপ—স্কুলের ছেলেরাও আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনে মেতে উঠেছে—ইংরেজের কোপে পড়ে মার খাচ্ছে, জেল খাটছে। পূর্ণবাবুর এক দৌহিত্র মার খেয়ে চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে। ঠিক এ সময়টায় সোজাসুজি আন্দোলন না হলেও এদিকে-ওদিকে হচ্ছে বৈকি। লুকিয়ে লুকিয়ে নাকি বোমাও তৈরী করছে কেউ কেউ—কলেজের ছেলেরাই বেশির ভাগ, তার মধ্যে স্কুলের ছাত্রদেরও টানছে। ধরা পড়লে ফাঁসি অনিবার্য। অত বড় ছেলে দেখে গৌরকেও যদি ঐ সর্বনেশেগুলো দলে টানে! ও যা বোকা, হয়ত এখনি যেতে বললে ছুটে যাবে।

সেজন্যেই আরও বাড়ি ফিরলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্কুলের কথা, বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করত। ইদানীং খেলতে যাওয়া বন্ধ করেছিল

গৌর—হেমন্তরই আপত্তি, গৌর তা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করে নি—সেটাকে সুবুদ্ধির পরিচয় ভেবে আরও বরং নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বাইরের প্রতি ঔদাসীন্যের মধ্যে যে গৃহের প্রতি টানটা বড় কথা—তা মনে হয় নি একবারও। বিপদের মূলটা যেখানে, যেখান দিয়ে সত্যকারের সর্বনাশ ওর আসার কথা, সেখানকার কথাই চিন্তা করে নি কখনও—ওদের বংশের ধারা!

. আঠারো বছরের ছেলে আর ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েছেলে—এই হিসেবটা মেলাতে পারে নি বলেই এদিকটাতে চোখ পড়ে নি। আজ মিলল। ওদের রক্তেই সে হিসেব লেখা আছে। সেইটে ভেবে দেখা উচিত ছিল।

এই নিমাইয়ের মুখেই বহু গল্প শুনেছে সে। বিষ্ণুচরণ তার ছেলেমেয়ের ঘরে আড়ি পাতত, জানলার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারেই দেখার চেষ্টা করত তাদের বিছানাটা। নইলে নাকি তার নিজের অসুবিধে হত। শিবচরণের ভয়ে কোন ঝি ওদের গোয়াল কাড়তে কি বাসন মাজতে রাজী হত না, সে নাকি পাগল হয়ে উঠেছিল এই ব্যাপারে। স্ত্রীর হাতে সত্যি সত্যি ঝাঁটা খেয়েও তার রোগ সারে নি। এমনি নানা বিচিত্র ও বীভৎস বিবরণ। হেমন্ত ধমক দিয়েছে, কাহিনীর সূচনাতেই থামিয়ে দিয়েছে—অনেক সময়। তবু, যতটা কানে গেছে তাই যথেষ্ট।

এর পর সে বংশের ছেলের কাছে কি আশা করবে সে?

॥ ১৮ ॥

রাত্রে স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেল হেমন্ত, কিন্তু ঘুমোল না। ঘুমের ভান ক'রে পড়ে রইল—নিমাইয়ের পরামর্শমতো। আজ নিমাইয়ের কথা উপেক্ষা করার সাহস নেই তার—কথাটা মনে পড়ে এই দুঃখের মধ্যেও হাসি পেতে লাগল। একেই কি ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে—অদৃষ্টের পরিহাস?

অবশ্য এজন্যে খুব কষ্টও করতে হল না। ঘুম তার চোখের ধারে-কাছেও নেই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে সেই বিকেল থেকে। তার মধ্যে অপমানের জ্বালাটাই প্রধান। নিমাইয়ের কাছে অপমান, ঐ ঝিটার কাছেও। তাকে ঠকাচ্ছে এতদিন ধরে, সেই চিন্তাটাই যেন অসহ্য।

না, ঘুমের জন্যে কোন চিন্তা নেই। কেবল একটা ভয় ছিল—ইদানীং নাকি মধ্যে মধ্যে নাক ডাকে তার। এদের মুখেই শুনেছে—নিমাই-গোয়াদের মুখেই—সে শব্দ না পেয়ে গৌর না সন্দেহ করে, সাবধান না হয়ে যায়। তবে মধ্যে মধ্যে ডাকে—সব সময় নয়, এই একটা রক্ষা। আর যদি নিমাইয়ের ইঙ্গিত সবটাই সত্য হয়, তরুণ বয়সের প্রথম কামোন্মত্ততা, অত সতর্ক হওয়ার, হিসেব করার, অত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার কথা নয়।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলও না। রাত বারোটা নাগাদ ওদিকে নিজের বিছানায় উঠে বসল গৌর। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল—সম্ভবত এদিকে তাকিয়ে। তারপর, হেমন্তকে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে বুঝে বিছানা থেকে নেমে এসে দরজার কাছেও দাঁড়াল অল্পক্ষণ—বোধহয় এদিকে কোন প্রতিক্রিয়া জাগে কিনা দেখার জন্যেই—তারপর সন্তর্পণে দোর খুলে বেরিয়ে গেল, কপাটটা আবার সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে।

দরজার বাঁদিকের কপাটটায় অনেকদিন ধরেই বন্ধ করার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছিল একটা—আজ দেখল বিনা শব্দেই বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবত এর ভেতর কেউ তেল দিয়ে মসৃণ ক'রে রেখেছে—হেমন্তই অত লক্ষ্য করে নি।

একটা ভয় ছিল, বাইরে থেকে না শেকল দিয়ে যায়। হাওয়ার বেগে দড়াম ক'রে কপাট পড়লে সে শব্দে ঘুম ভেঙে যাবে—এই ভেবে বন্ধ ক'রে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষ গৌর জানেই—হেমন্ত রাত সাড়ে-দশটা নাগাদ যে শোয় একেবারে সাড়ে তিনটে-চারটেয় উঠে পড়ে, মধ্যে ওঠা কি কলঘরে যাওয়ার অভ্যাস নেই তার।

তবে ভয় যেমন ছিল, ভরসাও ছিল, শুধু সে-ই জেগে নেই, ওদিকে নিমাইচরণও জেগে আছে নিশ্চয়। দরজা বন্ধ করলে খোলার লোকের অভাব হবে না।

কিন্তু হাওয়ার তেমন জোর নেই বলেই সে-কথাটা বোধহয় মনে পড়ল না গৌরের, অথবা তাড়া বেশী ছিল। সে-অধীরতার মধ্যে এত কথা মনে পড়া, এত হিসেব করা সম্ভব নয়।...

গৌর বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসল হেমন্ত, তবু তখনই নড়তে পারল না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা ওর, অবর্ণনীয় মনোভাব। কী দেখবে তা কতকটা জানে, অনুমান করতে পারছে। অনুমান যে সত্য হবে তাও নিজের মনেই বুঝছে। কিন্তু সেইজন্যেই যেন এই আড়ষ্টতা, একটা অপরাধবোধের সঙ্কোচ। সে অপরাধী নয়—বিচারক, তবু তারই যেন লজ্জার অবধি নেই। লজ্জা আর ভয়। হ্যাঁ, ভয়ই বেশী বরং। এতদিনের আশা, এতদিনের স্নেহ ও আত্মীয়তার মৃত্যু ঘটবে—তবে তার জন্যেও ঠিক নয়। এ ভয়টা লজ্জারই। কি দেখবে সেই ভয়। যে অন্যায় করছে তার হয়ত লজ্জা নেই—ওর হাত-পা অনড় হয়ে যাচ্ছে সেই লজ্জাকর পরিস্থিতিটা কল্পনা ক'রে। আশঙ্কা সেই লজ্জাটা ভোগ করতে হবে ভেবেই। বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে তার, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

একবার মনে হল কাজ নেই। এমনিই কাল দূর ক'রে দেবে বাড়ি থেকে—কোন কারণ না দেখিয়েই। এমন তো কোন লেখা-পড়া নেই যে, পুষতেই হবে। দয়ার দান—না দিলে নালিশ-মকদ্দমা নেই। কোন কৈফিয়ৎই চাইতে পারবে না কেউ। মিছি-মিছি তার জন্যে এই কদর্যতা, এই ইতরতার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই।...

কিন্তু শেষ অবধি মনকে শক্ত করল। অবিচার কারুর ওপরই করবে না। চোখে না দেখা পর্যন্ত এটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়।

অকারণ লজ্জার দুর্বলতা ও জড়তা কাটিয়ে আস্তে আস্তে সেও

নেমে এল খাট থেকে। এর শেষ নিজেই দেখবে সে, নিজের চোখে দেখে এ-পর্বে ছেদ টানবে। নিজের হাতে আশার এই ক্ষীণতম মূলটুকুও ঘুচিয়ে দেবে।

এবং—আর অপেক্ষাও করা চলবে না, অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

গৌরের মতোই নিঃশব্দে কপাট খুলে অন্ধকারে বেরিয়ে এল হেমন্ত। কোথায় যেতে হবে তা তো জানাই—সিঁড়ির পাশের ঐ খাঁজমতো জায়গাটা—ঝি যেখানে শোয়।

একবার পিছন ফিরে দেখল, ওদিকের ঘরের জানলায় একটা সূক্ষ্ম অগ্নিবিন্দু, একবার ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আবার স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। তার হিসেবই ঠিক, নিমাইও জেগে আছে, দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

খালি পায়ে যাওয়া—পায়ের শব্দ অবশ্যই তেমন হল না—তবু, সতর্ক থাকলে, এদিকে খেয়াল থাকলে টের পেত বৈকি! নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতায় এটুকু শব্দও কানে যাবার কথা, বিশেষ যারা মেঝেতেই শুয়ে আছে।···রাস্তার গ্যাসের আলো পিছনের তেতলা বাড়ির দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আলোর যে একটা আব্ছা আভা সৃষ্টি করেছে, তাতেও ছায়ামূর্তির আগমন লক্ষ্য করা চলত। আরও —সিঁড়ির নিচের দিকের জানলা দিয়ে সোজাসুজিই একফালি রাস্তার আলো উর্ধ্বমুখে এসে পড়েছে এদিকের দেওয়ালে—সেখানে কেউ এলে তো ছায়াটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু যে-দু'টি মানুষ দেখবে কি লক্ষ্য করবে, তারা নিজেদের নিয়েই মশগুল। দৈহিক আনন্দের উগ্রতায় অবৈধ সংসর্গের নেশায় আচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত। একজন তো বালক মাত্র, তার এ-অভিজ্ঞতা এই প্রথম, সে উন্মত্ত হয়ে উঠবে এও স্বাভাবিক। আর একজনের আশার অতিরিক্ত পাওনা। এসব দিকে নজর রাখার মতো অবস্থা তাদের কারও নয়।

তাছাড়া এরকম কোন আশঙ্কাও করে নি তারা। এ-ব্যাপার ক'দিন ধরেই চলছে, তাতে সাহস বেড়েও গেছে খানিকটা।

তাও একটু অসুবিধা হত হয়ত—আলোর জন্যে। মাসখানেক আগে হলেও হত। এই মাত্র কুড়ি-পঁচিশ দিন আগেই ইলেক্‌ট্রিক এসেছে এ-বাড়িতে। এর জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে হেমন্তকে। গলির মোড় থেকে এ পর্যন্ত তিনটে খুঁটি বসানোর বাড়তি টাকা ওকেই দিতে হয়েছে। তবে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—আশপাশের বাড়িতে যেমন যেমন কনেকশ্যন নিতে থাকবে, তেমনি তেমনি কিছু কিছু টাকা ফেরৎ পেতে থাকবে হেমন্ত।

ঠিক এখানটায় কোন আলোর ব্যবস্থা নেই—কিন্তু বারান্দায় আছে। এমনভাবেই বসানো হয়েছে সেখানে যে, সে আলো জ্বললে এই খাঁজটায় পুরো,—সেই সঙ্গে সিঁড়ির মুখটা পর্যন্ত আলো এসে পড়বে।

সেই আলোর সুইচটা টিপতেই ওরা টের পেলে, হেমন্ত জেগেছে ও জেনেছে—এবং একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তখন আর গোপন করার কি সামলে নেওয়ার কোন উপায় নেই। মিথ্যা কোন কাহিনী বয়ন করারও না। একেবারেই হাতে-নাতে ধরা পড়া যাকে বলে।

কোনরকম সামলে নেবার কি পালাবার সময়ও দিল না হেমন্ত। অনেকদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে একটা সরু লিকলিকে বেতের ছড়ি কে এনে দিয়েছিল পূর্ণবাবুকে, ভারী বাহারে ছড়ি, ঐটুকুর মধ্যেই নানারকম কাজ-করা। সেটা হেমন্তকে দেখাতে এনে এখানেই রেখে গিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত সেটা কোন কাজে লাগে নি, আলনার খাঁজে ঝোলানো থাকে শুধু। দৈবাৎই বেরোবার সময় সেটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, হাতে ক'রে নিয়ে বেরিয়েছিল হেমন্ত। গৌর চমকে, ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করার আগেই সেই বেত এসে পড়ল তার পিঠে।

তারপর সপাং সপাং বেতের বৃষ্টি হতে লাগল যেন। হরিমতী কোনমতে কাপড়টা টেনে জড়াতে জড়াতে গুড়ি মেরে পায়ের পাশ

দিয়ে গলে নেমে গিয়েছিল। তার দিকে লক্ষ্যও ছিল না হেমন্তর। তার সম্বন্ধে অত ক্ষোভ নেই, সে যা—যে-ঘরের মেয়েছেলে—সেই ঘরের মতোই কাজ করেছে। তার প্রবৃত্তির দোষ দেওয়া যায় না। কারও সাধ্যের অতীত কোন ভোগ্যবস্তু হাতের কাছে যেচে এলে সে হাত সরিয়ে নেবে—এতটা আশা করা উচিত নয়। সে সংযমের শিক্ষা পারিবারিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে। আসল অপরাধী গৌর। দিক্‌দাহকারী প্রচণ্ড রোষ তার সম্বন্ধেই—সেই সঙ্গে একটা গা ঘিন্‌-ঘিন্‌-করা গ্লানি। ভদ্রলোকের ছেলে, ব্রাহ্মণের ছেলে—অন্তত: ভদ্রলোকের ছেলের মতোই মানুষ হয়েছে যে বাল্যকাল থেকে—তার ওপর এখনও ছাত্র, শিক্ষার্থী—তার এ অপরাধ অমার্জনীয়।

উপর্যুপরি বেত এসে পড়ার মধ্যেই গৌর উঠে দাঁড়িয়েছিল কোনমতে, কিন্তু কাপড়টা গুছিয়ে পরার কি পালাবার অবকাশ পেল না। অবিরল ধারে বেতের বর্ষণ চলতে লাগল ওর সেই প্রায়-উলঙ্গ দেহে—সূক্ষ্ম পাকা বেত চামড়ায় কেটে কেটে বসতে লাগল, দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল ওর সর্বাঙ্গে—কোথাও কোথাও, একাধিকবার একই জায়গায় পড়ার ফলে চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

প্রথমটা চুপ ক'রেই ছিল গৌর—শেষে আর পারল না, চিৎকার করতে লাগল, 'ওগো আর মেরো না গো, ওগো আর করব না গো, ও মাগো, মরে গেলুম গো!' ইত্যাদি—। পাগলের মতো চিৎকার ক'রে যাচ্ছে সে—কী বলছে তাও কোন হুঁশ নেই—কিন্তু যে মারছে তার কানে যেন কিছু ঢুকছে না। সেও যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—একটা আর্তনাদের শব্দ কানে যাচ্ছে মাত্র—তার মর্মার্থ মাথায় পৌঁচচ্ছে না।

বেগতিক দেখে নিমাইচরণই ছুটে এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে এদিকে সরিয়ে নিয়ে এল জ্যাঠাইকে।

'কী হচ্ছে কি! তুমিও কি জ্ঞান হারালে নাকি? ষাঁড়ের মতো চিচ্‌কার করতে লেগেছে—এখুনি পাড়ার লোক ছুটে আসবে

যে, একটা খুনখারাবি হচ্ছে ভেবে! এই নিষুতি রাতে হুপুরে-মাতন শুরু হয়ে গেল যেন!…তারপর? ঐ শোন জানলা-দরজা খোলার আওয়াজ চারদিকে। কী কৈফেৎ দেবে জানতে এলে?…লাও। ঢের হয়েছে, চলে এসো এখন। সাজাটাজা যা দিতে হয় কাল সকালে তখন দিও, মাথা ঠাণ্ডা হলে। আর মারলে ছেলেটা মরেও যাবে যে! হাতে দড়ি পড়ার কাণ্ড করবে নাকি! ভ্যালা রে ভ্যালা!…ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। নাই দিলে কুকুর মাথায় উঠবে এ তো জানা কথাই—ত্যাখন দোষটা হয় কুকুরের, তাকে তখন আছড়ে মেরে ফেল্!…তা সেই কাণ্ড তোমার। আমরা কুকুরের জাত জানো না। কী বংশে এসে পড়েছেলে!'

চাপা গলায় ধমক দিল সে।

সামলে নেওয়া শক্ত খুবই। তখনও অপমান ও আশাভঙ্গের দাহ কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি। অব্যয়িত প্রচণ্ড ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপছে থরথর ক'রে, বহুক্ষণের রুদ্ধ বিলম্বিত নিঃশ্বাসের বেগে ও উত্তেজনায় বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। ওকে সত্যিই খুন করতে পারলে হয়ত এ-জ্বালার কিছুটা শান্তি হত।

তৎসত্ত্বেও—নিমাইয়ের কথাগুলোর যাথার্থ্য না বোঝার মতো জ্ঞান হারায় নি। এ-কেলেঙ্কারী জানাজানি হলে কাল আর পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না। সে প্রাণপণ চেষ্টাতেই নিজেকে সামলে নিল কতকটা। আগে যেমন অনায়াসে উত্তেজনা আবেগ আবরিত করতে পারত, এখন আর পারে না। তাতেও কষ্ট হয় খুব, বুকে যেন লাগে। এতক্ষণের উন্মত্ত ক্রোধ ও তাকে সংযত করার আকস্মিক চেষ্টা—হু'টোর প্রতিক্রিয়ায় কিছুক্ষণের জন্য মনে হল ওরই হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে। হু'চোখের সামনে কয়েক মুহূর্ত যেন সব অন্ধকার হয়ে গেল। কোনমতে বারান্দার রেলিংটা চেপে ধরে সামলে নিল কতকটা। তারপর বেতটা ফেলে দিয়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'ওকে ঐ ঘরে চলে যেতে বল্ নিমাই, আর একটুও আওয়াজ যেন না শুনি!'

আঙুল দিয়ে যে-ঘর দেখিয়ে দিল, সেটা গৌরেরই পড়বার ঘর, প্রয়োজন মতো বাইরের ঘর হিসেবেও ব্যবহার হয়। সেখানে শোওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, খানচারেক চেয়ার আছে শুধু, একটা টেবিল, আর মেঝেয় বসে পড়বার জন্যে মাদুর একখানা।... তা হোক, গৌর তখন ওর সামনে থেকে সরে যেখানে হোক পালাতে পারলে বাঁচে। সেও ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে কান্নাটা সামলে নিল। সমস্ত গা ঘামে-রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে, তারই মধ্যে কাপড়টা জড়িয়ে পরতে পরতে পাশ কাটিয়ে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। হেমন্ত নিজের হাতে দরজা বন্ধ ক'রে শেকল লাগিয়ে দিলে বাইরে থেকে ; কঠিন কণ্ঠে সাবধান ক'রে দিলে নিমাইকে, 'কেউ যেন না আদিখ্যেতা ক'রে দরজা খুলে দিতে যায়!···মরুক ও, ঐ ঘরে না খেতে পেয়ে। ওর বাঁচার কোন দরকার নেই, এ কালামুখ নিয়ে!'···

তারপর নিমাইকে নিচের সদর দরজাটা দেখে, খোলা থাকলে বন্ধ ক'রে আসতে বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তখন আর একটুও দাড়াবার সামর্থ্য নেই, বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে, মাথা ঘুরছে—সেখানেও যেন কিসের একটা প্রবল শব্দ হচ্ছে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে। ওর মনে হল এটা সন্ন্যাস রোগের সূচনা—কিংবা, এখনই হয়ত হার্টফেল করবে। তা করুক, মরতে কিছুমাত্র দুঃখ নেই—তবে ঐ অমানুষ বেইমানের ঝাড়ের জন্যে এ-দুর্গতি হবে—সেইটেই লজ্জার কথা।

·

সে-রাত্রে কারুরই ঘুম হল না। হওয়া সম্ভব নয়। নিমাই রাত চারটেয় উঠে বাড়ির ধোওয়ামোছা শেষ ক'রে বাসনের গোছা নিয়ে মাজতে বসে গেল। হরিমতী সেই রাত্রে তখনই পালিয়েছে—প্রায় একবস্ত্রে। উঠোনে যে কাপড়টা আর সেমিজটা শুকোচ্ছিল, তাছাড়া আর কিছুই নিয়ে যেতে পারে নি। ভয়ে দিশেহারা হয়ে বেরিয়ে গেছে, ঐ বেত তার পিঠে পড়লে সে আর বাঁচবে না, জীবন থাকলে জিনিসের কথা ভাবার ঢের সময় পাবে—এই বোধহয় তার

মনের ভাব তখন। সে যে এক মুহূর্তও আর এ-বাড়ি থাকবে না তা হেমন্তও বুঝেছিল, সেইজন্যেই দরজাটা দেখে বন্ধ করতে বলেছিল নিমাইকে।

ঘুম না হোক—ঘণ্টাচারেক চুপ ক'রে শুয়ে থেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করল হেমন্ত। সেও ভোরে উঠে স্নান সেরে রান্না চড়াতে যাচ্ছিল, নিমাই বারণ করল। বলল, 'অত তাড়ার কিছু নেই, আমি আজও আপিস যাচ্ছি না।···সিক-রিপোর্ট যখন ঝাড়তেই হবে তখন যাঁহা একদিন তাঁহা দু'দিন। তুমি পুজো-আচ্ছারা ক'রে নাও, চা-টা খাও—আমি এর ভেতর বাজারটা সেরে আসি। আর দেখি আমাদের সেই পুরনো মতির মাকে পাওয়া যায় যদি: সেদিন তার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে ছেল, শুনলুম দেশ থেকে বেশ সেরেসুরে এয়েছে। নেবুতলায় বাজারের পেছন দিকে থাকত তো—দেখি যদি খুঁজে বার করতে পারি!'

সকাল থেকে গৌরের প্রসঙ্গ কেউই তোলে নি। কিন্তু পুজো সেরে উঠে চা তৈরী ক'রে অন্যদিনের মতো রান্নাঘরের সামনের বারান্দাতেই যখন খেতে বসল—পড়ার ঘর থেকে যাতে সোজা নজর চলে—তখন আর নিমাই থাকতে পারল না। একটু উশখুশ ক'রে একবার একটু কেশে নিয়ে বললে, 'তা—ও-ছোঁড়াটাকেও—মানে, দোরটা তো একবার খুলে দেওয়া দরকার!'

হেমন্ত চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে শুধু বলল, 'না।'

সারারাত কেঁদেছে ছেলেটা, কান্না নয়—গোঙানি বলাই উচিত, মায়ের অবস্থা দেখেই যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পেরেছে নিমাই, তাতেই নরম হয়ে এসেছিল সে, তার ওপর তাকে একবিন্দু জলও না দিয়ে তার সামনেই বসে চা-খাবার খাওয়া—ও-ঘরে জলের কোন ব্যবস্থা নেই—এটা বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হল ওর। সে আরও একটু ইতস্তত: ক'রে মাথা-টাথা চুলকে বলল, 'ওর নাম কি—মানে, না, খেতে না দাও, বাইরের কাজকম্মগুলো তো আছে, সকালের

ব্যাপার! শেষে ঘরদোর নোংরা করলে সেই তোমাকেই তো মোক্ত করতে হবে—'

'হোক। সেজন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না বাবা, সে আমি বুঝব। ওকে উপোসী রেখে তোমার খেতে যদি বাধে— সটান উঠে চলে যাও, কিচ্ছু বলব না। খাবার তুমি খেলেও যা, নষ্ট হলেও তাই। খরচ যা হবার তা হয়েই গেছে, তুমি খেলে সে পয়সাটা কিছু ফিরবে না।···সে তোমার খুশি, তবে ওর হয়ে সুপারিশ করতে এসো না—পরিষ্কার বলে দিচ্ছি!'

এর ওপর কথা বলতে যাবে, নিমাইয়ের একটা ঘাড়ে কিছু এমন দশটা মাথা নেই। অগত্যা নিঃশব্দে নিজের চা-টুকু শেষ ক'রে উঠে ঝিয়ের সন্ধানে চলে গেল।

গৌর ঠিক এতটা আশঙ্কা করে নি। সমস্ত গা তার বিষফোড়ার মতো টাটিয়ে আছে, শোবার উপকরণ বলতে তো একমাত্র মাদুর— তাতেই শোবার চেষ্টা করেছে কয়েকবার, পারে নি, এত ব্যথা সর্বাঙ্গে। কাটা জায়গাগুলোয় রক্ত জমাট বেঁধে এসেছে, তবু এখনও ঘাম লাগলেই জ্বালা করছে। আর ঘাম হয়েই যাচ্ছে। এ-ঘরে একটি মাত্র জানলা ভেতরের দিকে, দরজাটা খোলা থাকলে তবু একটু হাওয়া খেলে—এখন গুমোট হয়ে আছে এই প্রথম বসন্তের দিনেও। তাতেই আরও এত যন্ত্রণা। বার বার কোঁচার কাপড়ে মুছছে, কিন্তু সামনের দিকটায় থুপে থুপে মোছা যায়, পিঠে তা চলে না। জল মোছার মতো ক'রে কাপড় টানতে গেলে আরও জ্বালা ক'রে উঠছে সেই ঘষটানিতে। কাপড়খানাও রক্তে ঘামে ভিজে উঠেছে প্রায়। গায়ে যদি গেঞ্জিটাও থাকত তো এত লাগত না। খালি গায়ে শুতে যায়, সেইভাবেই উঠে এসেছে, গেঞ্জি গায়ে দেবার কথা মনে হয় নি।

তার ওপর কষ্ট তেষ্টার। গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। কান্নাতে যন্ত্রণাতে আরও বেশী তেষ্টা পায়। একটু জল দেবার কথাও কারও মনে পড়ল না। কাকা আবার ঐ ডাইনী-

বুড়ির হুকুম নিতে গেল। কেন, এত যদি টান—বুড়ি যখন শুয়ে ছিল দরজাটা খুলে এক গেলাস জল দিয়ে যেতে পারে নি! কে জানে কাকাটাও হয়ত ঐ দলে আছে! ও-ই হয়ত গিয়ে লাগিয়েছে বুড়িকে। নইলে এতদিন পরে টেরই বা পেল কি করে! মহা শয়তান ঐ কাকাটা, চোরকে বলে চুরি করতে গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে। এখন আবার দরদ দেখাতে এসেছে!

ছোট প্রাকৃতিক কাজটা সে ঘরেই সেরেছে একবার—জল নেই পেটে বলে এখনও আর সে চেষ্টা হয় নি। অন্য যা—তা হবেও না এখন এ-অবস্থায়। সেদিকে কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু একটু জল না পেলে বা এর চেয়ে অন্তত একটু নরম বিছানায় শুতে না পারলে মরে যাবে যে। ঠায় এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় কাঁহাতক। ভাল ক'রে বসতেও যে পারছে না।

চা খেতে না দিলেও—আশা ছিল দুপুর নাগাদ ছেড়ে দেবে, নিদেন একটু জলও দিয়ে যাবে। কিন্তু কাকা বাইরে থেকে ঘুরে এসে ঝিয়ের খবর দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল—এতক্ষণে নিশ্চয়ই আরাম ক'রে বিড়ি ধরিয়েছে একটা—ঠাকুমাও দেখল দিব্যি এদিকের রান্না শেষ ক'রে ভাত চাপিয়ে ঘরে গিয়ে খবরের কাগজ খুলে বসল, বেশ যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন, যেন কোথাও কিছু ঘটে নি, যেন একটা লোক চোরের মার খেয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে টাঙ্গিয়ে নেই কাল রাত থেকে!

এইবার সে ক্ষেপে উঠল যেন। প্রথমটা একটু অস্ফুট স্বরেই কী সব গজগজ করল, তার মধ্যে 'আক্কেল' 'বিবেচনা' প্রভৃতি শব্দগুলোই শুধু এ-ঘর থেকে শোনা গেল, তারপর—তাতেও এদিক থেকে কোন সাড়া না আসতে সোজাসুজি গলা চড়িয়ে দিল, 'তাই বা কেন, ও আমার কে যে, ওর শাসন মানতে হবে! কিসের এমন সম্পর্ক আমার! সত্যিকারের কেউ তো নয়! বাপের জ্যাঠাই, ভারী রে! মাসীর মার কুটুম! তাও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল! কেলেঙ্কারী জানতে আমার

বাকী আছে নাকি! বেশী ওস্তাদি করতে এলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দোব আমি—তা বলে দিচ্ছি! আমাকে চেনে না!…উঃ! ভারী আমার আপনার লোক এলেন শাসন করতে! কিসের জন্যে এমন চোরের মার মারবে শুনি!…বেশ করেছি, খুব করেছি। আলবাৎ করব, যা খুশি আমার করব। ওকে মানি না। কী করবে আমার? আবার মারবে? আসুক না, এবার মারতে এলে আমিও আছি!… বন্ধ ক'রে রাখবে? এখনও চুপ ক'রে আছি তাই—এরপর এমন চেঁচাব যে, পাড়ার লোককে ছুটে আসতে হবে, তখন হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব। বলব, আমাকে খুন করতে চেয়েছিল কাকাতে আর ঐ ডাইনীমাগীতে মিলে—আমার বিষয়ের লোভে।…হুঁ—এই বলে দিচ্ছি সাফ্!'

স্তম্ভিত হয়ে যায় হেমন্ত। জীবনে বহু অকৃতজ্ঞতা সে দেখেছে—জীবনভোরই মানুষের পশুত্ব দেখে আসছে সে, নানাদিক দিয়েই—তবু এখনও যে দেখার বাকী ছিল তা ভাবে নি। এ ঐ বংশেরই ছেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হেমন্তর শাশুড়ির ও ভাশুরদের চেহারাই যেন আর একবার দেখতে পেল এর মধ্যে। মনে হচ্ছে তাদেরই প্রেতাত্মাগুলো মিলেমিশে এক হয়ে এই দেহটার মধ্যে ঢুকেছে। নইলে আঠারো বছরের ছেলের মুখ দিয়ে—এই কাণ্ড ধরা পড়ার পরও—এসব কথা বেরোয় না।

নির্বাক হয়ে গেল নিমাইও। সে যখন দরজা খুলে দেওয়ার সুপারিশ করতে গিছল তখন বালক ভেবেই দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল যথেষ্ট ভয় পেয়েছে, কাজও হয়েছে ঢের—ছেলেমানুষকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এসব কী শুনছে সে, সেই ছেলেমানুষটার মুখ দিয়েই কি বেরুচ্ছে এই কথাগুলো?

সে খানিকটা বোকার মতো চুপ ক'রে বসে থাকার পর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ওকেই শাসন করবে কি হেমন্তকে বলবে দরজা খুলে এই দণ্ডে ওকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে— কিছুই ভেবে পাচ্ছে না যেন, কিছুই মাথায় আসছে না। ছেলেটা ঐ ধরনের কুৎসিত

কথা বলেই যাচ্ছে। একবার ভাবল ধমক দিয়ে ওঠে—'এই চুপ কর্, কী হচ্ছে কি?' সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল—তাকেই হয়ত যা-তা বলে উঠবে এখনই। দাঁড়িয়েই রইল সে তেমনি—কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ভাবে, হাতে যে বিড়িটা ধরা আছে, আর জ্যাঠাইয়ের যে তা দেখতেও কোন অসুবিধে নেই—সে কথাটাও খেয়াল রইল না।

তবে ওকে দেখে বোধহয় হেমন্তর জড়বৎ অবস্থা কিছুটা কাটল।

একটা অপরিমাণ ঘেন্না গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে উপচে পড়ছে যেন। ঘেন্না নিজের ওপরও কম নয়, হয়ত বেশিই। ওই বংশের ছেলেকে সে মানুষ করতে চেয়েছিল! অপরাধ করেছে ভেবে শাস্তি দিতে গিয়েছিল! কাকে শাস্তি দেবে, রাগ করছে কার ওপর? ছাগলের কাজ ছাগল করেছে—তার ওপর আবার রাগ করার কি আছে; শাস্তিই বা কিসের? সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হচ্ছে ছাগল যা-ই হোক—সে এমন সাপের মতন ছোবল দেয় না। দুধকলা দিয়ে সযত্নে সে সাপই পুষেছে এতকাল।

সে আস্তে আস্তে উঠে এসে দরজাটা খুলে দিল। কিন্তু একটা কথাও বলতে পারল না। অনেক ভেবেও ওকে বলার মতো কোন কথা খুঁজে পেল না। এতকাল মানুষের সঙ্গেই কথা বলে এসেছে, যে মানুষ নয়—তাকে কি বলবে বুঝতে পারল না।

অবশ্য ভাল ক'রে কিছু ভাবারও অবস্থা ছিল না। অপ্রত্যাশিত অকল্পিত আঘাতে মাথা ও মন দুই-ই যেন জড় পাথর হয়ে গেছে। কিছু বলার, এমন কি কিছু ভাবারও অবস্থা ফিরে পায় নি এখনও। মাথায় কোন কঠিন আঘাত লাগলে নাকি সমস্ত চৈতন্য ও চিন্তাশক্তি এমনি আচ্ছন্ন হয়ে যায় কিছুকালের জন্যে—একথা অনেকের মুখেই শুনেছে—কথার আঘাতেও যে এমন হয় তা জানত না। কালকের যে ঘৃণ্য অপরাধ ধরা পড়েছে—ঘৃণ্য, রুচির দিক থেকে—পশুত্বের যে কুৎসিত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে, তারও আঘাত এত রূঢ় এত মর্মান্তিক নয়।

এর পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলাই উচিত, কিন্তু তাও বলতে পারল না।

চার বছর বয়স থেকে এই আঠারো পর্যন্ত—চোদ্দ বছর যাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছে—সে সাপ হলেও তাকে এ অবস্থায় রাস্তায় বার ক'রে দেওয়া যায় না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সব আস্ফালন থেমে গিয়েছিল গোরার, কে জানে সে হয়ত ভাবল আবার শাসন করতেই আসছে,—মাথা হেঁট ক'রে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই সময়···একবার এক চকিতে সেদিকে চেয়ে দেখেছিল—এক পলক মাত্র। তবু তাতেই অনেক দেখা হয়ে গেছে। পিঠে, বাহুমূলে —মায় গালেরও এক জায়গায় বেতের দাগগুলো লাল হয়ে ফুলে ফুলে আছে, কোথাও রক্ত বেরিয়েছিল সেই দাগে দাগে জমে গেছে, কোথাও বা ঘামেতে রক্তেতে মিশে গড়িয়ে পড়ে ছিল, সেই অবস্থাতেই শুকিয়ে একটা ভয়াবহ চেহারা ধারণ করেছে; যন্ত্রণায় অনাহারে তৃষ্ণায় চোখ-মুখ বসে গিয়ে যেন সুগভীর কালি মেড়ে দিয়েছে চোখের কোলে; সমস্তটা জড়িয়ে একটা অসহায়, আর্ত চেহারা।

সব অনাচার অসদাচরণ, সব অকৃতজ্ঞতা, ভয়ঙ্কর ক্রূর মনের জঘন্য নগ্ন প্রকাশ—সদ্যলব্ধ বিষাক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি—সমস্ত কিছু ছাপিয়ে এই দীন ক্লিষ্ট অবস্থাটাই বড় হয়ে উঠল—বেদনায় টন-টন ক'রে উঠল বুকের মধ্যে। যে মার খেয়েছে—তার থেকে, যে মেরেছে, আঘাত তাকেও যে কম বাজে নি, তার যন্ত্রণাও যে কিছুমাত্র কম নয় —এই মুহূর্তে সেই সত্যটাই স্পষ্ট ধরা পড়ল হেমন্তর কাছেও।···

কিছুই বলা হল না, বলতে পারল না। 'চলে যাও' যেমন বলা গেল না, তেমনি কোন সান্ত্বনার বাক্যও না। ধীরে ধীরে ফিরে এসে নিজের ঘরেই শুয়ে পড়ল আবার। সারা রাত্রের চেষ্টায়

সকালে যে মনের বল ফিরিয়ে এনেছিল—তা এই ক' মিনিটে আবার হারিয়ে গেছে। মনে বা দেহেও—কোন শক্তিই আর নেই, বিন্দুমাত্রও।...

কী করা উচিত—নিমাইও ভেবে পায় না। ঘর থেকে বাইরে আসার জন্য যে এত লাফালাফি চেঁচামেচি করছিল এতক্ষণ, দরজা খুলে দেবার পর সে আর বাইরে আসবার কোন চেষ্টাই করল না। হেমন্তর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন চুপ্‌সে গিয়েছিল সে-ও, তেমনি মাথা হেঁট ক'রে ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। সেও বুঝতে পারছে না কী করা উচিত তার। এরা এখনই দূর ক'রে দেবে কিনা, পুলিশে দেবার মতলব আছে কিনা (এসব ব্যাপারে পুলিশে দেওয়া যায় কিনা তাও তার জানা নেই, গর্হিত কাজ করলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যায় এমনি একটা আব্‌ছা ধারণা মাত্র আছে)—তাও বুঝতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একবার একটা পা, আর একবার অন্যটা তুলে অপর পা-টা—চুলকোতে লাগল।

মেঝেতে মাদুরের ওপরই শুয়ে পড়েছিল হেমন্ত চোখ বুজে। খানিকটা দেখে নিমাই পা-পা ক'রে সেখানেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে ওকে কি বলা হবে এখন ?'

তেমনি চোখ বুজেই ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'জানি না।'

এ-আবার কি কথা ! হতভম্ব হয়ে যায় নিমাই। এ বাড়িতে চিরকাল সব ব্যাপারে হেমন্তই হুকুম দিয়ে আসছে, সিদ্ধান্ত যা কিছু নেওয়ার সে-ই একমাত্র লোক—নিমাইয়ের কাজ শুধু নির্বিচারে সেগুলো তামিল করা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কখনও তো পড়ে নি সে।

খানিকটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে এক ধরনের কাষ্ঠ-হাসি হেসে নিমাই আবার বলল, 'হেঁ হেঁ, বাবাজী হয়ত ভাবছে যে, ওর তড়পানিতে ভয় পেয়েই তুমি দোর খুলে দিলে। নিজের কেরামতি ভেবে নিজে নিজেই খুব বাহবা নিচ্ছে হয়ত।...ঠিক যে তা নয়—এটা যে মনের ঘেন্নায় করলে—সেটা একটু বুঝিয়ে দিলে পারতে !'

তবু ওপক্ষ থেকে কোন সাড়া এল না। অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছে হেমন্ত, কথা বলারই আর কোন শক্তি নেই তার। মানুষ হলে তাকে কিছু বোঝানো যায়, কোন কোনও ক্ষেত্রে পশুকেও কথা বোঝার মতো ক'রে তৈরী করা যায়, কিন্তু যে পশুর অধম তাকে—কেন সে অধম তা বোঝানো যায় না। ছুঁচোকে মারলে নিজের হাতেই দুর্গন্ধ হয়—ছুঁচোর ছুঁচোত্ব যায় না তাতে।

কিন্তু এসব কথা মনে এলেও বলতে পারল না, মনে হচ্ছে কথা বলার বড্ড পরিশ্রম, তার চেয়ে যা খুশি হোক, যার যা খুশি করুক—শুধু তাকে একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে দিক। এ যে কী সুগভীর শ্রান্তিতে পেয়ে বসেছে তাকে—কাউকে সে এ অবস্থা বোঝাতে পারবে না। মনে হচ্ছে এমনিভাবে কোন অন্ধকারে নৈঃশব্দে ডুবে যাওয়াই সবচেয়ে আরামের, এই অবস্থায় এখনই মরে যেতে পারাই সবচেয়ে কাম্য।⋯ কোন নির্দেশ না পেয়ে নিমাই আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ভাতটা বুঝি পুড়ে যাচ্ছে। এ কাপড়ে সে ছুঁলে হেমন্ত হয়ত খাবে না—কিন্তু কাপড় বদলাবার সময় নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাতে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে নামিয়ে ফেন গেলে ফেলল।

তারপর আবার এসে প্রশ্ন করল, 'পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছিল, আমাকে তো এই কাপড়েই ছুঁতে হল ভাত। তা উনুনটা পেড়ে নিয়ে গামছা পরে কি তোমার মতো চাট্টি ভাত চাপিয়ে দোব আবার—না তুমিই উঠে চাপাবে? উনুনটা নিকিয়ে কয়লা দিয়ে রাখব—?'

এবার উত্তর এল। তেমনি চোখ বুজেই বলল, 'আমি এবেলা কিছু খাব না, ঐ ভাতটাত যা পারো খেয়ে নাও গে—আর কিছু চাপাতে হবে না।'

'তোমার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে? ডাক্তার-টাক্তার কাউকে ডাকব? যদি হোমিওপ্যাথী খেতে চাও তো—কাছেই দীর্ঘাঙ্গী আছেন, তাঁকেও ডাকতে পারি। এখনও হয়ত বেরোয় নি কলে, বারোটার পর বেরোয়—।'

'না, না। কিচ্ছু দরকার নেই। তোমরা সবাই সব করেছ, এখন শুধু দয়া ক'রে একটু শুয়ে থাকতে দাও শান্তিতে—তাহলেই ঢের উপকার হবে।'

আর ঘাঁটাতে সাহস হল না নিমাইয়ের। আশ্বস্তও হল খানিকটা। অসুখ বিসুখ—বুকের ব্যামো বা সেরকম কিছু নয়—অভিমান, রাগ, ঐ জাতীয় কিছু।

'মরুকগে, যাকে মাথায় ক'রে নেচেছেলে সে যদি মাথায় নাথি মেরে থাকে—তার আমি কি করব। আমার ওপর মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। আমাকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা করোও নি কখনও, আমার কাছে কিছু পিত্যেশাও করো না। জ্বালাই নি পোড়াই নি এই ঢের।...আমি তোমার উগ্‌গার করব, কাজে লাগব, ছেলের মতো দেখব—তেমন ব্যাভার তো করো নি কোনদিন। এখন দু'পক্ষ সমান করতে এলে চলবে কেন?'

আপন মনেই গজগজ করে সে রান্নাঘরে গিয়ে।

অবশ্যই অস্ফুট কণ্ঠে—হেমন্তর কানে না যায়।...

আর কোন শাসন কি পুলিশ ডাকা কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম কিছুই হল না দেখে গৌরও কিছুটা ভরসা পেল।

সে এবার আস্তে আস্তে—যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে কলতলায় গিয়ে আগে পেট পুরে খানিকটা জল খেয়ে নিল, তারপর মুখ ধুয়ে ওপর ওপর একটু জল ঢেলে স্নানের চেষ্টা ক'রে—জল ঢাললেই কাটা জায়গাগুলো জ্বালা করে উঠছে—কাপড় ছেড়ে বারান্দার এক কোণে চুপ ক'রে এসে বসল।

নিমাই আড়ে সবই দেখল। এখন কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করা দরকার কিনা—করলে গিন্নী খুশী হবেন না নারাজ হবেন—ভেবে ঠিক করতে পারল না। বিশেষ কিছু নেইও ঘরে—গোটা দুই সন্দেশ পড়ে আছে ঠাকুরের প্রসাদ। এ অবস্থায় সন্দেশ খেতে দেওয়াটা আবার বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে পড়বে, 'নাই' পেয়ে যাবে—নিজেরই মনে হল। তাই সে চেষ্টা আর করল না।

নিজেও স্নান সেরে এসে তু'জায়গায় ভাত বেড়ে—এখন বাড়তে গিয়ে দেখল তিনজনের মতোই চাল নেওয়া ছিল, নিত্যকার অভ্যাস কাজ ক'রে গেছে না স্বেচ্ছাকৃত কে জানে—ভাতের থালাটা এনে গৌর যেখানে চুপ ক'রে বসে ছিল—নীরবে সেইখানে নামিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে খেতে বসল।...

ও-বেলা মতির মা ঝি আসবে বলেছে। সুতরাং রান্নাঘর ধোওয়া কি বাসন মাজার দরকার নেই। সেগুলো রান্নাঘরেই গুছিয়ে রেখে দোরে তালা দিয়ে দিল। তারপর এক গেলাস শরবৎ তৈরী ক'রে হেমন্তর মাথার কাছে রেখে দিল ঢাকা দিয়ে, বলল, 'একটু মিছরির পানা রইল এখেনে—যদি তেষ্টা পায় তো খেয়ে নিও। শুধু শুধু আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি বলো—চোরের ওপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া বৈ তো নয়।'

বিকেলের দিকে হেমন্ত উঠে পড়ল। সংসারের কাজও করল কিছু কিছু, অভ্যস্ত প্রতিদিনের কাজ। ঝি এসে গিয়েছিল, পুরনো ঝি—তবু একবার তাকে কাজকর্মগুলো ঝালিয়ে দিতে হল, তারপর যথারীতি গিয়ে রাঁধতেও বসল। শুধু নিমাইকে ডেকে বলল, 'পারো তো একটা রাঁধুনী বামুন কি বামনী ঠিক করো। আমার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে—তু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে পারব না। ঠিকে লোক হলেও চলবে, রাতদিনের হলেও আপত্তি নেই। নেবুতলার বাজারের কাছে উড়ে ঠাকুরদের একটা আড্ডা আছে, সেখানে খোঁজ করলে পেতে পারবে। আমাদের বাড়ি কাজ ক'রে গেছে পীতাম্বর, বনমালী—তুজনেই এখন হালুইকরের কাজ করে শুনেছি—তাদের বললে তারাই ঠিক ক'রে দেবে।'

রাত্রে গৌরকে সে-ই রুটি তরকারি বেড়ে ধরে দিল। গৌরও মাথা হেঁট ক'রে এসে খেতে বসল। কথাবার্তা কোন তরফেই নেই সেটা একরকম বাঁচোয়া, গৌরের পক্ষে তো ভগবানের আশীর্বাদ। বুড়ির কথা বেতের চেয়ে কিছু কম ধারালো নয়।...

এমন কি রাত্রে যখন মতির মাকে দিয়ে ওর বিছানাটাও পড়ার ঘরে পাতিয়ে দিল তখনও সে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতকাল হেমন্তর ঘরেই সামনাসামনি চৌকিতে শোওয়ার ব্যবস্থা ছিল—সেখান থেকে এ নির্বাসনে ক্ষুণ্ণ হবার কথা—কিন্তু গৌর খুশীই হল। এটাই সে চাইছিল। এবার এসে পর্যন্ত ঠাকুমার সঙ্গে—সে এতকাল মা বলত—দিনরাত এত কাছাকাছি থাকা পছন্দ হচ্ছিল না। মুখ ফুটে না বলতেই যে ব্যবস্থাটা হয়ে গেল এ একরকম শাপে বরই হল বলা যেতে পারে।

এইভাবেই কাটল ক'টা দিন।

ইস্কুল যাওয়ার কথা কেউ বলে না আর—গৌরও যাওয়ার চেষ্টা করে না। খায় দায়, বাড়িতেই বসে থাকে চুপ ক'রে। বই-খাতা খুলে পড়বার ভানও করে না। ধরণীবাবুকে আগেই বারণ ক'রে পাঠিয়েছিল হেমন্ত, সে দায়েও নিশ্চিন্ত। কোথায় কিলবরণ না কি কোম্পানীর চুনের ভাটিতে একটা কাজের চেষ্টা দেখছে নিমাই—আড়াল থেকে শুনেছে, কিন্তু তাকে কেউই বলে নি কোন কথা।

ছ'সাতদিন পরে একদিন বিকেলে মতির মা দোকানে গেছে কি কিনতে, হেমন্ত কলঘরে কাপড়-কাচতে গা ধুতে ঢুকেছে—গোরা ছাদে বসে আছে দেখে কলঘরে ঢুকেছিল সে—এসে দেখল, ওর শোবার ঘরের গা-আলমারীটা খোলা, কেউ কোথাও নেই।···প্রথমটা ভেবেছিল ভুল, কারণ চাবিটা আলমারীর কপাটে ঝুলছে। তার পরই—বিদ্যুদ্বেগে সংশয়টা খেলে গেল মাথায়! সে দৌড়ে গিয়ে ছাদটা দেখে এল, নিচে-ওপরের পাইখানা, নিচের কলঘর, নিমাইয়ের ঘর, গৌরের বর্তমান শোবার ঘর—কোথাও গোরার কোন চিহ্ন নেই। সদর দরজাটা হা-হা করছে খোলা।

সেটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে আলমারীটা দেখল ভাল ক'রে। গয়নাপত্র, মোটা টাকা, দলিল-দস্তাবেজ এ আলমারীতে থাকে না, কিছু থাকে য়্যাটর্নীর কাছে, কিছু লোহার সিন্দুকে। সিন্দুকের চাবি

ঠাকুরঘরে গুরুদেবের ছবির সিংহাসনে, ভেলভেটের আসনটা চাপা—তার অস্তিত্ব কেউই জানে না। কারও সামনে, এমন কি নিমাইয়ের সামনেও আজ পর্যন্ত সেখান থেকে চাবি বার করে নি কি রাখে নি।

এখানে থাকে সংসার খরচের টাকা, ভাড়া ইত্যাদি যখন যা ওয়াশিল হয়—কিছু বেশীই থাকে দরকারের চেয়ে, আকস্মিক কোন বিপদ-আপদের জন্যে—আর থাকে দু'চারটে সামান্য সোনার জিনিস। সেইখান থেকেই—ভাল ক'রে গুনে হিসেব মিলিয়ে দেখল হেমন্ত—ছ'শ টাকা আর দু'গাছা সোনার বালা অন্তর্হিত হয়েছে। কতকগুলো খুচরো বাইরে দেবার টাকাও ছিল—নিমাই বলে 'পেমেন্টের টাকা'—বাড়ির ট্যাক্স্, ইলেক্‌ট্রিকের বিল (এই এক আপদ নতুন বাড়ল), পাইখানায় কাজ ক'রে গেছে 'পীলাম্বর' ক'দিন আগে তার মজুরী, বালি সিমেন্টের দোকানে কিছু খুচরো দেনা আছে—সে সব টাকা আলাদা আলাদা কাগজের মোড়ক ক'রে নাম লিখে রাখা ছিল ছেঁড়া কাপড়গুলোর নিচে—সেগুলো ঠিকই আছে, সম্ভবত চোখে পড়ে নি।

আসলে খুবই তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়েছে। হেমন্তরই বোকামি, অথবা কথাটা মাথায়ই যায় নি—চাবির গোছা আগেকার অভ্যাসমতো বালিশের তলায় রেখে কলঘরে গেছে। এইটুকু মাত্র অবসর। গা-ধুতে পনেরো মিনিটের বেশী লাগে না কোনমতেই, তাও তার মধ্যে ঝি এসে পড়তে পারে যে-কোন মুহূর্তে—সুতরাং মিনিট তিন-চারের বেশী সময় দিতে পারে নি ; ওর ভেতর যেটুকু যা পেয়েছে হাতের সামনে—নিয়েছে। খরচের টাকা কোথায় থাকে তা সে জানে, সেইটেই নিতে গিয়েছিল, বালাটা উপরি লাভ। কোন ছুতোয় নিভার কাছে পাঠাবে বলে সিন্দুক থেকে বার ক'রে রেখেছিল ক'দিন আগে।

কাপড়-জামাগুলো দেখল, সে-সব কিছুই নিয়ে যায় নি। যা গায়ে-পরা ছিল, ধুতির ওপর শুধু কামিজটা চড়িয়ে নিয়েছে। বাড়তি কাপড় নিতে গেলে ব্যাগে ক'রে নিতে হয়—ইস্কুলে যেত রাঁচীতে পোর্টম্যান্ট নিয়ে, সে অসম্ভব—কাপড় হাতে ক'রে কি

বগলে ক'রে নিয়ে যেতে গেলে কোন চেনা লোক দেখে ফেলতে পারে। তাহলেই নানা কৈফিয়ৎ, ডেকে জিগ্যেস করবে কোথায় যাচ্ছ কী বৃত্তান্ত—সেই ভয়েই নেয় নি। সময়ও পায় নি হয়ত।...

সব দেখে আলমারীটা আবার বন্ধ ক'রে চাবির গোছাটা আঁচলে বেঁধে নিল। চেঁচামেচি করল না, বিলাপও করল না। অতিরিক্ত কোন দুঃখ পেল বলেও বোধ হল না। বরং যেন একটা স্বস্তির—মুক্তির ভাব বোধ করল। কোন্ একটা অবাঞ্ছিত দায় থেকে যেন অব্যাহতি পেল। ক'দিন ধরেই গোরার উপস্থিতিটা কষ্টদায়ক বোঝার মতো বুকে চেপে বসেছিল, না পারছিল তাড়াতে না পারছিল আগের মতো সহজ হতে—দিনরাত একটা অশান্তি ভোগ করছিল। সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে আপনার লোক যখন পর হয় কি মনের বাইরে চলে যায়, তখন তার সান্নিধ্যটা অপরিচিত পরের চেয়েও অসহ্য বলে বোধ হয়।...

ঝি এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কাকা কোথায় মা, তাকে দেখছি না যে?'

হেমন্ত মা, সেই সুবাদে গোরা ভাইপো। খাতির ক'রে কাকা বলে।

হেমন্ত সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিল, 'এক জায়গায় গেছে।'

মতির মা আর কিছু জানতে চাইল না, হেমন্তকেও মিথ্যা বলতে হল না বেশী।

কিন্তু নিমাই আপিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে যখন প্রশ্ন করল, 'তোমার গুণধর পেয়ারের নাতি কোথায় গেলেন—তাঁকে দেখছি না যে, সট্‌কালেন নাকি?' তখন তাকে কথাটা বলতে হল। মিথ্যে বলে লাভ নেই, ক'দিন আর চেপে রাখবে? চলে গেছে যে—সেটা তো বলতেই হবে।

নিমাই শুনে তখনই আবার জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে যাচ্ছিল।

'এই ছাখো! এ-কথাটা এখনও বলো নি! আসামাত্তরই

বলবে তো! এখুনি তো থানায় যাওয়া দরকার তাহলে।···ওরা হুলিয়া বার ক'রে দিক একটা। সহজে ছাড়ব না আমি।· যাবে কোথায়—ঠিক ধরা পড়বে। কী চেনে কলকাতার!···তুমি ভেবো নি, টাকা হয়ত পাঁচ ভূতে লুটে নেবে ইরি ভিতরেই। তবে ওকে জব্দ ক'রে দোব। ইস! শেষে চুরিটাও করলে! ঐটেই বোধহয় বাকী ছিল আমাদের বংশে, চুরি ক'রে জেল খাটা।'

হেমন্ত বাধা দিল, 'না না, এ নিয়ে থানা-পুলিশ হাঙ্গামা আমি করতে পারব না। আকাশের দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়েই লাগে। তাকে জেলে দিয়ে কি আমার ইজ্জৎ বাড়বে? আমাদেরই বলবে লোকে—তোমরা মানুষ করতে পারো নি। ও থাক। কাউকে কিছু বলতে হবে না।···তাছাড়া এ তো ভালই হল—অল্পের ওপর দিয়ে গেল। এত সহজে অব্যাহতি পাব ভাবি নি আমি। আপনা থেকে ঘাড় থেকে নেমে গেল এই তো ভাল। নইলে ওকে নিয়ে কি-ই বা করতুম আমি!'

বলতে বলতে কি গলার আওয়াজটা গাঢ় হয়ে এল একটু?

কে জানে, ভাল ক'রে তাকিয়েও কিন্তু চোখে জল দেখতে পেল না নিমাই।

অগত্যা সে জামাটা আবার হুকে টাঙিয়ে রেখে সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য করল, 'ভাল!'

॥ ২০ ॥

দাদার মেজছেলে কলকাতায় থেকে চাকরি করে—এই খবরটুকু নিভার কাছ থেকে বার করতে পেরেছিল। ঐ একজনই কলকাতায় থাকে, ছোটটিকে কোন শিষ্য উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল, সেইখানেই কলেজে পড়ে, সম্প্রতি কোন ইস্কুলে মাস্টারীতে ঢুকেছে।

কলকাতায় থাকে এই খবরটুকু মাত্র পেয়েছিল, ঠিকানা পায় নি।

বোধহয় ইচ্ছে ক'রেই দেয় নি তখন—পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে দু-তিনখানা চিঠি লেখার পর নিভা ঠিকানা লিখে পাঠাল। কাছেই—সার্পেনটাইন লেনের ঠিকানা।

পরের শনিবার নিমাইকে পাঠাল হেমন্ত সুরেনের খোঁজে। ফিরে এসে নিমাই যা খবর দিল তাতে চোখ ফেটে জল আসার যোগাড়। মেসে থাকলে খরচ বেশী, তাছাড়া যে-কোন ঠাকুর-নামধারী লোকের হাতে খেতে হয়, তাদের অনেকেই বামুন নয়, চাকরির জন্যে একগাছা পৈতে গলায় ঝুলিয়ে মেসে-হোটেলে রাঁধতে আসে। তাছাড়া সেও সত্তিক জাতের ছোঁয়া-নেপা; বাসনপত্র ভাল ক'রে মাজা হয় না—বলতে গেলে সকলকার এঁটো খাওয়া। সুরেন তাতে রাজী নয়। ওদের বাড়ির নিয়ম-সংস্কার অনেক ত্যাগ করেছে—গুরু-বংশের প্রায় সমস্ত রকম কড়াকড়ি, নিষ্ঠা—এইটুকু এখনও ছাড়তে পারে নি।

এই সব কারণেই সে একটা ঘরভাড়া ক'রে থাকে। সার্পেনটাইন লেন অনেক দিনের গলি, চারিদিকেই বড় বড় বাড়ি। কিন্তু ওদেরটা পাকা বাড়ি নয়। মাটকোঠা যাকে বলে তাই। দেওয়াল মাটির, টিনের চাল। তবে তার মধ্যেও দোতলা; একতলার ছাদ বা দোতলার মেঝে, যা-ই বলুন, কাঠের ওপর আধা পাকা অর্থাৎ একটু চুন-সুরকী খোয়া পেটা আছে তার ওপর মাটি লেপা। একতলার ঘরের মেঝেগুলো বিলিতি মাটির—কিন্তু ওপরে অত খরচ করতে পারেন নি বাড়িওলা। ঐটুকুই করেছেন, যাতে দৈবাৎ জল-টল বেশী পরিমাণ পড়ে গেলেও নিচের ঘরে না পড়ে সেই জন্যে। দোতলার দেওয়াল অবিশ্যি মাটির নয়; করোগেট টিনের, কাঠের ফ্রেমে আটকানো।···এমন হাল্‌কা ফঙ্গবেনেভাবে তৈরী যে, দোতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলে কি কোন ঘরের মেঝেতে জোরে পা ফেললে ওপরতলার সব মেঝেটাই নাচতে থাকে।

এই মাটকোঠারই একটা ঘর নিয়ে থাকে সুরেন।

একটা গোটা ঘর নিয়েই থাকে, মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায়। অন্য

অন্য ঘরে তিন-চারজন পর্যন্ত আছেন, ঐ ভাড়াই ভাগ ক'রে দেন। তবে তাঁরা বেশির ভাগই বাইরে, হোটেলে বা অন্য কারও মেসে খান। সুরেন নিজে রান্না করে—তোলা উনুন ধরিয়ে। ফলে ঐ ঘরের মধ্যেই কেরাসিন-কাঠের বাক্সে কয়লা ঘুঁটে ইত্যাদি রাখতে হয়। বেশী পয়সা দিয়ে দোকান থেকেই কয়লা ভাঙিয়ে আনায়, তাও স্থানাভাবে দশ-পনেরো সেরের বেশি একসঙ্গে আনা যায় না। যারা নিচের ঘরে থাকে তারা উঠোনটা পায়, বাঁধানো উঠোন। কিন্তু সেটা এত নোংরা ক'রে রাখে সেই জন্যেই যে, সুরেন নিচের ঘর নেয় নি। নইলে ভাড়াও এক টাকা কম হত।

ঘুঁটে কয়লা ছাড়াও, ঐ এক ফালি ঘরের মধ্যেই মাটির হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভাঁড়ার থাকে। পেতলের বোগ্‌নো, চাটু কড়া থালা বাসন সব। মায় কলসীতে জল—একটা খাওয়ার, দু'টো রান্নার। এরই মধ্যে এক প্রান্তে একটি সঙ্কীর্ণ, সামান্য বিছানা—শতরঞ্জি কম্বল আর চাদর পাতা ; শীতকালের কী একটা—লেপ বা কাঁথা—পুঁটুলি বাঁধা বাঁশের আড়াতে টাঙানো।

ব্যারাক-মতো বাড়ি, নিচে-ওপরে টানা দু'হাত বারান্দার গায়ে সারবন্দী ঘর পাশাপাশি, চারখানা ক'রে। নিজে রেঁধে খায় বলে একেবারে কোণের ঘরটা নিয়েছে সুরেন। ফলে সমস্ত জল নিচে থেকে টানতে হয়—দু'টো টানা বারান্দা পেরিয়ে বালতি ক'রে তোলা। রাত্রে যখন আসে তখন কলে জল থাকে না বেশিরভাগ দিনই, তাই ভোর চারটেয় উঠে এই জল বই করে প্রত্যহ। রাত চারটেয় না উঠলে অতক্ষণ কল কেউ ছেড়ে দেবে না। আর এত নোংরা ক'রে রাখে কলতলা যে, ভাল ক'রে না ধুয়ে নিজের রান্না-খাওয়ার জল নিতে ইচ্ছে করে না সেখান থেকে।

জল বওয়া ছাড়া বাসনও মাজতে হয় মধ্যে মধ্যে। একটা ঠিকে-ঝি আছে বাসন মাজার জন্যে, মাসিক এক টাকা মাইনে নেয়। ভোরে এসে মেজে দিয়ে যাবে এই কথা—কিন্তু দেরি হয়ে গেলে, মানে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলে আর অপেক্ষা করতে পারে না।

তখন মেজে না নিলে পড়েই থাকবে সারাদিন। এমনিই একটু সময় হাতে রাখতে হয়, ঝি মেজে দিয়ে গেলে স্নানের আগে বাসনগুলো একবার ধুয়ে দেখে নেয় নিজে। এক-একদিন ওর বাসন মাজা শেষ হবার পর ঝি এসে পড়ে।

'কিন্তু উপায় 'কি বলুন?' সুরেন বলেছে, 'এক টাকা মাইনে দিয়ে তো আর তার মাথা কিনে নিই নি। তার হাতেও কিছু ঘড়ি বাঁধা নেই। রোজ যদি ঠিক সময়ে তার ঘুম না ভাঙে তো দোষ দেওয়া যায় না। আমি কোম্পানীর চাকরি করি--ঠিক সময়ে হাজিরে দিতে বাধ্য, সে তো আমাদের মতো ফক্কিগড়ের নবাবের কাজ করে, তার অত কিসের বাধ্যবাধকতা বলুন?'

রান্নাটা একবেলাই করে সুরেন। ফলে খাওয়ার ধারাটা বড় বিচিত্র। আপিস থেকে ফিরে এসে উনুনে আঁচ দিয়ে ভাত রুটি দুই-ই করে। রাত্রে ভাতটা খায়—রুটি আর তার সঙ্গে সামান্য কিছু ভাজাভুজি, শীতকালে তরকারিই থাকে—সকালে খেয়ে আপিসে চলে যায়। বাধ্য হয়েই নাকি এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাকে। পোর্ট কমিশনারের আপিসে কাজ করে, সকাল আটটার মধ্যে নইলে সেখানে পৌঁছনো যায় না। শীতকালে সাড়ে ছ'টাতেও ঘোর ঘোর থাকে, তখন তার মধ্যে রান্না ক'রে খেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থা বদলায় শুধু রবিবারে। তবে সেদিনে দিনের বেলায় রান্না হয় যেমন, তেমনি সোমবার চিঁড়ে খেয়ে আপিসে যেতে হয়। সকালের রুটি পরের দিন সকালে খেয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে চিঁড়ে-গুড় ঢের ভাল।

অবশ্য মাসে একটা রবিবার বাড়ি যায়, সেদিনটায় রান্নার ছুটি। ঐ একটা দিন মায়ের হাতে খেতে পাবে সেই আশায় মাসের বাকী ঊনত্রিশ দিন দিন-গোনে। তার জন্যে গাড়ির ধকল বড় কম সইতে হয় না, খরচও হয় বিস্তর, তবু মাসে অন্তত একদিনও মা-বাবা-ভাইদের দেখতে না পেলে যেন হাঁপ ধরে; শারীরিক কষ্ট অনুভব করে একটা।

নিমাই অনেক ক'রে—কাকুতি-মিনতি ক'রে বলে এসেছিল—হাত-জোড় ক'রে বলেছিল, নইলে জ্যাঠাইমা নিজেই এসে হাজির হবেন বলে ভয়ও দেখিয়েছিল—হয়ত সেই কারণেই সুরেন পরের দিন দুপুর বেলা এসে দেখা করল।

এই প্রথম দেখল হেমন্ত। এতদিন পরে। সুন্দর দেখতে, সুপুরুষ যাকে বলে তাই। ওদের বংশের মতোই চেহারা পেয়েছে। বয়সে নিমাইয়ের থেকে কমই হবে, হয়ত সাতাশ-আটাশ, কি আরও কম।

দু'জনেরই দু'জনের সঙ্গে এই প্রথম দেখা। একটু আড়ষ্ট ভাব তো থাকবেই। সুরেনেরই বেশি। অনেক শুনেছে সে এই পিসীর সম্বন্ধে। অনেক খারাপ কথাও শুনেছে। বাপের মৃত্যুশয্যাতে খবর পেয়েও দেখতে আসে নি। দাদাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এমনি অনেক কথাই।

হেমন্তর লজ্জার চেয়ে কুণ্ঠাই বেশী। কতটা শুনেছে এ ছেলেটা কে জানে, সে হৃদয়হীন অমানুষ—শুধু এইটুকু, না আরও ঢের বেশী? সে দাইয়ের কাজ করেছে, স্বভাব-চরিত্র খারাপ—এ ধরনের কথাও? সেইটে আঁচ করতে না পারার জন্যেই তার অস্বস্তি, কুণ্ঠা বেশী।

সহজ ক'রে দিল নিমাইচরণই কতকটা। সুরেনের জীবনযাত্রার বিবরণী কালই ফিরে এসে যথেষ্ট দিয়েছে—সেইটেরই আবার আদ্যোপান্ত পুনরাবৃত্তি করতে বসল, কিছু বাড়তি রঙ, টীকাটিপ্পনী সুদ্ধ। মানুষেরই স্বধর্ম এটা। কোন ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে প্রতিবারেই কিছু কিছু কাল্পনিক কথা যোগ হয়, ক্রমশ সেগুলো বক্তারও বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায়। অনেক সময় যেটা ভুলে যায় সেই ফাঁকাটা কল্পনায় ভরায়—নিজেও সেটা সত্য ভাবে। এক্ষেত্রেই বা তার অন্যথা হবে কেন? ফলে লজ্জা পেয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা

করতে লাগল সুরেন, আর সেই প্রসঙ্গে হেমন্তও দু'টো বলবার মতো কথা পেল। এইভাবেই প্রথম দিককার আড়ষ্টতা কমে এল আস্তে আস্তে।

এইবার জানা গেল নিভা সুরেনকেও পিসীর ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখেছে, দেখা করতে লিখেছে বার বার। পিসীর প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ, অমন ভালমানুষ যে কেউ হয়, মানুষকে অমন ভালবাসতে পারে—তা তার জানা ছিল না। পিসীর সম্বন্ধে ওদের যা ধারণা ছিল তা নাকি সব ভুল, নিশ্চয়ই ভুল-বোঝাবুঝির ওপরই এতটা ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া পিসীর ওপর যে তাঁর বাবা অনেক অবিচার করেছিলেন সে তো সুরেন বাবার মুখেই শুনেছে। ইত্যাদি—

অনেকক্ষণ গল্প করার পর—যে কথাটা সেই প্রথম থেকে বলার জন্য উশখুশ করছিল, সঙ্কোচে বলতে পারে নি—সেইটেই ভরসা ক'রে বলে ফেলল হেমন্ত। যেরকম নিষ্ঠার কথা শুনছে, বলতে সাহস হয় না—বাজারের সন্দেশ-রসগোল্লা খাবে তো সুরেন?

'খুব, খুব!' সুরেন লজ্জা পায়, 'নিমাইদার কথা শোনেন কেন!···কলকাতায় বাসা ক'রে থাকি, আপিসে চাকরি করি—আমার আবার নিষ্ঠা! নেহাৎ সতেরো জাতের এঁটোটা খেতে একটু বাধে এখনও, তাই মেসে থাকি না। তাছাড়া খরচের কথাও তো আছে। এ আমি এক-তরকারি-ভাত খাই—মাছ-কাছের বালাই নেই—দশ টাকার মধ্যে হয়ে যায়। কয়লা ঘুঁটের খরচ ধরেও। মায় কেরোসিন তেল সুদ্ধ। মেসে থাকলে যেমন-তেমন ক'রে চোদ্দ-পনেরো টাকা লাগবে। মাইনে পাই মোটে চুয়াল্লিশ টাকা, তার মধ্যে ট্রাম ভাড়াতেই তিন সাড়ে তিন বেরিয়ে যায়—বাকী টাকার মধ্যে কী-ই বা খাব আর কী-ই বা পাঠাব বলুন? সেখানে মা বাবা ভাইবোন বলতে গেলে উপোস ক'রে কাটায় অর্ধেক দিন—আমার মুখে এখানে মাছভাত আরামের খাওয়া রোচে? মনে হয় চারটে পয়সা বাঁচাতে পারলেও অনেকখানি সাশ্রয়। শুধু

খাওয়াই তো নয়—আপিস করতে হয়, জামাকাপড় জুতো এসবও তো আছে। মাসে ক'টা টাকাই বা পাঠাতে পারি।'

আবারও যেন চোখ উপ্‌চে জল বেরিয়ে আসতে চায়। এখানে এই বেইমানের ঝাড়ের জন্যে কত টাকা খরচ করছে সে, বার বার। নিজের ভাই-ভাইপো-ভাইঝিরা উপোস ক'রে দিন কাটাচ্ছে। এমন ভদ্র বিবেচক সোনার চাঁদ ছেলেমেয়েরা!...

একটু চুপ ক'রে থেকে উদ্গত অশ্রু সামলে নিয়ে বলে, 'তা যখন বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বাবা, আমি খোলাখুলি কথা জিজ্ঞেস করছি, তুমিও খোলাখুলি উত্তর দিও এইটুকু অনুরোধ—আমি যদি লুচি-পরোটা ভেজে দিই, তুমি খাবে? আমার অবশ্য নিরিমিষের বাসন সবই, ওরা মাছ খেলে নিমাই নিজেই রেঁধে নেয় আজকাল, সে-সব কড়াখুন্তি আলাদা।'

এতখানি জিভ কেটে হাত জোড় করে সুরেন। বলে, 'আমাকে কি পেয়েছেন বলুন তো! ছি-ছি, এসব কথা বলে কেবল আমায় অপরাধী করা! আমি কি গুরুদেব এসেছি আপনার? আপনিই তো গুরুজন বরং। আপনার হাতে খাব না কেন? কত বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি খেয়ে আসছি, ব্রাহ্মণ ছাড়াও যাঁদের জানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আচার-বিচার আছে—তাঁদের বাড়িও লুচি-পরোটা খেয়েছি। ভাত তাঁরা কোনদিন খেতে বলেন নি, আমিও খাই নি। তাছাড়া নিরিমিষের কড়া কিসের? আমি মাছ-মাংস খাই না এমন তো নয়। এখানে খাই না—পয়সার প্রশ্ন তো আছেই, তবে এক-আধদিন কি আর খেতে পারি না—অত ঝঞ্ঝাট করে কে? মাংস অবিশ্যি বৃথা—মাংস কোনদিন বাড়িতে রান্না হয় না, তবে খাব না এমনও কোন প্রতিজ্ঞা নেই আমার।'

মুগ্ধ হয়ে শোনে হেমন্ত। যেমন নিভার তেমনি এরও। কথা শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। এতদিন এইসব কাঞ্চন ফেলে কী সব ভাঙা কাঁচ বেঁধেই না জীবনের আঁচল ভারী ক'রে রেখেছিল!

সন্দেশ আনানোই ছিল, সুরেন আসবে আশাই করেছিল ওরা,

তখনকার মতো জল খেতে দিয়ে—চা বিশেষ খায় না সুরেন, মানে নিয়মিত খাওয়ার কোন অভ্যেস নেই তা আগেই বলে দিয়েছিল—উনুনে আঁচ দিয়ে দিল। তারপর নিমাইকে দিয়ে মাছ আনিয়ে লুচি তরকারি মাছের কালিয়া রেঁধে সামনে বসিয়ে পরিপাটি ক'রে খাওয়াল।

সুরেনও বেশ তৃপ্তি ক'রেই খেল। নিজেই স্বীকার করল বহুকাল এত সুখাদ্য পেটে পড়ে নি। নিজের হাতের সেদ্ধ পাঁচন খেয়ে খেয়ে মুখে চড়া পড়ে গেছে, আজ যেন জিভটা ছাড়ল। মাছের কালিয়া বিশেষ ক'রে—খুবই ভাল হয়েছে, হালুইকরদের মতো।

'তুমি যদি রোজ এসো ভায়া, তুমিই বলছি কিছু মনে ক'রো না—' নিমাই খেতে খেতে আরামে চোখ বুজিয়ে বলল, 'তাহলে আমাদেরও মুখে ছড়াঝাঁট পড়ে। অন্য রান্না অবিশ্যি উনিই করেন, কিন্তু মাছ তো আমাদের ভাগে—কী আর রাঁধব বলো, ঐ এক ঝাল দিয়ে—কি রবিবারেই রাঁধা বরাদ্দ। জ্যেঠাই রেঁধে দিতে চায়, মিথ্যে বলব কেন—আমিই রাঁধতে দিই না। আজকাল আবার বাতিক হয়েছে, মাছ রান্না করলে চান না ক'রে কিছু খায় না। কাঁহাতক আর কষ্ট দিই বুড়িকে!'

চমকে ওঠে সুরেন, 'এই রাত্তিরে এখন চান করবেন আবার! ইস, বড্ড অন্যায় হয়ে গেল তো! মাছের কথাটা না তুললেই হত। মাছ খাই না ধরে নিয়েছিলেন, সে ভুল না ভাঙলেই ভাল হত!'

'না ভাঙলে সেটাই অন্যায় হত বাবা। এখন গরমের দিনে একবার চান করব তাতে কষ্টটা কি? এমনিই তো দু'বার-তিনবার চান করি।'

খেয়ে উঠে আঁচিয়ে বাসায় ফেরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, হেমন্ত বলল, 'লুচি অনেক রয়েছে, নিরিমিষ দিকেই তো সব, লুচি আর আলু-পটল ভাজা একটা জায়গায় একটু বেঁধে দিই না? কাল সকালের তো কিছু নেই—খেয়ে যেতে? নিরিমিষ ভাজা—রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলে কি দোষ হবে?'

'তা হবে না।' সুরেন অপ্রতিভভাবে হেসে বলে, 'কিন্তু রাত্রে অনব্যেসের পেটে গুরুপাক এইসব খাওয়া হল—রীতিমতো পাকা ফলার যাকে বলে—তার ওপর আবার কাল সকালে লুচি সহ্য হবে না, ভালও লাগবে না। ও আমার চিঁড়েই ভাল। যাবার সময় দু'পয়সার দই নিয়ে যাব—দোকানের হাঁড়িচাঁচাগুলো এক জায়গায় জড়ো করা থাকে, সে পেলে দু'পয়সায় এতখানি দই হবে—তোফা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চিঁড়ে-দই দিয়ে দধিমঙ্গল করা যাবে'খন ভোরবেলা।'

'তা দুপুরে টিফিন করো কি?'

'কী আর করব? ওখানে কি কিছু পাওয়া যায়? আর পাওয়া গেলেই বা পয়সা কোথায়? যেদিন শুখো ছোলাভাজা-টাজা পাই—এক-আধ পয়সার—সেদিন পেটে পড়ে, নইলে ঐ একেবারে ফিরে এসে—।···ও আজকাল অব্যেস হয়ে গেছে, দরকারও হয় না। জলই মেলে না অর্ধেক দিন, একটু বাই আছে তো, গিয়ে যেদিন নিজে কল থেকে জল নিয়ে গেলাসে ক'রে রাখতে পারি সেদিনই খেতে পাই, নইলে সে গুড়েও বালি।'

জুতো পরতে পরতেই বলে সে।

'তা কবে আবার--?' প্রশ্নটা শেষ করে না, উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে হেমন্ত।

'আবার কবে?···দেখি!'

'না না, দেখি-টেখি নয়। সামনের রবিবারে অবশ্য আসবে। দুপুরে বরং এখানেই দু'টি ঝোলভাত খেয়ো, কেমন? না, আপত্তি হবে?'

'কিচ্ছু হবে না। কী যে বলেন—! আচ্ছা তাই হবে, দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ আসব।'

'না, মনে যদি কোন খুঁৎ থাকে—'

'আবার ঐ সব কথা? তাহলে আর আসবই না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। দু'বেলাই খেয়ে একেবারে রাত্রিতে ফিরবে, পরের দিনের সকালের খাবার নিয়ে।'

'না, ঐটে করবেন না। দোহাই! দু'বেলা আপনার এখানে খাওয়া, সে-ই তো রাজসূয় যজ্ঞ, তার ওপর আবার পরের দিন সকালে লুচি খাওয়া চলবে না। আর একটা কথা—যদি রবিবার রাত্রেও খেতে হয়, ভাত কি রুটি দেবেন। এত ঘি ময়া পেটে সইবে না।'

সে হাসিমুখে প্রণাম ক'রে চলে গেল। হেমন্ত ছলছল চোখে তার নিষ্ক্রমণ পথের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইল।

নিমাই বললে, 'বেশ ছোকরা, না?'

হয়ত 'বেড়া-নেড়ে-গেরস্তর-মন-বোঝা'র মতো ক'রেই বলল সে। হেমন্ত কোন জবাব দিল না, চুপ ক'রে রইল। কিন্তু তার মনও যেন চিৎকার ক'রে এই কথাটাই বলতে চাইছিল। বেশ ছেলেটি, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কথাবার্তা শুনলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। এই ছেলেকে যে গর্ভে ধারণ করেছে, যে আপন ক'রে-পেয়েছে—তার তুল্য সৌভাগ্যবতী তার তুল্য ঐশ্বর্যশালিনী কে আছে! তারই তো জন্ম সার্থক। হোক সে গরীব, এত তো পয়সা হেমন্তর, একলা মেয়েছেলে হিসেবে অনেক পয়সা—তবু সে আজ সুরেনের মাকে ঈর্ষাই করছে। এমন ছেলে থাকলে জন্ম-জন্মান্তর পরের বাড়ি ঝাঁট দিয়ে বাসন মেজে খেতেও রাজী ছিল।

আসল কথাটা—যেটা ঠোঁটের ডগায় এসে আটকে আছে—প্রথম দিন বলি-বলি ক'রেও বলা হয় নি। একেবারে প্রথম দিনই বলাটা অশোভনও হত।

পরের রবিবার দুপুরের খাওয়া শেষ ক'রে মাদুরে শুয়ে গড়াচ্ছে সুরেন, কাছে বসে কথাটা পাড়ল।

'একটা কথা বলব বাবা? কিছু মনে করবে না তো?'

'সে কি কথা! আপনি সব ব্যাপারে অত "কিন্তু" হন কেন বলুন তো?···এতকাল পর হয়ে ছিলেন—তাই? কিন্তু সে তো বাবার মুখে শুনেছি—বাবা বিশেষ মিথ্যে কথা তো বলেন না—

যে, সে তাঁদেরই অন্যায়, বাবা বলেন অপরাধ। পিতৃনিন্দা করবেন না বাবা কোন কারণেই—তবু আকারে-ইঙ্গিতে যা শুনেছি, ছোটকা তো স্পষ্টই বলেন, সবচেয়ে সে জন্যে দায়ী ছিলেন আমাদের ঠাকুর্দা-মশাই-ই। সে অবস্থায় অন্য যে কোন লোক হলেই আত্মহত্যা করত, আপনি যে নিজের চেষ্টায় সৎপথের উপার্জনে দাঁড়িয়েছিলেন—সে-ই তো আপনার বাহাদুরী।'

কে জানে আরও কতটা শুনেছে, সবটা শুনেছে কিনা—বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে হেমন্তর—বিবেচক ছেলে ইচ্ছে ক'রেই অন্ধকার দিকটা চেপে গেল কিনা!

তবু অনেকটা ভরসা পেল বৈকি!

আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'তাই যদি মনে করো—এতদিন জানতুম না কে কোথায় আছে, সেইজন্যেই খোঁজ করতে পারি নি—এত বড় বাড়ি খালি পড়ে, আমিও একা থাকি দেখছই তো, দেখার লোক বলতে তো ঐ এক নিমাই, তা ওরও মতিগতি কেমন হবে জানি না, ও বংশের কাউকেই আমার বিশ্বাস নেই—তাহলে তুমি ওখানে অত কষ্ট ক'রে পড়ে থাকছ কেন আর? মিছিমিছি এই খাটুনি! একা ওপরে জল তুলে নিয়ে গিয়ে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া! শরীর কি টিকবে এতে? বারোমাস বাসি রুটি খেয়ে আপিস যাওয়া! এখানে তো নিমাইকেও আমার সাতটার মধ্যে ভাত দিতে হয়, মাঝে মাঝে একটা ঠিকে বামুন কি বামনীও রাখি—তা সে নবাব-বেগমের দল—তো আসেন সাতটা সাড়ে সাতটায়—ততক্ষণে নিমাই খেয়ে বেরিয়ে যায়। আমার কিছু বেশী খাটুনিও হবে না। এখানেই থাকো না এখন থেকে?··· না-না, কথা শেষ করতে দাও, তারপর উত্তর দিও—ভেবে দেখে ভাল ক'রে। আমি তোমার সম্মানহানি করতে চাই না। তোমার ওখানে যে খরচ পড়ছে—মায় ঘরভাড়া সুদ্ধ—আমাকে ধরে দিও, আমি হাসিমুখে হাত পেতে নোব, তাহলেই হল তো?'

'তা ঠিক হল না পিসীমা।' উঠে বসে দু'হাত জোড় ক'রে

বলে সুরেন, 'অনেক তফাৎ, অনেক ফাঁক থেকে যায়। ঐ হুকুমটি আমাকে করবেন না। একথা যে আপনি পাড়বেন তা আমি জানতুম। সত্যি কথা বলতে কি—এখানে আসার আগে, আপনাকে দেখার আগেই ভেবেছি। নিভার চিঠিতে আপনার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, আর এই গরজ ক'রে নিমাইদাকে পাঠানোতেই—তাতেই জানি—এ উত্তর আমাকে দিতে হবে।'

তারপর একটু থেমে, আস্তে আস্তে বলল, 'না পিসীমা, এ কোন রাগ কি অভিমানের কথা নয়, কিংবা আমি এখানে থাকলে বাবা যে ক্ষুণ্ণ কি বিরক্ত হবেন তাও না। আমারই আপত্তি। যতই হোক—আমার যেটুকু দেবার ক্ষমতা, এখানে যে রাজভোগে থাকব, তার তুলনায় সে কিছুই নয়। ওটা মনকে স্তোক দেওয়া মাত্র। আর কি জানেন, আরাম একবার অব্যেস হয়ে গেলে—না পেলে বড় কষ্ট। নিজের সাধ্যমতো চলাই উচিত নয় কি? চাল বিগড়ে গেলে হয়ত এই টাকা ভেঙেই বিলাসে খরচ করব—মা-বাবা, ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে। সেটা ভাল নয়। যতই হোক, আজ আমাকে ভাল লাগছে—একদিন মাত্র দেখেছেন, আমার স্বভাব আচার-আচরণ কিছুই জানেন না—এর পর যদি ভাল না লাগে তখন আবার পুনর্মূষিক হতে হবে তো? না-না, আপনি বলেও বলছি না, আমার মতে বাপের পয়সা থাকলেও—বড় হলে, নিজে রোজগার করতে শুরু করলে নিজের আয়-মতোই চলা দরকার। বাবাও যে সব সম্পত্তি ছেলেকে দিয়ে যাবেন তার মানে কি? আর দিয়ে যাওয়াও তো মরবার সময়, নিশ্চিত পাবে তো বাপ মরার পর—। কত বড়লোকের ছেলেকে তো দেখছি, বিয়ে-থা করার পর বৌয়ের সঙ্গে বাপ-মার বনিবনাও হয় না—আলাদা হয়ে গিয়ে তারপর ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে। বাপের কাছে টাকা চাইবার মুখ নেই, নিজেরও মুরোদ নেই। বুঝলেন না?'

হাসল হেমন্ত। ম্লান করুণ হাসি। বলল, 'বুঝলাম। খুব সুন্দর ক'রেই বললে বাবা, আমার যাতে আঘাত না লাগে তার

জন্যে অনেক গুছিয়ে-সাজিয়ে বললে, তবু আসল কথাটা বুঝতে পারলুম বৈকি!···আমারই হয়ত ভুল হল, একটু বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কথাটা পাড়া। আর কিছুদিন না গেলে আমাকে তোমার চেনার সুযোগ হবে না। তার আগে ছুট্ ক'রে এখানে এসে ওঠা সম্ভবও নয়।···যাক, তাহলে, আজই জোর-জবরদস্তি করব না। তবে রবিবারগুলোয় তোমার দেখা পাব তো?'

'তা পাবেন, তবে সব রবিবারে তো হয়ে উঠবে না। মাস-কাবারের পর একটা রবিবার ক'রে বাড়ি যাই। তা-ছাড়াও অন্তত আর এক রবিবার যাওয়া উচিত, মাঝে মাঝে যাইও। তা-বাদে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি—এদিক-ওদিকও যেতে হয় মধ্যে মধ্যে। তবে তা হলেও—এখানে থাকলে যখন হোক একবার ঘুরে যাব। দিনে না থাই, রাত্রে খেয়ে যাব, কিংবা উল্টোটা—সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাই হবে। তবে আর একটা অনুরোধ রইল বাবা, কোনদিন যদি আপিস থেকে বেরিয়ে শরীর খারাপ লাগে—এমনিও অনেক সময় ইচ্ছে করে না ফিরে গিয়ে রান্নাবান্না করতে—সে-সব দিনে অবিশ্যি এখানে চলে এসো। এখানেই চান-সন্ধ্যে সেরে খেয়ে যেয়ো। পরের দিনের খাবার না নিয়ে যেতে চাও না-ই গেলে—রাতটা তো নিশ্চিন্তি!'

একটু হাসল সুরেন।

নানাদিক দিয়েই স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে চাইছে হেমন্ত—সেটা সে বুঝেছে, এ হাসিতে যেন সেইটেই জানিয়ে দিল। তারপর শুধু বলল, 'দেখা যাক। তবে তেমন খারাপ লাগলে অনেক সময় চান-সন্ধ্যেও করতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় কোথাও গিয়ে এখুনি শুয়ে পড়ি। কিন্তু সে-সব কথা আগে থেকে ভেবে লাভ নেই।'

হেমন্তর কথাটাই ঠিক। কিছুদিন পরে অনেকটা সহজ হয়ে এল সুরেন। এ-বাড়িতে এসে উঠল না বটে, তবে আসার মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেল। সপ্তাহের মধ্যেও এক-আধ দিন এসে পড়তে লাগল। রবিবারে তো—যে রবিবারে কলকাতায় থাকে—হয় সকালে নয় বিকালে একবার ক'রে আসেই। নিতান্ত আসবার মতো অবস্থা না থাকলে সে অন্য কথা। তাও, এক রবিবার কোন বন্ধুর বাড়ি কী কাজে সেওড়াফুলি যেতে হয়েছিল—তার আগের দিন শনিবার রাত্রে এসে দেখা ক'রে বলে গিয়েছিল।

তবে আজকাল প্রায়ই কিছু-না-কিছু হাতে ক'রে আনে, পিসীমা যা খেতে ভালবাসে এমনি সব—ডাঁসা পেয়ারা, যশোরের আতা, সিমলে থেকে একটু ভাল দই—এই ধরনের জিনিস। কুণ্ঠিত হয় হেমন্ত, বেচারীর অত দুঃখের হিসেব করা পয়সা এইভাবে খরচ করছে বলে, আবার আনন্দিতও হয়। কেউ তো এমন আনে নি কখনও, পূর্ণবাবু যাবার পর। কুণ্ঠিতই বেশী হয় যখন ওর সামান্য আয়ের কথা ভাবে, তবু বারণও করতে পারে না পাছে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

তবে এও সে জানে—হেমন্তকে চেনা ও জানার সুযোগ পাওয়ার পর তার আসাটা বেড়েছে বটে—কিন্তু কারণটা সে যা ভেবেছিল তা নয়—সম্পূর্ণ আলাদা। পিসীর প্রতি দয়া ক'রে—দয়া কথাটা নিজের কানেই আঘাত ক'রে—মমতাতেই আসে। পিসীটা যে কত দুঃখী, কত নিঃসঙ্গ, কী বিপুল শূন্যতা যে দিনরাত বহন করছে মনের মধ্যে—সংসার পাতার কত সাধ, অদৃষ্টের বিদ্রূপে ও বিরূপতায় সেই সাধই বার বার কী নিদারুণ পরিহাসে পরিণত হচ্ছে, কী নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক সে ভাগ্যের বক্রতা—এতদিনে সে

নানা প্রসঙ্গে অতীত দিনের টুকরো টুকরো নানা কাহিনীতে ভাল ক'রেই জেনেছে। সেইজন্যেই সে আসে, নিজের আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নয়, ভাল খেতে পাবে বলে আসে না। বরং এটা-ওটা—বলে বলে, ফরমাশের ছলে, নিজের বাড়ির মতো খাওয়ার জন্যে ওর মন কত ছটফট করে, সেই কথা শুনিয়ে—খাওয়াটা অনেক সাধারণ ক'রে এনেছে। নিরিমিষের দিকেই বেশী যায়—মোচার ঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, সুক্তো চচ্চড়ি ইত্যাদিতে। এইগুলোই ফরমাশ করে বেশী, খাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

এ-কৌশলটা যে হেমন্ত না বোঝে তা নয়। যাতে দু'বার ক'রে রান্নার বেশী ঝামেলা না থাকে, ওদের পাঁচরকম মাছ-মাংস রান্না ক'রে খাইয়ে নিজেকে না ভাতে-ভাত খেতে হয়।

এ-ব্যবস্থায় নিমাইচরণ খুশী হয় না তা বলাই বাহুল্য। পরিহাস-ছলে প্রকাশ্যেই অনুযোগ করে। বলে, 'তোমার দৌলতে বেশ খাওয়া-দাওয়াটা চলছিল, তুমি ঘোড়ার ডিম আবার সেই বিধবার খাওয়া ধরলে! থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়—সেই যে কী বলে না, তা এও তো সত্যি সত্যিই তাই। কী আছে এতে? এ তো চিরকালই খাচ্ছি। দেশে তো এ-ই। পুকুর কি বিলের ধারের শাক—নয়তো সজনেশাক আছে বারোমাস গাছে—খাড়া, ডুমুর, থোড়, কাঁচকলা—বাগানে যা হয়, বাজার করার তো ক্ষ্যামতা নেই—এর বেশী কিছু জোটে না। কোন বাবু কোনদিন পুকুরে ছিপ্ ফেললে তো মাছ। সে ধরো ন'মাসে ছ'মাসে একদিন। এই শাক-চচ্চড়ি খেয়েই জন্মকাটা বলতে গেলে।...অবিশ্যি নিরিমিষও জ্যাঠাই রাঁধে ভাল তা মানছি, চচ্চড়ি তো বলতে পারি অমন কেউ রাঁধতে পারবে না, রাজা পঞ্চম জর্জকে খাওয়াতে পারলে বিলেতের চাটিবাটি তুলে এই কলকেতায় এসে বসত—তবু এ তো খাচ্ছিই চিরকাল। এখন এই পাঁচরকম মাছ-টাছ পেলে আবার একটু নতুন হয় তবু উরি মধ্যে—'

'আমার আবার ঐ পুরনো খাওয়াটাই যে হয় না দাদা। বারো মাসই তো হয় ডাল-আলুভাতে, হয়তো একটা সেদ্ধপক্ক তরকারী,

এই তো বরাদ্দ। বাটনা বাটতে পারি না—যা করে ঐ কোঁড়ন ভরসা, তার সঙ্গে একটু নুন একটু মিষ্টি এই তো। মুখে যে সাতপুরু ছ্যাত্‌লা পড়ে গেল। বাড়ি যাই মাসে একদিন, তা ধরুন শনিবার রাত্তিরে গাড়ি চাপি, বাড়ি পৌঁছতে সকাল সাতটা বেজে যায়, আবার সন্ধ্যের মধ্যে না বেরোতে পারলে এখানে এসে সোমবার ভোরে পৌঁছতে পারি না। বাড়ির খাওয়া বলতে মা'র হাতের রান্না—মাসে ঐ এক বেলা। এর বেশী তো নয়।'

'আহা বাছা রে!' চোখের জল চাপার চেষ্টাও আর করে না হেমন্ত, 'এই কষ্ট ক'রে ঐ ক'টা টাকা!'

'এই ক'টা টাকাই বা পাচ্ছি কোথায় পিসীমা? ম্যাট্রিকটাও তো পাস করি নি। বাবার অবস্থা শুনেছেনই—পড়ানোর ক্ষমতাই ছিল না। লোকজনকে ধরে-ক'রে চেয়ে-চিন্তে পড়াবেন সে মানুষও নন, মুখচোরা লোক। নিজের চাড়ে যতটা হয় শিখেছি, তবু পাস করার সার্টিফিকেটখানা তো নেই। কাগজে-কলমে তো মুখ্‌খু! নেহাৎ একটু সুপারিশ ধরা গিছল বলে, বাবারই এক শিষ্য এখানের বড়বাবু, তাই, এইটুকু পেয়েছি। এ যদি যায়, এখন আর এ-মাইনের কাজও কোথাও পাব না বোধ হয়।'

এই ক'টা টাকা কেন—এর বেশীই দিতে পারে। হেমন্তই পারে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এর মধ্যে একদিন কথাটা পাড়তে গিয়েছিল, ঠিক দেওয়ার কথা নয়, সে সাহস হয় নি—একটু ঘুরিয়ে বলেছিল, 'আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবি বাবা, তুই যেদিন যাবি? দাদা বেঁচে থাকতে থাকতে মাপটা চেয়ে আসি!'

কথাটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল সুরেন। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে, নিমাই কাছাকাছি নেই দেখে বলেছিল, 'তা নিয়ে যেতে পারি, আপনাকে তো আর বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। কিন্তু আপনার সেখানে না যাওয়াই ভাল পিসীমা। না, আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হবে না, বাবা কোন কথা মনে ক'রেও বসে নেই, দেখে খুশীই হবে বরঞ্চ—আপনিই দুঃখ পাবেন। যে কষ্টে তারা আছে,

কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনটা চালাচ্ছে এই পর্যন্ত। দাদার আবার বিয়ে দিয়েছেন বাবা—খরচ বেড়েছে, আয় বাড়ে নি এক পয়সাও। অথচ না দিলেও চলে না, জমিজমাই বলুন, শিষ্যি-যজমানই বলুন, - সবই গেছে প্রায়, আজকাল কেউ ঘরোয়া গৃহী-গুরুর কাছে মন্তর নিতে চায় না। তাছাড়া ঠাকুর্দামশাই নষ্ট ক'রে গেছেন বেশির ভাগ—যা আছে দু-এক ঘর—দাদাকেই তো দেখতে হয়, উদয়াস্ত খাটুনি, তাঁকে কে দেখে? সেজন্যেই আরও বিয়ে দেওয়া—। মা অথর্ব হয়ে পড়েছেন, তিনিও তো এতকাল কম খাটেন নি, ঝিকে ঝি, রাঁধুনীকে রাঁধুনী—আমি তো বলি তুমি আমাদের ঠাকুরঝি—এখন সংসারে একটা লোকও দরকার। কলকাতায় এক রকম, ওসব জায়গায় গিয়ে বসা, কোন শিষ্যর হয়ত ছেলের অন্নপ্রাশন, আগের দিন বাঁকে ক'রে সিধে তেল ঘি পাঠিয়ে দিলে, কী সমাচার, না আপনাদের প্রসাদ ছেলের মুখে দোব। সে-সব তো চিরকাল মাকেই এক-হাতে করতে হয়েছে, এখন আর পারেন না।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে এবং বোধ করি পরের প্রশ্নটার জন্যে সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে বলে হেমন্ত, 'তা সে কষ্ট কি কিছু দূর করতে পারি না আমি?'

'সেই তো হয়েছে বিপদ। আপনি যে কেন যেতে চাইছেন তা কি আমি জানি না! তাদের কষ্ট দূর করতে চাইবেন সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু একটা বাধা আছে। বাবার দিকে বাধা। বাবা —বাবা যেদিন আপনার ওখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, ঠাকুর্দামশাই জানতেন যে, বাবা আপনার সন্ধানেই এসেছিলেন, মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আশা ছিল কিছু টাকা দেবেন আপনি, একটু ভালরকম চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা হবে তাঁর, ঐ ধরনের মানুষ ছিলেন তো, নিজের কথাটাই শুধু চিন্তা করতেন—বাবা কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর মুখ দেখেই ঠাকুর্দামশাই বুঝেছিলেন যে, বাবা অপমান হয়ে ফিরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি দিয়েছিলেন বাবাকে যে, এর পর কোনদিন আপনি কোন সাহায্য করতে গেলেও তিনি

যেন না নেন। কঠিন দিব্যি দিয়েছিলেন। এটা কেন করতে গেলেন, তা আমি বুঝি এখন, তবে গুরু-নিন্দা আর করব না—গুরুর গুরু। পরে হয়ত মত বদলে ছিল, আপনার সঙ্গে দেখাও করতে চেয়েছিলেন।—দেখা হলে হয়ত তিনিই হাত পেতে নিতেন কিছু, সেই রকমই ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছিলেন এদান্তে—আর তাহলে সে দিব্যিরও কোন মানে থাকত না, কিন্তু তা তো হয় নি, সে সময় সে-দিব্যির কথা কোন পক্ষের মনেও ছিল না—তাই সেটা কাটানোও হয় নি, থেকেই গিয়েছে।···নিহাৎ ছেলেমানুষী, আমি ওসব মানি না, তবে বাবাকে তো চেনেনই। ঠাকুর্দামশাইয়ের আদেশ বেদবাক্যের থেকেও অলঙ্ঘ্য।'

এর পর নীরবে বসে চোখের জল ফেলা আর অনুতাপ ছাড়া পথ কি?

আর যেতে চায় নি সেখানে। সুরেনের কথাই ঠিক। শুধু শুধু দুঃখ বাড়াতে গিয়ে লাভ কি? কিছুই করতে পারবে না, মাঝখান থেকে তাদের অন্নধ্বংসে আসা!

বোধহয় বহুদিন ধরেই মনের মধ্যে মাথা কুটছিল কথাটা। মুখ ফুটে বলতে পারে নি হেমন্তকে। সাহসে কুলোয় নি। জানে - গালা-গাল তো খাবেই, দু-চার ঘা মারধোরও এই বুড়ো বয়সে খাওয়া আশ্চর্য নয়। হয়ত তদ্দণ্ডেই দূর ক'রে দেবেন। 'বেরোও আমার বাড়ি থেকে হারামজাদা, দূর হয়ে যা!' বললেই হল, সে মেয়াদের ওপর আপীল চলবে না আর।

প্রধানত এই ভয়েই বলতে পারে নি।

এতদিন পরে সুরেনের প্রতিপত্তি দেখে, তার প্রতি টান-ভাল-বাসার 'আদিখ্যেতা' দেখে, তাকেই পাকড়াও ক'রে ধরল নিমাইচরণ। টান আরও একজনের ওপর ছিল—গোরা—কিন্তু থাকলে সে-ই করুণার্থী হয়ে থাকত, সে আর তার হয়ে কি ওকালতি করবে! তাছাড়া তারও স্বার্থের সম্পর্ক। ভাগীদার বাড়ানোতে তারই অসুবিধা বরং। এসব কথা ছেলেমানুষ ভাইপোকে দিয়ে

বলানোও যায় না। বলতে গেলে শুধু সেইজন্যেই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত।

সেদিক দিয়ে সুরেন সম্পূর্ণ নিরাপদ। সে দয়ার প্রার্থী নয় জ্যাঠাইয়ের। তাকে প্রার্থী করার জন্যে জ্যাঠাই-ই তার করুণার প্রার্থী। সে বিষয়ের ভাগ চায় না, এই ঐশ্বর্যে তার লোভ নেই। এ-নিরাসক্তি যে ঢং নয়, ন্যাকামি নয়, তা ভাল ক'রেই বাজিয়ে দেখেছে নিমাইচরণ। সত্যিই, নিজের খাটাকড়ি ছাড়া কিছু চায় না—পড়ে-পাওয়া টাকা-পয়সায় কোন লোভ নেই ছেলেটার। সুতরাং নিমাইচরণের বিয়ে দিয়ে ছেলে-বৌ নিয়ে সংসার পাতলে তার ঈর্ষার কোন কারণ হবে না বোধহয়—বাগড়া দেবার চেষ্টা করবে না।

তাই সুরেনকেই ধরল একদিন নিমাই—সটেপটে। এ-বাড়িতে ফাঁক পাওয়া শক্ত, সেই জন্যে সেদিন আপিসের পর ওর সেই সার্পেন্টাইন লেনের বাসাতে গিয়েই হাজির হল।

'এলুম ভাই তোমাকে একটু বিরক্ত করতে। তুমি বোধহয় রাগ করছ, রান্না-বান্নার দেরি হয়ে যাবে, কাজের সময় আগড়োম-বাগড়োম বকতে এলুম বলে—তা ভাই আমি নাচার, আমারও ধরগে কথাটা না বললে নয়।'

'না না, সে কি কথা! রাগ করব কেন? এমন কি আর, আমার বন্ধু-বান্ধবরা আসে না! এই তো পাশের ঘরের বিশ্বনাথবাবুই—কোন কাজ নেই, কর্ম নেই, আপিং খান আর ঝিমোন,—হঠাৎ কোন কোন দিন মনে হয় আমি একা আছি, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে,—এসে বিছানা-জোড়া ক'রে বসেন, আমাকে নানারকম সাংসারিক সদুপদেশ দেন—যদিও নিজে সে-সব সৎ-আদর্শ মানেন নি—নিজের জীবনবৃত্তান্ত শোনান, রাত এগারোটার আগে নড়েন না। তাই বা কি করছি বলুন? আপনি কিছু কুণ্ঠিত হবেন না। তবে দাদা, পাঁচটা মিনিট বসুন, এখনও দেখছি কলে জলটা আছে, দু'ঘটি মাথায় ঢেলে আসি চট ক'রে। এ-ভাগ্যি প্রায়ই হয় না, মানে হয়ে ওঠে না।

চৌবাচ্চার জলে আর চান করতে ইচ্ছে করে না ; যা বারোভূতে নোংরা ক'রে রাখে—সকলকার চানের জল সাবান তেল তো পড়ছেই —কাক্-চিলের ময়লা তার ওপর ফাউ।'

বলতে বলতেই গামছাটা টেনে নিয়ে দৌড়য়। চান ক'রে এসে বারান্দায় তোলা উনুনটা ধরিয়ে একেবারে ঘরে এসে বসে, বলে, 'বলুন, দাদা, কী হুকুম ! ··তবে চা-টা কিছু খাওয়াতে পারব না, ও-পাট নেই। বসেন একটু তো মোড়ের দোকান থেকে মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে আসি কিছু।'

'না না, ওসব কিচ্ছু করতে হবে না।···এমন সময়ে মিষ্টি খেলে অম্বল হয়ে যাবে। তুমি থির হয়ে ব'সো। · হেঁ হেঁ—হুকুম-টুকুম কিছু নয়, তুমি বলো বেশ কিন্তু, মাইরি—তা নয়, আমি এসেছি তোমাকে একটু সুপারিশ ধরতে।'

'আমি ? সুপারিশ ? বলেন কি দাদা, আমার হয়ে কে সুপারিশ করে তার ঠিক নেই ! বলে যে টিকে ধরাতে জামিন লাগা, আমারও তো সেই অবস্থা, আমি আপনার কি কাজে লাগব ?'

'আছে আছে, তাও আছে। তেমন পাত্তর না জেনে কি বলছি ! তুমি ওকালতি করলে মামলা ফতে হবে—এমন আদালতও আছে বৈকি !···হেঁ হেঁ, বলছি কি তোমার এই পিসীর সব ভাল, কেবল আমার বিয়ের নামটি করে না কেন বলো তো ? এতদিকে এত বিবেচনা, তোমাদের দুঃখু-কষ্ট দেখে তো ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বেস ফেলে অনবরত—আমার কথাটা মনে পড়ে না তো কৈ ? অথচ আমি তো পায়ের তলার জুতো হয়ে, জুতোর সুখতলা হয়ে পড়ে আছি বলতে গেলে। আমার কথাটা একটু মনে করা উচিত ছেল না ? এদিকে আমার যৈবন যে যেতে চলল। বয়েসটা কি আর কম হল ? জোয়ারে না বেয়ে কি ভাঁটায় বাইব ? সে যে ব্যাভ্রম হতে হবে শেষ-মেষ ! বৃদ্ধস্য তরুণী ভাজ্জা যাকে বলে !'

এই বলে একটু থেমে, সুরেনের দিকে খানিকটা অপ্রতিভভাবে চেয়ে থেকে, অকারণেই খানিকটা হেঁ হেঁ ক'রে হেসে নেয়। তারপর

আবার বলে, 'তাই একটু বলছিলুম কি—ভাগ বুঝে তুমি একবার কথাটা পাড়ো না একদিন! মনে করিয়ে দাও না! হয়ত মনেই নেই, বড্ড কাছে থাকি তো, এত কাল আছি—আমার যে মানুষের শরীল, আর মানুষের শরীল হলেই শরীলের ধম্মও থাকবে—এইটেই হয়ত মনে পড়ে না।...আর, আমার বে না দিলে আমার বংশ না থাকলে—ওর পয়সা খাবেই বা কে? যক্ দিয়ে যেতে হবে যে মরার সময়। হেঁ-হেঁ!'

এসব কথা ভাল লাগে না সুরেনের। সে চুপ ক'রে থাকে খানিকটা। তারপর বলে, 'এসব কথা আমার তোলা কি ভাল? আমার সঙ্গে সম্পর্ক যা-ই হোক—দু'দিনের তো পরিচয়। আপনি এতকাল—আছেন ছেলের মতো—আপনার জোর ঢের বেশী। দেখি তো, আপনার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেন।'

'না না ভায়া, বোঝ না। ঐ পজ্জন্ত। নিভ্ভর করেন, কাজ থাকলে বলেন—তার পর আর মনে থাকে না। বলে কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলেই পাজী। তুমি এখন নতুন হাজার হোক, অনেক বেশী পেয়ারের। তুমি বললে সাতখুন মাপ! আমি বলতে গেলে হয়ত তেড়ে মারতেই আসবে। এদান্তে যা মেজাজ হয়েছে! সেদিন, এই তো পুরী থেকে আসবার দিন—কুলীটা মাল নিয়ে আসতে আসতে বাসনের থলেটা ফেলে দিয়েছেল, ফেলে দিয়েছেল মানে তোরঙ্গের ওপর থেকে গইড়ে পড়ে গেছল, ছেঁড়া কাপড় পোরা ছেল দেদার—একটা বড় সাণ্ডরীর কানা ছাড়া কিছু ভাঙে নি—তা সে তো পরের কথা, খুলে দেখে তো বিচের—এমন টেনে এক চড় কষিয়ে দিলে, সাজোয়ান হিন্দুস্থানী কুলী 'বাপ' বলে বসে পড়ল। সে কী কাণ্ড ইস্টিশানে—ভীড় জমে গেল রীতিমতো।...হেঁ হেঁ!'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুরেন বলল, 'বলেন আমি বলতে পারি। তবে যেমন ভাবে আপনি বললেন, ওভাবে বলতে পারব না।'

'তা সে ভাই তুমি যেমন ভাল বোঝো ব'লো। তুমি বেশ

গুছিয়ে মিষ্টি ক'রে বলতে পারো, সে আমি দেখিছি। হাজার হোক পণ্ডিতের বংশ তোমাদের, নিজেও ঢের বই-টই পড়েছ, তোমাদের কাছে আমরা ? হেঁ-হেঁ—'

আরও কিছুক্ষণ সুরেনের সময় নষ্ট ক'রে, রান্না সম্বন্ধে নানান জ্ঞান দিয়ে যখন বিদায় নিল নিমাই—তখন উনুনের প্রথম আঁচটা পড়ে গেছে। আবার অতি দুঃখের কয়লা চাট্টি খরচ ক'রে বাতাস দিয়ে তবে আঁচ তুলতে হল সুরেনকে।

পরের রবিবারেই কথাটা হেমন্তকে বলল সুরেন।

সবই বলল—যা যা বলেছিল নিমাই। ওরই মধ্যে একটু ঘষা-মাজা মোলায়েম ক'রে নিয়ে। মায় তার বংশরক্ষা না হলে হেমন্তরও যে বিপদ—সে-কথাটা সুদ্ধই বলল।

ওকে আসতে দেখেই নিমাইচরণ বাজারে বেরিয়ে পড়েছিল, বলার অবসর দিয়েই, সুতরাং সব কথা বলারও কোন অসুবিধা হল না।

কথাটা শুনে কিন্তু হেমন্ত রাগ করল না, ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠল না, গালিগালাজও করল না, বরং যেন চিন্তিতই হয়ে উঠল। কুট্নো কুটতে কুটতেই শুনছিল কথাগুলো, আরও খানিকটা নিঃশব্দে বসে কুমড়ো ডাঁটার আঁশের মতো খোসা ছাড়াবার পর—ঈষৎ একটু অপ্রতিভ ধরনের হাসি হেসে বললে, 'তা বটে! আমার না-হয় সব ঘুচে-পুচে গেছে, তাই বলে ও-ও এই বয়সে মানব-জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচিয়ে বসে থাকবে, বিধবা হয়ে—তা তো আর সম্ভব নয়। · আমারই কথাটা ভেবে দেখা উচিত ছিল। তবে কি জানিস, আবার এই সব ঝঞ্ঝাটে জড়াতে আর ভাল লাগে না, ভয় করে। হবে যা তা তো বুঝতেই পারছি, মিছিমিছি ওদের জীবনটাও হয়ত মাটি হয়ে যাবে আমার বরাতের সঙ্গে বরাত জড়িয়ে।···এই তো একজনকে নিয়ে নতুন ক'রে সংসার গড়তে গিছলুম, আমার তো প্যাজ-পয়জার-গুনোগার হলই—সে ছোঁড়াটার জীবনও নষ্ট হয়ে

গেল। কোথায় হয়ত ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছে, কিম্বা চুরি ক'রে জেল খাটছে—কে জানে!...আমি যা কিছু করতে যাব—শুধু অশান্তিই বাড়বে, আর কোন লাভ হবে না।'

সুরেন আস্তে আস্তে বলে, হেমন্তর ব্যথাটা বুঝেই, 'কিন্তু জড়িয়েছেন যখন, এতকাল কাছে রেখেছেন আশ্রয় দিয়ে, তখন এটুকু ঝুঁকিও নিতে হবে, নইলে কর্তব্যের হানি ঘটবে না কি?'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন! আগেই হয়ত সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা যখন হই নি—তখন দুর্বুদ্ধির খেসারৎ দিতে হবে বৈকি! আসলে সবই মহামায়ার মায়া, আশা গিয়েও যেতে চায় না।· দেখি, আবার সমরাঙ্গনে নামি বিধাতার সঙ্গে, দেখি তিনি জেতেন কি আমি জিতি!'

তারপর কুট্‌নোগুলো রান্নাঘরে ঠাকুরের কাছে দিয়ে বলে, 'তুমি বাকী সব রান্না কর, চচ্চড়িটা আমি রাঁধব। আমার হাতের চচ্চড়ি খেতে ভালবাসে তোমার এই দাদাবাবু।...তোমার হলে আমাকে ডেকো, আমি সব সরিয়ে নিলে তুমি মাছটা রেঁধে রেখে চলে যেয়ো। কেমন?'

তারপর ফিরে এসে বঁটি কুট্‌নোর ঝুড়ি গুছিয়ে তুলে রাখতে রাখতে বলে, 'তা বাবা ছাখ্ না একটা মেয়ে গরীবের ঘরের-টরের—ঐ তো বাঁদর পাত্তর, কে-ই বা ভাল মেয়ে দেবে!...তোদের যদি জানাশুনো কেউ থাকে—আমি এক পয়সা চাই না, নোবও না। শুধু একগাছা কড় পরিয়ে বে দিলেও নোব। মেয়েটা একটু ভাল হয়, দেখতে-শুনতে যত না হোক, স্বভাবটা ভাল হয় এইটেই চাই। জানাশুনো ঘরের হলে নিশ্চিন্তি হয়ে নিতে পারি। একটু ভেবে ছাখ, তেমন কারও কথা মনে পড়ে কিনা!'

'দেখি! এই তো বললেন। মাকেও লিখি না হয়।'

সুরেন নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল দু'টোর দিকে চেয়ে উত্তর দেয়।

হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছিল, এতক্ষণ নিজের মনের মধ্যেই ভাবছিল কিছু। ভাবছিল কথাটা পাড়বে কিনা, মানে এই পাত্রের সঙ্গে। যে বংশের ছেলে—তাদের বিবরণ তো কিছু কিছু শুনেছে—বাবার মুখে, কাকার মুখে—এই পিসীর মুখেও। তার পরও এ পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করা ঠিক হবে কিনা, চিরজীবনের মতো দায়ী অপরাধী হয়ে থাকতে হবে কিনা—মনে মনে বোধ হয় এই কথাটাই তোলাপাড়া করছিল, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াও একটা।

শেষে সন্ধ্যার পর, বলেই ফেলল কথাটা।

'একটি মেয়ে আছে পিসীমা, বড় পিসীমার ভাগ্নী হয় সম্পর্কে। আপন নয়—মাসতুতো ননদের মেয়ে।···এরা তো চাটুজ্যে—না? তা হলে হবে, মেয়েরা মুখুজ্যে।'

'কি রকম মেয়ে, তুই দেখেছিস? তারা একে দেবে—নিমেকে?'

'মেয়ে আমি চোখে দেখি নি, তবে যে দেখেছে সে-ই বলে খুব ভাল দেখতে। সাকারা সুন্দরী নয় হয়ত—খুব চটক আছে। অনেকে সুন্দরীই বলে। শুধু তাই নয়—মেয়ে এখানের ভাল ইস্কুলে থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ছিল, একটু-আধটু গানও জানে নাকি। মানে তেমন—যাকে শেখা বলে তা শেখে নি—তবে ওদিকে খুব ঝোঁক আছে, একবার শুনলেই নাকি তুলে নিতে পারে, গলা মিষ্টি, সুরের জ্ঞান আছে।'

'ছ্যাৎ! সে মেয়ে কখনও এই রূপী বাঁদরের হাতে দেয়! মিছিমিছি ওকথা তুলে লাভ কি?' হেমন্ত হতাশার সুরে বলে।

'আছে, এর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড 'কিন্তু' আছে, নইলে কথাটা তুলতুম না। ভদ্রলোক, মানে পিসীমার নন্দাই অবিনাশবাবু না কি যেন নাম, অবিনাশই বোধ হয়—কলকাতায় বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতেন, কি এক বাঙালী বাড়ি কাজ করতেন। বাঙালী বাড়ির চাকরী হলেও ভাল মাইনে ছিল নাকি—শতাবধি টাকা পেতেন মাসে। তা ছাড়া উপরিও ছিল কিছু, বিল পেমেণ্ট নিতে আসত যারা, শতকরা এক টাকা দস্তুরি দিয়ে যেত, সেইটে জমে বছরের

শেষে কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ হত। তাতেও শ'-দুই টাকার মতো হত প্রায়, পুজোর সময় সেটা হাতে পেতেন। হঠাৎ মালিক মরে গিয়ে দুই-তিন ভাইপো এসে গদীতে বসল, ভাইয়ে-ভাইয়ে রেষারেষি ক'রে দেদার চুরি শুরু করল নিজেরাই। যে কারবারে মাসে পাঁচ-ছ' হাজার টাকা মুনাফা হত, সেই কারবার দেড়বছরের মধ্যে ফেল হয়ে দেউলে খাতায় নাম লেখাল, আদালতের লোকে এসে চাবি দিলে—এক কথায় মেসোমশাইয়ের চাকরীটা গেল। সেই থেকেই বেকার—তখনকার দিনে বড়বাবুকে ধরে চাকরীতে ঢোকা, ম্যাট্রিক পাস-টাস কিছু নয়, বুড়ো বয়সে—এখন প্রায় পঞ্চাশ-একান্ন বছর বয়স হল—কে চাকরী দেবে? সরকারী চাকরী তো হবেই না, যেটা হতে পারত বাঙালী বাড়ির কাজ—তাও এখন সবাই সন্দেহ করে, মালিক পক্ষ নিজেরা চুরি ক'রে ব্যবসা ফেল করেছে এ কেউ বিশ্বাস করে না। ভাবে ভাইপোরা নতুন লোক, বুড়ো গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর—মনিব মরতে না মরতে এই সব বুড়ো ঘুঘুর দল লুটে-পুটে খেয়ে নিয়েছে।'

'মেসোমশাইয়েরও আহাম্মুকি' একটু থেমে হেসে বলে স্বরেন, 'এইখানে এক বছর ধরে ভাড়া গুনে বাসা বজায় রেখে ঘুরেছেন চাকরীর জন্যে, এক বছরেরও ওপর—ফলে সর্বস্বান্ত। কত টাকাই বা থাকে বলুন! দিন-আনা দিন-খাওয়া কেরানীর ঘরে? শেষে মাসীমার গায়ে সোনারত্তি বলতেও যখন কিছু রইল না তখন হুঁশ হল। ওঁর আর এক ভায়রাভাই বলে-কয়ে এই রাজগঞ্জের কাছে এক চালের কলে একটা তিরিশ টাকা মাইনের খাতা-লেখার কাজ যোগাড় ক'রে দিয়েছেন। তাতেও হত না, মালিক একটু জমিদার-মতোও বটে, তাঁর ঠাকুরবাড়ির এক পাশে, বোধ হয় এককালে পুজুরীদের জন্যে তৈরী হয়েছিল, আসল পুজুরী তো থাকেনই একটা অংশে, এ বাড়তি—সেইখানে দু'টো ঘর দিয়ে রেখেছেন বিনা ভাড়ায়। এখন শুনছি ছেলেমেয়েগুলোর ওপর একটু নজর পড়েছে—দেখতে ভাল সবাই নাকি, স্বভাবও খুব ঠাণ্ডা—ছোট

ছু'টোকে ওখানের ইস্কুলেও ভর্তি ক'রে দিয়েছেন। তাছাড়া যদিও বাবুরাও ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলী, তবু ব্রত-পার্বনের ছুতোয় বড় বড় সিধেও পাঠান প্রায়ই, কাপড়-চোপড় চাল-ডাল। তাইতেই এক রকমে যোগেযাগে চলছে ওঁদের, বলতে গেলে পরের দয়ার ওপর—'

দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত ক'রে চুপ করল সুরেন। চোখ ছু'টো ওর কিন্তু এখনও নিজের সেই পায়ের নখ ছু'টোর ওপর নিবদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে একবারও পিসীর মুখের দিকে তাকায়-নি।

হেমন্তও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর নত মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তুই এত কথা জানলি কি ক'রে? দিদি তো নেই, এত ছিষ্টির কথা তোকে বললেই বা কে, আর কেনই বা বলতে গেল? নিশ্চয় তোর সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিল কেউ?'

যেন চমকে উঠল সুরেন, ঈষৎ ত্রস্তভাবে চোখ তুলে পিসীর দিকে তাকাতেই তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা চোখে পড়ল, তার ফলে যেন আরও বিব্রত আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল—এই অন্তর্যামীর মতো কথা বলাতেই এত ভয় তার—তার পর আবার মুখ নীচু ক'রে বললে, 'আপনি যা গণকঠাকুরের মতো বললেন, আপনার কাছে আর গোপন করব না। হ্যাঁ, তাই।'

আবারও হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে হেমন্ত।

'তোর যেমন কথা! তোকে যে পাত্তর ধরতে এসেছিল সে কখনও নিমেকে দেয় ঐ মেয়ে, বানরের গলায় মুক্তোর মালা!'

'কেন? বা রে!' এবার যেন গলায় একটু জোর পায় সুরেন, 'নিমাইদা খারাপ পাত্রটা কিসের? প্রায়-সরকারী চাকরী করে, দেশেও যা-ই হোক গিয়ে পড়তে পারলে কিছু ধানচাল পাবে,—তারপর হয়ত আপনার এই বিষয়ও ওতেই অর্শাবে যদি বনিয়ে চলতে পারে। আমার চেয়ে তো ভাল পাত্র পিসীমা!'

'হ্যাঁ! কিসে আর কিসে। শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার ল্যাজে! অজ মুখ্খু, ক-অক্ষর গোমাংস। মেয়ে বলছিস থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়া, গান জানে, সুন্দরী—'

'মুখ্‌খু তো আমিও পিসীমা। যতই যা পড়ে থাকি, পাসের ছাপ তো নেই, সেখানে দু'জনেই সমান। চাকরীর বাজারে দু' আনা এক আনার তফাৎ কেউ দেখে না। দরখাস্ত লিখতে গেলে দাদাও লিখবেন রেড আপ টু দি ম্যাট্রিক ক্লাস—আমিও তাই।'

'দেখতে-শুনতেও তো একটা কথা আছে!' হেমন্ত তবুও বলে, 'তোর মতো রূপবান ভদ্র জামাই যে খুঁজতে এসেছিল—'

বাধা দিয়ে স্বরেন বলে, 'সে যখন হবার জো নেই তখন আর সেকথা ভেবে লাভ কি বলুন! তাছাড়া রুপো যখন নেই ঘরে, জামাইয়ের রূপ খুঁজতে এলে চলবে কেন? এই তাই—যদি আপনারা দয়া ক'রে নেন—নইলে কি আর ঐ মেয়ের বিয়ে হবে ভাবেন? যতই ভাল মেয়ে হোক, একেবারে ডোমের চুপড়ি ধুয়ে ঘরে তুলতে কেউ রাজী হবে না। ঐ যে বাবুরা অত ভালবাসেন, দয়া করেন—কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন তাই বলে?'

'তবে ছাখ—যদি দেয়। চিঠি লিখে ছাখ।...বিশ্বাস তো হয় না।'

হেমন্ত যেন মেয়ের রূপগুণের বিবরণে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে।

মনোরমার মতোই আর একটা জংলী বৌ আসবে হয়ত—এই তার মস্ত ভয়।

॥ ২২ ॥

সাতদিনের মধ্যেই খবর এসে গেল। কন্যাপক্ষ খুব রাজী—তবে খরচ কিছুই করতে পারবেন না। দানের বাসনটা দেবেন, তাও সব সাজিয়ে দিতে পারবেন না হয়ত—মোটামুটি থালা বাটি গেলাস গাড়ু ঘড়া এগুলো দেওয়া যাবে, বর-কনের কাপড় আংটিও হয়ত ভিক্ষে-দুঃখু ক'রে যোগাড় হয়ে যাবে—কুড়ি-পঁচিশটি বরযাত্রীও খাওয়াতে পারবেন কোনরকমে—তার বেশী একটি পয়সাও খরচ

করতে পারবেন না। মেয়ের হাতে দু'গাছা পেটি আছে, কানে একজোড়া ক্ষয়াঘষা ফুল, সেগুলো অবশ্য খুলে নেবেন না, তবে ঐ পর্যন্তই 'ইতি', ঐ দিয়েই সালঙ্কারা করবেন।

হেমন্ত এতেই হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পায়।

'খুব, খুব! খুব রাজি আমি। যা শুনছি মেয়ে যদি সেরকম হয়—পৌনে রকম হলেও চলবে—আমি ওদের ঘরখরচা সুদ্ধ দিতে রাজী আছি। আমি আগেই বরং গয়না পাঠিয়ে দোব, দু-একটা গয়না শাড়ি, যা বলে।'

'আরে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আগে মেয়ে দেখুন। সবই তো শোনা কথা পিসীমা।'

'মেয়ে দেখা? তাই তো! সে আবার কে যাবে! তোকেই যেতে হয় তাহলে!'

'আমি—!' আঁৎকে ওঠে প্রায় সুরেন, 'আমি যাব কি! না, না। সে আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন। এ ঝুঁকি আমি নিতে পারব না।'

'কী ব্যবস্থা করব বল? আমার কে আছে আর? এক যদি ডাক্তারবাবু থাকতেন তো কথাই ছিল না। আর যারা ছিল, কর্মসূত্রে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তারা একে একে অনেকেই চলে গেছে, যাও-বা দু'চারজন বেঁচে আছে, অন্তত বিশ-বাইশ বছর কোন সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে। এখন তাদের কাকে গিয়ে বলব—আমার হয়ে মেয়ে দেখে এসো! এখন যাদের সঙ্গে কাজ—এ্যাটর্ণী রাজমিস্ত্রী চুনসুরকীওলা—তাদের তো আর একথা বলা যায় না।'

'তা হলে যার বিয়ে সে-ই দেখে আসুক না!'

'না না, ছিঃ! ও কী দেখবে? তাছাড়া ওকে দেখলে, কথাবার্তা শুনলে আর তারা মেয়ে দেবে না। আর, ওর আর দেখাদেখি কি? ওকে একটা বাঁদরী ধরে দিলেও পরমপদার্থ করবে—বাপের সঙ্গে বর্তে যাবে।'...

সুরেন বিব্রত বিপন্ন মুখে চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ।

এমন প্রস্তাব আসতে পারে জানলে সে এ কথা পাড়তই না বোধহয়।

হেমন্তই ওকে নীরব দেখে ওর একটা হাত চেপে ধরল। 'হেই বাবা, দোহাই তোর, একবারটি যা!'

সুরেন বলল, 'পিসীমা, আপনি কথাটা বুঝছেন না। একে অল্পবয়িসী ছোকরাদের কেউ মেয়ে দেখাতে চায় না, তায় প্রবীণ কেউ থাকলেও কথা ছিল—একজন ভারিক্কি লোকের সঙ্গে দু-একজন ছেলেছোকরা গেলে তত দোষ হয় না—তার ওপর, মানে আমার সঙ্গে একবার কথা উঠেছিল, সেই আমিই যাব সে-মেয়ে দেখতে—না না, সে বড় বিশ্রী!'

'তাহলে কী করব বল? এক্ষেত্রে মেয়ে না দেখেই বিয়ে ঠিক করতে হয়!'

'তার চেয়ে আপনি কেন চলুন না? আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজী আছি।···আমি বাইরে থাকব, আপনি ভেতরে গিয়ে মেয়ে দেখে নেবেন—'

'না রে, সে বড় খারাপ দেখায়। একেবারে কেউ কোথাও নেই, নিমুড়ো-নিছ্ড়ো—সেইটেই আরও ভাল ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়।···শুনেছে, জানতেও পারবে—তবু গোড়া থেকেই—। একটা মাগী যাবে ধ্যাং ধ্যাং ক'রে মেয়ে দেখতে—না না, সে বড় লজ্জা আর অপমানের কথা।'

চুপ ক'রে থাকে সুরেন।

কী বলবে কী করবে কিছুই ভেবে পায় না।

শেষে হেমন্তই প্রস্তাবটা দেয়, 'হ্যাঁ রে—তা তোর আপিসে এমন কোন প্রবীণ লোক-টোক নেই, যাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারিস? বলবি যে, আমার এক দাদার জন্যে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি—আর কেউ নেই তেমন যাবার মতো—আপনি দয়া ক'রে চলুন একবার। আমি যাওয়া-আসার সব খরচ দোব। ট্যাক্সী করে নিয়ে যাস বরং।··· রাজগঞ্জ তো ষ্টীমারে যেতে হয়?—চাঁদপালঘাট থেকে ছাড়ে, না?

সে ভাড়া, যাওয়া-আসা ট্যাক্‌সী, সেখানে যদি পাল্‌কি লাগে—ওখানে এখনও পাল্‌কির চল আছে শুনেছি—সব আমি দোব। যাতে কোন কষ্ট না হয় তাই করিস, খরচের জন্যে কোন ভাবনা করতে হবে না।'

'না, আপিস থেকে কাউকে নেওয়া যাবে না।' চিন্তিত অন্যমনস্ক-ভাবে উত্তর দেয় সুরেন। মনে হয় মুখে কথাগুলো বলতে বলতেই অন্য কোন কথা ভেবে নিচ্ছে, 'এমনিই আপিসে সবাই বিয়ের কথা বলে দিনরাত—অনেক বামুন আছে তো, তারা প্রায় সবাই—কেউ শালী, কেউ বোন, কেউ মেয়ের জন্যে নিত্যিই ঘ্যানঘ্যান করে। আমার বিয়ের অবস্থা নয় শুনলেও বিশ্বাস করে না। তার ওপর এই কথা তুললে আপিসময় জানাজানি হয়ে ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে। সবাই ভাববে দাদা-টাদা বাজে কথা—আমার নিজের দাদার বিয়ে হয়ে গেছে তাও সবাই জানে—নিজের জন্যেই মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। সবাই টিটকিরি দেবে, নানান কথা কইবে, যাঁরা নিজেদের ঘরের পাত্রীর জন্যে দরবার করছিলেন, তাঁদের মুখ হাঁড়ি হবে। না পিসীমা, সে সম্ভব নয়।···তবে আমি আর-একজনের কথা ভাবছিলুম—'

এই বলে একটু যেন অপ্রতিভের হাসি হেসে বলে, 'আমার পাশের ঘরে যে বিশ্বনাথবাবু আছেন, এমনি ভদ্রলোক—খুব উঁচুঘরের ছেলে তো—কথাবার্তায় খুব চোস্ত; সভায় বসিয়ে দিলে দরবার-জিতে বেরিয়ে আসবে। দোষের মধ্যে কুঁড়ে—কাজে ভীষণ ভয়। ইচ্ছে ক'রে ক'রে চাকরি ছেড়েছে একটার পর একটা—ভাল ভাল চাকরি। আর প্রচণ্ড আপিঙের নেশা, রোজ গুলি খেলার মার্বেলের মতো দু'-ডেলা আপিঙ লাগে। ফলে ছেলেমেয়ে স্ত্রী কারও সঙ্গে বনে না, দিনরাত খটাখটি—ঐখানে আলাদা পড়ে থাকেন। একবেলা হোটেলে খান আর একবেলা বেগুনি ফুলুরি ভরসা। ছেলে ভাল কাজ করে, মাসে মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে দেয়—তা হলে কি হবে, সর্বস্ব আপিঙ খেতেই চলে যায়, মাসের শেষ চার-পাঁচদিন শুধু বেগুনি আর চা খেয়েই কাটে, কারণ ও-দু'টো ধারে

পাওয়া যায়।···এক-আধদিন আমি এক-আধখানা রুটি দিই, তাতেই ড্যাম গ্ল্যাড—তা আমার আর কত ক্ষমতা বলুন? জামা-কাপড় ভাই-ভাইপোদের কাছে চেয়ে-চিন্তে চলে। আগে তারা টাকাই দিত, সে-টাকাতেও আপিঙ খেয়ে শতছিন্ন জামা-কাপড় পরে বেড়ান দেখে এখন সেয়ানা হয়ে গেছে, কাপড়-জামা-ই দেয়—তাও নতুন আনকোরা নয়, নিজেরা এক-আধ ধোপ পরে দেয়, নইলে তাও হয়ত বেচে দেবে। কতকটা রেসের নেশার মতো ব্যাপার।···তাঁকে বললে এখুনি রাজী হয়ে যাবেন। একটা ভদ্র জামা-কাপড় পরিয়ে যদি নিয়ে যাওয়া যায়—ট্যাক্সী ভাড়া লাগবে না, ওঁকে ট্রামেই নিয়ে যেতে পারব—বরং আপিঙ খেতে একটা নগদ টাকা দোব বললে নাচতে নাচতে যাবেন ভদ্রলোক। এমনিও, আমি বললে ঠিক যাবেন।'

'বেশ তো, তাহলে তো খুব ভাল হয়। যদি তেমন বুঝিস তো—আমি টাকা দিচ্ছি—ভাল জামা-কাপড় কিনে দে—? বড় বংশের ছেলে বলছিস, ঐ রকম লোকই তো এসব কাজে দরকার।···তাই একটু বলে ছাখ বাবা!'

'দেখি! তবে নতুন জামা-কাপড় লাগবে না, এক প্রস্থ সম্প্রতি পেয়েছেন এক ভাইপোর কাছ থেকে, কাচানো ধোপদস্ত—আমি কালও দেখেছি, মাথার কাছে মাটিতে পড়ে আছে বিছানার পাশে। বাক্‌স-প্যাঁটরার তো বালাই নেই, যা করে ঐ মাথার কাছে খবরের কাগজ পেতে—ও-ই ঘরগেরস্তালী ওঁর।'

মেয়ে দেখতে যাওয়ার আগে যে কথাই মনে থাক, যত ঔদাসীন্য বা নির্লিপ্ততা, অথবা সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতদূর কল্পনা—এখন সামনা-সামনি দেখে যেন বুকে একটা ধাক্কা খেল সুরেন।

ঠিক এ মেয়ে দেখবে বলে প্রস্তুত ছিল না সে।

দেখে প্রথম যে-কথাটা মনে এল—ফুটন্ত ফুল একটি।

সাধারণ কোন ফুল নয়, পদ্ম কি উঁচুজাতের গোলাপ কিংবা

ম্যাগনোলিয়া—এই ধরনের রাজসিক ফুলের কথাই মনে পড়ে যায় একে দেখে।

কোন তথ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাঁশীর মতো নাক, কি সপ্তমীর চাঁদের মতো কপাল, কি পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ—এ-সব কিছুই খুঁটিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখার কথা মনে রইল না, লক্ষ্য ক'রে দেখলে হয়ত নিশ্চয়ই কিছু খুঁত বেরোত, শুধু দেখার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণকালের জন্যে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর।···সম্প্রতি একটা কি ইংরেজী বইতে পড়েছে breath-taking beauty—সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল—বুকে আঘাতটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে।

তার পর আর অনেকক্ষণ চাইতে পারল না সেদিকে।

না চাইতে পারার অনেক কারণ—কিন্তু সেও তখন হিসেব ক'রে দেখার অবস্থা নয়। তবে একটা কারণ সুপ্রত্যক্ষ।

পাত্র। পাত্রের কথাটা ভেবেই যেন শারীরিক একটা কষ্ট হতে লাগল তার।

একটা অনুশোচনা, গ্লানি বোধ করতে লাগল।

বানরের গলায় মুক্তোর মালা—না, তাও নয়, বানরের গলায় পদ্মফুলের মালা দোলাতে যাচ্ছে সে।···ঐ ছেলের হাতে এই মেয়ে দেওয়া—এ তো একটা সামাজিক অপরাধ!····

কোন কথাও কইতে পারল না। সব চিন্তা যেন মনের মধ্যে গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কী প্রশ্ন করতে হবে, কোনো প্রশ্ন করা উচিত কিনা—মেয়ের বাবার সঙ্গে হয়ত একটু কথা বলা উচিত—এসব কোন কথাই মনে রইল না তার। ভাগ্যে বিশ্বনাথবাবু এসেছিলেন, তিনি বহু পাত্রী দেখতে গেছেন জীবনে, কি বলা—কি কি প্রশ্ন করা উচিত—সব জানেন, তিনিই কাজ চালিয়ে দিলেন, কোন অস্বাভাবিক অশোভনতা ঘটল না।

বহুক্ষণ পরে সুরেনের হুঁশ হল—অবিনাশবাবু তাকেই কি জিজ্ঞাসা করছেন। এই মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকাটাকে স্বাভাবিক লজ্জা বলে মনে ক'রে তিনি বলছেন, 'কী হল বাবা সুরেন, তুমি কিছু

জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করো !···তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে—আত্মীয়। যদিও বলে মামার শালা পিসের ভাই তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই—তবে সে বে-র ব্যাপারে যাতে না আটকায় সেই জন্যে—নইলে আত্মীয় তো বটেই, সেটা না বলার জো নেই। তুমি অমন ঘাড় হেঁট ক'রে বসে রইলে কেন ?'

'না না, কী আর বলব ? বিশ্বনাথকাকা তো বলছেনই। আমার তো কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, আমি তো সব জানিই।'

আস্তে আস্তে যেন বুকে বল এনে, চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে যায় মেয়েটির দিকে।

হাতদু'টির দিকে প্রথম চোখ পড়ে। একেই বোধহয় চাঁপার কলির মতো আঙুল বলে। ঠিক তেমনিই দেখতে। চাঁপার কলি থেকে প্রথম পাপড়ি ছাড়লে সেটা যেমন অপরূপ ভঙ্গিমায় বেঁকে থাকে—তেমনিই আছে কড়ে-আঙুলদু'টো। কনকচাঁপার মতোই রঙ—না, শ্বেতচাঁপার মতো।···আরও খানিক চেষ্টার পর আর একটু ওপরে চোখ পৌঁছতে চোখে পড়ে খাঁজ-কাটা সুডৌল গলা, সুন্দর দু'টি চোখ। খুব বড় হয়ত নয়, যতটা বড় হলে মানানসই হয় ঠিক ততটাই। কিন্তু ভারী সুন্দর, কেমন একটা আবেশ আছে দৃষ্টিতে, চোখের টানটাও শিল্পীর হাতের কাজ বলে মনে হয়।···আর সবচেয়ে ঠোঁট-দু'টি। দুর্গাপ্রতিমার ঠোঁটের মতোই গঠন, ওপরেরটি যেন উপুড় করা ধনুক একখানি।

আবার সব গোলমাল হয়ে যায় বুঝি। চোখ ফিরিয়ে জোর ক'রে সে অবিনাশবাবুর সঙ্গে কথা শুরু করে। স্টীমারের সময় জিজ্ঞাসা করে, এবার উঠতে হবে—সে-কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠেন অবিনাশবাবু। সে হতেই পারে না। কখন কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছে ওরা—সেইটেই যথেষ্ট অন্যায় করেছে, এ-বেলা না খেয়ে যাওয়া হতেই পারে না।

'না না, সে কী ক'রে হবে ?' সুরেন প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, 'সাতটায় নাকি শেষ স্টীমার ছেড়ে যায়—'

অবিনাশবাবুর বর্তমান মনিব ও আশ্রয়দাতা ষোড়শীবাবু বসে ছিলেন, তিনি এদের খুবই স্নেহ করেন—বিশেষ এই মেয়েটিকে—তিনি বললেন, 'সে আমি খোঁজ করছি। না হয় আমি পাল্‌কি ক'রে সাঁকরেল ইস্টিশানে পাঠিয়ে দোব, ট্রেনে চলে যাবেন। রাত ন'টা পর্যন্ত গাড়ি আছে।'

'না না, ইনি—বিশ্বনাথকাকা সন্ধ্যের পর অসুস্থ বোধ করেন, তার আগেই ফিরিয়ে নিয়ে যাব ওঁকে, সেই কড়ারেই এনেছি—'

বিশ্বনাথবাবুও ক্ষীণকণ্ঠে সমর্থন করেন তা। আপিঙ খেয়ে সন্ধ্যের সময়টা ঝিমিয়ে পড়েন ঠিকই। তাই বলে একটা যাচা-ভোজ ছেড়ে (ভাল খাওয়া-দাওয়া হবে নিশ্চয়ই—তাতে সন্দেহ নেই) যেতেও ঠিক ইচ্ছে করছে না। তাই সমর্থনটা খুব প্রবল বা সরব নয়।

ষোড়শীবাবু হয়ত তা বুঝলেন বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। সাতটার স্টীমারই আমি ধরিয়ে দোব। তা বলে না খেয়ে যাওয়া চলবে না। ও ব্যবস্থাটা আমার ওখানে, আমিও ব্রাহ্মণ—আপত্তির কোন কারণ নেই, করলেও শুনব না। তালপুকুরে ঘটি ডোবে না—তবু নামে এখনও জমিদার, আমি না ছাড়লে যেতে পারবেন না।'

অগত্যা সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে যেতে হল। খুবই খারাপ লাগল সুরেনের। যেন শারীরিক অসুস্থ বোধ করছে তখন সে। এও বুঝছে যে, খেতে বসে সুখাদ্য সব গলায় ডেলা পাকিয়ে যাবে, কিন্তু উপায়ও কিছু খুঁজে পেল না অব্যাহতি পাবার।···

বিদায়ের সময় অবিনাশবাবু রীতি-মাফিক হাত কচলাতে কচলাতে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আমি—মানে কবে নাগাদ—ইয়ে খবর পেতে পারব?'

সুরেন যেন একটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ চমকে উঠল অবিনাশবাবুর কথায়, কতকটা বিহ্বলভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'কিসের খবর মেসোমশাই?'

'এই—ইয়ে মানে মেয়ে পছন্দ হল কিনা?'

হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, 'এ-মেয়ে আবার অপছন্দ হবার কি আছে মেসোমশাই? এ তো লোক-দেখানো দেখতে আসা। এবার খবর দেওয়া-নেওয়া সবই আপনার ওপর নির্ভর করছে। আপনি একবার গিয়ে পিসীমার সঙ্গে বসে কথাবার্তা সব পাকা ক'রে আসুন। দিন-টিন ঠিক ক'রে—যা-কিছু বলার বা শোনার সব সেরে ফেলুন। আপনি কবে যাবেন খবর দিলে পুরুতমশাইকে সেই সময় থাকতে বলবেন তিনি।'

প্রায় অস্ফুটস্বরে অবিনাশবাবু যেন একবার বললেন, 'মেয়ে অপছন্দ হবার কিছু নেই, তবু তো তোমাকে রাজী করাতে পারলাম না বাবা। মেয়ে যে ভাল – সে তো তুমিই স্বীকার করছ—'

এ-কথার কোন উত্তর দিল না সুরেন, কথাগুলো তার কানে গেছে কিনা তাও বোঝা গেল না। সে আধো-অন্ধকারে তার মুখটাও ভাল ক'রে দেখতে পেলেন না অবিনাশবাবু। ষোড়শীবাবু সঙ্গে লোক দিয়েছিলেন, তার পিছু পিছু বিশ্বনাথবাবুকে ধরে নিয়ে স্টীমার ঘাটের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল।

অদৃষ্টের পরিহাস কথাটা শোনাই ছিল এতকাল, এমনভাবে কখনও বোঝে নি—যেমন এবার বুঝল সুরেন। যে-কাজে তার সবচেয়ে অনিচ্ছা, সেই কাজেই জড়িয়ে পড়তে হল—অষ্ট-বন্ধনে বাঁধা পড়ল বলতে গেলে।

নিমাইয়ের এই বিয়েটা প্রাণপণেই এড়াতে চেয়েছিল সে, এড়াতে চেয়েছিল ঐ মেয়েটাকেও, সেই মেয়ের সঙ্গে সেই বিয়ের সমস্ত ভারটাই তার ওপর এসে পড়ল।

অবিনাশবাবু যেদিন কথা কইতে এলেন, সেদিন স্বভাবতই সুরেনের উপস্থিত থাকার কথা উঠল। সে-ই চেনে তাঁকে, আত্মীয়তারও—যত ক্ষীণই হোক—সূত্র একটু আছে।

পুরুতমশাইকে আগেই খবর দিয়ে আনিয়েছিল, তবু পাঁজিটা তাকেও দেখতে হল একবার। কারণ এটা পিসী বুঝেছিল, ঐ

ভটচাযমশাইয়ের চেয়ে এ-বিষয়েও তার ভাইপোর দখল অনেক বেশী। একেই গুরুবংশের ছেলে—এসব জ্ঞানের কিছুটা তার সহজাত, তার ওপর শখ ক'রেও এসব কিছু কিছু চর্চা করেছে সে।

অবিনাশবাবুর ইচ্ছা বৈশাখের গোড়ার দিকে কি মাঝামাঝি দিন ধার্য হোক—হেমন্তর ইচ্ছা বিয়েটা এই ফাল্গুনেই হয়ে যাক। তার তখন যেন একটা ঝোঁক চেপে গেছে, নেশার মতো পেয়ে বসেছে বিয়েটা। আগে যতটা ঔদাসীন্য ছিল এখন ততটাই তাড়া।... মেয়েটি ফুটফুটে শুনেই আরও এই ঝোঁক। একটা সুশ্রী কচি মুখ সামনে ঘুরে বেড়াবে, হয়ত সামান্য একটু-আধটু সেবাও করল—না করলেও ক্ষতি নেই—কাছাকাছি থাকবে, তাতেই অনেক শান্তি। ইদানীং ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে তার। ...

এদিকে ফাল্গুনের শেষ লগ্নের আর তেরোটি দিন মাত্র বাকী। অবিনাশবাবুর মুখ শুকিয়ে উঠল।

'এর মধ্যে কি হয়ে উঠবে বেয়ান—ভিক্ষে-দুঃখু করে মেয়ের বে দেওয়া আমার!'

'ভিক্ষে-দুঃখুর ব্যাপার তো আপনার শুনছি সামান্যই বেইমশাই! আপনি তো বলছেন দানের বাসন ঘরেই আছে, সান দিয়ে নেবেন শুধু একবার। আর যা সামান্য কাপড় আংটি—সে যদি চাইতে হয়—যার কাছে চাইবেন, মানে দেবার মতো লোক যে, সে তখনও দেবে এখনও দেবে। বরং দেরি হলে ফ্যাকড়া তুলতে পারে। কিছু মনে করবেন না একথা বললুম বলে। আপনি সব কথা খুলে বললেন বলেই এত আস্পদ্দা আমার। বলেন তো, যদি অপরাধ না নেন—যা-যা দরকার আমিও ক'দিন আগে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'না না,' প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েন অবিনাশবাবু, 'সেটি পারব না। আপনাদেরই আমার দেবার কথা—দিতে পারছি না, সে-ই তো যথেষ্ট লজ্জা একে—তার ওপর আপনার কাছ থেকে হাত পেতে নেওয়া—সে পারব না। ছিঃ! আর গয়নাপত্তরও আপনাদের যা দিতে ইচ্ছে হয়—সম্প্রদানের পর পরিয়ে দেবেন দয়া ক'রে, আগে

কিছু পাঠাবেন না। আপনাদের দেওয়া জিনিস পরিয়ে দান করা—সে তো একরকমের দত্তাপহারী হওয়া বলতে গেলে। আরও একটা নিবেদন, গায়ে-হলুদও—তেল হলুদ শাড়ি ছাড়া কিছু পাঠাবেন না—কারণ আমরা যখন ফুলশয্যের তত্ত্ব করতে পারব না, তখন—না না, সে বড় লজ্জার কথা হবে।'

'তাই হবে, যা বলেন। তবে একটু মাছ মিষ্টি দইও তো ঐ সঙ্গে দিতে হবে—লক্ষণ একটা—না হয় কম-কমই দিলুম। কিন্তু বিয়েটা আপনি এর মধ্যেই সেরে ফেলুন, অযথা দেরি করবেন না।'

'অযথা ঠিক নয়—' চিন্তিত মুখে অবিনাশবাবু বলেন, 'মনে তো লাগছে এত তাড়াতাড়ি হবে নে। এর মধ্যে কি আর গুছিয়ে উঠতে পারব ?'

কথাটা আপনিই বেরিয়ে গেল সুরেনের মুখ দিয়ে, নিয়তির বিধানেই বোধ করি, 'কিন্তু বোশেখে মেসোমশাই ঝড়বিষ্টির ব্যাপার আছে একটা। আপনাদেরও যেমন অসুবিধে, আমাদেরও তেমনি। তার ওপর কালবৈশাখীর দিন জাহাজে ক'রে ফেরা বরকনে নিয়ে—। সবটা ভেবে দেখুন ভাল ক'রে।'

এই কথাটাতেই অবিনাশবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন।

এর ভেতর সুরেনও আর একটা দিন খুঁজে বার করল। সংক্রান্তির আগের দিন—গোধূলি লগ্নে, অরক্ষণীয়া মতে দিন আছে একটা। কিছু না—তবু দু'টো দিন বাড়তি সময় পাওয়া যাবে।

পাঁজির দাগ দেওয়া জায়গাটা পুরুতমশাইকে দেখিয়ে সুরেন বলল, 'আজকাল আর কোন্ মেয়ে অরক্ষণীয়া নয় বলুন ?'

তিনিও সে কথায় সায় দিলেন, 'তা ঠিক। লেহ্য কথা বলছ বাবাজী।'

ঐদিনটাতেই রাজী হয়ে চলে গেলেন অবিনাশবাবু।···

এদিকে যতক্ষণ আপত্তির আশঙ্কা ছিল ততক্ষণ সেইটেকেই যা কিছু বাধা ভেবেছিল ওরা—এখন দেখা গেল, এ পক্ষেও প্রস্তুতির

অনেক কিছু আছে। হাটবাজার করা, গয়না গড়ানো, লোক-খাওয়ানোর ব্যাপার—বিবাহের হাজারো খুঁটিনাটি—আনুষ্ঠানিক তথ্য। সবগুলিই একে একে সুরেনের ঘাড়ে এসে পড়ল। সে যত সরে যেতে চায় তত কাকুতি-মিনতি করে হেমন্ত, হাতে ধরে কাঁদে। কেবলই বলে, 'আমার আর কে আছে বল্, এইটুকু দয়া কর! নিমেকে যা হুকুম করবি ও তাই করবে—কিন্তু ও কিছু তো জানে না—হুকুম তামিল করা ছাড়া ও কিছু করতে পারবে না।'

এমনি ক'রে আস্তে আস্তে যেন নাগপাশের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল। হেমন্তও ইতিপূর্বে কখনও কিছু করে নি—এধরনের কোন কাজ। বিয়ে দেখেছে, নেমন্তন্ন খেয়েছে, কিন্তু তার জন্যে কতটা প্রস্তুতি দরকার তা জানে না। নিত্‌কিত্‌ই অনেক জানে না, শ্বশুরবাড়ির কী সব নিয়ম আছে, হয়ত এক-আধবার শুনেছে, কিন্তু সেও বহু আগে, তখন সাধুচরণই জন্মায় নি, ওর বাবার বিয়েও হয় নি। কিছু কিছু নিমাই বলল, তার যা শোনা আছে বা দাদার বিয়ের সময় যা দেখেছে—যতটা মনে পড়ল, বাকীটা সুরেনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিল। অর্থাৎ কিছুটা শ্বশুরবাড়ির মতে কিছুটা হেমন্তর বাপের বাড়ির মতে কাজটা হল।

বিয়ের চিঠি ছাপাবার খুব শখ। সুরেন বলল, 'কিন্তু এত কাকে নেমন্তন্ন করবেন পিসীমা? বাইরের লোক কি খুব বেশী একটা হবে?'

'না' একটু যেন লজ্জিতই হয়ে পড়ে, 'মানে তোদের বাড়ি, দিদির বাড়ি, অন্য আমার যে আত্মীয়-স্বজন আছে; এখানে পূর্ণবাবুর বাড়ি—শরৎদিদি মারা গেছেন, তার পর থেকে আর অবশ্য সম্পর্ক নেই বিশেষ—তবু বলতে হবে।···অন্য দু'চারজন আগেকার কর্মসূত্রে জানাশুনো—'

'এসব যে বলবেন আপনাকেই গিয়ে বলতে হবে। সে ছাপা চিঠিতে হবে না। আর আপনার নামে চিঠি ছাপানো সে বড় খারাপ দেখায়—ওর জ্যাঠারা জাঠতুতো দাদারা বর্তমান থাকতে।

এক তাহলে তাদের নামেই, সম্পর্কে বড় যে তার নামে চিঠি ছাপাতে হয়।'

'না না, তার দরকার নেই। মাগো!' প্রবল প্রতিবাদ ক'রে ওঠে হেমন্ত, 'ও গুষ্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

'কে বরকর্তা হবে তাহলে পিসীমা?' সুরেন প্রশ্ন করে, 'নিমাইদার জ্ঞাতগুষ্টির কেউ এসে না দাঁড়ালে খারাপ দেখাবে না? বরকর্তা তো একটা চাই!'

'বরকর্তা তুই, আবার কে!' ছদ্ম প্রশান্তির সঙ্গে উত্তর দেবার চেষ্টা করে হেমন্ত।

'ওমা, সে কি কথা! আমার সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই—পিসের ভাইয়ের ছেলে—তার ওপর আমি বয়সেও ছোট—আমি কখনও বরকর্তা হতে পারি?'

'হতেই হবে। আর কে আছে বল্? তাছাড়া বাধাই বা কি? যাদের কেউ নেই তাদের কি হয়? আর এ তো বলাই আছে তাঁদের যে, কেউ কোথাও নেই, দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ওর। সে সব জেনেই তো তাঁরা রাজী হয়েছেন!'

'তা হয়েছেন বটে। তবু তাঁদেরও তো আত্মীয়-স্বজন আছে; তাঁদের কাছে বরযাত্রী বার করতে হবে, দেখাতে হবে।'

'সে ওর আপিসের লোক আছে, আমার পাড়ার লোক আছে। ধনুবাবুর ছেলেকে বলব, আমার য়্যাটর্নী, খুব লম্বা-চওড়া চেহারা তার। বিশ্বনাথবাবুকে বলিস, যদি তোর আপিসের কাউকে বলতে চাস—'

'না না, আমি কাকে বলব! বিয়েটা কার—বোঝাতেই তো একঘণ্টা লাগবে!'

অপ্রসন্ন মুখে বলে সুরেন।

ভাল লাগে না, একেবারেই ভাল লাগে না তার। যেন হাঁফ ধরে। মনে হয় তাকে যেন একটা গবাক্ষহীন ঘরের মধ্যে দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে, আর তার দেওয়ালগুলো ক্রমশ ভেতর

দিকে সরে আসছে—ঘরের সীমিত বায়ুকে সীমিততর ক'রে। খাঁচা-কলে পড়ার অবস্থা হয়েছে ওর।

এক-একবার ভাবে ক'দিনের ছুটি নিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়। ছুটি পাওনাও আছে, সেক্‌শ্যনের বড়বাবুকে খোশামোদ করলে পাওয়াও যাবে—কিন্তু কোথায় যাবে, যেখানেই যাবে খরচা আছে। আর এই অসহায়া বৃদ্ধাকে ফেলেই বা যায় কোথায়?...

এ কী বিপদে পড়ল সে! এই কথাই বার বার কেবল নিজেকে প্রশ্ন করে।

ছোট কাকাটাও যদি থাকত এখানে!...নিভা যা লিখেছে—তার আর কোথাও যাবার সামর্থ্য নেই। আস্তে আস্তে পিদীমের তেল ফুরিয়ে আসছে আর কি! ওদের নাকি দেখার ইচ্ছা খুব—কিন্তু এরা কোথায় যাওয়ার খরচা পাবে সেই ভেবেই লেখে না। নিভার কাছ থেকেও নিতে রাজী নয়, বলেছে, 'তুই যদি আমার অজান্তে পাঠিয়েছিস এক পয়সাও—তাহলে তোর ভাত এই পর্যন্ত। পথে গিয়ে মরে পড়ে থাকব সেও ভি আচ্ছা!'

সে চিঠি পাবার পর থেকে তার প্রাণের কথাটা ভেবেই সদা-কণ্টকিত আছে—কোনদিন কি খবর আসে—সে লোকের কাছ থেকে কোন দৈহিক সহায়তা পাওয়ার আশা তো বাতুলতা। সুতরাং যীশুখ্রীস্টের এই ক্রুশ তাকেই বইতে হবে।

আগে যতই যা বলুক—ক্রমশ নরম হয়ে আসে হেমন্ত।

ব্যাপারটা যে নিমাইচরণেরও ভাল লাগছে না, তা বুঝতে পারে। এও বোঝে যে, ভাল লাগা সম্ভব নয়—সবাই থাকতে এমন অনাথার মতো বিয়ে করতে যাওয়াটা। শেষে দিন-তিনেক হাতে থাকতে ডেকে বলে, 'ছাখো, তোমার জ্ঞাতগুষ্টি কাউকে যদি বলে আসতে চাও তো বলে এসো। ভাইয়েরা কেউ বরযাত্রী যেতে চায় তো কে কে আসবে আসতে বলো। বৌভাতেও যে ক'জন আসবে আসুক। তবে এখানে এসে বেশ গেড়ে বসে থাকবে এই ছুতোয়—তা হবে না

সেটাও বলে দিও। একদিনও না। আর যেন কেউ বরকর্তাও না সাজতে যায়, কিংবা সেখানে গিয়েও না চাল দেখায় কি আত্মীয়তা জাহির করে। সেটা ভাল ক'রে সাবধান ক'রে দিও, নইলে অপমান হতে হবে।'

নিমাই বোধহয় এই অনুমতিটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, সে সেইদিনই রওনা হয়ে গেল।···

রাত্রে ফিরে আসতে আর একটা খবর পাওয়া গেল। অপ্রীতিকর ও অস্বস্তিকর। গৌর নাকি কোথা থেকে কি খারাপ অসুখ ধরিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। কঙ্কালসার চেহারা হয়ে গেছে, চুল-টুল উঠে একেবারে বুড়োর মতো দেখাচ্ছে।···

তার ফলে এক ধারের একটা ঘরে থাকতে দিয়েছে দাদারা, কেউ সেদিকে যায় না, ছেলেমেয়েদের যেতে দেয় না। আলগোছে ভাত ফেলে দিয়ে আসে কেউ গিয়ে, নিজের থালাবাসন নিজেকে মাজতে হয়। কী অসুখ তা কেউ খুলে বলল না, তবে উঠোনের ধানসেদ্ধ উনুনে নিমপাতার জল ফুটিয়ে আড়ালে বাগানে গিয়ে চান করে দু'বেলা, আর যন্ত্রণায় কাতরায়—নিমাই দেখে এসেছে। খুব কাকুতি-মিনতি ক'রে কিছু পয়সা চেয়েছে ওর কাছে, হাতে নগদ পয়সা বলতে একটাও নেই, দাদারা কেউ দেয় না। পয়সার অভাবেই কোন চিকিৎসা হচ্ছে না, কে খরচ করবে? নিমাই ওর কষ্ট দেখতে না পেরে নাকি দু'টো টাকা দিয়ে এসেছে। অন্য কোন উপকার অবশ্য হবে না, ডাক্তার দেখানো যাবে না, তবু মাসখানেক বিড়ির খরচাটাও তো চলবে। এমনি কষ্ট তো আছেই—নেশা না করতে পেরে পেট ফুলে মরছে যে তার ওপর!

এমনি অনেক খবর দেয় নিমাই, অনেক কথা বলে যায়।

চোখ দু'টো কি জ্বালা ক'রে ওঠে হেমন্তর—শুনতে শুনতে?

বুকের মধ্যটায় কি একটা ব্যথা বোধ করে? একটা দৈহিক যন্ত্রণা?

আর সেইটে কমাতেই কি অকস্মাৎ, নিমাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই, উঠে চলে যায় সেখান থেকে ? কে জানে !

নিমাইও অনেকক্ষণ তার পর গুম হয়ে বসে থাকে। হাজার হোক নিজের ভাইপো। তার এ দুর্দশা ভাল লাগে না। আগেকার ঈর্ষার ভাবটা চলে গেছে—এখন একটা উৎকণ্ঠা আর অনুকম্পাই বোধ করে ছেলেটার জন্যে।

॥ ২৩ ॥

সুরেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা ক্ষীণ আশা ধরে ছিল যে, হয়ত এমন একটা কিছু ঘটবে, যাতে এই বিয়ের ভারটা তার কাঁধ থেকে নেমে গিয়ে অন্যের ওপর পড়ে। এর মধ্যে হয়ত তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন এসে যাবে নিমাইদার। চাই কি পিসীরও সুবুদ্ধি হতে পারে কিছু।

কিন্তু কিছুই ঘটল না সে রকম। নিজের একটা অসুখ-বিসুখও করল না। সে-ই শুকনো মুখে ওকেই সব যোগাড়-যন্ত্র ক'রে সবাইকে গুছিয়ে ডেকে বর নিয়ে রওনা হতে হল এক সময়। যত দিন এগিয়ে আসছিল তত সেই চাপা-দেওয়ালের নিঃশ্বাস-বন্ধ-হয়ে-আসা ভাবটা বেড়েই যাচ্ছিল, তত অসহায়বোধ বাড়ছিল—কিন্তু তাতে শরীরটা এমন ভাঙল না যাতে এধার থেকে অব্যাহতি পায়।

শুধু এই ঝঞ্ঝাট বা পরিশ্রমই নয়, আরও কিছু।

যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা, কেবলই মনে হচ্ছে কী একটা বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। অকারণ, অবর্ণনীয় অস্বস্তিবোধ। অথচ এসব কথা কাউকে বলা যায় না, বললেও কেউ এটাকে অব্যাহতি দেবার মতো যথেষ্ট কারণ বলে মনে করবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে।

যা-ই হোক, শেষ অবধি অবশ্য একেবারে হত-দরিদ্রের বিয়ে হল

না, বিয়েটা বিয়ের মতোই মনে হল। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী—সব মিলিয়ে ষাটজনের বেশি নয় অবশ্য—খাওয়াবার ভার অবিনাশবাবুর মনিব সেই ষোড়শীবাবুই নিয়েছিলেন। তিনি একটা হারও দিয়েছিলেন কনেকে, তাঁর বাড়ি থেকেও আর কারা মিলে ব্রোঞ্জের ওপর সোনা বাঁধানো চুড়িও দিয়েছিল ছ'গাছা। এছাড়া কম দামের হলেও একটা বেনারসীর ব্যবস্থাও হয়েছিল কোথা থেকে, হয়ত অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কোন আত্মীয় দিয়ে থাকবেন। সুতরাং বিয়ে করতে বসে খুব একটা ভিক্ষে-দুঃখুর বিয়ে বলে মনে হয় নি নিমাইয়ের।

ষোড়শীবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গেই দেখাশুনো তদ্বির-তদারক করলেন, কিন্তু এমনই ভাগ্য, ঠিক সম্প্রদানের সময়টা থাকতে পারলেন না; তাঁর নাকি শরীর খারাপ হয়ে পড়ল হঠাৎ। কি রকম খারাপ, কি হয়েছে—কেউ ভালরকম বলতে পারল না। একজন বলল জ্বর, আর একজন বলল মাথা ধরেছে। কেবল এক ভদ্রলোক চুপি চুপি বললেন—কন্যাযাত্রীদের একজন কি ষোড়শীবাবুদের আত্মীয় তা ভাল বোঝা গেল না—'আরে মশাই আসল কথা ভোচকানির মতো কিছু হয়েছে। সকাল থেকে কিছু মুখে দেয় নি, ঠায় উপোস দিয়ে এইসব করছে তো! আজ তো দু'তিনদিন থেকেই বলতে গেলে উপোস চলেছে।···শরীর খারাপ হবে না! তার আর অপরাধ কি বলুন!'

এই বলে তিনি ডান-চোখটার একটা বিশেষ ভঙ্গী করলেন।

'উপোস কেন?' সুরেন বুঝতে পারে না কথাটা। চোখের এই বিশেষ ভঙ্গীটাও না, 'ওঁর তো আর নান্দীমুখ করার কথা নয়।'

ভদ্রলোক গলাটা আরও নামান, 'আপনি তো মশাই জোয়ান আজকালকার ছেলে, বুঝতে পারলেন না?··· মেয়েটার ওপর যে বড্ড টান ছেল। বলি তার জন্মেই তো চাকরির নাম ক'রে বাড়িতে এনে রাখা আর গুষ্টিবগ্‌গ পোষা। বয়স এখনও পঞ্চাশও হয় নি, আর ঐ তো সাড্‌ডোল সাজোয়ান চেহারা, এতটুকু কোথাও

টসকায় নি—ঘি-দুধ খেয়ে স্বাস্থ্য যা রেখেছে, দেখলে চল্লিশও মনে হয় না। বলি সে একটা অল্পবয়িসী ফুটফুটে ছুঁড়িকে নিজের মেয়ের মতো দেখবে—তা তো আর হয় না, বললে কি হবে? সে কথা ওর গিন্নীও বিশ্বেস করে না।···কৈ, তাকে দেখছেন? তার বাড়িই তো কাজ বলতে গেলে। সেই প্রথমেই যা একবার মাত্তর এসে দাঁইড়েছেল—ধম্মডাক দেবার মতো ক'রে—তার পর সেই যে উবে গেছে—আর কেউ টিকি দেখেছে তার? বলি, তার ভয়েই তো, গিন্নী যে একেবারে দশভুজো-চণ্ডী, খাণ্ডারনী—নইলে বাবুটি আমার সোনায় মুড়ে দিত এক-গা গয়না দিয়ে। আর তা-ই বা কেন, তাকে বাঘের মতো ভয় করে বলেই না—নইলে হাতছাড়া করবে কেন? আপনাদের কি সাধ্যি তার গর্তে ঢুকে ওকে নিয়ে যান!··· বৌটোরও যে হয়েছে বয়েস অল্প, মরবার মতো কোন রোগ-অসুখও নেই, নইলে কিছুদিন এখন জিইয়ে রাখত, এমন ক'রে দানপত্তর লিখে দিত না।···হরিবোল, হরিবোল!···যাক গে যাক দাদা, অনেক কথা বলে ফেললুম, কারুক্কে বলবেন না এসব কথা, কে কি ভাববে! আমার পাগলের খ্যাল, যা মনে এল তাই বললুম। এর কি দাম বলুন? বলি জজে মানবে?···হরিবোল, হরিবোল, মা তারা, তুমিই রক্ষা করো মা!···আমরা মশাই খাইদাই কাঁসি বাজাই—রগড়ের কি ধার ধারি?···এসেছি, একপাত খেয়ে চলে যাব। আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে দরকারটা কি?'

এই বলে আবারও এক চোখ টিপে একটা কদর্য ইঙ্গিত ক'রে সেখান থেকে চলে গেলেন লোকটি।

এত অল্প লোকের মধ্যে বরপক্ষীয় কে কে—চেনার কোন অসুবিধা নেই; বিশেষ সুরেনই বরকর্তা। তার সঙ্গেই অবিনাশবাবু কথাবার্তা কইছেন, অনুমতি নিচ্ছেন, এখানে কুশণ্ডিকা হবে, সে ব্যবস্থাও সুরেনই করল—কী আনতে হবে তার জন্যে টাকা ধরে দিল—সুতরাং বরপক্ষের লোক বিশেষ বরকর্তা জেনেই লোকটি এই

বিষ উদ্গার ক'রে গেলেন। হয় এঁদের কোন আত্মীয়, নয় ষোড়শীবাবুদের। ভাবে মনে হয় অবিনাশবাবুদেরই কেউ হবেন, আগে ভাংচি দেবার সুযোগ পান নি, সেই অবশ্যকরণীয় কাজটা এখন সেরে নিলেন।

তবু মনটা দমে গেল সুরেনের। কথাটার মধ্যে কতটা সত্যি আছে তা কে জানে! তবে অসম্ভব কিছুই নয়। ষোড়শীবাবুর আকর্ষণের যথেষ্টই কারণ আছে। মেয়েটার দিক থেকে তার কোন প্রশ্রয় আছে কিনা ?···একবার নিমাইয়ের দিকে চেয়ে দেখল : কালো রোগাটে চেহারা, চোয়াড়ে চোয়াড়ে ; গাল চড়ানো, দু'টো রগের কাছও ভেতরে ঢুকে-যাওয়া, টেপা-মতো। একেবারেই শ্রীহীন। শুধু এ মেয়ে কেন—কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ-বংশের মেয়ে এর জীবনসঙ্গিনী হচ্ছে, ভাবতেও কষ্ট লাগে।···

যাকগে, এসব চিন্তা এখন ক'রে কোন লাভ নেই।···লোকটাই বিষম বদ।···জেনেশুনে এই অনিষ্টটি ক'রে গেল। বিশ্বাস করুক বা না করুক—কাঁটার মতো কথাটা মনে গেঁথে রইলই।···অশান্তি আর অস্বস্তি।

তবে আর কারও কোন অসুবিধা নেই। খাওয়া-দাওয়া ভাল হয়েছে, বরযাত্রীরা খুশী। একটা বড় ঘরে ঢালাও ফরাশ পেতে বিছানার ব্যবস্থাও হয়েছে, বালিশও এসেছে কতকগুলো—খুব সম্ভব বিভিন্ন বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে, কারণ কোন বালিশের ওয়াড় ধব ধব করছে ফরসা, কোনটা আধময়লা, কোনটা একেবারেই তেলচিটচিটে ; মশারি অবশ্য এত লোককে দেওয়া সম্ভব নয়, তবু বরযাত্রীরা অপ্রসন্ন নন। কেবল নিমাইয়ের দেশ থেকে দুই জ্ঞাতিভাই এসেছিল—তারা কিছু কিছু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে লাগল। সুরেনের মনে হল তারা একটা ঝগড়া বাধাবারই চেষ্টা করছে, তবে সে দলে আর কেউ যোগ না দেওয়ায় মজাটা তেমন জমল না।

এটা স্বাভাবিক। ঐ রকমই শিক্ষা-দীক্ষা ওদের। বরযাত্রী হয়ে এলে কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে হয়, ঝগড়া বাধাতে

হয়—এ-ই ওরা জানে। এটা একটা নিয়মের মতো হয়ে গেছে। তা ছাড়াও, এখানে ঈর্ষারও পর্যাপ্ত কারণ আছে। নিমাইয়ের এমন সাড়ম্বরে বিয়ে হবে—সুন্দরী বৌ—এ ওরা কল্পনাও করে নি কখনও। জ্যাঠাইয়ের বাড়ি অন্নদাস হয়ে পড়ে আছে, চাকরের মতো খাটিয়ে নেয়, তারও বেশী—'উঠতে লাথি বসতে ঝাঁটা' মেলে সেখানে মজুরী—এ-ই শুনে এসেছে। বিশেষ গৌর গিয়ে আরও বেশী ক'রে বাড়িয়ে রঙ ফলিয়ে বলেছে, নইলে তার চলে আসার কারণটা দেখানো যায় না।···সেই নিমাইয়ের এমন বৌ!

তার ওপর, সম্প্রদানের পালা চুকে গেলে যখন সুরেন পকেট থেকে চুড়ি বালা নেকলেস বার ক'রে অবিনাশবাবুর হাতে দিয়ে বলল কনেকে পরিয়ে দিতে তখন তো ক্ষেপে যাবার অবস্থা হবেই।

খুশী নিমাইও। খুশী বললে কিছু বলা হয় না। সুন্দরী শুনেছিল বটে, কিন্তু সত্যিই তার বৌ যে এত সুন্দরী হবে, হতে পারে তা কখনও কল্পনাও করে নি। তার ওপর যে রকম গরিব লোক, ভিক্ষে-দুঃখু ক'রে বিয়ে দিচ্ছে শুনেছিল—তাতে বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়ন সম্বন্ধেও দুশ্চিন্তা ছিল একটা। এর পর না জানি কত টিটকিরি শুনতে হবে। এখন দেখল যেমন আর পাঁচজনের বিয়ে হয়—ওদের মতো ঘরে, তেমনিই হচ্ছে। বেনারসী শাড়িও দিয়েছে, গহনাও চলনসই—মেয়ে একেবারে 'নেড়াবুঁচো' নয়—দানসামগ্রী, ওর আঙটি, জোড়—রেশমের জোড় দিতে পারে নি, ভাল সুতীরই ধুতি-চাদর দিয়েছে—বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া—সবই সাধারণ আর পাঁচটা বিয়ের মতোই হয়েছে। এ আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না—নিমাইয়ের এমন অবস্থা। একফাঁকে আড়ালে পেয়ে সুরেনকে বলেই ফেলল, 'ভাই রে, কী বলব তুই বয়সে অনেক ছোট, নইলে পায়ের ধুলো নিতুম।···তুই আমার বাবার কাজ করলি। অবিশ্যি তাও আমার বাবা বেঁচে থাকলেও এ বে দিতে পারত না, ঐ পাড়াঘর থেকে একটা খেঁদীবুঁচি কেলুটি এনে গছিয়ে দিত!'

পরের দিন সকালে অবশ্য ষোড়শীবাবু দেখা দিলেন আবার। শরীর খারাপের জন্য থাকতে পারেন নি, সে জন্যে এঁরা কিছু মনে করলেন কিনা জানতে চাইলেন। তবে সুরেনের মনে হল মুখটা গম্ভীর তাঁর, দৃষ্টিও বিষণ্ণ। কিংবা সবটাই কালকের কথাটা শোনার ফল—কে জানে! সে-ই হয়ত এটা কল্পনা করছে!

কুশণ্ডিকা কাল রাত্রেই সারা হয়ে গিয়েছিল, সুরেন সকালে জলযোগের পরই চলে যেতে চাইল। ষোড়শীবাবুই ছাড়লেন না। বললেন, 'সব আয়োজন প্রস্তুত, একটু ঝোলভাত খেয়ে যান, নইলে আমাদের খুব দুঃখ হবে।'

বরযাত্রীরা অবশ্য বেশির ভাগই ভোর পাঁচটায় উঠে ছ'টার স্টীমার ধরে চলে গেছে। তাদের আপিস আছে। তারা একটু চা-ও পায় নি। সুরেন বলতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়েছে। অবিনাশবাবু খিঁচিয়ে উঠেছেন, 'এত রাত্তিরে চা কে ক'রে দেবে? এ কি মামার বাড়ির আব্দার নাকি?' অপ্রিয় পরিস্থিতির ভয়ে সে-কথা এদের আর বলল না সুরেন, বলল, 'ওঁরা বলছেন কিছুই তো যোগাড় নেই, অনেক দেরি হবে। উনুন না ধরলে—'

সে পয়সা দিয়ে দিল হিসেব ক'রে, জাহাজ-ঘাটায় যদি পাওয়া যায় তো যেন কিনে খেয়ে নেয় তারা। আসলে—এই প্রথম, এঁদের অন্তঃপুরে ঢুকে দেখল সুরেন—অবিনাশবাবুদের ওখানে কিছুই হচ্ছে না, কোন যোগাড়ই নেই। সমস্ত ব্যবস্থাই—হয় ষোড়শীবাবু যেচে নিজের হাতে নিয়েছেন, নয়তো এঁরাই তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।...

তাড়া-লাগানো সত্ত্বেও খাওয়া-দাওয়া আশীর্বাদ সেরে রওনা হতে হতে তিনটে হয়ে গেল। তাও, পরে বারবেলা পড়বে তাই—এঁরা তাড়া করলেন একটু। সাড়ে তিনটের স্টীমার। বর-কনের পাল্‌কি ঠিক ছিল, মালপত্র মুটের মাথায় গেল। মাল আর কি, কনের তোরঙ্গতেই বাসনপত্র সব, মায় হেমন্তরা যা সামান্য গায়ে-হলুদের তত্ত্ব করেছিল, কাপড়জামা, একপ্রস্থ বাসন ইত্যাদি—

তাও ধরে গেল। এ ছাড়া গাড়ু-ঘড়া আসন প্রভৃতির একটা পুঁটলি।

বিদায়ের আগে যখন হাতে-হাতে-সঁপে-দেওয়া অর্থাৎ কান্নাকাটির পালা, তখনও আর ষোড়শীবাবুকে দেখা গেল না। তবে তিনি আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, দুপুর নাগাদ এক সময় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট কাগজের মোড়ক সুরেনের পকেটে ফেলে দিলেন। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ভাই—আমার হয়ে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। আমার বোধহয় কাল বৌভাতে যাওয়া ঘটে উঠবে না। আপনি আমার হয়ে এইটে যৌতুক করবেন—প্লীজ। এখন কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই, তাহলেই এরা চেঁচামেচি করবে, আপনি কাল কথাটা ওকে বলে—দিয়ে দেবেন। কেমন ?'

সৌজন্য প্রকাশের জন্য যতটুকু পীড়াপীড়ি করা দরকার তা করল সুরেন—যাওয়ার জন্যে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করল, বলল, 'আমি কিন্তু আগে দোব না, আপনার জন্যে অপেক্ষা করব, আপনি গিয়ে নিজে হাতে দেবেন সেইটেই তো শোভন হবে। কনেও খুশী হবে তাতে।...এ যেন একটা দায়-ঠেলা গোছের হচ্ছে না ?'

'না না, কনে ঠিক বুঝবে যে—যেতে পারলে যেতুম। আচ্ছা, চেষ্টা করব।' এই বলে প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে গেলেন ষোড়শীবাবু।

আর একটু আড়ালে এসে মোড়কটা খুলে দেখল—খুব সরু একটা চেনে পাথরবসানো লকেট, বেশির ভাগই লাল পাথর আর কুঁচো মুক্তো, লকেটের ভেতর দিকে, যেখানটা গায়ে লেগে থাকে তাতে খোদাই-ক'রে নাম লেখা—'ষোড়শী'।

ফেরার সময় বরযাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। ধন্নুবাবুর ছেলে শেষ-রাত্রেই জাহাজঘাটায় চলে এসেছিল, পূর্ণবাবুর ছেলেও তাই। তাদের ঐ মশায় ঐ রকম শয্যায় এইসব সঙ্গীদের সঙ্গে শোওয়া অভ্যেস

নেই—বাইরে বসে বসে সিগারেট খেয়েই রাত কাটিয়েছে তারা, চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে—কেউ ওঠার আগেই—সুরেনকে বলে চলে এসেছে। আর যারা, বেশির ভাগই ছ'টায় স্টীমার ধরেছে। বাকী বর-কনে, নিমাইয়ের জ্ঞাতিভাই দু'জন, বিশ্বনাথবাবু, হেমন্তদের ভাড়াটেদের ছেলে একটি, পাশের বাড়ির একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের গোলগাল বোকা-বোকা ছেলে আর সুরেন। পুরুত-নাপিত দশটার সময় চলে এসেছে। সুরেনের বড় পিসীর ছেলেরা এসেছিল এদের সঙ্গে—কিন্তু তারা থেকে গেল, পরের দিন কন্যাপক্ষর সঙ্গে আসবে।

কনের ভাইবোন কাউকে সঙ্গে দেবার কথা বলেছিল সুরেন, কি ঝি একটি—যেমন দস্তুর—তাতেও অবিনাশবাবু ঝেঁজে উঠেছেন, 'আমাদের কি ঝি রাখার অবস্থা যে ঝি দোব? বাবুদের ঝি দোব—সে বড়লোকের ঝি কি বলবে এসে না বলবে—মাঝখান থেকে শতেক কথা উঠবে। আর ভাইবোন কাকে দোব বলো—সে রকম সঙ্গে যাবার মতো কেউ নেই। তোমাদের মধ্যে গিয়ে কথাবার্তা ভাল বলতে পারবে না, ভয় পাবে। কাল বৌভাতে যাবে তারই কাপড়-জামা নেই—হয়ত কারও যাওয়াই হবে না।'

স্টীমারে উঠে বর-কনেকে এক জায়গাতেই বসিয়েছিল সুরেন, নিমাই খানিকটা পরে ওদিকে উঠে গেল। সম্ভবত বিড়ি খেতে। আর যারা—তারা লজ্জাতেই দূরে দূরে রইল। বেচারী কনে-বৌ একা বসে—শুকনো মুখে। স্বভাবতই আসবার আগে যথেষ্ট কান্নাকাটি করেছে। সকাল থেকেই কাঁদছে তাও লক্ষ্য করেছে সুরেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, উদ্বেগে এবং বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার বেদনায়—চোখ-মুখ বসে গিয়েছে বেচারীর। আসবার সময় বমি করেছে একবার। যেটুকু যা সকালে ওরা খাইয়েছিল জোর ক'রে, সবই উঠে গেছে। এখন এইভাবে সর্বপরিত্যক্ত গোছের একা পড়ে গিয়ে আরও যেন ভয় পেয়ে কেমন হয়ে পড়েছে বেচারী।

সুরেন এদিকে-ওদিকে খুঁজে দেখল ওদিকের রেলিং-এর কাছে

দাঁড়িয়ে নিমাই বিড়ি খাচ্ছে আর জ্যাঠতুতো ভাই নিতাইচরণের সঙ্গে গল্প করছে। কাছে গিয়ে বলল, 'এ কী করছেন নিমাইদা, বৌদি একা বসে রয়েছে! একটু কাছে থাকুন, গল্পগুজব করুন—'

'তুমি যাও না ভাই, একটু কথাবার্তা বলো না!···ওসব লেখাপড়া-জানা মেয়ে, শহরে ছিল, তায় গান জানে—খাসা গাইলে কাল বাসরঘরে, আবার বড়লোক জমিদারের আওতায় গিয়ে পড়েছে—আমরা পাড়াগেঁয়ে ভূত, তার উপরি মিস্তিরির কাজ করি—কী বলব না বলব, প্রথম থেকেই বিগড়ে যাবে। আমার ভাই ভয়ই করছে একটু, সত্যি বলছি। তুমি যাও, একটু কথাবার্তা বলোগে। সত্যিই তো, একা পড়ে গেছে—আবার হয়ত কান্নাকাটি লাগাবে।'

তার পর আরও একটু গলা নিচু ক'রে বললে, 'নামটা শুনেছ তো? একেবারে হালফ্যাশানের বিবি-বিবি নাম, মণিকা। আগে বুঝি রেণুকা ছিল, কী নাকি পরশুরামের মায়ের নাম অপয়া বলে ষোড়শীবাবুরা পাল্‌টে মণিকা করে দিয়েছেন। নাম শুনেই তো পিলে চমকে গেছে।···আমাদের বাড়ির যত বৌ এসেছে এই জ্যাঠাইয়ের নামই যা শহুরে হালফ্যাশানের। নইলে সবই ঠাকুর-দেবতাদের নাম, কেবল বৌদির নামটাই যা –'

শেষ অবধি শোনার আর ধৈর্য রইল না, সেখান থেকে চলে এল সুরেন। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। সে যত ঘনিষ্ঠতা এড়াতে চাইছে এদের সংসারের সঙ্গে, ততই যেন ভগবান ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন ঐ দিকে।

কিন্তু তবু বৌটির মুখের দিকে চেয়ে—করুণ অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ে দূরে থাকতেও পারল না, কাছে গিয়ে বসতেই হল।

কী কথা কইবে খুঁজেই পায় না। কখনও এ ধরনের আলাপ শুরু করতে হয় নি ওকে। অনেক ভেবে, ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনার শরীর এখন কেমন লাগছে বৌদি?'

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, মাথা নিচু করল শুধু। তবু সুরেনের মনে হল যে, ওর সাহচর্যটা ভালই লাগল তার।

'খুব একা-একা লাগছে, না? ভয়-ভয় করছে একটু—কোথায় যাবেন, কাদের মধ্যে—ভাবনা হচ্ছে?'

এবার ঈষৎ একটু ঘাড় নাড়ল মণিকা, সমর্থনসূচক।

'ঐ জন্যেই বলেছিলুম আবুঁইমশাইকে যে, আপনার ভাইবোন কাউকে সঙ্গে দিতে, একেবারে সব অপরিচিত লোকদের সঙ্গে যাওয়া—'

'সে রকম কেউ নেই যে।' আস্তে আস্তে প্রায়-অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ভাই বড্ড ভীতু, আর দুই বোনের পর ভাই তো, বিষম আব্‌দেরে আর জেদী, ওকে কুটুনবাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। ছোট বোন খুকী এখনও বিছানায় ইয়ে ক'রে ফেলে। সঙ্গে যাবার মতো এক আমার পরের যে বোন বাসন্তী—তাকে বলেছিলাম, সে আসতে চাইল না, সে একটু ময়লা তো, বলে, 'হ্যাঁ, তুমি সুন্দর—তার সঙ্গে আমি এই কুচ্ছিত গিয়ে দাঁড়াই আর সকলে টিটকিরি দিক!' কোথাও যেতে চায় না ও আমার সঙ্গে। মাও পাঠাতে চাইলেন না, বড় হয়ে গেছে তো? চোদ্দ-পনেরো হবে তা।'

সুরেন হেসে একটু তামাশার সুরে বলল, 'ও, আপনি যে সুন্দর দেখতে তা আপনি বেশ জানেন, অহঙ্কারও একটু আছে!'

'না না, তা কেন? বা রে!' অপ্রতিভ হয়ে ওঠে মণিকা, একটু সহজও হয়, 'ও বলে তাই বলছি। আমি কি বলেছি আমি সুন্দর!'

'আপনার কি সে বিশ্বাস একটুও নেই, সত্যি ক'রে বলুন তো?'

দেখা গেল মেয়েটি বোকা নয় আদৌ। অনায়াসে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি-আপনি ক'রে বলছেন কেন? বৌদিকে কেউ আপনি বলে?'

'বৌদিই বা দেওরকে আপনি বলছে কেন?' সুরেন হেসে জবাব দেয়।

'দেওর যে বয়সে বড়, সে 'তুমি' বলতে শুরু না করলে বৌদি বলে কোন্ সাহসে?'

'ঠিক আছে। দু'জনেই বলব এবার। কেমন তো?'

হেসে ঘাড় নাড়ে মণিকা।

'খুব মন-কেমন করছে, না? ভাইবোনদের জন্যে?'

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ম্লান হয়ে ওঠে আবার। মাথা নিচু করে বলে, 'খুকীটা বড্ড ন্যাওটো আমার। মা তো সংসারের কাজ ক'রে ওকে দেখতেই পারে না। আমিই মানুষ করেছি বলতে গেলে। কী যে করবে—! আসার সময় আছাড়ি-পিছাড়ি ক'রে কাঁদছিল, দেখলেন তো!'

'আবার!' ভুলটা বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটা পাল্‌টাবার পথ খুঁজছিল, এখন মণিকার এই ভুল পেয়ে বেঁচে গেল।

মণিকা তার মধ্যেই একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলল, 'এক-আধবার ভুল হবে বৈকি!'

'আচ্ছা, ষোড়শীবাবু আপনাকে খুব ভালবাসেন, না?'

একবার যেন, সুরেনের মনে হল, চকিতে একটা রক্তাভা খেলে গেল মণিকার সুগৌর কপোলের ওপর দিয়ে, একবার যেন একটু ত্রস্ত দৃষ্টিতে এক লহমা দেখে নিল সুরেনের মুখটা—কথাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে চাইল—তারপর মাথা হেঁট ক'রে সত্যপ্রাপ্ত চুড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ষোড়শীবাবু আমাদের খুবই ভালবাসেন। খুব ভাল লোক উনি। উনি না থাকলে আমাদের বোধহয় উপোস করে মরতে হত।'

এরপর দু'জনেই চুপ ক'রে গেল কিছুক্ষণ। খুব আস্তে আস্তে চলছে স্টীমারটা। এতক্ষণে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাটে গিয়ে ভেড়বার কথা। ইঞ্জিনে কোন গোলমাল হয়েছে না গঙ্গায় কোথাও চড়ার ভয়,—এমনি কোন কারণেই গতি মন্থর হয়েছে। হু-হু ক'রে দক্ষিণা বাতাস বইছে। একটু গরম হয়ে এসেছে বাতাস এরই মধ্যে—গঙ্গার ওপরে বাতাস দিলে শীত করারই কথা, কিন্তু এখন আরাম লাগছে। দূরে কলকাতার বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে, হাইকোর্টের চুড়োটা, খিদিরপুরের ডকে জাহাজ বাঁধা। এদিকে ছোট ছোট

গ্রাম, নিবিড় নারিকেল বন, মধ্যে মধ্যে ইটখোলার কাঁচা ইট শুকোচ্ছে নদীর পাড়ে। চারিদিকে একটা শান্ত নিশ্চিন্ততার ভাব।

হঠাৎ নিমাই এসে পিছন দিকে দাঁড়াল।

'কী হল, তোমরা সব চুপচাপ যে!···তোমার বৌদি খাসা গান গায় হে সুরেন। শোন না একটা! কাল আমি তো শুনে—হাঁ। আমার হাতে পড়ে কি আর এসব—! শোন শোন। আমি থাকলে লজ্জা পাবে, আমি চলে যাচ্ছি। এই খোকা, তুমি এসে বসো না বৌদির কাছে। গাইতে-টাইতে বলো না একটু!'

অভাবনীয় মূল্যবান জিনিস হাতে পেলে ছেলেরা যেমন সবাইকে তার সব গুণগুলো দেখাতে চায়—নিমাইয়েরও তেমনি মনের ভাব কতকটা।

'শুনেছি তো আপ—না মানে তুমি গান জানো, গাও না একটা!' অগত্যা সুরেন অনুরোধ করে।

লজ্জায় মাথাটা আরও ঝুঁকে আসে মণিকার। বলে, 'পরে শোনাব এখন। ওখানে গিয়ে।'

'সে তো শুনবই। এখন একটা হোক না!'

'এই সকলের সামনে—? অনেক লোক যে চারদিকে!'

'কাছাকাছি তো কেউ নেই। এমনিই এ সময়ে ভীড় থাকে না বিশেষ। এই স্টীমার গিয়ে যখন আবার ফিরবে তখন দেখবে ভীড়।'

নিমাইদের পাশের বাড়ির যে মোটাসোটা ছেলেটি এসেছিল, সে এবার কাছ ঘেঁষে বসে বললে, 'করো না বৌদি একটা গান! গুনগুন ক'রেই গাও না!'

'কার কাছে গান শিখলে?' সুরেন আবার প্রশ্ন করে।

'কারও কাছেই না। কলকাতায় যে বাড়িতে ভাড়া থাকতুম, সেই বাড়িওলার মেয়ে গান শিখত মাস্টারের কাছে, আমি তাই শুনে শুনে শিখেছি—এক-আধখানা। এখানে এসে ষোড়শীবাবুর গ্রামোফোন আছে—তা থেকেও তুলেছি দু-চারটে গান। ঐ গোটা

দশ-বারো, সব জড়িয়ে। শেখার মতো কিছু নয়। হার্মোনিয়ামও বাজাতে জানি না।'

সেই ছেলেটি অসহিষ্ণু হয়ে উঠে তাগাদা করল, 'আবার সব বাজে কথা হচ্ছে! ও বৌদি, ধরো না একটা গান!'

'গাও না ভাই বৌদি' সুরেনও বলে, 'জাহাজ তো থেমে গেল দেখছি। কখন পৌঁছবে তার ঠিক নেই।…ওখানে অনেক কাজ, সকাল ক'রে ফেরা উচিত ছিল।'

সে চুপ করতে একটু নীরব থেকে গুনগুন ক'রে গান ধরল একটা মণিকা।

'জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি,
ও কে নিল হরি, মরি মরি!

* * *

যার লাগি ফিরি একা একা
চাহি পিপাসিত, নাহি দেখা
তারি বাঁশী ওগো তারি বাঁশী
তারি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি—'

সাধারণ মিষ্টি গলা, তবে সুরজ্ঞান আছে—গান শুনলে সেটা বোঝা যায়। যত্ন ক'রে শেখালে ভাল গাইয়ে হত। ওখানেই কি হবে? পিসী হয়ত শেখাতে চাইবেন, কিন্তু ছেলেপুলে হয়ে গেলে সংসার ঠেলে কি আর গান শেখা হবে?

গান কখন শেষ হয়ে গেছে তা হুঁশও ছিল না সুরেনের। গানটার সুর মনের মধ্যে কোথায় একটা যেন বিশেষ তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছে। গঙ্গার জলে অপরাহ্নের আলো, উদাস-করা বাতাস আর এই বিরহকরুণ সুর—সব মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা গুমরে উঠছে, যার কোন অর্থ নেই, প্রত্যক্ষ কারণও নেই। কী পাওয়া হল না জীবনে—কি এল না, আসবেও না কখনও—এমনি অজ্ঞাত একটা অভাববোধ।

একটু পরে মণিকাই প্রশ্ন করল, 'ভাল লাগল না, না?'

চমক ভেঙে উত্তর দিল সুরেন, 'না না, খুব ভাল লেগেছে—ভাল লেগেছে বলেই তো সুরের মধ্যে অমন তলিয়ে গিয়েছিলুম। খুব ভাল লেগেছে।...আর একটা গাইবে?'

'এখন থাক ঠাকুরপো।' মিনতির সুরে বলে, 'মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

'তবে থাক। ইস, আমারই এটা ভাবা উচিত ছিল। যা ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, আর যা কান্নাকাটি!'

সেই ছেলেটি উঠে গেল ওদিকে, বিলম্বের কারণ জানতে। জাহাজটা প্রায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এখন আবার চলতে শুরু করেছে। তবে এখনও আস্তে আস্তে যাচ্ছে খুব।

একটু পরে অকারণেই খাপছাড়াভাবে মণিকা বলল, 'এই গানটা ষোড়শীবাবু খুব শুনতে ভালবাসেন—আমার গলায়।'

বলেই যেন বুঝল যে, কথাটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক—হঠাৎই অপ্রতিভভাবে চুপ ক'রে গেল।

'ষোড়শীবাবু একটা জিনিস দিয়েছেন তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে? কি জিনিস?' নিমেষে যেন উদ্‌গ্রীব, কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে মণিকা।

'সেটা কাল দিতে বলেছেন, কনে সেজে যখন বসবে। কালই দেখো।'

সুরেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো বলে।

মণিকা চুপ ক'রে থাকে কিছুক্ষণ। অবসন্ন ক্লান্ত মুখটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে কিনা, তা ঠিক বোঝা যায় না। খানিকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলে, 'তার মানে কাল আসবে না। আমাকে মিছে ক'রে বললে, নিশ্চয় যাব।'

বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাটে স্টীমার এসে দাঁড়ায়। বহু লোক নেমে যায়—ওঠেও কিছু। এবার যাত্রা ওপারে—সামনে চাঁদপাল ঘাটে। সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নামার জন্যে। নিমাইও এগিয়ে আসে, তবে তখনও পাশে বসে না।

তারই মধ্যে চুপি চুপি একটু যেন ভয়ে ভয়েই এক সময় মণিকা বলে, 'আমার একটা ব্যাপারে কিন্তু বড্ড ভয় করছে ভাই ঠাকুরপো! কী বলবেন জ্যাঠাইমা কে জানে! খুব রাগ করবেন হয়ত—'

'তুমি ওঁকে মা-ই ব'লো বৌদি, মায়ের মতোই তো। কিন্তু ভয়ের কী আছে? খুব ভাল লোক, অনেক আঘাত পেয়েছেন, তাই মাঝে মাঝে হয়ত রেগে ওঠেন, কিন্তু আসলে রাগী বা ঝগড়াটে নন।'

'তা নয়—মানে—সে আপনাকে বলতে পারব না। হওয়ার কথা নয়—হঠাৎ কাল—কি ভাববেন কে জানে!'

সুরেন যেন চমকে উঠল। ঘটনাটায় নয়—তাকে এই কথাটা বলায়। তারপর বুঝল, আর কেউই নেই সঙ্গে যাকে এটা বলতে পারে, অথচ ভয়ও স্বাভাবিক, নিতান্ত বাধ্য হয়েই বলেছে।

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'সেই অবস্থাতেই বিয়েটা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, উপায় ছিল না নাকি। তখন কি আর বিয়ে বন্ধ করা যায়!'

'তুমি পিসীমাকেই কথাটা খুলে ব'লো। রাগ করবেন কেন, তিনি কি অবুঝ?'

সব কথাবার্তার মধ্যে—নিজের মনের বিষণ্ণতা, বুকচাপ ভাবটার কোন কারণ খুঁজে পায় না সুরেন, তার মন সেই কথাটাই ভাবে।

॥ ২৪ ॥

বৌ দেখে হেমন্ত খুব খুশী। আনন্দে যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল সে। সুরেনের গলা ধরে মাথাটা নামিয়ে চুমোই খেয়ে ফেলল একটা তার গালে। বললে, 'তুই লজ্জা পাবি তাই, নইলে কোলে তুলে নাচতুম!'

সুন্দর শুনেছিল, কিন্তু এতটা সুন্দর হবে ধারণা করতে পারে নি। গান শুনে আরও মুগ্ধ। এই ধরনের মার্জিত রুচির গান জানে, তা সুরেনও আশা করে নি। যা গাইল—রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্তর

গান। দু-একজন প্রবীণার অনুরোধে একটা পুরনো দেহতত্ত্বর গানও গাইল। তবে বেশী গান জানে না—সেটা বার বারই বলল ওঁদের, মোট পুঁজি ওর বারো-চোদ্দখানার বেশি নয়। সুরেন যা বলেছিল—হেমন্ত তখনই বলে দিল, 'তুই একটা ভাল মাস্টার গ্যাখ সুরেন, আমি ওকে গান শেখাব ভাল ক'রে।…এ একটা আলাদা শান্তি।'

তবু, স্বভাবটা কি রকম দাঁড়াবে—সে সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ছিলই। তাতেও 'পাস' হয়ে গেল মণিকা। ঠাণ্ডা মেজাজ, আস্তে কথা বলে। নতুন অভ্যাস শুরু—তবু মাথার কাপড়ও সরে না। শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, রাত্রে প্রত্যহ পা-কোমর টিপে দেয়। শুতে যাবার সময় হলে হেমন্তর কোলে মুখটা গুঁজে বলে, 'আপনার কাছেই শুই না মা—কি হয়েছে?' হেমন্ত হেসে মুখটা তুলে আদর ক'রে বলে, 'না মা, তা কি হয়? সে জন্যে কি আর নিমে বিয়ে করেছে?…না কি তোমারই ভাল লাগবে? যাও মা, শুয়ে পড়ো গে, আমিও কপাট বন্ধ করি।'

ষোড়শীবাবুকে কেন্দ্র ক'রে সুরেনের মনে যে একটা সূক্ষ্ম সংশয়ের কাঁটা ছিল, সেটাও উঠে যায় আস্তে আস্তে। এ পক্ষ থেকে যে কোন আকর্ষণ আছে—তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিয়ের পর বাপের বাড়ি গিয়ে মাত্র আট-দশ দিন ছিল, আরও বেশী দিন থাকার জন্যে কোন বায়না তোলে নি বা ফিরে এসেও ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্যে আব্দার করে না। বরং বাপের কোন ভাল চাকরি হয় কিনা—হওয়া সম্ভব কিনা—সেই কথাটাই বলে বার বার। হেমন্তকেও ধরে মধ্যে মধ্যে, 'আপনার তো শুনেছি অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে জানা-শুনো—দিন না মা একটা কিছু ক'রে! ওখানে বলতে গেলে পেটভাতায় থাকা—একটুও ভাল লাগে না। বাবা চিরদিন ভাল চাকরি করেছেন, খরচের হাত—অভাব-অনটনে যেন কেমন হয়ে গেছেন—কথায় কথায় চটে যান, ক্ষেপে ওঠেন একেবারে।'

সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেমন হওয়া উচিত তেমনিই। চেষ্টা ক'রেও কোন অসঙ্গতির সুর বার করা যায় না তা থেকে।

যোড়শীবাবুর কথা উঠলেও সহজভাবেই আলোচনা করে। তিনি ওকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁদের অন্তঃপুরে ওর যাতায়াত ছিল। ইদানীং এমন কি কোন কোন লোহার সিন্দুকের বা আলমারীর চাবি ওকে দিয়ে বলতেন টাকাকড়ি কাগজপত্র বার ক'রে আনতে, কখনও কখনও গুছিয়ে তুলে রাখতেও বলতেন। আদর ক'রে বলতেন, 'সেক্রেটারী।'···সে জন্যে যে ও-বাড়ির কেউ কেউ ঈর্ষার চোখে দেখত বা এখনও দেখে—সে কথাও সরলভাবেই স্বীকার করে। কৌতুকের হাসি হাসে।

সহজভাবে আলোচনা করে বলেই দুশ্চিন্তাটা কেটে যায় সুরেনের—অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

নিশ্চিন্ত হতে পারে না নিজেকে নিয়েই।

যেটা সে প্রথম থেকে ভেবেছিল, সেটাই হয়ে ওঠে না।

মনে মনে অনেকবার নিজেকে শাসিয়ে ছিল সে, নিমাইয়ের বিয়ের পর—অনুষ্ঠানগুলো চুকে গেলেই সে এ বাড়ি আসা কমিয়ে দেবে, ফি রবিবারেও আর আসবে না।···যেমন ছিল সে তেমনিই থাকবে। এ মায়ায় আর জড়াবে না—এ ঝঞ্ঝাটে থাকবে না।

সেটা আর হয় না কিছুতে। বরং ক্রমশই যেন আরও জড়িয়ে পড়ে। ছুটির দিন ছাড়াও প্রায়ই আসতে হয়। না এলে এমন করুণ মুখে অনুযোগ করে মণিকা, এত দুঃখ করে—আসবার সময় কাকুতি-মিনতি করে পরের দিনই আসবার জন্য, এমন ছোটখাট ফরমাশ চাপিয়ে দেয় যে—না এসে থাকতে পারে না সুরেন।

অনুরোধ অবশ্য নিমাইও করে। বলে, 'আমি তো জানই একে মুখ্‌খু তায় পাড়াগেঁয়ে ভূত, তায় মিস্তিরির কাজ করি যত রাজ্যের খোট্টাদের দলে—আমার সঙ্গে কথা কয়ে কি ওর সুখ হয়? সেটা আমি বুঝি, প্রেথম প্রেথম দুটো-চারটে কথার পরই বলা ফুরিয়ে যায়।·· তুমি এলে একটু আনন্দে থাকে তবু। অল্পবয়িসী বলতে

তো আর বাড়িতে কেউ নেই। দুপুরে তবু এবাড়ি-ওবাড়ির বৌ-ঝিরা আসে এক-আধজন বেড়াতে—সন্ধ্যেটা কাটে না একেবারে। জ্যেঠাই হয় পুজোয় নয় রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকে—বেচারা একেবারে একা পড়ে যায়।'

বলেন পিসীমাও, 'আসিস না বাবা একটু! বলি যে এখানেই রাত্তিরটা নিদেন খাওয়ার ব্যবস্থা কর—তা তো করবি না, কি যে তোর গোঁ বুঝি না—অন্তত এমনিই আয়।'

এতেই আরও অস্বস্তি লাগে সুরেনের। অসুবিধাও হয়—তা এঁরা বোঝেন না। খাওয়া রাত্রে একরকম হয়েই যায়—জলখাবার যা দেন তাতেই। সেও, পিসীমা খানিকটা পীড়াপীড়ি করেন, সেটা যদি বা এড়ানো যায়—মণিকা এমন জেদ ধরে আব্দার করে যে—'না' বলতে পারে না। 'এটা আমি করেছি ঠাকুরপো, এই তরকারিটা আমি রেঁধেছি—ও কি, উঠছেন কি, এই পরোটাখানা আমি নিজে হাতে বেলে ভেজে নিয়ে এলুম যে, বা রে—এ কে খাবে?' ইত্যাদি। ফলে বাড়ি গিয়ে আর রাঁধতে ইচ্ছা করে না অত রাত্রে। সেদিনও পর্যাপ্ত খাওয়া হয় না, পরের দিনেরও কোন ব্যবস্থা থাকে না। কোন কোন দিন রাত চারটেয় উঠে ভাতে-ভাত চাপিয়ে দেয়—সেও রোজ অত ভোরে উঠতে ইচ্ছে করে না।

এটা অসুবিধার দিক। অস্বস্তির কারণ অন্য, এ ছাড়াও। মেয়েটি তাকে যেন ক্রমশই বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরছে। বিকেলে ছাদের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দূর থেকে আসতে দেখলেই দুড় দুড় ক'রে নেমে এসে দরজা খুলে দেয়—'প্রথম দেখা হল আমার সঙ্গেই' বলে ছেলেমানুষের মতো খুশী হয়ে ওঠে। যত মনের কথাও যেন সারা দিন ধরে জমিয়ে রাখে—ওর জন্যেই। না এলে যে ম্লান হয়ে যায় আউতে-পড়া-ফুলের মতো—তা এক-আধদিন আসার অভ্যস্ত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এসে পড়ে—লক্ষ্য করেছে সুরেন। যেদিন আসা হয় না তার পরের দিন তো কাঁদো-কাঁদো হয়ে থাকে একেবারে।

নিমাইও আজকাল প্রায়ই সকাল সকাল ফেরে, কিন্তু তার সঙ্গে গল্পে জমে না। বিশ্বব্যাপী 'ডিপ্রেসন' চলেছে, কাজ-কারবার সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বেকার, কোথায় কোন দেশে কত হাজার ছোকরা (না কি এক লাখ ?) কাজকর্ম না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে, গান্ধী যে কত ভুল করছে, সি আর দাসের চালটা ধরতে পারছে না —এই সব আলোচনাতেই তার উৎসাহ। নিজে কাগজ পড়ে না, অথবা পড়ে মানে বুঝতে পারে না, এসব তথ্য বা সংবাদ আপিসের 'বাবু'দের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে নিজের পাণ্ডিত্য এবং রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। লেখাপড়া জানে না বলেই বোধ হয় এই ঝোঁক তার এত বেশী। এ বাড়িতে 'বসুমতী' কাগজ আসে একখানা ক'রে, গত ক' বছর ধরেই নিচ্ছে হেমন্ত, দুপুরে মণিকাও একটু-আধটু পড়ে বসে। নিমাই ভুলভাল বললেই টপ ক'রে ধরে ফেলে—এবং তখন তার কণ্ঠস্বর অকারণেই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সেটা সুরেনের ভাল লাগে না, তার কানে বাজে। অকারণে—মানে বাইরের খবর শুনে এসে একটু ভুল বললে এতটা বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। এ যেন বড় বেশী। একটা অশোভন জ্বালাই প্রকাশ পায়। নিমাই অবশ্য অত বোঝে না, রাগও করে না। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে খানিকটা আমতা-আমতা ক'রে সরে পড়ে।

অবশ্য বেশীক্ষণ বসা তার হয়েও ওঠে না—দোকান-বাজার বাইরের যত কাজ বিকেলের জন্যেই তোলা থাকে, চা-জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ে। ফেরে যখন—সুরেনের ওঠার সময় হয়ে যায়। অন্তত ওঠার চেষ্টা করে সে তখন থেকেই।

স্বামী সম্বন্ধে মণিকার মনোভাবটা যে সশ্রদ্ধ নয়—সেটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই শঙ্কিত বোধ করে সুরেন। শ্রদ্ধা না থাকলে প্রেম থাকা সম্ভব কি?—এইটেই প্রশ্ন করে নিজেকে বার বার। ঘর করে—এমন অনেকেই করে, বিবাহটা অচ্ছেদ্য বন্ধন মেনে নিয়ে, এরকম অনেককে দেখেছে—কিন্তু দাম্পত্য প্রেমটা গড়ে ওঠে না।

পুরুষ বা স্ত্রী একজনের দৈহিক কামনা থাকে, হয়ত দু'জনেরই থাকে, ছেলেপুলেও হয়—তবু, ভালবাসা যাকে বলে, একাত্মতা, তা খুব কম দম্পতির মধ্যেই গড়ে ওঠে।

তা হোক—মানিয়ে নিয়ে চলতে পারলেই হল।

মণিকা সেটুকুও পারছে কি?

দু-চার মাস যেতে সেই সন্দেহটাই বদ্ধমূল হয় সুরেনের মনে। এক-আধটা কথায় অবজ্ঞা—হয়ত-বা বিতৃষ্ণাও ফুটে ওঠে, মণিকার অজ্ঞাতসারেই।

'ঠাকুরপো, তোমার দাদা বিড়ি খায় কেন ভাই? বলে-কয়ে বকে-ঝকে বন্ধ করাতে পারো না? মা গো, কি বিচ্ছিরি গন্ধ, বমি আসে কাছে এলে।...কোনদিন ঐ গন্ধটা আমি সইতে পারিনে। বাবা মধ্যে ধরেছিলেন—তা-ই আমি কাছে যেতুম না, শেষে আমার জন্যেই ছেড়ে দিলেন, এখন এক-আধটা সিগারেট খান, মানে পেলে—নইলে কিছুই খান না। সেই আমার কপালেই বিড়িখোর জুটল!'

সুরেন হাসে—যদিও মনের মধ্যে সে হাসির সমর্থন পায় না। বলে, 'পারলে তুমিই ছাড়াতে পারবে বৌদি, ও কি আমাদের কাজ! ...পিসীমা কত গালমন্দ দেন গন্ধ নাকে গেলে—সে তো তুমিও শুনেছ, তা-ই বন্ধ হয় না, আমি আর কত বকাঝকা করতে পারব যে, বন্ধ হবে!'

আবার হয়ত কোনদিন মণিকা বলে, 'বড্ড বাজে বকে ভাই তোমার দাদা। আমার যেন বিরক্ত লাগে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে—এটা-ওটা বকেই যাচ্ছে অনবরত!'

কোন কোন দিন, হেমন্তর আড়ালে, নিজেই ধমক দেয় নিমাইকে, 'আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। একটু চুপ করো তো। উঃ, সেই এসে পর্যন্ত সমানে বকছে। মুখও ব্যথা করে না। আমাদের তো শুনতে শুনতেই মাথা ধরে গেল!'

নিমাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, চুপ ক'রে যায়। মাথা চুলকোতে চুলকোতে সেখান থেকে সরে পড়ে একটু পরেই।

এইগুলোই ভাল লাগে না সুরেনের। এর বহুদূরপ্রসারী ফল দেখতে পায় সে মনে মনে।

আর সেই সঙ্গেই বোঝে যে, এখানে এমনভাবে দিনে দিনে জড়িয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না। তার এ বাড়ীতে আর না আসাই উচিত, অন্তত খুব কমিয়ে দেওয়া উচিত যাওয়া-আসাটা।

তবু সেটাই হয়ে ওঠে না। বার বার সঙ্কল্প করা সত্ত্বেও।

দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গ স্নেহ-বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবন—আশাহীন, আনন্দহীন—অবলম্বনহীন—এই আকুলতা ও পথচাওয়ার, অনুযোগ ও অনুরোধের আকর্ষণ এড়াতে পারে না। বুদ্ধি-বিবেচনার সতর্কবাণী, হিসেব-নিকেশ সব এক প্রবল অনাস্বাদিতপূর্ব আবেগের টানে কোথায় ভেসে চলে যায়।

শেষে বুঝি দৈবই বাঁচিয়ে দেয় সুরেনকে। অথবা ওর গুরুবল।

ছোট্ট ঘটনা, শুনলে হাস্যকর, ছেলেমানুষীই মনে হয়—তবু তাতেই চৈতন্য হয়।

ওরও, হেমন্তরও।

যত দিন কেটেছে, সংযত হওয়া, ব্যবধান রচনা করা দূরের কথা—সুরেন যেন বেশী ক'রে জড়িয়ে পড়েছে। সেটা হেমন্তও যে লক্ষ্য করে নি তা নয়, তবে তার মধ্যে দুষ্য কিছু আছে ভাবে নি। মা-বাবা-ভাইবোন থেকে দূরে একা পড়ে আছে একটা টিনের ঘরে, নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়—না পায় কারও স্নেহভালবাসা, না পায় কোন মধুর সাহচর্য। এখন যৌবন কাল, স্ত্রী-সঙ্গ তো একরকম প্রয়োজনই—অথচ সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কোন ভাল চাকরি পেলে তবে; যা দিনকাল, সে আশা করাও বাতুলতা। বোনেদের বিয়ে দিয়ে নিজে বিয়ে করবে, ততদিনে আবার ভাইঝিরা বড় হয়ে

উঠবে। তাছাড়া নিজেও তো বুড়িয়ে যাবে। বিয়ের বয়স কি থাকবে?

নাঃ, সে আশা বিশেষ নেই। সুতরাং ছ'টো দিন এখানে যদি একটু শান্তি পায়—পাক না। ছোট বোনের মতো—আব্দার অনুযোগ করে, আদরযত্ন করে—সেটা ভাল লাগা স্বাভাবিক। আর তাতে দোষই বা কি! থাকে তো বড়জোর মেরেকেটে দু-ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা। আরও, আজকাল প্রায়ই ফিরতে দেরি হয়ে যায় বলে এখানে খেয়েই যায় বেশির ভাগ দিন, সেও একটা শান্তি হেমন্তর। সে রাত্রে ভাত খাইয়ে পরের দিনের রুটিও এখান থেকেই ক'রে দিতে চেয়েছিল—সুরেন কিছুতে রাজী হয় নি। তবু রাত্রের খাওয়াটা চোখের সামনে বসিয়ে খাওয়াতে পারে সেও কম তৃপ্তি নয়।

সুরেনও যে বুঝতে পারত না তা নয়। কিন্তু ক্রমশ, জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা-হিসাববোধের ওপর আবেগের এই প্রাধান্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল। আজকাল আর অতটা ভাবতও না। ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক, কতকটা এইরকম হয়ে উঠেছিল মনের ভাব। এখানের হাস্য-পরিহাস দু-একখানা গান, কিছুটা আব্দার, কিছুটা প্রীতির প্রকাশ—জোর ক'রে এটা-ওটা খাওয়ানো, জোর ক'রেই বাতাস করা, ময়লা গেঞ্জি ছাড়িয়ে নিয়ে জোর ক'রে সাবান দিয়ে কেচে দেওয়া—এই ধরনের ছোটখাট সেবার চেষ্টা—সব জড়িয়ে যে মধুর স্মৃতি—বাসায় ফিরে গিয়ে সেটারই রোমন্থন চলত—তার মধ্যে বিবেক বা পরিণত বুদ্ধি প্রবেশের পথ খুঁজে পেত না ওর মস্তিষ্কে। সুখস্মৃতির এই পুনরাস্বাদনের মধ্যে যেন কোথায় একটা মুক্তি, একটা অবকাশের আস্বাদন লাভ করত।

এক-আধ দিন বিশ্বনাথবাবু মৃদু ঠাট্টা করতেন, 'কি হে, ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে!...নাঃ, যা দেখছি ক'দিন পরে ওখানে গিয়েই বাসা বাঁধবে।...আমার আড্ডাটাই দেখছি ভেঙে গেল! রান্নাবাড়া

চুলোয় যাক—রাত্রে কখন ফেরো তাই টের পাই না।···আর যা সব লোক, দু'টো কথা কইব সে মানুষ নেই।···তা সোজাসুজি পিসীর বাড়িই গিয়ে উঠলে পারো, আপন পিসী তো—পর তো আর নয়?'

এ ঠাট্টার মধ্যে কোন খোঁচা বা জ্বালা ছিল না বলেই অত গায়ে মাখত না সুরেন।

চৈতন্য হল অন্য ঘটনায়। অন্য আঘাতে।

হেমন্তর বাড়ির ছাদে অনেক ফুল গাছ ছিল,—টবে-টিনে-ডাবায়। ফুল কেন—একটা পেয়ারা গাছ একটা লেবু গাছও ছিল। ছোটখাট বাগান বলা যায়। ঘোলা জলের ট্যাঙ্ক আছে ছাদে, আগে ঝিরা জল দিত, এখন মণিকাই দেয়। তারও গাছের শখ খুব, ক' বছর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে সেটা আরও বেড়েছে—নিজের গরজেই যত্ন করে, পরিচর্যা করে। আগে এখানেই—এই ফুল গাছের মধ্যে ওদের সান্ধ্য আড্ডা বসত, মাস খানেক হল হেমন্ত মণিকাকে সন্ধ্যার পর ছাদে যেতে বারণ করেছে। এমনিও কোথাও গেলে কি বিকেলে ছাদে উঠলেও খোঁপাতে খড়কে কাঠি গুঁজে দিচ্ছে। অর্থাৎ সন্তান-সম্ভাবনার লক্ষণ। এখনও ঠিক নিশ্চিত নয় হয়ত—তবে সাবধানের মার নেই বলেই এখন থেকে এত সতর্কতা।

সুরেন কিন্তু এই গাছগুলির আকর্ষণেই একবার ক'রে ছাদে ওঠে রোজ। তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে পাড়াগাঁয়ে, গাছপালার মধ্যেই মানুষ বলতে গেলে। এখানে এই সার্পেন্টাইন লেনের অন্ধ গলির মধ্যে মাটকোঠার জীবন যেন এক-এক সময় অসহ্য বোধ হয়। সত্যি-সত্যিই হাঁফ ধরে সেসব সময়গুলোয়, মনে হয় দু'টো একটা গাছপালার মুখ দেখা গেলেও কিছুটা স্বস্তি পেতে পারত। পয়সা বা সময় থাকলে ওখানেই টবে দু'টো গাছ বসাত। ও ঘরের একমাত্র জানলা (জানলা নয়—ঘুলঘুলি বলাই উচিত, এতই ছোট সে) থেকে পেছনের বাড়ির এক টুকরো ছাদ দেখা যায়, সেই কোণটায় আলসের ওপর একটা টবে তুলসী গাছের সঙ্গে একটা হাড়ভাঙার

গাছ লাগান আছে, কোন কোন দিন দম বন্ধ হয়ে আসার মতো ভাব হলে খানিকটা সেই দিকেই চেয়ে থাকে।

এই জন্যই তার পিসীমার বাড়ির ছাদ এত ভাল লাগে। উনত্রিশটা টব আছে—টব আর কেরোসিনের টিন মিলিয়ে। এ ছাড়া একটা কাঠের ডাবা। তাতে একটা হাসনুহানার ঝাড় হয়েছে। এটা এসেছে মণিকা আসার পর, তারই শখে। টিন ছ'টোতে আছে লেবু আর পেয়ারা গাছ, এত টুকু-টুকু ফলও হয় মধ্যে মধ্যে। তাতেই যথেষ্ট আনন্দ এদের। এছাড়া সবই ফুলের গাছ —বেল যুঁই রজনীগন্ধা গন্ধরাজ গোলাপ জেঁওজষষ্ঠী—এই সব গাছই বেশী। একপেটে টগরও আছে একটা। ভোরে উঠে হেমন্ত কিছু ফুল পুজো করতে তুলে নিয়ে যায়, বেশির ভাগই টবে থাকে।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় এমনিই ছাদে উঠে বেড়াচ্ছিল সুরেন। তখন হেমন্ত ঠাকুরঘরে—মণিকা ওর জন্যেই কি একটা খাবার করতে রান্নাঘরে গেছে। এবেলা হেমন্ত এটা-ওটা দেখিয়ে দেওয়া বা যোগাড় দেওয়া ছাড়া রান্না বিশেষ করে না, মাছ থাকে বলে। যা পারে ঠাকুরই করে, ঠাকুর না এলে মণিকা। তবে ঠাকুর থাকলেও, সুরেনের জলখাবার তার হাতে ছেড়ে দিতে চায় না মণিকা। ঠাকুরপোর জন্যে নিজে হাতে একটা কিছু ক'রে দিতে না পারলে ওর মন ওঠে না। তা হোক, কেউ না থাক, চারিদিকে এই ফুলের রাশির মধ্যে কিছুক্ষণ একা থাকতে ভালই লাগে সুরেনের। বরং এই অবসরটাই চায় সে।

ফুলের গাছগুলোর সামনে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করল, অনেক দিন পরে মতিয়া বেলের গাছটায় ফুল এসেছে, এক বোঁটায় একসঙ্গে ছ'টি ফুল ফুটেছে। বেশ বড়, মাঝারি আকারের গাঁদা-ফুলের মতো এক-একটা ফুল। দেখে এত লোভ হল যে, কেন তুলছে তা ভাল ক'রে ভাবার আগেই, বোঁটাসুদ্ধ জোড়া ফুল তুলে নিল। তুলে একটু ভয়ও হল অবশ্য—পিসীমা যদি কিছু মনে

করেন। তিনি হয়ত দেখে গেছেন, পরের দিন সকালে ঠাকুরকে দেবেন বলে চিহ্নিতও ক'রে রেখেছেন।...তবে তার পরই মনে হল, সব ফুল তো পিসীমাও তোলেন না, বলেন গাছ একেবারে ন্যাড়া ক'রে ফুল তুললে বিশ্রী লাগে, গাছ আলো ক'রে থাকে সে-ই ভাল। আর ফুলও তো ফুটেছে অজস্র, তাঁর পুজোর মতো ঢের আছে।

তোলার পর অতর্কিতে আপনিই একবার মনে হল, এটা মণিকার খোঁপায় গুঁজে দিয়ে আসে সে।

তারপর এই আকস্মিকভাবে মনোভাবটা নিজের কাছেই ধরা পড়ে যাওয়ায়—নিজের মনের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল, আসলে এটা মণিকার জন্যেই তুলেছে সে। ফুল তার সাধারণত গাছ থেকে তুলতে ইচ্ছে করে না—আজকে এটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাত এগিয়ে গেছে এবং কী করছে তা বোঝার আগেই তুলে নিয়েছে—তার পেছনে এই ইচ্ছাটাই কাজ করেছে, নিজের অজ্ঞাতসারেই। সে সময় ওর মানসচক্ষুর সামনে যে সুগৌর সুডৌল গ্রীবা ও কাঁধের ওপর এলিয়ে-পড়া বিপুল কালো খোঁপার ছবিটা ছিল, সেটা মণিকারই। এ-ফুল ঐ খোঁপাতেই, ওকেই মানায়; ও খুশী হবে—এ-চিন্তাটা আপনা থেকেই মনে এসেছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হবার অনেক আগেই হয়ত।

এবার, এই ধরা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রবল লজ্জা বোধ করল সে। একটা অবচেতন অপরাধবোধের লজ্জা। সেইজন্যেই হাতে ক'রে নিয়ে এসে—খোঁপায় পরিয়ে না হোক, অন্তত ওর হাতে দেবার প্রবল ইচ্ছা হলেও—শেষ অবধি দিতে পারল না। অনেকবার ইতস্তত: করল, কয়েকবার চেষ্টাও করল—কিন্তু একটা প্রবল সঙ্কোচ এসে যেন হাত চেপে ধরল, মনের মধ্যে আকুতিটা আকুলি-বিকুলি করা সত্ত্বেও পারল না। পিসীমা কি নিমাইদা কি মনে করবেন, এ-আশঙ্কার থেকেও তার নিজের কুণ্ঠাটাই যেন বেশী।

একবার ভাবল মণিকাদের ঘরে রেখে আসে—তাও পারল

না। ওর মাথায় পরিয়ে দেবার জন্যে যা তুলেছিল, তা হাতে দিলেও কিছু তৃপ্তি পেত—শুধু শুধু ঘরে রেখে আসার কোন মানে হয় না। হয়ত নিমাইদাই নিয়ে কানে গুঁজবে কি হাতে ক'রে চটকাবে। তার চেয়ে পথে ফেলে দেওয়াও ভাল। সুতরাং কিছুই করা হল না, শেষপর্যন্ত নিজেরই বুকপকেটে রেখে দিল ফুলজোড়াটা।

হেমন্ত দেখেছিল ফুলটা, 'বাঃ, বেশ বড় হয়েছে তো! বৌমার সার দেওয়াতেই এত বড় হয়েছে এবার!' এছাড়া কোন মন্তব্য করে নি। একটা ফুল তোলা নিয়ে এত বলারই বা কি আছে!

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি যাবার সময়ও ভাবল একবার—বৌদিকে ডেকে দিয়ে যায়, তখনও পারল না। সেই একই সঙ্কোচ। শেষে কতকটা নিজের ওপর বিরক্ত হয়েই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

অন্যদিন যাওয়ার সময় নিচের সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়েই চলে যায় সে, ঝি একেবারে রাত্রে ভালভাবে বন্ধ ক'রে দেয়। আজ নিচে নেমে দরজা খুলতে গিয়ে দেখল দরজার ঠিক পাশে ছায়ামূর্তির মতো কে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বিস্মিত হবার, সন্দিগ্ধ হবার কি কোন প্রশ্ন করার আগেই, যে দাঁড়িয়েছিল সে সটান ওর বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে ফুলদু'টো বার ক'রে নিয়ে চকিতেই সিঁড়ির নিচের ঘনতর ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল।···

বাইরে বেরিয়ে এসে বহুক্ষণ সেইখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সুরেন। হঠাৎ যেন পা-দু'টো বড় দুর্বল, অনড় হয়ে গেছে। একটা অসহ সুখে, দুরাশার সংশয়-কণ্টকিত বেদনায় এবং অনির্বচনীয় চরিতার্থতাতেও—বুকের মধ্যেটা রিন্‌রিন্ করছে। এ-ধরনের সমস্ত-ইন্দ্রিয়-অবশ-করা অনুভূতি এই প্রথম তার জীবনে। এ যে সুখ নয়, অধিকতর দুঃখেরই ভূমিকা, সে কথা তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তবু এই মুহূর্তে সমস্ত দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কাকে আচ্ছন্ন ক'রে একটা চিন্তাই মনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল, মনে হল—এই মুহূর্তটারই জয় হোক জীবনে। বিবেচনা হিসেব—এ তো রইলই।

এর মাস-দুই আড়াই পরে হেমন্তই একদিন শেষ বিকেলে সুরেনকে 'এই, একবার শোন্'—বলে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল।

তখনও অপরাহ্নের আলো একেবারে বিদায় নেয় নি, আলো না জ্বাললেও কিছুটা নজর চলে। ছাদে উঠে মুঠোর মধ্যে থেকে একটা কি বার ক'রে দেখাল হেমন্ত, 'এটা চিনতে পারিস ?'

হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল সুরেন, শুকনো ফুলের মতো কি। আর একটু ভাল ক'রে দেখে চিনল, শুকনো মতিয়া বেলফু'টো। এখনও, এত শুকিয়ে গেলেও, এক বোঁটাতেই আছে।

মুখটা শুকিয়ে গেল ওর, বুকের মধ্যে অকস্মাৎ যেন মৃদু যন্ত্রণা বোধ করল একটা। বুঝি রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠারই বেদনা এটা—কিন্তু শুধুই কোন অজ্ঞাত আশঙ্কায় নয়, বোধ করি একটা অনির্বচনীয় আনন্দেও—ঘটনার অভাবনীয়তায়।

তবু সে মিছে কথাও বলল না। বলার চেষ্টা করাও মূর্খতা সে জানে—হেমন্তর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও শাণিত সহজ বুদ্ধির বহু পরিচয় সে পেয়েছে এর মধ্যে। শুধু বলল, 'পারি।'

হেমন্ত মিনিট-দুই চুপ ক'রে রইল। ও-পাশের মিত্তিরদের বাড়ির ছাদে কে একটি মেয়ে ছেলে কোলে ক'রে বেড়াচ্ছে; গাঙ্গুলীদের ছাদ থেকে একটা বেড়াল লাফিয়ে ওদের ছাদে যাবার চেষ্টা করছে—মেয়েটি থাকার জন্যে যেতে পারছে না; দূরে বড় রাস্তায় ট্রাম-বাসের শব্দ হচ্ছে, মোটরের হর্ণ; আকাশে একটা তারা উঠে পড়ল, হঠাৎই—অকূল চিন্তার মধ্যেও হেমন্তর সংস্কার কাজ ক'রে গেল, মৃদুকণ্ঠে 'কপিল' 'কপিল' বলে উঠল একবার; নিচের কলতলায় জল পড়ার শব্দ; পাশের বাড়িতে কোথায় একটা শিশু কেঁদে যাচ্ছে; এমনি নানান তথ্যে দৃষ্টি ও মন দেবার চেষ্টা করল সুরেন। কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে একটা সকারণ অপরাধবোধ ও অকারণ আনন্দের সংঘাতই মনের মধ্যে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে—কিছুতে কোনদিকে যেন মন দেওয়া আর সম্ভব নয়।

হেমন্তই নীরবতা ভঙ্গ করল একটু পরে। ধীর গম্ভীর—ঈষৎ

বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, 'বৌমার পোর্টম্যাণ্টটা গুছিয়ে দিতে বসেছিলুম আজ। পেটে ছেলে আসার পর অনেকেরই শরীর খারাপ হয়—এর আবার বড্ড বেশী, কিচ্ছু মুখে তুলতে পারছে না। যা খাচ্ছে, বমি হয়ে যাচ্ছে তা তো দেখছিসই। ওর দ্বারা কিছু হবে না। অথচ কাপড় বার করতে ফি-বারই দেখি সব এলোমেলো হয়ে রয়েছে, হাণ্ডুল-মাণ্ডুল করা। সেইজন্মেই আজ দুপুরে ওটা নিয়ে বসেছিলুম। বৌমা ঘুমুচ্ছিল তখন আমার ঘরে, সে জানেও না। তোরঙ্গের তলার দিকে নেকলেসের বাক্সর মধ্যে এটা ছিল, এমনি পড়ে থাকা নয়, বাক্সর মধ্যে যখন ছিল তখন কেউ যত্ন ক'রেই রেখেছে নিশ্চয়।'

এই বলে আবারও চুপ করল হেমন্ত।

সুরেনেরও কিছু বলার কথা নয়। দণ্ডাদেশ শোনার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে সে। সে-ও চুপ ক'রে রইল।

হেমন্তই আবার বলল, 'তোর দোষ নেই, তুই তো আসতে চাইতিস না, আসা কমিয়ে দিতেই চেয়েছিলি। আমরাই জোর করেছি।···কিন্তু তুই এবার সত্যিই আসা-যাওয়া কমিয়ে দে বাবা। নিমে যা-ই হোক, ওর ঘরই করতে হবে মেয়েটাকে। এ তো আর ফেলবার জিনিস নয়, জন্মান্তরের সম্পর্ক বলে—তা না হলেও আমরণ সাথী তো বটেই। মিছিমিছি মনে একটা বড়রকম ভাঙন ধরলে গ্যাখ দু'টো জীবনই নষ্ট হবে।···এ তো বদলে নেওয়া সম্ভব নয়।·· আর চাঁদ সামনে থাকলে জোনাকীতে কার মন ভরে বল্?'

তবুও সুরেন কিছু বলল না। কত কী পরস্পর-বিরোধী ভাব-সংঘাত হচ্ছে তার মনে—সে প্রবল বিপ্লবে বা সংঘর্ষে কিছু গুছিয়ে ভাবা কি বলার শক্তি নেই আর।

একটা প্রবল অভিমান, অবিচারবোধ মাথা তুলতে চাইছে, ইচ্ছে করছে চিৎকার ক'রে প্রতিবাদ করে। 'কেন কেন, এই মণিকার মতো মেয়ের জীবন ঐ নিমাইয়ের মতো অর্ধ-বর্বরের সঙ্গে জন্মান্তরের মতো গাঁথা হয়ে থাকবে, আর থাকলেও কেন তার একটু উপরি পাওনা—একটু স্নেহ, একটি পূজাবনত নীরব হৃদয়ের প্রীতিরু

অর্ঘ্য—নেওয়াও নিষিদ্ধ হবে? এ তো কোন কলুষিত সম্পর্ক নয়।'

আবার সেই ক্ষোভের মধ্যেই কোথায় একটা পরিণত বিচার-বুদ্ধি যুক্তি প্রয়োগ করে—হেমন্ত যা বলছে তা ষোলআনাই সঙ্গত। আকর্ষণটা যে এইখানেই থেমে থাকবে তার কোন অর্থ নেই। পূজারী যে পূজা ক'রেই তৃপ্ত থাকবে চিরদিন, তারই বা নিশ্চয়তা কি? দু'জনে দু'জনের দিকে আর একটু বেশী এগিয়ে এলে—তারপর? সুরেন কি করতে পারবে, কতটুকু সাধ্য তার? সে কি পারবে ওকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে, জীবনের ভার নিতে—জীবনসঙ্গিনী করতে?...না, তা সম্ভব নয়। আর সম্ভব যখন নয়—তখন অকারণে মেয়েটার মনে একটা প্রবল তৃষ্ণা, সেই সঙ্গে বর্তমান ভাগ্যে অতৃপ্তির ভাব বাড়িয়ে লাভ কি?...

কিন্তু এ সমস্ত মনোভাব ছাপিয়ে একটা আনন্দেও বুক ভরে যায় যেন।

এমন কখনও ভাবে নি, এমন আশাও করে নি। অন্তরবাসিনী দেবী যেদিন পূজার্থীর কাছ থেকে নিজে পুষ্পার্ঘ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনও সে-অর্ঘ্যের এ-পরিণতি ছিল স্বপ্নের অগোচর। পূজার্থীই পূজিত হবে—ভক্তের নিবেদিত উপহার দেবীই পূজার আসনে বসাবেন—এর চেয়ে বড় কোন্ বর কোন্ পুরস্কার ভক্ত আশা করতে পারে?

অনেক—অনেকক্ষণ পরে—বুঝি বা নিজের বুকেরই তুফান ঝঞ্ঝার দিকে কান পেতে থাকতে থাকতেই—উদ্বেলিত আবেগ সংঘাত কিছুটা সামলে নিয়ে শুধু বলল, 'আচ্ছা...আমি তাহলে এখন যাই?'—সে সত্যিই ছাদের দোরের দিকে পা বাড়ায়।

হেমন্ত সজোরে ওর একটা হাত চেপে ধরে, 'ও কি, এখনই যাবি কি? পাগল হয়েছিস নাকি? না না, রাগ-অভিমান ক'রে চলে যাস নি। তোকে দিন-রাতই চোখের সামনে রাখতে ইচ্ছে করে আমার, সেই তোকে আসা কমিয়ে দিতে বলতে হল—বিধাতার

বিড়ম্বনা ছাড়া কি বল্। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়—এও তাই।··· তাই বলে একেবারে আসা-যাওয়া বন্ধও করিস নি। পেটেপোয়ে মেয়েটা মন গুমরে গুমরে থাকলে বাচ্ছাটা শেষপর্যন্ত হয়ত 'হাবা-কালা' হয়ে যেতে পারে। এই তাই—তুই এসেছিস শুনে মরে মরেও রান্নাঘরে গেছে তোর জন্যে চা-হালুয়া করতে। তোর খাবার আর কাউকে দিয়ে করালে শান্তি হয় না ওর।'

অগত্যা বসতে হল একটু। চা-হালুয়াও খেতে হল। সে হালুয়া গলার মধ্যে ডেলা পাকিয়ে কণ্ঠরোধ করতে চায়—তবুও খেল, জোর ক'রেই। তবে সেদিন আর মণিকার কোন অনুরোধ-উপরোধই শুনল না, একটু পরেই বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে।···

কিন্তু তখনই সেই নিরানন্দ অন্ধকূপেও ফিরতে পারল না। সেণ্ট জেম্স্ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল। বসেও রইল বহুক্ষণ।

দুঃখ? বেদনা?

না, বোধহয় শুধু তাও না। কী যে, নিজেই বুঝতে পারছে না যেন।

এইমাত্র সর্বাপেক্ষা কঠিন এক নির্বাসনের দণ্ডাদেশ শুনে এল, বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিয়েও এল সে দণ্ড। একটি মাত্র যে দীপশিখা তার সামনে অসীম অন্ধকার-জীবনপথে জ্বলে উঠেছিল ক্ষণকালের জন্য—তা চিরকালের মতোই নিভে গেল। আশা কিছু ছিলই না—সাময়িক আনন্দের যে উৎসটুকু ছিল—এইমাত্র বোধ করি নিজ হাতেই—স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।

তবু সব দুঃখ, জীবনব্যাপী—ভবিষ্যতে যতটা দৃষ্টি চলে—দিকদিশাহীন অন্ধকারের মধ্যেও একটা তৃপ্তি একটা পরিপূর্ণতার আনন্দও যে বোধ করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নিজের মনোভাবের সুরটি অপর একটি ঈপ্সিত হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়েছে—এই তো যথেষ্ট, এই তো অনেক পাওয়া। তার মতো ছন্নছাড়া জীবনে এর বেশি আর কি পেতে পারত সে?···

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই একভাবে বসে কেটে গেল সুরেনের। ক্রমশ জনবিরল হয়ে এল পার্ক, যে দু-চারজন পার্কেই শুয়ে থাকে রাত্রে—তারা একে একে আসতে শুরু করল আবার, দূরে চাঁপাতলায় গাড়িঘোড়ার শব্দও আর পাওয়া যাচ্ছে না। আশপাশের বাড়িতে আলো নিভতে লাগল একটির পর একটি, শুয়ে পড়ছে সবাই দিনের কাজ শেষ ক'রে শ্রান্তি ও চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেতে—সুরেন কিন্তু উঠতে পারল না। তার লাভ বেশী হল কি ক্ষতি—সেই হিসেবটাই মিলছে না তার কিছুতে—অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা ক'রেও।

॥ ২৫ ॥

মণিকার প্রথম সন্তান ছেলেই হল। মায়ের মতো অত সুন্দর নয় হয়ত—তবে নিমাইয়ের মতোও নয়। মোটের ওপর দেখতে ভালই। রঙ এখন যতটা অত থাকবে না, তবু ফরসা-ঘেঁষাই হবে। বেশ স্বাস্থ্যবানও হয়েছে।

হেমন্ত আদর ক'রে নাম রাখল 'গোপাল'। নিমাইচরণ নিজেদের নিয়মে কৃষ্ণচরণ রাখতে চেয়েছিল—কালীচরণেও আপত্তি নেই জানিয়েছিল—হেমন্ত ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে, 'রাখ দিকি! তোর বংশের বিন্দুবাষ্পও ছোঁয়া না লাগে ছেলেটার। যদিবা কেষ্ট নাম রাখতুম ফরসা ছেলের কেষ্ট নাম রাখতে দোষ নেই—কেলে ভূত যদি নিমাই গৌর হতে পারে তো ফরসা ছেলের কেষ্ট হওয়াই উচিত—তা ঐ জন্যেই রাখব না, ও আমার গোপালই ভাল।'

মণিকার অবশ্য কৃষ্ণ বা গোপাল কোনটাই পছন্দ নয়। ষোড়শীবাবু নাকি কবে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে হলে রবীন্দ্রনাথ নাম রাখব'—সেইটেই ধরে ছিল মণিকা, বললও শাশুড়িকে—হেমন্ত তাও উড়িয়ে দিল।

'হ্যাঁ! গণ্ডা গণ্ডা রবীন্দ্রনাথ চারদিকে গড়াগড়ি খাচ্ছে, সবাই কি রবিঠাকুর হচ্ছে নাকি? ছ্যাখো গে যাও কত রবীন্দ্রনাথ বিড়ি পাকাচ্ছে, কত জেল খাটছে বসে। ঐ যে আধপাগলা লোকটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় চাইতে থাকে—ওর নামও রবীন্দ্রনাথ।'

আর কথা বলতে পারে না মণিকা। তবে কৃষ্ণচরণ নাম যে রাখে নি তার জন্যে শাশুড়ির কাছে সে কৃতজ্ঞ। মাগো, ঐ আবার একটা নাম নাকি? সবাই ডাকবে কেষ্টা বলে।··চাকর-বাকরের মতো।···ওদের নাকি বংশের ধারা। রক্ষে করো! বংশের ছেলেদের যা নমুনা! ঐ তো এসেছিল সব জ্ঞাতি-ভাইরা, কী এক-একখানি চেহারা, আর তেমনি কথাবার্তা। তেমনি সব কীর্তি-কাহিনী। ওদের জন্যেই তার সাধটা হতে পারল না। নিসেধো হল ছেলেটা, সে আর এক রাগ। এর কে ভাইপো এক, গোরা না গৌর—সাধের যে দিন ঠিক হয়েছিল, তার দু'দিন আগেই মারা গেল। অশৌচ পড়ল—সে অশৌচ যখন কাটল, তখন আর পাঁজিতে দিন নেই, আর তারপর—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ছেলেও তো হয়ে গেল।·সে ভাইপোও তেমনি, উনিশ-কুড়ি তো মোটে নাকি বয়েস—বলে তো, কত ঠিক কে জানে—এরই মধ্যে খারাপ রোগ ধরিয়ে বিনি চিকিচ্ছেয় মরে গেল। শেষে নাকি গায়ে এমন পচা গন্ধ হয়েছিল যে, কেউ ওর ঘরে যেত না। ধসা-পশ্চিমে না কি বলে—তাই হয়ে গিছল।···

ঐ তো গুণধর ভাইপো—ইনি আবার বলেন সে-ই নাকি ওর গোপাল হয়ে এ-বাড়িতে এসেছে আবার। ভাগ্যিস শাশুড়ি অনেক জানেন শোনেন, তিনি বলেছেন, 'তা কখনও হয়, পাঁচ মাসে প্রাণ এসে যায় ছেলের—আর এ তো মরেছে বৌমার ভরা ন'মাসে। তোর যেমন কথা!···তা শাশুড়িও তো ঐ গুণধর নাতির জন্যে কেঁদেকেটে চোখ ফোলালেন। এদের বাড়ির কি ব্যাপার ভগবানই জানেন!···'

ছেলে ভালভাবেই মানুষ হতে লাগল। হেমন্তর যত্ন খুব। নিয়মকানুন জানেও অনেক, ঘড়ি ধরে নাওয়ানো খাওয়ানো করে।

সেদিক দিয়ে মণিকা অনেক নিশ্চিন্ত। তবে কড়াও খুব। ষোড়শীবাবুর স্ত্রী নাকি হঠাৎ মারা গেছেন, শুনে বাপের বাড়ি যাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, হেমন্ত যেতে দিল না। ছেলের নাকি অযত্ন হবে, অনিয়ম হবে। সেইটেই প্রধান কারণ। তার পর বলল, 'আর তার বৌ মরেছে, তুমি গিয়েই বা কি সান্ত্বনা দেবে! তোমাদের জ্ঞাতি কি আত্মীয়ও নয়। তার বাড়িতেও ঢের লোক—তোমাকে শোক ভোলাতে যেতে হবে কেন? বৌ মরেছে বেশ হয়েছে, ভাগ্যিমানের বৌ মরে। পয়সা আছে, চেহারা ভাল, বয়স বোঝা যায় না—আবার দু'মাস পরেই দেখো একটা বিয়ে করবে। ওদের আবার শোক, ওদের আবার দুঃখ!'

এর পরে আর কিছু বলতে পারে না মণিকা, মুখ ভার ক'রে থাকে। ষোড়শীবাবু এর ভেতর দু-একবার দেখা করতে এসেছিলেন, হেমন্তর সঙ্গেও দেখা ক'রে গেছেন। 'বেয়ান' বলেন নি, বলেছেন 'মাসীমা'। চলে যেতে হেমন্ত ভ্রূকুটি ক'রে বলেছে, 'কী রকম সম্পর্ক তোমাদের বৌমা? অতবড় মানুষটা, যতই হোক—পঞ্চাশের মতো বয়স তো হবেই, হয়ত দু-এক বছর এদিক-ওদিক হতে পারে, বেশী হওয়াও আশ্চর্য নয়—তা তুমি কাকা কি মামা কি মেসো কিছু বলো না? সে সুবাদে আমাকে তো বেয়ান বলা উচিত। কী বলে ডাকো তুমি?'

ভাল ক'রে জবাব দিতে পারে নি মণিকা, জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে, 'না, আমরা—মানে—এমনি কিছুই বলি না—মানে ডাকার তো দরকার হয় না।…আড়ালে ষোড়শীবাবুই বলি। তেমন হলে—এক-আধবার বুঝি ষোড়শীদাও বলেছি।…কে জানে, অত মনে নেই—।'

'অতবড় মানুষটা তোমার দাদা হতে গেল আবার কি সুবাদে!' অপ্রসন্ন মুখে মন্তব্য করেছে হেমন্ত।…

অবশ্য সান্ত্বনা দেবার জন্যে মণিকাকে যেত হল না, নেবার জন্যে ষোড়শীবাবুই এলেন। এবার যেন একটু ঘন-ঘনই আসতে লাগলেন।

এসে হয়ত বলেন, 'এই—একটু কাজ ছিল এদিকে—ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টারের সঙ্গে দেখা করতে হল একবার।' নয়ত 'একবার একটু য়্যাটর্ণী বাড়ি যেতে হয়েছিল—তাই বলি তোর একটু খোঁজ নিয়ে যাই।' কিংবা 'রেভিনিউ' আপিসে একটা কেস ছিল তাই আসতে হল। বলি যে যাই একবার—' ইত্যাদি।

হেমন্ত এমনি কিছু বলে না, শুধু একদিন আর থাকতে পারে নি, বলেছিল, 'বৌমা, ভদ্রলোকের দেখছি ঘন-ঘন কলকাতায় আসবার দরকার হচ্ছে। ঘরে বোধহয় একেবারেই মন টিকছে না আর!'

মণিকা ফোঁস ক'রে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে, 'তা ভদ্রলোক আসছেন, উপকারী লোক, আমাদের অন্নদাতা—ওঁকে কি মুখের ওপর আসতে বারণ ক'রে দোব? উনি কি কোন খারাপ উদ্দেশ্যে আসেন?'

হেমন্তও শীতল কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'এ আবার কি ধরনের কথা বৌমা! আমি তো বারণ করার কথা বলি নি, উদ্দেশ্যও খুঁজতে যাই নি। এ তো ঠাট্টা ক'রেই বলা—এমন তো হামেশা বলে থাকে লোকে। এ আমি ওঁর মুখের ওপরই বলতে পারি। একথা তোমার গায়েই বা বাজে কেন? বলে পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে!...তাহলে কথাটা তোমার মনেও লেগেছে বুঝতে হবে!'

এরপর চুপ্‌সে চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। হঠাৎই কথাটা বেরিয়ে গিছল মুখ দিয়ে, এতটা ভাবে নি।

এর দিনকতক পরে ভদ্রলোক আর একদিন একটা ছুতো ক'রে এলে হেমন্ত খাতির ক'রে বসিয়ে জলখাবার খাইয়ে—নিজেও সামনে চেপে বসল। অন্যদিন, বাপের বাড়ির লোক এলে একটু আড়ালে ওদের কথা কইতে দেওয়া উচিত বলেই, কোন একটা ছুতো ক'রে অবসর দিয়ে সরে যায়। আজ ইচ্ছে ক'রেই গেল না। কুশল-প্রশ্নের পর বৌমার বাবা-মা-ভাইবোনের খবর নিয়ে বলল, 'বেইমশাই (বেই শব্দটায় একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ করল) এমন সময়েই আসেন, একদিনও আপনাদের জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় না।

আজ বরং থেকে যান, আলাপ-টালাপ ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে যেতে পারেন যাবেন—নয়ত একটা রাত না হয় গরিব মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি কাটালেনই।'

'বেইমশাই' শুনেই মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল ষোড়শীবাবুর, তার ওপর 'মেয়ে-জামাই' যোগ করাতে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। তবে তিনিও—ছোটখাটো হলেও জমিদার ও ব্যবসাদার, বললেন, 'না, সে আজ আর হবার জো নেই মাসিমা, বলা-কওয়া তো নেই, তাছাড়া মা-মরা ছোট ছেলেটা, রাত্রে আমি কাছে না থাকলে বড় কান্নাকাটি করে। আর একদিন তখন সময় ক'রে—একটা ছুটির দিন দেখে এলেই হবে।'

তারপর একটু কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে বললেন, 'তা আপনি আমাকে বেইমশাই বললেন কি সুবাদে ? আমি তো আপনাকে মাসিমা বলি, আর মনুও তো দাদা বলে আমাকে— !'

'তা বটে। ঐ দেখুন—মনের ভুল। বয়েস হয়েছে তো। তাছাড়া আপনাকে বয়সের তুলনায় একটু বড়ই দেখায় বলে—কেমন যেন বৌমার দাদা ভাবতে পারি না, গুলিয়ে যায় সম্বন্ধটা। কাকা কি মেসো ভাবতেই ইচ্ছে করে।…তা আপনি আমার বেয়াইকে কি বলেন—কাকা না মামা না মেসো ?'

খুবই সরল, সহজ কণ্ঠস্বর—প্রশ্নেও কোন জটিলতা নেই। কিন্তু ষোড়শীবাবু এতেই ঘেমে উঠলেন। বললেন, 'না, মানে কী যে বলি কখন—আসলে তার কিছু ঠিক থাকে না। কিছু যে সম্পর্ক পাতিয়ে ডাকি—তা মনে হয় না।…আপিসে তো, অবিনাশবাবুই বলি বেশির ভাগ।'

মণিকার মুখও রাঙা হয়ে উঠেছে এ প্রশ্নে। সে জলখাবারের খালি রেকাবিটা নিয়ে বাইরে রাখতে চলে গেল। হেমন্ত পুনশ্চ তেমনি অমায়িক সহজকণ্ঠেই বললে, 'আমার অবিশ্যি বলা শোভা পায় না, আস্পদ্দার মতোই শোনায়—তবু যখন মাসিমা বলেন, সেই অধিকারেই বলছি—এমন কিছু বয়েস নয় তো আপনার—আর একটা

বিয়ে ক'রে ফেলুন, দেরি করবেন না। শুধু শুধু এমন ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ নেই এখানে ওখানে, এতে শান্তি পাবেন না, ঘরের ফাঁকটা ভরবে না তাতে। কতদিন বাঁচবেন তার তো ঠিক নেই, কদ্দিন আর অপরের ভরা-ঘর দেখে নিঃশ্বেস ফেলবেন? বিয়ে করতেই হবে, করবেনও—সেক্ষেত্রে মিছিমিছি আরও খানিকটা বয়েস না বাড়িয়ে কাজটা সেরে নিন।...আর যদি আপনি অপরাধ না নেন তো বলি, এদের তো আপনি ভালবাসেন—বৌমার বোনটিকেই দয়া ক'রে গ্রহণ করুন না। তারও জানাশুনো ঘর—আপনার ছেলে-মেয়েরাও তাকে চেনে—বাইরে থেকে কাকে আনবেন, সে কি রকম লোক হবে তা তো জানেন না, সেগুলোর হয়ত দুগ্‌গতির সীমা থাকবে না। এ গরিবের মেয়ে, আপনার ঘরে পড়লে বর্তে যাবে, প্রাণ দিয়ে খাটবে।'

ঘামের ফোঁটাগুলো বড় বড় ধারায় গড়িয়ে পড়তে শুরু করে ষোড়শীবাবুর কপাল গলা বেয়ে। দরজার বাইরে মণিকাও যেন পাথর হয়ে যায়—উত্তরটা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। শাশুড়ি যে একথাটা পাড়বেন তা স্বপ্নেও ভাবে নি, তবে এখন মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

'কিন্তু সে তো মানে'—ষোড়শীবাবু আমতা আমতা করেন, কী যে বলবেন যেন ভেবে পান না।

'সে দেখতে ভাল নয়, রঙ ময়লা—এই তো? তা না-ই বা হল বেই—ঐ দেখুন আবার সেই ভুল, বাবাই বলি—তা না-ই বা হল বাবা, একবার তো সুন্দর পেয়েছিলেন, এতকাল তো ভোগও করলেন—এখন সেবাযত্ন ঘরকন্না করবে গুছিয়ে, ছেলেমেয়েদের দেখবে—এই জন্যেই তো বিয়ে করা? এখন আপনি একটা সুন্দরী অল্পবয়িসী বৌ আনলে সে আপনাকে পছন্দ করবে কিনা তাও ভাবুন। মিছি-মিছি বুড়ো বয়সে অশান্তি জোটানো।'

ষোড়শীবাবু এতখানি জীবনে কখনও এমন বিব্রত বোধ করেন নি বোধ হয়। তাঁর যেন মনে হল তিনি একটা খাঁচা-কলে পড়ে

গেছেন। অন্য কোনভাবে ধিক্কার দিলে মণিকা তাঁর দলে আসত, এ পরিস্থিতিতে তার কি মনোভাব হবে সেটা বুঝতে না পেরেই আরও অস্বস্তি তাঁর।

ফলে তিনি যেন একটু ক্রুদ্ধই হয়ে উঠলেন। আর রাগ হলে খুব বুদ্ধিমান লোকও যা-তা বলে বসে। ষোড়শীবাবুও হঠাৎ বলে ফেললেন, 'তা তাহলে মনুর সঙ্গে শালী সম্পর্ক হয়ে যাবে—তখন তো রোজ এলেও আপনি আপত্তি করতে পারবেন না!'

'ওমা, তা এখনই বা আপত্তি করছে কে? আমরা কি কখনও আপত্তি করেছি? আপনি রোজই আসুন না। আমি তো আপনাকে উলটে থেকে যেতেই বলছিলুম আজ।...তা নয় বাবা, এলে কি আপনার লাভ হবে? পষ্ট কথা বলছি কিছু মনে করবেন না—অনেক বয়েস হল, দেখেছি শুধু শুধু ঢেকে-ঢুকে কথা বলতে গিয়ে কোন লাভ হয় না—এখানে, আপনার দিক থেকেই বলছি, নিত্য না আসাই ভাল। চোখের সামনে এই চেহারা দেখলে এমনি বৌ-ই চাইবেন, কিন্তু এ চেহারা পাওয়া কি এত সোজা? আর দোজবরে—যতই যা বলুন পঞ্চাশের কাছাকাছি তো বয়েস গিয়েইছে—আপনাকে এত সুন্দরী মেয়ে দেবে কেন? এ জিনিসও পাবেন না, সে তো আর হবার নয়—এমন জিনিসও পাবেন না। এ ভুলে যাওয়াই ভাল। আপনার মঙ্গলের জন্যেই কথাটা বললুম বাবা, হয়ত একটু রূঢ় শোনাল—নিজগুণে অবস্থা বুঝে ক্ষমা করবেন।'

আর বসতে পারলেন না ষোড়শীবাবু। রাগ, না ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা, তা তাঁর কাছেও স্পষ্ট নয় তখন—শুধু এই মহিলাটির তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাওয়া দরকার—এইটেই মনের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রবল। মণিকা এই দরজার বাইরেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, তা অনেকক্ষণ ধরেই আড়ে দেখছেন। তবু তার চোখের দিকে চাওয়া তো দূরের কথা, যাবার সময় একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত ক'রে গেলেন না। কোনমতে হেমন্তর দিকে একটা হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গী ক'রে দ্রুত নেমে চলে গেলেন।

ষোড়শীবাবুর আসা এবার বন্ধ হল। সুরেন তো বহুদিনই আসা বন্ধ করেছে—ন'মাসে ছ'মাসে হয়ত একদিন আসে—মণিকা অনুযোগ করলে কাজের অজুহাত দেখায়, বলে, 'টিউশ্যানী ধরেছি সন্ধ্যেবেলায় বৌদি, ফিরতে বড্ড রাত হয়ে যায়। আর অন্যদিন কোন কাজ সারা হয় না, রবিবারের জন্যে সব তোলা থাকে বলে সেদিনও নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাই না।' নেহাৎ হেমন্তর শরীর খারাপ শুনলে কিংবা কোন উপলক্ষে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ক'রে না পাঠালে সে আর আসে না। এলেও একটু পরে চলে যায়।

এতে মণিকার মন তিক্তই হয়ে ওঠে ক্রমশ। স্বামীর কাছাকাছি আসা হয় না—বরং এর ফলে আরও যেন দূরেই সরে যায়। চাঁদ সামনে না থাকলেও জোনাকি জোনাকিই থাকে। তার আলোয় চাঁদের কাজ হয় না।

হেমন্ত এটা লক্ষ্য করে, চিন্তিত হয়।

প্রথম প্রথম ভেবেছিল—গোড়ায় একটু আশাভঙ্গ হয়েছে, ক্রমে সেটা সয়ে যাবে; যখন দেখবে বুঝবে যে, বিয়ে ফেরানো যায় না, এর সঙ্গে জীবনের মতোই গ্রন্থি-বদ্ধ হয়েছে, তখন আস্তে আস্তে ভাগ্যকে মেনে নেবে। কিন্তু যত দিন যায় ততই যেন স্বামী সম্বন্ধে অবজ্ঞা আর তিক্ততা বাড়ে মণিকার। বরং যতদিন সুরেন আসত, এমন কি তারপর যখন ষোড়শীবাবুর আসা-যাওয়া বাড়ল—তখনও যেন অনেকটা সয়ে থাকত—বদ্ধ জীবনে এরাই কতকটা বাতায়নের কাজ করত—আরও, এদের সামনে বলেই হয়ত মানিয়ে নিয়ে চলত। কিন্তু সবদিকের বাতায়ন বন্ধ হয়ে গিয়ে যখন পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা বাস্তব-জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াল তখন, যেন প্রথম নিজের অবস্থাটা বুঝল—এবং আরও তিক্ত, আরও রুক্ষ হয়ে উঠল।

এ অবজ্ঞা না-বোঝার মতো বোকা নিমাই নয়। কিন্তু সে সইতে জানে, নইলে হেমন্তর ঘরে অদ্বিতীয় হয়ে থাকতে পারত না আজ। তাছাড়া নিজের সম্বন্ধে তার নিজের ধারণা স্ত্রীরই অনুরূপ—সে জানে যে, সে কোন অংশেই এ স্ত্রীর যোগ্য নয়। রূপসী, তার তুলনায় লেখাপড়া-জানা মেয়ে—গান-জানা, ভদ্রসমাজের উপযুক্ত কথাবার্তা কইতে পারে, তাদের সঙ্গে সমানে মিশতে পারে—এ বৌ তার মতো মূর্খ মিস্ত্রীর হাতে পড়ার কথা নয় কোনমতেই। দেশেঘাটে যেসব বিবাহযোগ্যা মেয়েকে দেখেছে তাদের সঙ্গে কোন মিলই নেই এর। নিতান্তই তার ভাগ্যের জোর আর জ্যাঠাইয়ের পয়সার জোরে এ-ঘরে এসেছে ঘর করতে।

তাই, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেলে কিছু লাঞ্ছনা সইতে হবে—এটা সে মেনেই নিয়েছিল। বিশেষ চাঁদ যখন করায়ত্ত তখন একটু-আধটু লাঞ্ছনাতে কিছু এসে-যাবে না। তাছাড়া মণিকার মতো স্ত্রী তাকে ধমক দেওয়ায়, শাসন করাতেও নিমাই এক রকমের সুখ অনুভব করত, এক ধরনের গর্ব বোধ করত। কারণ তার থেকে সর্বাংশে উচ্চস্তরের না হলে এ অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারত না এবং এই উচ্চস্তরের জীব যতই যা করুক—সে যে তার স্ত্রী, তারই ঘরণী, চিরদিনের মতো—ইহজন্মের মতো তার সঙ্গে বদ্ধ—তিরস্কারের প্রতিটি শব্দে সেই সত্যেরই স্বীকৃতি প্রকাশ পাচ্ছে না কি?

কিন্তু তবু সহ্যেরও সীমা আছে। প্রথমদিকের সৌভাগ্য-বিহ্বলতা একটু একটু ক'রে কাটে। সুন্দরী স্ত্রীর অভিনবত্বও ক্রমে সহনীয়, অভ্যস্ত হয়ে আসে। বন্ধুবান্ধবদের কারও কারও কাছে অবস্থাটা বর্ণনা করলে তারা পরিহাস করে, বলে, 'তুই যে গোড়া থেকেই মাগের ভেড়ো হয়ে রইলি হাত জোড় ক'রে—তাকে বুঝিয়ে দিলি যে, সে লাথি মারলেও তোর সুখ, তার গালাগাল তোর অঙ্গের ভূষণ, লাথি খেলে তার পায়ে লাগল কিনা সেই চিন্তেই তোর বেশী হবে! এ ক'রে কি আর বৌকে বশ করা যায়! ওরে, ওরা হল নাথখোরের জাত, লাথি না খেলে ঢিট থাকে না। লাথির ঢেঁকি চড়ে সোজা

হয় না—তা জানিস তো ? প্রথম থেকেই বেচাল দেখলে যদি চুলের ঝুঁটি ধরে ঘা-কতক দিতিস তো দেখতিস সে-ই তোর কাছে হাত জোড় ক'রে থাকত, পিছু পিছু ঘুরত।…নেঃ ! সুন্দরী, সুন্দরী তো কী হয়েছে ! তুই-ই বা কমতি কিসের ? নিজেকে ছোট মনে করিস কেন ? হাজার হোক তুই তো তার মরদ, সে তোর বাঁদী। যতই ভাল হোক—বাপের এক পয়সার মুরোদ নেই, ভিখিরীর মেয়ে—তার আবার অত অহঙ্কার কিসের ! ওকে বাড়তে দেওয়াটাই তো ভুল হয়েছে।'

তারা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা মতোই বলে। জীবনের যে স্তরের মানুষ তারা—সেই রকমই। এ দুই স্তরে তফাৎ আছে খানিকটা, তা নিমাই জানে। তবু এতেই, এই অবিরাম ধিক্কারেই একটু একটু ক'রে শক্ত হয় নিমাই, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এতদিন পরে তা আর সম্ভব হয় না। মিছিমিছি তিক্ততাই আরও বেড়ে যায়। এতকাল যে সর্বপ্রকার বশ্যতা স্বীকার ক'রে ছিল—এখন সে পা থেকে মাথায় উঠতে চায় দেখে আরও জ্বলে যায় মণিকা। খিটিমিটি লাগে প্রায় প্রত্যহই—দু'জনেরই মুখের রাশ আলগা হয়ে আসে। ক্রমে মতান্তরটা মনান্তর—শেষে ইতর কলহে পৌঁছয় গিয়ে।

হেমন্ত ভেবেছিল একটা ছেলেমেয়ে কিছু কোলে এসে গেলে এটা কমে যাবে—এই আশাভঙ্গের ভাবটা। সন্তানই সেতু রচনা করবে মা-বাবার মনে। তারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হয়ত, গোপাল তার কাছেই বেশির ভাগ মানুষ হতে লাগল বলে সে সেতু-বন্ধন সম্ভব হল না।

হেমন্ত অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, অনেক উপদেশ অনেক উদাহরণ দিয়ে—কিন্তু মণিকার যেন কিছুই পছন্দ হয় না নিমাইয়ের। চেহারা, চালচলন, কথাবার্তা অভ্যাস স্বভাব—কিছুই না। সব বিষয়েই সে নিমাইকে তার অযোগ্য অনেক নিম্নস্তরের জীব বলে মনে

করে। ক্রমে হেমন্তরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। এতই বা কিসের অহঙ্কার, কত তফাৎ ওর স্বামীর সঙ্গে? এমন কিছু আহামরি সুন্দরী, নূরজাহান নয় মণিকা। লেখাপড়া! একটা পাসও তো করে নি, দু-চারটে ক্লাস বেশী পড়েছে এই পর্যন্ত। গানবাজনা শেখা যাকে বলে তাও শেখে নি—শুনে শুনে দু-চারটে গান গাওয়া, সে তো গাড়োয়ানরাও গেয়ে থাকে। তেমন কোন নামকরা বংশের মেয়েও নয়। বাপের তো না চাল না চুলো—না পরিচয় দেবার মতো কিছু। বড়লোকের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছিল, সে লোকটার কুমতলব ছিল বলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত, প্রশ্রয় দিত—তাতেই যদি নিজেকে জমিদারের বাড়ি রাজার বাড়ি পড়বার যোগ্য বলে ভেবে থাকে তো সেটা ওর আহাম্মুকি। বোকারা দেওয়ালে মাথা ঠুকতে যায়—তাতে দেওয়ালের কোন ক্ষতি হয় না, নিজেরই কপালে লাগে, কপাল ভাঙে।

প্রকারান্তরে এই কথাগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে জ্বালা যেন আরও বাড়ে, বিতৃষ্ণা বিদ্বেষে পরিণত হয়। বিদ্বেষটা হেমন্তর ওপরও, বরং ওর ওপরই বেশী। মণিকার মনে হয় ওর টাকার জোরে গরিব বাপ-মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে, কেড়ে এনেছে। সে বিদ্বেষ তর্কাতর্কি বাদানুবাদের মুখে বেরিয়েই যায়, এখন আর ঢাকবার চেষ্টাও করে না।

কদর্যতা ও ইতরতা—আপাত-শান্ত মানুষের মধ্য থেকেও ঐ দু'টো বস্তু টেনে বার করে, বেনোজলের মতোই। হেমন্তর আজকাল এমনিই মেজাজ উগ্র হয়েছে, সে এত স্পর্ধা সইতে পারে না। ভদ্র সংস্কারের মুখোশ খসে পড়ে। সে বলে, 'আর কে জুটত তোর—রাজা মহারাজা লাটবেলাট? বাপের তো ঐ মুরোদ—দু'শো টাকা খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, তাও চেয়ে-চিন্তে, ভিক্ষে ক'রে। ডবকা মেয়ে দেখিয়ে মনিবের বাড়ি এসে বসে তার ঘাড় ভেঙে বিয়ে দিলে—তাও সে মনিবও তো কৈ খরচা ক'রে ভাল পাত্তরে দিতে পারল না। সে নামও তো করে নি, দিন গুনছিল কবে বৌটা

মরবে, তোকে নিয়ে গিয়ে বসাবে—বুড়ো বাপের বয়িসী ভাতারের সেবা করার জন্যে, আর এক পাল সতীনপো-সতীনঝি মানুষ করার জন্যে! কপাল ভাল তাই এমন ঘরবরে পড়েছিস। মাতাল নয়, গেঁজেল নয়, রাঁড়খোর নয়—যা রোজগার করে একটা সংসার স্বচ্ছন্দে চালাতে পারে—তাতেও বৌয়ের কাছে জোড় হাত ক'রে আছে সর্বদা। আর কি চাস তুই? যা অবস্থা তাতে তো বিড়ি'ওলা কি গাড়োয়ানের হাতে পড়বার কথা।'

একথার উত্তর দেওয়া যায় না, ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসে মণিকা।

'ওগো বাবা গো, দেখে যাও গো—কী রাজার ঘরে বিয়ে দিয়েছ! কী খোয়ার হচ্ছে তোমার আদরের মেয়ের!' ইত্যাদি—

অন্য সময় হয়ত বলে, 'এর চেয়ে গরিব কেরাণীর হাতে পড়ে বাসন মেজে রান্না ক'রে সংসার চালাতুম সে আমার ঢের ভাল ছিল! মানুষের মতো মানুষ হলে তার জন্যে সব করা যায়।'

অনুচ্চ কণ্ঠে হয়ত বলে, হাতে একটা কাজ করতে করতে। তবু রান্নাঘর কি পাশের ঘর থেকে হেমন্তর জবাব আসে সঙ্গে-সঙ্গেই, 'তারা তোকে নেবে কেন? আ মলো যা! মানুষের মতো মানুষ—মানে তো আমাদের সুরো, তা তার সঙ্গেও তো সম্বন্ধ পাড়তে গিয়েছিল—কৈ হল? তাকে রাজী করাতে পারলে!...লাট সায়েবের ঘরে পড়লে তো আরও ভাল হত। তা তো সকলকার হয় না। কী করবি বল! এই যা পেয়েছিস তাই ভাগ্যি বলে মান। গুণ তো যা দেখতেই পাচ্ছি, ওরই মধ্যে একটু চকমকে চামড়া—তা তার জন্যে কি স্বগ্‌গের দেবতারা এসে সেধে নিয়ে যাবে ভেবেছিলি?'

অশান্তি বেড়েই যায়। নিমাই এক-একদিন রাগ ক'রে বলে, 'ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও জ্যাঠাইমা—কত ধানে কত চাল হয় বুঝে আসুক।'

কিন্তু কে জানে কেন এই প্রসঙ্গেই কেমন চুপ্‌সে যায় মণিকা।

খবর আসেই সেখান থেকে, কেউ না কেউ খবর দেয়—আর সে খবর নাকি ভাল নয়। ওর বোনকে বিয়ে করেন নি ষোড়শীবাবু,

কোথা থেকে একটি বয়স্কা মেয়ে ধরে এনেছেন, সে নাকি আগে খুব 'নেটিপেটি' ছিল, এখন উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে একেবারে। কারও কাছ থেকে কিছু শুনেছে কিনা কে জানে, অবিনাশবাবুদের ওপর প্রচণ্ড কোপ এসে পড়েছে; বলেছে, 'কর্মচারী আছে কর্মচারী আছে—বাড়িতে এনে তোলা কেন? কাছে না থাকলে বুঝি রাসলীলে করার সুবিধে হয় না? ওদের ভালয় ভালয় বিদেয় করবে তো করো, নইলে আমি নিজেই একদিন ঝেঁটিয়ে সাফ করব। বুড়ো বরের ঘর করতে এসেছি—তার আবার ভাগ দিতে পারব না।'

মণিকার বোনই বলে পাঠিয়েছে, 'তুই যেন ভুলেও কোনদিন আসার চেষ্টা করিস নি, তাহলে হয়ত সত্যিই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে। মনে হয় তোকে জড়িয়েই কেউ কিছু রটিয়ে থাকবে, সে রটনা ওর কানে উঠেছে—'

সেই জন্যেই চোখের জল চোখে মেরে সয়ে যেতে হয় সব। বাপের বাড়ির জোর না থাকলে শ্বশুর বাড়িতে মুখ থাকে না দাঁড়াবার—এ কথাটা ওর মা-ই অনেকবার বলেছে, আজ তার মূল্য বুঝল।

নইলে, এক একদিন লোভ হয় বৈকি যে, গিয়ে দেখে একবার—ষোড়শীবাবুর ভাবখানা কি? না, কোন অসৎ কি অবৈধ কিছু করতে চায় না—বৌ হতে পারলে তবু কথা ছিল, একটা আধবুড়ো লোকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করার মতো বোকা সে নয়। তেমন কন্দর্প কামদেব কি রাজামহারাজাও নন ষোড়শীবাবু। সে সব কিছু না, এমনিই, স্রেফ একটু নেড়েচেড়ে দেখা—এখনও আগের প্রভাবের কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, এখনও তাঁর চোখে সে মুগ্ধতা, সে বিহ্বলতা ফোটে কিনা ওকে দেখে! শুধু এই কৌতূহলটাই মেটাতে চায় মণিকা, এতে কি লাভ হবে তা জানে না—সে হিসেব ক'রে দেখে নি, শুধু এইটুকু জান'র জন্যেই, ষোড়শীবাবুর চোখে নিজের মূল্য যাচাই করার জন্যেই ছটফট করে সে।

কিন্তু সে আর হবার উপায় নেই। ভগবানই মেরেছেন, এই অন্ধকূপেই পড়ে থাকতে হবে চিরকাল।

হেমন্ত এইবার যেন ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করে নিজেকে।

কেবলই মনে হয় সে ফুরিয়ে গেছে, তার জীবনে আর কিছু করারও নেই, পাবারও নেই।

কে যেন অহরহ বলে মনের মধ্যে, 'ছেলে-বৌ নিয়ে ঘর করার সাধ তো মিটল, আর কেন? এখনও কোন্ লোভে সংসারে পড়ে থাকতে চাও!'

সবেতেই বিতৃষ্ণা আসে। আরও ওর বিপদ, যে-ভগবানে মন দিয়ে রিক্ত নিঃস্ব দুঃখী মানুষ সান্ত্বনা বা অবলম্বন পায়—সেখানে ওর কোন আশ্রয় নেই। পুজো করে নিত্য, পুজোর সময় বাড়িয়ে দেয়—কিন্তু আর কেউ না জানুক ও নিজে জানে যে, এসবই লোক দেখানো কতকটা।

হ্যাঁ, মন দেওয়ার চেষ্টা করে, মনকে বাইরে থেকে টেনে তাঁর পায়ে সংহত করার জন্যে ভগবানকে ডাকে প্রত্যহই—তার মধ্যে কোন ফাঁকি বা ভেজাল নেই—তবু সে মন ঈশ্বর থেকে বহু দূরেই সরে থাকে। সেই যে তারক আর কমলাক্ষর মৃত্যুর পর ভগবান সম্বন্ধে বিরূপ হয়েছিল, বিশ্বাস হারিয়েছিল মন—সে বিরূপতা আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না। ফলে শূন্যতা আর হাহাকারও গেল না জীবন থেকে।...

খাঁ খাঁ করে যেন বাড়িটা। গোপাল যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ তাকে নিয়ে একরকম কাটে, দুপুরে যখন ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা সন্ধ্যায়—তখনই যেন বড় অসহ্য বোধ হয়। আজকাল আর রান্নার দিকে যেতে পারে না—যেতে ইচ্ছেও করে না—কদাচ কোনদিন সুরেনের আসবার কথা থাকলে রান্নাঘরে ঢোকে, নয়ত ঠিকে বামনী বা ঠাকুর আর মণিকাই যা পারে করে। দুপুর বেলাটা ঘুমও হয় না আজকাল, ফাঁকা খালি বাড়িতে প্রেতিনীর মতো নিঃশব্দে এঘর-ওঘর ওপর-নিচ করে। কাজ নেই, বিশ্রামও নেই। খবরের কাগজখানা সকালেই উল্‌টে দেখা হয়ে যায়; লাইব্রেরী থেকে বই আনায় কিন্তু তাতে আজকাল আর মন বসে না, কোন তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ তো

পড়তেই পারে না—সে শ্রেণীর বইয়ের মধ্যে মহাভারত ছাড়া কিছুই পছন্দ হয় না ওর। গীতাটা পুজোর সময় নিয়ম ক'রে পড়ে এই পর্যন্ত।

সবচেয়ে অসহ্য এই দুপুরগুলোই। নিজের জীবনের ব্যর্থতা তার দুঃসহ স্মৃতিগুলো নিয়ে যেন তাড়া ক'রে বেড়ায়। তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতেই আরও যেন—অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করে। অকারণেই কখনও নিচে নামে কখনও ওপরে ওঠে। মাঝে মাঝে এক-একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েও পড়ে, রিক্‌শা ক'রে গঙ্গার ধারে চলে যায়। সন্ধ্যাবেলা আহ্নিক শেষ ক'রেই ছাদে ওঠে। গোপাল এই সময় থেকেই ঘুমোয়। নিমাই আসে, স্বামী-স্ত্রীর ঘর-সংসারের কথা হয়, কলহকেজিয়া তো আছেই, দোকানবাজার করতে বেরিয়ে যায় আবার; ওপর থেকে সবই টের পায় হেমন্ত—দাম্পত্য আলাপের স্বরগ্রাম এখান অবধি পৌঁছয় মধ্যে মধ্যে—কিন্তু কোন কিছুই আর তাকে আকৃষ্ট বা বিচলিত করতে পারে না। মানুষের চেয়ে সংসারের চেয়ে টবের এই গাছগুলো ভাল, ঋতুতে ঋতুতে বর্ষে বর্ষে যার যা সাধ্যমতো ফুল ফল দিয়ে যাচ্ছে, এরা কখনও বেইমানী করে না। সুরেন কোথা থেকে একটা কমলালেবুর চারা এনে বসিয়েছিল বড় একটা টবে, নিজেই কোথা থেকে পুঁটিমাছ পচা না কি সব সার এনে দিয়েছিল—এবার তাতেও দু'টো তিনটে লেবু হয়েছে। সুপুরির মতো ছোট ছোট, তবু হয়েছে।

এখানেই যা একটু সান্ত্বনা, যা একটু শান্তি। কিন্তু এদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যখনই ওপর দিকে কি আশপাশে চায়, তখনই আবার যেন সেই রিক্ততার হাহাকার, মন হু-হু-করা ভাবটা ফিরে আসে। বাড়ির পর বাড়ি চারিদিকে—অসংখ্য ছাদ আর পাঁচিল—এ সময় লোকজন কম থাকে, থাকলেও অন্ধকারে দেখা যায় না—আর ওপরে কলকাতার ধূমমলিন আকাশের বিবর্ণ ধূসর জ্যোৎস্না কিংবা অস্পষ্ট নক্ষত্ররাজি; এই আকাশ আর পৃথিবী—পৃথিবীর ঘরবাড়ি মানুষ—সবই তার কাছে অরণ্য বলে মনে হয়। মনে হয় সীমাহীন এই বনে সে সম্পূর্ণ একা, এখানে তার কেউ আপন নেই,

কিছুই আপন নেই; তার বর্তমান নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই একা একটা বিশাল শূন্যতার মধ্য দিয়ে সে চলেছে অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে। কোনদিন কোথাও এর মধ্যে সে আশ্রয় পাবে না, শান্তি পাবে না, শেষও হবে না এই নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনযাত্রা।

ভাবতে ভাবতে নিজের জন্যেই বেদনায় তার দু'চোখ জ্বালা ক'রে জল আসে, মনে মনে বলে, 'ভগবান সত্যিই যদি তুমি থাকো— আমার জন্যেই বা বেছে বেছে এমন জীবন বরাদ্দ করেছিলে কেন? কেন আমার ওপর তোমার এত বিদ্বেষ? আমি তো তোমার কিছু করি নি, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই কপালে আমার ভাগ্যলিপি লিখে দিয়েছ। সে সময় কি কোন ভাল কথা মনে পড়ে নি তোমার, বিষ ছাড়া কোন ভাল জিনিস দিতে পারো নি? অকারণ এ আক্রোশ কেন তোমার—একটা মেয়েছেলের ওপর? কেন? কেন?'

॥ ২৭ ॥

ক্রমশই এই নিঃসঙ্গতা-বোধ ও সংসার সম্বন্ধে বীতস্পৃহা বেড়ে যায় হেমন্তর। কেউ নেই তার কিছুই নেই—মিছিমিছি কেন এই ঠাট? এই কথাই কেবল মনে হয়।

মণিকার আবার একটি মেয়ে হয়েছে, গোপালের দু' বছর বয়সে ওদের দেখাশুনো, হেমন্ত নাম রেখেছে কমলা। ফুটফুটে মেয়ে, মায়ের মতোই দেখতে হত হয়ত—কিন্তু ফরসেপ্ ডেলিভারীর সময় শেষ পর্যন্ত বুঝি ডাক্তারের আঙুলের প্রবল চাপে রগ দু'টো অস্বাভাবিক চাপা হয়ে গেছে। হয়ত বড় হলে এতটা থাকবে না, এখন খুব খারাপ দেখায়, অত সুন্দর মুখের শ্রীটাই গেছে নষ্ট হয়ে।

দু'টো ছেলেমেয়ে দেখার অসুবিধে বলে হেমন্ত আলাদা একটি ঝি রেখেছে—পুরনো জানাশুনো—খরচের কোন ত্রুটি করে না সে।

খাওয়া-দাওয়ায় জামায়-পোশাকে ওষুধে ধনীর সন্তানের মতোই মানুষ হয় ওরা। এক-একবার মনে হয়—আগের দিন হলে বলতও —মণিকাকে শুনিয়ে বলে, 'তোর ষোড়শীবাবুর ছেলেমেয়ে কি এভাবে কোনদিন মানুষ হয়েছে? তার ঘরে পড়লি না বলে তো দুঃখে পরাণ ফাটে, সেখানে কি এই রাজার হালে থাকত ছেলেমেয়ে? বুকে হাত দিয়ে সত্যি ক'রে বল দিকি।' কিন্তু বলে না, অপ্রীতি বাড়াতে ইচ্ছে করে না। কিছুই বলতে ইচ্ছে করে না কাউকে, প্রীতিকর অপ্রীতিকর কোন কথাই—নির্লিপ্ত উদাসীনভাবেই থাকতে চায়। যা কিছু কথা ওর এই বাচ্চা দু'টোর সঙ্গেই। কমলা কথা বলতে পারে না, তবু তার সঙ্গেই একতরফা বকে যায়—তাতেই খানিকটা শান্তি।

মণিকারও সে উত্তাপ সে জ্বালাটা কমেছে অনেকটা। নিমাইয়ের চেষ্টাতেই বোনের একটা বিয়ে হয়ে গেছে। ওরই আপিসের এক সহকর্মীর ভাই, আবাদায় বাড়ি, ম্যাট্রিক পাশ, রেলে কাজ করে—নিজেদের বাড়িঘর আছে। আশাতীত ভাল সম্বন্ধ ওদের পক্ষে। হেমন্ত বিয়ের সময় এক জোড়া বালা ও নগদ দুশো টাকা মণিকার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাতেই নাকি কোনমতে সম্মান রক্ষা হয়েছে।

কৃতজ্ঞ হওয়ারই কথা, স্বামী-শাশুড়ি দু'জনের কাছেই। বিশেষ এবার ষোড়শীবাবু, নতুন স্ত্রীর ভয়েই সম্ভবত, একখানা হাওড়ার হাটের সস্তা দামের তাঁতের শাড়ি ছাড়া কিছুই দিতে পারেন নি। তবু মণিকার সে উদ্ধত ভাবটা যায় না। অবশ্য আগের জ্বালা আর নেই, কথায় কথায় নিমাইকে অপমান করা, অকথাকুকথা শোনানোটা বন্ধ হয়েছে, ভাগ্যকে অনেকটা মেনেই নিয়েছে—কিন্তু কে জানে কেন হেমন্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাবটা যেন কিছুতেই যায় না। কেন, তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না হেমন্ত, নিমাইও না। এ কি শাশুড়ি সম্বন্ধে বধূদের সহজাত বিদ্বেষ—শাশুড়ি হলেই তার ওপর আক্রোশ হবে—না অন্য কোন কারণ আছে?

তবু দিন-রাত খটাখটি, কথা-কাটাকাটি, রুক্ষ রূঢ় কথার আদান-প্রদানটা কমেছে—এই একটু তবু শান্তি। এতেই অনেকটা খুশী হেমন্ত। আর কিছু না হোক নিজের মনটা উত্যক্ত, নিজের মুখটা ছোট হওয়ার থেকে তো অব্যাহতি। নিজেকে নিয়ে, নিজের ভাগ্য নিয়ে একা চুপচাপ থাকতে পায়—এইটুকু ঢের।

হয়ত এইভাবেই চলত, অনন্তকাল না হোক অনেকদিন। হয়ত এইভাবেই ছেলেমেয়ে দু'টো বড় হত, লেখাপড়া করত, পৈতে বিয়ে-থা হত—আরও ভাইবোন হয়ে যেত ওদের, তাদেরও মানুষ করত এই রকম ক'রে—একটানা জীবনযাত্রা বয়ে যেত, যেমন আর পাঁচটা পরিবারে যায়। তাই ভেবেছিল নিমাই, মনে মনে আশার বিরাট সৌধ গড়ে তুলেছিল। মণিকাও ভেবেছিল তাই—তবে সে অন্যরকম; কোনদিন নিজের মতো ক'রে নিজের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী হওয়া আর হবে না—এইভাবেই বুড়ি হয়ে যাবে সে একদা। হয়ত কিছুদিন আগে হলে হেমন্তও তাই ভাবত, আর তাতে বিস্মিত হবার, ক্ষুব্ধ হবার—অন্য কিছু ভাববার কি পরিবর্তন করার কোন কারণ দেখত না।

কিন্তু ক্রমশ হেমন্তর আর এই একঘেয়ে জীবন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—'রাঁধার-পরে-খাওয়া আর-খাওয়ার-পরে-রাঁধা'-গোছের এই গতানুগতিক, একটা বিশেষ বাঁধা-ছকে বাঁধা-পথে আবর্তন এ যেন আর সহ্য হল না। অনেকদিন ধরেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল—আর নয়। এখানে এভাবে আর নয়। নিঃসঙ্গই যদি থাকতে হয়, কারও সঙ্গে দু'টো প্রাণ খুলে কথাই না বলতে পারে, তাহলে এ সংসারে থেকে লাভ কি? নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে থাকা! এ ঠাট তুলে দেওয়াই তো ভাল।...

কলকাতায় যারা পরিচিত ছিল, আপনার লোকের মতো—তারা সকলেই চলে গেছে। পূর্ণবাবুর স্ত্রী এক দায়িত্ব ছিল—তিনিও মারা গেছেন। এখানে আর কোন আকর্ষণ কোন বন্ধন নেই। এক যে

পায়ের বেড়ি হতে পারত, গোরা—তার ওপরই যা একটু অপত্যস্নেহ পড়ে ছিল সে নিজে থেকেই বেড়ি ভেঙে অব্যাহতি দিয়ে গেছে। নিমাই কোনদিনই আপন হয় নি, হয়ত হেমন্তরই দোষ সেটা, আপন করতে চায় নি। যাই হোক, নিজের সংসার নিয়ে সুখী না হোক, ব্যস্ত পরিপূর্ণ সে—থিতু হয়ে গেছে। আর কেন ?

সম্পর্কে আপনার লোক কিছু আছে বৈকি। কিন্তু হেমন্ত তাদের আপন হতে বা আপন করতে পারে নি।

নিজের বোন বোন-পোরা কে কোথায় ছড়িয়ে আছে, যোগাযোগ হয় নি। করারও ইচ্ছা নেই আর। অনেক তো ক'রে দেখল; তার অদৃষ্টে কোন স্নেহের বন্ধন লেখেন নি ভগবান। মিছিমিছি আরও আঘাত আরও অপমান যেচে নিতে গিয়ে লাভ কি ? সবচেয়ে বড় কথা—যাকে অবলম্বন করতে পারলে শেষ জীবনে একটু শান্তি পেতে পারত, হয়ত তাকে নিজেই সরিয়ে দিল —এই বাইরের জঞ্জাল জড়িয়ে, ছেঁড়াচুলে খোঁপা পরতে গিয়ে।... কে জানে, সুরেনের ওই ক্ষতি করল কিনা।

সুরেন এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কুষ্টিয়ায় এক কাপড়ের কলে কাজ নিয়ে চলে গেছে। অনেক ধরপাকড় ক'রেই নাকি সে চাকরি যোগাড় করেছে, অথচ আর্থিক সুবিধা কিছু হয় নি। প্রায় একই রকম আয় থেকে গেছে, হয়ত চার-পাঁচ টাকা বেশী হতে পারে। এ যেন কলকাতা থেকে পালাবার জন্যেই চলে যাওয়া। এই মেয়েটা বুঝি সুরেনের জীবনেও অভিশাপের মতো এল। কেউ নয় সে, নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কও নেই, মাঝখান থেকে হেমন্তই তাকে জড়িয়ে এই অনিষ্টটি করল। নিজেরও, সুরেনেরও।

একবার ভাবে তখন যদি নিমাইকেই সরিয়ে দিত—তাহলে হয়ত সুরেনকে অবলম্বন করা অসম্ভব হত না। আবার ভাবে, তাতে আরও কুফলই হত হয়ত। তার জন্যে মণিকারা পর হয়ে গেল, পথে বসল—এ জেনে সে কিছুতেই ওর কাছে আসত না, কোনদিনই। সে প্রস্তাবেই হয়ত চাকরি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে

যেত। অনিষ্ট যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছে, এই বিয়েতে তাকে জড়াতে গিয়েই।

কিন্তু এসব চিন্তাও তো এখন অনর্থক। জীবন-ভোর তো ভুলই ক'রে গেল। কোনটা কতটুকু বেশী আর কোনটা কতটুকু কম, সে হিসেব এখন আর ক'রে লাভ নেই।

হঠাৎই মন স্থির ক'রে ফেলল একদিন।

নিমাইকে ডেকে বলল, 'তুই একটা ভাল মেস-টেস দেখে নে নিমে, এখানকার পাট তুলে দোব এবার।'

বিনামেঘে বজ্রাঘাত কথাটা বহুবার শুনেছে নিমাই, এইবার জিনিসটা বুঝল। প্রথম তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না ভাল ক'রে, হতভম্ব হয়ে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইল, তারপর যদি বা আব্‌ছা আব্‌ছা শব্দগুলো নিজের মনে মনে পুনরাবৃত্তি ক'রে একটু বুঝতে পারল—সে শুধু তার শব্দগত অর্থই, মর্মার্থ তখনও মাথায় পৌঁছল না। গলা এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, কোন প্রশ্ন করা কি কথার উদ্দেশ্যটা বুঝতে চাওয়ারও শক্তি রইল না অনেকক্ষণ।

এতদিনে, সবে—এই বোধহয় মেয়েটা জন্মাবার পর—অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে আশার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল—এই সম্পত্তি তার না হোক তার ছেলেমেয়েদের কপালেই নাচছে এই রকম একটা ধারণা হতে শুরু করেছিল, সেই সঙ্গে তার সংসারও এখানেই দৃঢ়মূল হল এই রকম একটা বিশ্বাস, এমন সময়ে এ আবার কী রকম কথাবার্তা ?···

অনেকক্ষণ, বোধহয় পাঁচ-ছ' মিনিট পরে, বিস্তর চেষ্টায় গলার স্বর ফুটল, 'তার—তার মানে ?'

'কেন, মানে না বোঝার মতো কিছু বলেছি নাকি ?' হেমন্ত ধমক দিয়ে ওঠে প্রায়, 'এখানকার সংসার তুলে দোব। এখানে থাকলে ছেলেমেয়ে দু'টো মানুষ হবে না, সেই গোরার মতোই হাল হবে। কাশীতে বাড়ি কিনব, সেইখানেই থাকব গিয়ে। ওরা সেখানে পড়বে—য়্যানি বেসান্তের ইস্কুলে। শুনেছি খুব ভাল ইস্কুল।'

আবারও কিছুক্ষণ সময় লাগে—কথাগুলোর মধ্যে থেকে বার্তাটা ছেঁকে নিতে। প্রশ্ন করতে আরও খানিকটা। গলা যে আপনিই এমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় মানুষের, কোন পরিশ্রম কি রোদে ঘোরাঘুরি না ক'রেও—তা কে জানত! অবশেষে অনেক কষ্টে শুধু তিনটি শব্দ উচ্চারণ করে, 'তা ওদের গর্ভধারিণী ?'

'আ মরণ তোমার! ওদের গর্ভধারিণী ওদের সঙ্গেই যাবে। সে আবার কোথায় থাকবে!...আবার শুদ্ধভাষা—গর্ভধারিণী! ..ঐ কচি শিশু দু'টোকে নিয়ে যাচ্ছি কার ভরসায় তাহলে ?...মা ছেড়ে কি থাকতে পারে এখন থেকে ? ওদের সবাইকে নিয়ে চলে যাব একেবারে, এখানের বাড়ি ভাড়া দিয়ে। সেই জন্যেই তো তোকে মেস দেখতে বলছি একটা!'

আবারও কিছুক্ষণ—কয়েক মুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা একটা।

আবারও অতিকষ্টে, যেন আর কার ঠোঁট ও জিভ নড়ছে তেমনিভাবে, প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে, 'তা তার পর ?'

'তারপর আর কি, মেসে থাকবি, চার মাস ছ' মাস অন্তর যেমন যেমন ছুটি পাবি গিয়ে দেখে আসবি। তোর তো সংসারের জন্যে এক পয়সা খরচ হচ্ছে না, শুধু মেসে থাকা-খাওয়ার যেটুকু—সেই পয়সাটা রেল-কোম্পানিকে দিবি, তাতেও ঢের বাঁচবে।...তোর আপিসে যে-সব হিন্দুস্থানী মিস্তিরি আছে, তারা কি করে খোঁজ ক'রে দেখিস, কেউ একবছর কেউ দেড় বছর অন্তর দেশে যায়। ঐ মাইনেতেই তাদের সংসার চালাতে হয় বলে ঘন-ঘন যাওয়া হয় না, তোর তো সে-সব দায়-দায়িত্ব রইল না।'

আর কোন কথা বলতে পারল না নিমাই। কী বলবে ? এ প্রস্তাব যে কেউ করতে পারে, করা সম্ভব তাই তো ধারণায় আসে না। এ তো মাথা খারাপের লক্ষণ। উন্মাদ-পাগল না হলে একথা কেউ বলতে পারে না, সেক্ষেত্রে সে কী জবাব দেবে, কাকে দেবে ? এরকম কোন প্রস্তাবের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা মাথায় থাকলে তার উত্তর একটা ভাবার চেষ্টা করত। এখন তো তারই মাথা খারাপ হবার

যোগাড় এই আকস্মিক ধাক্কায়—কিছু ভাবা কি বোঝার মতোই তো অবস্থা নেই।···

তখনও কিছু বলতে পারল না, তার পরও অনেকক্ষণ নয়। গুম হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ সেইখানেই। হেমন্তর তখন 'বোমা' ফেলা হয়ে গেছে—সে নিশ্চিন্ত হয়ে তার হিসাবপত্রের খাতা নিয়ে বসল, নিমাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না বা এ প্রসঙ্গে অন্য কোন আলোচনা করারও চেষ্টা করল না।

সেইভাবেই নিঃশব্দে বসে থাকার পর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল নিমাই। উঠলও না, খেতেও গেল না।

হেমন্ত যে সে খবর না পেল তা নয়, তবে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করার মানুষ নয় সে। জীবনের এসব স্তর অনেকদিন পেরিয়ে এসেছে। যাদের জন্যে এতটা ব্যস্ত হওয়া চলত তারা কেউ নেই। কেন যে খাচ্ছে না সে কারণ তো জানাই। এটুকু বিচলিত হবে বৈকি, আকস্মিক এত বড় একটা পরিবর্তন—বলতে গেলে একটা বিপর্যয়ের--প্রস্তাবে।

সাধাসাধি মণিকাও করল না। ঠিকে লোক রান্না ক'রে চলে গেছে। রাত্রের খাবার ও-ই পরিবেশন করে। হেমন্ত এখন রাত্রে শুধু দুধ আর ফল খায়—তার খাবার সাজিয়ে দিয়ে নিজে খেয়ে রান্নাঘর সেরে নিশ্চিন্ত সহজভাবেই শুতে এল।

দরজা বন্ধ হতে প্রথম প্রশ্ন করল নিমাই, 'শুনলে কথাটা? সব শুনলে?'

'শুনলুম বৈকি!'

'এর পরেও মুখে ভাত উঠল, বেশ খেতে পারলে! ধন্য, ধন্য তুমি!'

'ওমা, তা এর সঙ্গে না খাওয়ার কি আছে? খাওয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, এখানেও তাঁর কাছে আছি সেখানেও তাঁর কাছে থাকব। এর মধ্যে এত আপোস-তাপোস করার কি আছে?'

'তার মানে ? তা হলে তুমি চলে যাবে ওর সঙ্গে ?'

'তুমি বড় বাজে কথা বলো। আমি কি যাওয়া না-যাওয়ার মালিক! আমি কে যে, যাব কি যাব না ঠিক করব, যাব কিনা ভাবতে বসব! আমি হলুম হুকুমের বাঁদী, যা হুকুম করবে তাই করব। শাশুড়ি, শাশুড়ির ছেলে—সবাই তো আমার মালিক, আমার মাথা কিনে রেখেছে। আমার কিছু ভাবারও নেই, ঠিক করারও নেই। তোমরা তোমাদের মতো ঠিক করবে—আমি যেমন হুকুম পাব তেমনি তেমনি কাজ করব। আমার অত ভাববার দরকার কি ?'

এই বলে সে যেন বেশ গুছিয়ে আরাম ক'রে শোয়, পাশ-বালিশটা টেনে নিয়ে।

প্রায় সেই সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে নিমাই, 'উঃ! হুকুম! কিসের হুকুম ? ওসব হুকুম-টুকুম আমি মানি না। আমার পরিবার, আমার ছেলেমেয়ে। তারা কোথায় থাকবে না থাকবে সে আমি বুঝব। ওঁর সঙ্গে সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে ভ্যাগাবেনের মতো ঘুরে বেড়াব নাকি ?'

'তোমার পরিবার তোমার ছেলেমেয়ে পোষবার মতো ক্ষমতা আছে ? তা থাকলে হুকুম শুনবেই বা কেন ? আর তা থাকলে এ হুকুম দেওয়ারও সাহস হত না। জানে যে, এক কড়ার মুরোদ নেই, তাই চোখ রাঙাতে সাহস করে।'

'আচ্ছা! মুরোদ আছে কি নেই সে বোঝা যাবে! আমি আমার মতো চলব। মাথার ওপর যে এলেক্‌টার পাখা ঘোরাতে হবে কি রাঁধুনী বামুন রেখে বসে খেতে হবে তার কি মানে আছে ? আমার সঙ্গে কাজ করে হরিশ বসাক, সাতটা প্রাণী তার সংসারে, খাচ্ছে না ? ওপোস ক'রে আছে নাকি ?'

আর কথা কয় না মণিকা। এইটেই ঝোঁকের মাথায় বেশী বলে ফেলেছে, শাশুড়ির প্রতি বিদ্বেষটা প্রবল বলেই। বলার আগে অতটা তলিয়ে বোঝে নি তখনও। হরিশ বসাকের বৌয়ের মতো সংসার করার—একমাত্র নিমাইয়ের ভরসায়—খুব উৎসাহ নেই

তার। এত আকর্ষণও নেই স্বামীর ওপর, অত পরিশ্রম করারও সাধ নেই।

সারারাত ঘুমোয় না নিমাই। বলতে গেলে জীবন-মরণের প্রশ্ন তার সামনে। অনেক সহ্য করেছে সে এই বিষয়ের মুখ চেয়ে, অনেক সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অমানুষিক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছে একসময়। সেই বিষয়—এই বিপুল বিত্তের আশা এক কথায় ছেড়ে দেবে? এতদিনের এত দুঃখ এত কষ্ট সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

আবার অন্য দিকটাও ভাবে।

জ্যাঠাইয়ের যে কথা সেই কাজ—এতদিন ধরে দেখে এটুকু বেশ চিনেছে সে। গোঁ যখন ধরেছে তখন ছাড়বে না। বাধা দিলে আরও বেঁকে দাঁড়াবে। 'মোষের সিং বাঁকা যোঝবার বেলায় একা'। এ মানুষকে নোয়ানো যাবে না। বিষয়ের আশা রাখতে গেলে, ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে—তারা ভালভাবেই মানুষ হবে হয়ত ওখানে গেলে—এই মতে মত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার মানে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম তুলে দেওয়া।

হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে আবার নরম হতে পারে, তখন হয়ত ওকেই সেখানে নিয়ে যেতে পারে, কিংবা আবার কলকাতাতেই ফিরে আসতে পারে—তবে সে অনিশ্চিত, মর্জির মুখ চেয়ে থাকা।...এক যদি মরে যায়। বয়স হয়েছে, মরার বয়সই হয়েছে। কিন্তু এখনও যা শক্ত শরীর, সহজে মরবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এ সংসারে যারা জ্বালাতে এসেছে তারা চট ক'রে মরে না।

সমস্ত রাত ভেবেও মন স্থির করতে পারল না।...মণিকার কাছ থেকে কোন সাহায্য—যুক্তি-পরামর্শ পাবার উপায় নেই। সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সুতরাং সকালবেলাও দুশ্চিন্তা নিয়েই উঠল।

সেইভাবেই কাটল ঘণ্টাখানেক।

হয়ত এই চিন্তা নিয়ে আপিসে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ

করলে মধ্যপন্থা কিছু বেরোত, কিন্তু তার আগেই, হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বুদ্ধি-বিবেচনা ভবিষ্যতের চিন্তা গেল ভেসে।

হেমন্ত মেয়েটাকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে নিমাইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন ঝাঁপিয়ে কোলে চলে এল; আর ঠিক সেই সময়ই স্নান সেরে সিঁদুরের ফোঁটা পরে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো ভিজে চুলের রাশি পিঠে এলিয়ে তার ওপর দিয়ে আলতো মাথার কাপড় টেনে সামনে এসে দাঁড়াল মণিকা। কি রকম কী একটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল মাথার মধ্যে। নিমেষে আগুন জ্বলে উঠল। সব বিবেচনা সব হিসেব ভেসে চলে গেল কোথায়। দুম দুম ক'রে পা ফেলে নিচে নেমে গিয়ে সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে স্বগতপাঠ শুরু করল, একটা অদ্ভুত সুর ক'রে বলে উঠল, 'উঃ, হুকুম মানতেই হবে! পরিবার আমার রায় দিয়ে বসে রইলেন। কেন, কিসের জন্যে মানব আমি অন্যাই হুকুম? আমি কি এতটা বয়সে বে করেছি আমার বৌ শুধু ঐ বুড়ির সেবা করবে বলে?···আর আমি এখানে মেসে পড়ে পড়ে হাপু গিলব! তারপর ঐসব ছাইভস্ম গু-গোবর খেয়ে আমার শরীরটি যখন যাবে— তখন? একে আমরা হলুম গে অল্লভুগীর বংশ!·· তাছাড়া, বলি শরীলের ধম্মও তো একটা আছে! শেষে কি ভাইপোটার মতো কুচ্ছিত রোগ ধরিয়ে বসে থাকব!···না, ওসব হবে-টবে না, এই বলে দিলুম। বৌ ছেড়ে ছেলেমেয়ে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তোমার শাশুড়িকে বলে দিও। হুঁ!'

বক্তব্যের শেষেও একটা বিচিত্র সুর বার করে গলা দিয়ে।···

এক মুহূর্তের জন্যে কি চোখে আগুন জ্বলে উঠেছিল?

ভ্রূকুটিতে দেখা দিয়েছিল বজ্রের আভাস?

কে জানে, মণিকার সাহস হয় নি সেদিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখার।

তবে কথা যখন কইল হেমন্ত, তখন কণ্ঠস্বরে জ্বালার আভাসমাত্র নেই। বরং বড় বেশী শান্ত, বড় বেশী কোমল বলে মনে হল।

'তা অমন ক'রে চোখের আড়ালে গিয়ে আর একজনকে উপলক্ষ করে বলছিস কেন? এ আর এমন কি দোষের থাক যে, সামনা-সামনি বলা যায় না? আমিই বা রাগ করব কেন এতে? তোমার মাগছেলে নিয়ে তুমি তোমার মতো ঘর করবে, সে ক্ষমতা হয়েছে তোমার—এ তো অতি উত্তম কথা।...খুব ভাল কথা! সুমতি হয়েছে তোমার বুঝতে হবে। এত সহজে অব্যাহতি দেবে আমাকে তা ভাবি নি।...তা বেশ, সেই ব্যবস্থাই করো তাহলে। এই কথা পাকা তো?'

তবুও নিমাইয়ের সাহস হয় না ওপরে এসে মুখোমুখি কথা কইতে। উত্তর দেয়, 'ব্যবস্থা করো বললেই তো আর এখুনি করা যায় না! এখুনি বেইরে যাও বাড়ি থেকে বলবে, আর অমনি বৌছেলে নে বেইরে যাব সুড়সুড় ক'রে তা হবে না। নোটিশ দিতে হবে। সময় চাই আমার। একটা ভাড়াটে তুলতে গেলেও একমাসের নোটিশ লাগে!'

'সে তো লাগবেই। ভাড়াটে তো লক্ষ্মী, তারা টাকা দেয়, খাওয়ায়। তাদের সঙ্গে কি আর পথের শ্যাল-কুকুরের তুলনা! তাদের তো দূরদূর ক'রে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত, দ্যাখ-মার দ্যাখ-মার ক'রে।...তা তবে সেও অত ভয় পেতে হবে না। সময় দিচ্ছি, সময় নাও। একমাসের নোটিশই দিলুম। বাড়ি বিক্রি করাও তো একদিনে হচ্ছে না, দালাল ধরাব, খদ্দের দেখবে, দরদস্তুর আছে, বায়না, সার্চ, রেজেস্ট্রী—অনেক সময় লাগবে। তোমাদের অবিশ্যি অতদিন থাকতে হবে না। তোমরা তোমাদের সুবিধেমতো যখন খুশি চলে যেয়ো।'

তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বলে, 'তোমার কিছুই ছিল না, এক-বস্তরে এসেছিলে, মনে আছে বোধহয়—শ্বশুরও ঐ একপ্রস্থ দানের বাসন ছাড়া কিছু দেয় নি। তবু যা-যা দরকার, যা-যা ভোগ করছ—বাসন বিছানা খাট—সব নিয়ে যেয়ো, স্বচ্ছন্দে। কুকুরে মুখ দেওয়া বাসন, বেড়াল শোওয়া বিছানা—ওতে আমার দরকার নেই।

…একটু আগেই ঘর ঠিক ক'রে যা-যা নেবার নিয়ে যেয়ো, কেন না— এসবও তো রাখব না। খাট চেয়ার টেবিল বাসন-কোসন—সব বেচে দোব। খদ্দের ঠিক হলে যা থাকবে সব নিয়ে চলে যাবে। তোমাদের যা নেবার তা আগেই আলাদা ক'রে নিও, আমাকে দেখিয়ে।'

শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠে, বিচারকের রায় দেবার মতো ক'রেই বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল হেমন্ত, সহজ ধীর গতিতে।…

সেই সিঁড়ির কাছেই অনেকক্ষণ আড়ষ্ট দাঁড়িয়ে রইল নিমাই। তারপর কেমন একরকমের করুণ অসহায় কণ্ঠে বললে, 'এ – এসব আবার কি কথা? এ বাড়ি বিক্কিরি ক'রে দেবে নাকি? তবে যে শুনেছিলুম ভাড়া দিয়ে চলে যাবে!'

'সে তো তখন তোমরা একদিন বাস করবে—এই কথা ভেবেছিলুম। সে পাট যখন চুকেই গেল, তখন আর এসব ঝামেলা কার জন্যে রাখব? কে দেখবে কে মেরামত করাবে? কে সময়ে টেক্সখাজনা দেবে।' ঘর থেকেই তেমনিভাবে উত্তর দেয় হেমন্ত।

আরও কিছুক্ষণ সময় লাগে নিমাইয়ের সাহস সঞ্চয় করতে, তারপর গোটা পাঁচ-ছয় ধাপ উঠে এসে বলে, 'তা এ-কাজগুনো কি আমি করব না বলেছি? এসব তো দেখাশুনো আমিই করতে পারি, যেমন করছি—'

'হ্যাঁ, অমনি ভাড়াটা আদায় ক'রেও খেতে পারি! সে জানি। অত উপ্‌কার তোমাকে না করতে হয়, অত কষ্ট—সেই জন্যেই সব ঘুচিয়ে দিয়ে চলে যাব। তুমি স্বাধীন জীবন বেছে নিয়েছ, নিজের ছেলেমেয়ে নিজের বৌ নিয়ে নিজের বাড়িতে নিজস্ব সংসার পাতবে —তার মধ্যে আর এসব কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না। মিথ্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এসব পিছটান জঞ্জাল পায়ে না বাধানোই তো ভাল। আমিই বা অত কষ্ট দোব কেন? তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, আমাকেও সেটা দেখতে হবে বৈকি! পাণ্টা মুক্তি দিতে হবে না?'

আরও খানিক পরে নিমাই কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল হেমন্ত, 'চোপ! আর একটা কথাও না শুনি! ফের যদি ঐ ক্যানক্যানানি গ্যাজোর গ্যাজোর শুনি—এখুনি এই দণ্ডে তোর আর তোর বোয়ের পেছনে লাথি মেরে বার ক'রে দোব—তোর কোন বাবা কোন শ্বশুর রুখতে পারবে না বলে দিচ্ছি! হারামজাদা! ডুবও খাব টামাকও খাব—নিজের নিজের হিসেব ষোলকাহন বুঝে নোব, অথচ তোমারটাও ষোল আনা চাই—না? অত আহ্লাদ এখানে চলবে না। নিজের পথ বেছে নিয়েছ—দেখে বুঝে—ঐখানেই ইতি করো, আর এ সম্পর্ক নয়।'

সেদিন আর আপিস গেল না নিমাই। খেলও না কিছু। থুম হয়ে বসে রইল শুধু। কথাটা যখন বলে তখন কোন জ্ঞান ছিল না তার। থাকলেও এ পরিণতি হবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি। সত্যি সত্যিই সব বেচেকিনে দিয়ে চলে যাবে—হয়ত বা কোন মঠে কি হাসপাতালেই দান ক'রে দেবে—এ সম্ভাবনার কথা মাথাতেই যায় নি তার। কিন্তু এখন আর কথাটা তামাশা বলে মনে হচ্ছে না। এ বুড়ি সব পারে। এ কী হল তাহলে তার? এখন কি হবে? একটা মিনিটের ভুলে এতদিনের সব কষ্ট অনর্থক হয়ে যাবে নাকি?

সারা দিন ভেবে বিকেলের দিকে শুষ্কমুখে রুক্ষ চুলে হেমন্তর কাছে গিয়ে বসল। গলায় একটা কান্নার মতো আওয়াজ ক'রে পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'উঁহুঁ, উঁহুঁ হুঁ, আর কখনও এমন করব না, উঁহুঁ হুঁ, এই বারটির মতো মাপ করো। মাথাটা খারাপ হয়ে গেছল তাই—উঁ হুঁ হুঁ—আরও ঐ মাগীর জন্যে, দিনরাত জ্বালায়, আমার জন্যে এমন ক'রে সব্বত্যাগী হলে আমাকেও তাহলে আপ্তঘাতা হতে হবে। হুঁ হুঁ, বলে কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়—'

কথাটা শেষ করা গেল না। প্রচণ্ড এক চড় এসে পড়ল গালে তার মধ্যেই, সে চড়ের বেগে কিছুক্ষণের জন্যে চোখের সামনে সব

যেন অন্ধকার হয়ে গেল নিমাইয়ের, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সামলাবার আগেই প্রচণ্ডতর লাথি।

'হারামজাদা! আমার সঙ্গে ন্যাকাপনা করতে এসেছ! ঐ মায়াকান্নায় আমাকে ভোলাবে! মানুষ চেন নি এতদিনেও? ফের যদি আর একটা কথা শুনি, এখুনি এক-কাপড়ে বের ক'রে দোব বাড়ি থেকে—মাগছেলেমেয়ে সুদ্ধ! কাল সক্কালবেলাই যেখানে হোক ঘর খুঁজে নিয়ে চলে যাবি এই বলে দিলুম, যদি লাথি খেয়ে না বেরোতে চাস! আপ্তঘাতা! আপ্তঘাতা হবার হলে অনেকদিন আগেই হতিস—যদি লজ্জাঘেন্না কিছু থাকত! বেইমান, বজ্জাত, নাথখোর!···নাথখোরের জাত কোথাকার!'

এরপর আর একটা কথাও বলার সাহস হল না নিমাইয়ের। আঘাতে অপমানে এবার সত্যিকার চোখের জল ফেলতে ফেলতেই উঠে আসতে হল।

॥ ২৮ ॥

পরের দিনই দু-তিনজনকে ডেকে দালাল ধরিয়ে দিল হেমন্ত। বাড়ি জমি যেখানে যা আছে সব বিক্রী করবে সে। এ ছাড়াও ফার্ণিচার গহনাপত্র বিক্রী করতে শুরু করল। ঠিক পরের দিন না হলেও দিন-তিনেকের মধ্যেই নিমাইকে চলে যেতে হয়েছিল। তবে অবশ্য এক-কাপড়ে নয়—রাগের মাথায় যা বলেছিল, খাট বিছানা বাসন-কোসন, যা-যা ওদের দরকার হতে পারে সবই দিয়ে দিল হেমন্ত। মায় কাপড়-চোপড় রাখার একটা বড় তোরঙ্গ—বাসনপত্র রাখার কাঠের বাক্স, আলনা সব। যাবার সময় মণিকা প্রণাম করতে এসেছিল, তাকে কিছু বলে নি, তবে সেই সময়ই বলে দিয়েছিল, 'ঐ হারামজাদা না আমার সামনে আসে বৌমা, বারণ ক'রে দিও। আমার মেজাজের ঠিক নেই, আবার একটা কেলেঙ্কারী ক'রে বসব হয়ত যাওয়ার সময়।'

সে সাহস এমনিও হত না—একথা শোনার পর তো হবেই না—চোরের মতোই চলে গিয়েছিল নিমাই একদিক ঘেঁষে, ঘাড় হেঁট ক'রে।

যাত্রার সময় মণিকা ছেলেমেয়ে দু'টোকে কোলে দিতে গিয়েছিল, হেমন্ত তাও নেয় নি, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল একেবারে।

এর পর একেবারেই বাড়ি খালি হয়ে গেল, শুধু ঝিয়ের ভরসায় থাকা। এভাবে থাকা উচিত নয় ঝি নতুন, তা ছাড়া সে মুখ্যু মেয়েছেলে—তার দায়িত্বজ্ঞানের ওপরও ভরসা করা ঠিক হবে না বুঝে—ধন্নুবাবুর ছেলেকে গিয়ে ধরল। সে তার জানা একটা বয়স্ক আর বেশ শক্ত-সমর্থ দেখে দারোয়ান ঠিক ক'রে দিল, বলল, 'যতদিন না আপনি যান, বাড়ি খালি করেন, ততদিন একেই রেখে দিন। এর প্রাণ থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। গোণ্ড জেলায় বাড়ি, বুড়ো হলে কি হয়, সুয্যি এখনও চলন্ত ট্রেণে উঠে দু-চারটে লোকের মুণ্ডু কেটে নিয়ে আবার নেমে আসতে পারে। ওর হাতে লাঠি থাকতে বন্দুক, পিস্তল নিয়ে কেউ এলেও ভয় নেই। তবে তেমনি, মনিবের কোন অনিষ্ট কখনও করবে না। যার নিমক খেয়েছে তার জন্যে যে কোন সময় জান দিতে তৈরী। একেই রাখুন— বাইরে-টাইরে বেশী পাঠাবেন না, দিন-রাত পাহারা দেবে সে-ই ভাল।'

বাড়ি জমি সবই দ্রুত বিক্রী হয়ে গেল, তিন-চারমাসের মধ্যেই। কিছু হয়ত কম পেল—ধৈর্য ধরে থাকলে সবগুলোরই কিছু কিছু বেশী দাম পেত—কিন্তু কমে ছাড়ল বলেই তাড়াতাড়ি বিক্রী হল। কলকাতা যেন তাকে বেঁধে মারছে মনে হয়—চারিদিক থেকে গলা টিপে ধরছে। যত তাড়াতাড়ি হয় এখানের পাট চুকিয়ে যেন পালাতে পারলে বাঁচে—এই রকম মনের ভাব তার। লোকসান হয় হোক, তার আর লাভই বা কি লোকসানই বা কি, দু-পাঁচ হাজার কম পেলে তার এমন কি ক্ষতি হবে— তার চেয়ে মনের শান্তির দাম ঢের বেশী।

সব বেচে দিল, মানে অধিকাংশই। সামান্য কিছু সোনার গহনা ও ক'খানা গিনি হাতে রাখল। বিদেশে গিয়ে যদি থাকতে হয় একা

—হঠাৎ কোন দরকার পড়তে পারে, ভারী অসুখ-বিসুখ কিছু যদি হয়—তখন এগুলো কাজে লাগবে। সোনা ফেললে রাত-দুপুরে টাকা মেলে, আর কোন জিনিসের বদলেই অত তাড়াতাড়ি টাকা পাওয়া যাবে না। এছাড়া যা কিছু টাকা—বাড়ি জমি ফার্ণিচার বাবদ পাওয়া গেল সব ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিল। বলে দিল সুদের টাকাটা তাকে ছ'মাস অন্তর পাঠাতে। ধনুবাবুর ছেলের পরামর্শেই —আর যা-যা, শেয়ার কোম্পানীর কাগজ ছিল, তাও ব্যাঙ্কেই জমা ক'রে দিল, তারাই যাতে সুদ আদায় ক'রে নিতে পারে।

ওর পরামর্শেই তিনটে ব্যাঙ্কে ভাগ ক'রে রাখল টাকাটা, দিনকাল খারাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়, বড় বড় কারবারীরা টলমল করছে। স্বদেশী হাঙ্গামায় সায়েবদের কারবার অনেকে গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কোন্ ব্যাঙ্ক কখন ফেল হয় কেউ বলতে পারে না। তবে এসব ব্যাপারে হেমন্তরও কিছু জ্ঞান-অভিজ্ঞতা হয়েছে এতদিনে —সুদ কম পাবে জেনেও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেই বেশির ভাগ টাকা জমা ক'রে দিল।··

এবার তল্পি গুটোবার পালা। আর নয়, এখানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার সময় হল।

শেষ বাড়িটা রেজেস্ট্রি হবার আগেই সে সুরেনকে একটা টেলিগ্রাম করল—সে যেন অতি অবশ্য এই রবিবার এসে ওর সঙ্গে দেখা করে। সৌভাগ্যক্রমে সেই শনিবারেই মুসলমানদের কী একটা বড় পর্ব পড়েছিল, দু'দিন ছুটি—একদিন আগেই এসে পড়ল সুরেন।

'কী ব্যাপার পিসীমা, এমন জরুরী তলব? আমি তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছি, কেবল ভাবছি অসুখ-বিসুখ কারুর না ক'রে থাকে! হে ভগবান!···কিন্তু এ কী? বাড়ির কি হাল? জিনিসপত্তর সব কোথায় গেল?—খালি বাড়ি ঢা-ঢা করছে। এ বাড়ি ছেড়ে অন্য

কোথাও উঠে যাচ্ছেন নাকি? সেই জন্যে খবর দিয়েছেন?... নিমাইদারা কোথায় গেল, তাদেরও তো দেখছি না—?'

'বোস বোস, বলছি। তুই এক নিঃশেষে সব জিজ্ঞেস ক'রে যাচ্ছিস—উত্তরটা দেবার অবসর না পেলে কেমন ক'রে দোব?... কিন্তু সারারাত জেগে এসেছিস, আগে কাপড়-চোপড় ছাড়, মুখ-হাত ধো, বলছি সব। আমার একটা থানই পর, কী আর হবে! অনেক বেঁচেছে দাদা, তার আর অকল্যেণ হবার ভয় নেই।'

তার পর, সুরেন স্নান-আহ্নিক সেরে জলখাবার খেয়ে সুস্থ হয়ে বসলে সবই খুলে বলল হেমন্ত। ওর প্রস্তাব থেকে নিমাইয়ের প্রতিক্রিয়া—তাকে তাড়ানো, সব। সেইজন্যেই সুরেনকে ডেকেছে সে। এবার এখানকার যা-কিছু সম্পত্তি বেচে দিয়ে, এখানের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে, পাট উঠিয়ে, চিরদিনের মতো কাশীবাসী হতে চায় সে। বিক্রী সমস্তই হয়ে গেছে, বালিগঞ্জের বাড়িটা বাকী ছিল, সে-ও বায়না হয়ে গেছে, তারা সার্চ প্রভৃতি যা করবার সব করিয়েছে, সামনের পরশু রেজেস্ট্রি হলেই হেমন্তর সব দায় শেষ। এ-বাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে গত মাসেই, তারা ক'টা দিন দয়া ক'রে রেখেছে; তবে এবার ছেড়ে দিতেই হবে। সেই জন্যেই সুরেনকে এত জরুরী তলব পাঠাতে হয়েছে।

সুরেন এসব কিছুই জানত না। ইচ্ছে ক'রেই হেমন্ত লেখে নি এসব। যে শান্তির জন্যেই এখান থেকে সরে গেছে—তাকে আর উত্ত্যক্ত ক'রে লাভ কি?

সমস্ত শুনে সুরেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তার পর ঈষৎ একটু অনুযোগের সুরেই বলল, 'এটা কেন করতে গেলেন পিসীমা? এ কি মানুষ পারে! সবে দু'টো ছেলেমেয়ে হয়েছে, অল্পবয়সী স্ত্রী, তাদের সেই কোন মুলুকে রেখে এখানে পড়ে থাকবে—এ কি সম্ভব? এ কেউই রাজী হত না। অন্তত বাঙালীর ছেলেরা নয়। এ আপনার তাকে তাড়াবার জন্যেই মতলব করা!'

অনুযোগের সুরটা শেষ পর্যন্ত যেন তিরস্কারের সুরেই পরিণত হয়।

হেমন্ত অভিযোগটা মেনে নিল। বলল, 'তা যে একেবারে মিথ্যে তা বলতে পারি না। আসল কথা বৌটা ঐ রকম, নিমেটার অবশ্য কিছু করার নেই, তাকে দোষ দেওয়া বৃথা—আমার যেন কেবলই মনে হতে লাগল, নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে আছি—একা, নিঃসঙ্গ। এতগুলোকে নিয়ে রয়েছি, এত খরচ করছি, গতরেও খাটছি, তবু আমার কেউ নেই। আমি একা। এইটেই সহ্য হল না বাবা। এতে যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে তো হয়েছে। তবে কি জানিস, নিমের যদি অমন মতিচ্ছন্ন না হত, মুখের ওপর কথা না বলত—কি হাতে-পায়ে ধরে সময় চাইত—কি যদি আমার কথাটা বলত মিথ্যে ক'রেও, যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—তাহলে কি হত বলা যায় না! হয়ত আমিই মত বদলাতুম, কিম্বা হয়ত ওদেরই এ বাড়িতে রেখে আমি একা কাশী চলে যেতুম। ওরও অদৃষ্টে দুঃখ আছে, গ্রহ বিরূপ—তাই অমন ছন্নমতি হল।...তবে এ একরকম ভালই হল, বুঝলি? সে তার জোর বুঝেছে, বৌ-ছেলে নিয়ে সংসার পেতেছে—এত চিন্তাই বা কি? এতদিন তো টানলুম, পয়সাও হাতে জমেছে কিছু নিশ্চয়। আর সে যা হয় করবে। গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হবার তো হয়েই গেছে।'

'হয়ে কি গেছেই ঠিক? আর ফেরানো যায় না?'

'না। ওর মনের চেহারাটা দেখতে পেয়েছি। আর আমার সাধ নেই সংসারের বাবা। আমারও তো ঢের বয়স হল—আমার দিকটাও তো আমার ভাবার অধিকার আছে!'

'তা আমি এখন কি করতে পারি বলুন?'

সুরেনের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ একটু শঙ্কার আভাস।

হাসে হেমন্ত। বলে, 'ভয় নেই, নিমের বদলে তোকে নিয়ে সংসার পাততে চাইব না। ভাল ঘোড়ার এক চাবুক, তোকে আমি সেই একদিনেই চিনে নিয়েছি। আর সে শখ থাকলে, সব বেচে-কিনে দিয়ে তোকে খবর দোব কেন, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই ডাকতুম!'

তারপর বলে, 'তা নয়। তোকে একটু সাহায্য করতে হবে বাবা। এই বোধহয় শেষ, আর তোকে বোধহয় বিরক্ত করতে হবে না। মনে তো হচ্ছে আর ফিরব না, যা হবার বাবা বিশ্বনাথের চরণেই হবে।...আমাকে একটু গিয়ে থিতু ক'রে দিয়ে আসবি শুধু। একা তো কখনও যাই নি কোথাও, কেউ না কেউ সঙ্গে গেছেই।.. তারক যখন যায়, ডাক্তারবাবু পুরুতঠাকুরকে ঝিকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এমনি বেড়াতে যাওয়া সে তবু একরকম। এ ধর সংসার ভেঙে নিয়ে চিরদিনের মতো এখানের বাস উঠিয়ে যাওয়া, এই বয়সে আর একা যেতে ভরসা হয় না। হ্যাঙ্গাম ঝঞ্ঝাটও তো কম নয়। কলকাতা শহর দাঁহুড়ে বেড়াই চিরদিনই, আমাদের সে আমলে পাল্‌কি ছিল, ব্যায়রাদের বলতুম অমুক জায়গায় যাব—নিশ্চিন্তি, উড়ে ব্যায়রারা তখনকার দিনের গুণ্ডা-বদমাইশ কি চোর-ডাকাত ছিল না। একালে ট্যাক্সী হয়েছে, একা ট্যাক্সী চড়তেও অবিশ্যি সাহস হয় না, তেমনি রিক্‌শাও আছে, যেখানে খুশি যাওয়া যায়। কাশী শুনেছি গুণ্ডার জায়গা—বড় ভয় করে।'

'তা জেনে-শুনে সে দেশে যাচ্ছেন কেন তাহলে?' দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে ফেলে সুরেন।

'বদমাইশও যেমন আছে, তেমনি বাবাও আছেন।' হেমন্তও হেসে জবাব দেয়, 'তাছাড়া সবাই কি আর বদমাইশ গুণ্ডা, ভাল লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্নিসি সাধক বিস্তর আছেন। আমার মতো অনাথা অবীরে বিধবাদের তো কথাই নেই। আমাদের তো ও-ই জায়গা বাবা! এমন তো হাজারে হাজারে ওখানে!'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তোকে বলা এই জন্যে যে বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, আমার ঝোঁকটা পছন্দটাও জানিস। তুই তিন-চারটে দিন আগে চলে যা—কোথাও একটা হোটেল-মোটেলে থেকে—আমার জন্যে একটা বাড়ি কি ঘর খোঁজ। কোন ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে একটু আলাদা বন্দোবস্ত—এই হলেই ভাল হয়। একেবারে একা থাকতেও ভরসা হয় না, অথচ আবার কারও সঙ্গে পাশাপাশি

গাওয়া-গাওয়িও থাকতে পারব না। এক জায়গাতেই জল-কল হবে হয়ত, তাই নিয়ে দিন-রাত খ্যাচখ্যাচানি, নোংরার দল যত, ছেলে-পুলে থাকলে ক্যালব্যাল—সে আর এ বয়সে বরদাস্ত হবে না।··· মানে, একটা বাড়ির দোতলা কি তেতলা নিয়ে রইলুম, অন্য অংশে বাড়িওলা কি অন্য ভাল ভাড়াটে রইল—এই রকম হলেই সবচেয়ে ভাল।···আর সেই সঙ্গে মা-গঙ্গার ধারে-কাছে হয়—চট ক'রে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে পারি কি জানলা ছাদ থেকে দর্শন হয়—।··· অনেকখানি ফরমাশ মনে হচ্ছে, কিন্তু তা নয় রে, গোটা বাঙ্গালী-টোলাটাই বলতে গেলে গঙ্গার ধারে, ওদিকেও শহরের ধার দিয়েই তো মা গেছেন—এমন বাড়ির অভাব হবে না।'

'তার পর? আপনি যাবেন কার সঙ্গে? আবার ফিরে এসে নিয়ে যেতে হবে তো?'

'উঁহু, সে এখন আমার যে দারোয়ান আছে—সুর্যু, গোণ্ড জেলায় বাড়ি, এদিকে ডাকাত শুনেছি কিন্তু খুব বিশ্বাসী, নজরও খুব চার-দিকে।···মালপত্তর যা আলাদা যাবে তা বুক করিয়ে দেবে এখন, সে লোক আমার আছে। এই বাড়ি যে কিনেছে সে রেলেই কাজ করে—সে বলেছে আপনি নিভ্‌ভরসায় থাকুন—আমি বুক করিয়ে রসিদ এনে যাবার আগে পৌঁছে দোব।···তুই বাড়ি ঠিক ক'রে টেলিগ্রাম করিস একখানা, আমি আর দারোয়ান এখান থেকে রওনা হয়ে যাব, তুই ইস্টিশানে নামিয়ে নিস। যেটুকু গিয়েই দরকার হবে, বাক্স একটা, বিছানা, ঠাকুর আর রান্নার বাসন—এই শুধু সঙ্গে যাবে, মোট তিন-চারটে মাল, সে দারোয়ানই নিয়ে যেতে পারবে। ও ধন্নুবাবুর আমলের লোক, ওঁর কাজে যখন ভর্তি হয় তখন কুড়ি-একুশ বছর বয়েস—ধন্নুবাবুর সঙ্গে ঘোরাই ওর কাজ ছিল বাইরে বাইরে।'

সুরেন তখনই কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে চুপ ক'রে বসে রইল। বোধহয় মনে মনে একটা হিসেব ক'রে নিলে, তারপর বললে, 'এ যা বলছেন, যাওয়া-আসা, বাড়ি দেখা, আপনাকে বসিয়ে থিতু ক'রে আসা—অন্তত পনেরোটি দিনের ধাক্কা। বেশী

তো কম নয়। এত দিন ছুটি তো পাব না আমি। পাওনাও নেই। বছরে ক'টা দিনই বা ছুটি, এই ক'মাস আগে মায়ের কাজেই সব চলে গেছে, বেশীই নিতে হয়েছিল দু-একদিন। আর, ওসব কাপড়কলের ব্যাপার, পাওনা থাকলেও অত দিন একটানা ছুটি দিত না। এমনিই ছুতো খুঁজছে অবিরত জবাব দেবার। আমি বড়বাবুর থু দিয়ে, তাঁকে ঘুষ খাইয়ে ঢুকি নি, তাঁর একটা গাত্রদাহ আছেই। নিহাৎ মা মারা গেছেন, তাঁর কাজ বলে কিছু বলতে পারে নি। এ বাজারে চাকরি গেলে আর কোথাও কাজ পাব না।···ধীরুটা ঐ কাণ্ড ক'রে বসে রইল, যা হোক তবু মাসে কুড়ি-পঁচিশটা টাকাও দিত—সে তো বন্ধ হলই, বেরিয়েও কোথাও কাজ পাবে না। আমার যদি কাজ যায় এখন—ঐ এক গন্ধ রইল গায়ে, আমিও অন্য চাকরি পাব না।'

'সে কি রে! ধীরু আবার কী করল? কৈ, শুনি নি তো! ধীরু মানে তোর ছোট ভাই ধীরেন?'

একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে সুরেন বললে, 'সে আপনাকে লেখা হয় নি বটে। এমনিই তো চিঠি লিখি না বিশেষ—অত মনেও ছিল না; তাছাড়া এসব খবর লেখাও উচিত নয়, আপনার পেছনে টিকটিকি লেগে থাকত। এখন আমাদের সব চিঠি খুলে পড়ে। আসা-যাওয়া—দু'দিকেই।'

'কেন, ধীরু কি করল কি?'

'আর বলেন কেন, চাকরি-বাকরি ছেড়ে—হঠাৎ খেয়াল হল নাইট ইস্কুল করবে, চরকা-কাটা খদ্দর-বোনা এই সব শেখাবে। মা মারা যাবার আগেই—মা মারা গেছেন তা বোধ হয় শোনেও নি—বলে আমি তো সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করছি না, এসব ব্যাকওয়ার্ড জায়গা, পশুর মতো জীবনযাপন করে সব, না খেয়ে মরছে—না শিক্ষা, না কিছু—শাঁস যেটুকু রাজাই শুষে নিচ্ছে,—দু' পায়ে থ্যাৎলাচ্ছে এদের। এর বিহিত না করতে পারি—চেষ্টাও করব না, তবে আর মানুষ কি?···তা এসব দেশ হলেও না হয় হত—ইংরেজের খাস দখলে—এদের তবু একটু চক্ষুলজ্জা আছে—ওখানে রাজার

অনেক হাত পুলিশের ব্যাপারে, তিনি এসব প্রজা-ক্ষেপানো, বিশেষ তাদের সচেতন ক'রে দেওয়া নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে—ভাল চোখে দেখবেন কেন? তিনিই বোধ হয় কলকাঠি টিপে দিয়েছিলেন, কাছাকাছি একটা ডাকাতি হতেই তার সঙ্গে ওকে জড়িয়ে সাক্ষী-সাবুদ এমনভাবে সাজালে—ওর সেই নাইট ইস্কুলের ছাত্ররাই সাক্ষী দিয়ে এল দু-তিনজন ; কি করবে, তাদেরও প্রাণের ভয় আছে তো ?—প্রমাণ হয়ে গেল যে, ধীরু সে দলে ছিল। যদিও আসল ডাকাত একজনকেও ধরতে পারে নি নাকি, টাকা-পয়সাও রিকভার করতে পারে নি। তবে তাতে কিছু এসে গেল না, ধীরুর জেল হয়ে গেল দু' বছর। এখনও সেই জেল খাটছে।'

হেমন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, 'বলিস কি রে, তা বাড়ির কথা, মা-বাপ ভাইয়ের কথা ভাবল না একবার ?'

এই ধরনের দেশপ্রীতির কথা সে ভাবতে পারে না, সেরকম শিক্ষাও নেই তার।

'সে বলে তোমরা তো ভাবছই। সবাই যদি বাড়ির মার কথা ভাবে তো এ মার কথা ভাববে কে ? দেশও তো মা। দেশের জন্যে, দেশের লোকের জন্যে সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।'

বলে একটু হাসল সুরেন, বিষণ্ণ ম্লান হাসি। বলল, 'আমাদেরই কি আর ইচ্ছে করে না দেশের কাজে লাগতে ? চোখের সামনে যেদিন দেখলুম মদের দোকানে পিকেটিং করেছিল বলে পুলিশ দু'টো ছেলেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে খোয়া-বার-করা রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—জামা ছিঁড়ে পিঠের চামড়া কেটে রক্তারক্তি, তার ওপর লাথি মারছে বুট সুদ্ধ—সেদিন কি আর রক্ত গরম হয় নি, ইচ্ছে হয় নি কি ছুটে গিয়ে ওদের পিস্তল-বন্দুক কেড়ে নিয়ে ওদের গুলি ক'রে মারি ? কিন্তু মহাত্মাজীরও নিষেধ আছে, আর তা ছাড়া বুড়ো বাপ-মার কথা ভেবেই, তারা উপোস ক'রে থাকবে হয়ত, হয়ত কেঁদে কেঁদেই প্রাণটা দেবে—আর সাহসে কুলোয় নি।'

শুনতে শুনতে হেমন্তর কঠিন শুষ্ক চোখও জলে ভরে এসেছিল বলল, 'আহা, বাছা রে! দাদা জানে এসব কাণ্ড?'

'জানেন বৈকি! না বলে আর কত ঢেকে রাখব পিসীমা! জীবনে অনেক আঘাতই তো পেলেন, জীবনভোরই ভাগ্যের কাছে আঘাত খাচ্ছেন, একটা-দু'টো বেশী-কমে কি এসে-যাবে?'

এর পর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল দু'জনেই। তারপর হেমন্ত আস্তে আস্তে বলল, 'শোন। তোকে চাকরির ঝুঁকি নিয়ে যেতে বলব না, এটা ঠিক। সে আমার কপালে যা-ই থাক। তবে এ-কথাও ভেবেছি, তোর ছুটির কথাও। আগে মনে পড়ে নি, একটা কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল ক'দিন আগে, এই তোকে চিঠি লিখব লিখব ভাবতে ভাবতেই। তোদের কলের যিনি বড়-কর্তা বা মালিক—চক্রবর্তী মশাইয়ের সঙ্গে আমাদের ওঁর, মানে ডাক্তারবাবুর, পূর্ণ ডাক্তার আর কি—খুব জানাশুনো ছিল। উনি একবার কি একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নাকি ভদ্রলোকের স্ত্রীকে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচিয়েছিলেন, দিন-রাত পাশে বসে থেকে, আহার-নিদ্রা জ্ঞান না রেখে। সেই থেকে খুব ভাব, বন্ধুত্বের মতো। মানে উনি পূর্ণবাবুকে খুব ভক্তি করতেন, দেবতার মতো দেখতেন। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গেও জানাশুনো; আমার এখানে এসেছেনও ক'বার। তাছাড়া ওঁর—মানে ডাক্তারবাবুর ভারী অসুখের সময় অনেকবার এসেছেন—আমি তো পাশেই বসে থাকতুম—আমার সঙ্গেও খুব জানাশুনো হৃদ্যতা হয়ে গিছল। অনেকবার বলেছেন, আপনি যা করলেন, যা করছেন তার জন্যে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। ডাক্তারবাবু ভাল হয়ে উঠুন—একবার আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের ওখানে—নদীর ওপর বাড়ি, দু'দিন বিশ্রাম করবেন।...সে অবশ্য আর যাওয়া হয় নি, তবে আমার তো মনে হয় আমাকে ভোলেন নি একেবারে।...আমি এই সব ভেবেই একখানা চিঠি লিখে রেখেছি তাঁর নামে। চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে তুই তাঁর হাতে দিস, যদি সামনে পর্যন্ত পৌঁছতে না পারিস তো কাউকে দিয়ে পাঠাস, নয় তো ওখান থেকেই রেজেস্ট্রি

ক'রে ডাকে দিস। তাতে তোর নাম-ধাম সব দিয়ে দিয়েছি, দরকার হলে নিজেই খুঁজে বার করবেন।...আমার তো মনে হয় এ চিঠি চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে পৌঁছলে তোর ছুটির অভাব হবে না, চাই কি চাকরিতেও কিছু উন্নতি হতে পারে। আমার নিজের ভাইপো, আমার ওপর অভিমান ক'রে ওখানে ঐ কাজ করছে, তা ছাড়া খুব আত্মমর্যাদা জ্ঞান, স্বাবলম্বী—সেই জন্যেই আরও, কিন্তু এ আয়ে সংসার করা সম্ভব নয়, এইভাবেই লিখেছি।'

সুরেন খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল পিসীর মুখের দিকে। তারপর বললে, 'এসব আবার লিখতে গেলেন কেন? শুধু ছুটির কথা লিখলেই হত। কি মনে করবেন, ভাববেন হয়ত আমিই লিখিয়েছি!'

'তাতে কি তোর মাথা কাটা যাবে?' হেমন্ত এবার ঝেঁঝে ওঠে, 'আ গেল যা! আমি তো তোর পিসী। লোকে চাকরির জন্যে কত লোকের সুপারিশ ধরে—পিসীকে ধরলেই যত দোষ!'

'না, তা নয়'—অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সুরেন, বলে, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে বড়বাবুটি খাপ্পা হয়ে থাকবেন—শত্রুতা করবেন বাগে পেলেই। বার বার তো অত বড় লোকের কাছে যেতে পারব না।'

হেমন্ত শুধু বলে, 'ছ্যাখোই না কি হয়! আমার তো মনে হয় খুব সুবিধে করতে পারবে না কেউ আর।...ভাবছিস বুড়ি নিজেকে মস্ত লাট-বেলাট ভাবে, তা এর আগে তো এমন কথা বলি নি আর কখনও—জাঁক করা স্বভাব এমন তো বলতে পারবি না!'

তারপর, চোখে ওর নিজস্ব বিশেষ কৌতুকের ভঙ্গী ক'রে বলে, 'আজ এই দেখছিস পিসীকে অসহায়, একা—একা চিরদিনই অবিশ্যি—তবু একদিন এই ক'খানা হাড়েই ভেল্‌কি খেলেছে। আজ কি আর সে ক্ষ্যামতার কিছুই নেই?'

আর কিছু বলে না সুরেন।

ঝুঁকি যতই হোক, এই অসহায় বৃদ্ধাকে এভাবে ত্যাগ করতে পারবে না সে।

অনেক বেছে অনেক ঘুরে অনেক হেঁটে—সুরেনই এই বাড়িটা পছন্দ করল। মান-সরোবরের ঘাটের কাছে, অভয়াচরণ তর্কচূড়ামণির বাড়ি। একেবারে গঙ্গার ওপর নয়, বাঙালীটোলার যেটা বড় রাস্তা, যা কালীতলা থেকে কেদারঘাট পর্যন্ত সোজা চলে গেছে তারই ওপর। তবু গঙ্গা দেখা যায়। ওপরে তিনতলা থেকে তো কথাই নেই, মনে হয় গঙ্গার ওপরই আছি। এদিকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ থেকে ওদিকে রামনগর পর্যন্ত দেখা যায়। শুধু ডানহাতি কোণাকুনি একটা বড় বাড়ি থাকায় কাশীনরেশের প্রাসাদটা পুরো চোখে পড়ে না।

দু'মহল ঠিক নয়—দু'ভাগে ভাগ করা বাড়ি। একটাতে তর্কচূড়ামণি নিজে থাকেন, আর একটা ভাড়া দেন। তারই তিনতলা পুরোটা ভাড়া নিল সুরেন। একখানা দেড়খানা ঘরে হয়ত কোনমতে থাকতে পারে হেমন্ত, কিন্তু পাশাপাশি অন্য ভাড়াটে থাকলে বনিয়ে থাকা মুশকিল। তাছাড়া একা নিজস্ব বাড়িতে এতকাল থেকে এসে, এখন পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে বাস করাও সম্ভব নয়। এ গুনতিতে তিনখানা, আসলে আড়াইখানা ঘর। ভাড়াও সে অনুপাতে একটু বেশি। তর্কচূড়ামণি ষোল টাকার এক পয়সা কম নিতেও রাজী হলেন না কিছুতেই। তাও ব্রাহ্মণ বলেই এতটা 'কনসেশন' করছেন তিনি—বার বার শুনিয়ে দিলেন। (ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে দেবেন না সে কথা তো আগেই শুনিয়ে দিয়েছেন—তবে আর কনসেশনের কথাটা উঠছে কেন? তবে সে কথা বলে লাভ নেই বুঝেই সুরেন চুপ ক'রে গেল।)

সুরেন এতদিনে মোটামুটি পিসীর মেজাজ ও রুচি বুঝে নিয়েছে। বাড়ি দেখে আর তাঁকে চিঠি লিখে মত আনাবার জন্যে অপেক্ষা করল না, একেবারেই এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ভাড়া পাকা ক'রে নিল, যদিচ মত আনাবার মতো সময় ছিল হাতে।

সত্যিই পিসীর চিঠিতে আশ্চর্য ফল হয়েছে। এতটা যে হবে তা সুদূর কল্পনাতেও কখনও ভাবে নি সুরেন। নিজে পৌঁছতে পারে নি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে, চাপরাশীকে দিয়েই চিঠিটা পাঠাতে হয়েছিল বটে—কিন্তু চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং, অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যে সম্মান দেন না, ওকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পিসীর খবর নিয়েছিলেন। হঠাৎ এভাবে সংসার গুটিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন—কারণটা জিজ্ঞাসা করাতে সব খুলে বলতেও হয়েছিল—শুনে খুব দুঃখ প্রকাশও করেছেন। অতঃপর নিজে ওকে দিয়ে তখনই দরখাস্ত লিখিয়ে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর ক'রে বার বার বলে দিয়েছেন যে, দরকার হলে স্বচ্ছন্দে আরও দু'চার দিন দেরি করতে পারে। পিসীকে ভালভাবে থিতু না ক'রে যেন আসে না।

তারপর সুরেনের খবর নিয়েছেন।—কোন্ ডিপার্টমেণ্ট, কী কাজ করে। শুনে বলেছেন, 'ও, বগলাবাবুর সেকশ্যন? এই রে, মানুষটি ভাল নয়—বেগ দেবে তোমাকে।…ঠিক আছে, আমি অর্ডার লিখে দিচ্ছি। ফিরে এসে তুমি আমার খাস আপিসে কাজ করবে, তোমাকে অন্য কোন সেকশ্যনে যেতে হবে না। মাইনেও বেড়ে যাবে অটোমেটিক্যালি!'

তারপর একটু থেমে বলেছেন, 'তোমার হাতের লেখা তো ভালই। কথাবার্তা কয়ে মনে হচ্ছে কিছু লেখাপড়াও করেছ। যদি কাজ চলে, মনে হচ্ছে চলবে—তাহলে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজটা তোমাকে দিতে পারি। এখন যিনি আছেন তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না, কেবলই কামাই করেন—বড় অসুবিধে হয়। তাঁকে অন্য একটা কাজে বসিয়ে তোমাকে নিয়ে নোব। হাউ এভার, তার আগে আমার আপিসে তো কাজ করো কিছুদিন, কাজটা বুঝে শিখে নাও, তারপর দেখা যাবে। নইলে ঠিক পেরেও উঠবে না।'

এ সবই সদয়, সহৃদয় কথা। অন্তরঙ্গতার সুর। আত্মীয়ের মতো, অভিভাবকের মতো ব্যবহার। সাধারণ নিচুদরের কেরাণীর

কাছে সুদুর্লভ সৌভাগ্য। এও একরকম পিসীর কাছেই উপকৃত হওয়া। তবে সেটা তত গায়ে লাগল না—তার বদলে সেও কিছুটা কাজে আসতে পারল বলে।...

হেমন্তও বাড়ি দেখে খুশী হল। বললে, 'এই জন্যেই তোকে পাঠিয়েছিলুম। এমন মনের মতোটি আর কেউ বেছে নিতে পারত না। সবদিক দিয়েই সুবিধে হল। কাছেই তো দেখছি বাজার বসে, আনাজ বেচতেও যায় মাথায় ক'রে। আমার তো আর মাছের চিন্তা নেই, বাজার যেতে হবে না। সামনে গঙ্গা, কাছেই কেদার। এক বিশ্বনাথ একটু দূরে পড়লেন—তা হোক, পালে-পাব্বনে এইটুকু হেঁটে যেতে পারব অনায়াসে। গলি দিয়ে গলি দিয়ে যাওয়া—রোদ্দুরের ভয় নেই। এই বেশ হয়েছে।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'তা সবই তো ভাল, এমন খাসা তোর পছন্দ, বুদ্ধি-বিবেচনা সবই তো ভাল,—এইবার নিজে দেখে একটি বিয়ে কর। যাহোক, মাইনেও তো বাড়ল কিছু।'

'যা হোক নয় পিসীমা, আমার হক্কে পনেরো টাকা মাইনে বাড়া—এ তো আশার অতীত ঐশ্বর্য। কিন্তু তেমনি ধীরুরটা একেবারে বাদ চলে গেল যে! খরচা ওদিকে বেড়েই যাচ্ছে। দাদার দু'তিনটে ছেলেমেয়ে হয়ে গেল। আয় তো আর বাড়ছে না। বাবার ঐ শরীরের অবস্থা—ডাক্তার-বদ্যির খরচ তো লেগেই আছে। ...বাবা অবশ্য খরচ করতে দিতে চান না, কিন্তু আমরা দেখেশুনে চুপ ক'রে থাকি কি ক'রে? তবু তো ছোট্‌কার ভারটা বইতে হল না—নিভারা সে দায়টা তুলে নিলে পুরোপুরিই—আর শুনছি বেশীদিন তাদেরও বইতে হবে না। তবু খরচেরও তো অন্ত নেই।'

বলতে বলতেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল সুরেন। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তাছাড়া এখনকার মেয়ে, দেশে শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকবে, সংসারে খাটবে, আমি মাসে একদিন যাব—এতে কেউ রাজী হবে না। দেখছি তো চারদিকেই। মহা অশান্তি হবে

সে একটা। অথচ এই মাইনেতে যদি বৌ নিয়ে কর্মস্থলে বাস করতে হয়—এক পয়সাও পাঠাতে পারব না।…না পিসীমা, ও আশা ত্যাগই করুন। দাদার ছেলে হয়েছে, বংশরক্ষের জন্যে ভাবতে হবে না।…আর, আমার ঠিক ইচ্ছেও আর নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল দু'জনেই। তারপর হেমন্ত আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ রে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব— ? ইচ্ছে নেই কেন, সে কি বৌমার জন্যে ?'

'তীর্থস্থানে বসে, তায় আপনি গুরুজন সামনে—মিথ্যে কথা বলব না, সেদিকে যে মনটা একটু না টলেছিল তা নয়, দিনকতক খুবই কষ্ট হয়েছিল, তারও জীবনটা হয়ত আমার জন্যেই নষ্ট হয়ে গেল, সে ভেবেও কতকটা—তবে সে ভাবটা এখন কেটে গেছে, সত্যিই বলছি। কখনও-সখনও তাকে মনে পড়ে যে বুকের মধ্যেটায় এটুকু কেমন ক'রে ওঠে না তা নয়—তবে সে কদাচিৎ। তাছাড়া এটুকু বুঝে নিয়েছি, এদের বাইরেটা যার যতই চকচকে হোক— ভেতরটা ভাল নয়। খুব কম পুরুষের জীবনেই শান্তি আনতে পারে এরা।'

খানিকটা তেমনি স্থির হয়ে বসে থেকে হেমন্ত বলে, 'তোর দিকে ওর মনটা ঝুঁকেছিল ঠিকই, সে ঝোঁকটা এখনও বোধহয় যায় নি। আরও সেই জন্যেই হয়ত বরকে মনে ধরে না।…তোরা যাকে প্রেম বলিস, নবেলে নাটকে যা লেখে—সে প্রেমটা তোর দিকেই। নইলে ষোড়শীবাবু-টাবু—'

বলতে গিয়েও যেন হঠাৎ চুপ ক'রে যায় হেমন্ত।

সুরেন মুখ তুলে চায় না, কিন্তু তার নত দৃষ্টিটা ভ্রূকুটিবদ্ধ হয় একটু। হেমন্ত সেটা লক্ষ্য করে।

সুরেন বলে, 'ষোড়শীবাবু—কি হয়েছে— ?'

এধরনের কৌতূহল সুরেনের স্বভাববিরুদ্ধ। কোনরকম নোংরা কথার ধারে-কাছেও যেতে চায় না সে। তাই হেমন্ত একটু অবাকই হল ওর প্রশ্নে। বলল, 'ও, তুইও সন্দেহ করেছিলি তাহলে! তবে

ওটা আমি ভেবে দেখেছি, এমন কিছু দুষ্য ব্যাপার নয়। যোড়শীবাবুর টান স্বাভাবিক, সেটা বৌমার মন্দ লাগত না এই জন্যে যে, এতবড় একটা লোক, ধনী, আশ্রয়দাতা—সময়ে অসময়ে এটা-ওটা শখের জিনিস যোগায়—সে ওর জন্যে উৎসুক, ওর কৃপার প্রার্থী—এইটেই ভাল লাগত আর কি! তার বেশী কিছু নয়। পুজো কে না চায় বল! না চাইলেও অযাচিত পেলে তো আরও খুশী হয়। ...তবে ওর আসল টানটা তোর দিকেই—'

আস্তে আস্তে সুরেন বলে, 'ওকথাটা থাক পিসীমা।...বৌদি বলি, গুরুজন সম্পর্কে এসব আলোচনা না করাই ভাল। লাভও তো কিছু নেই।'

'তা ঠিক।' সায় দেয় হেমন্ত, 'তবে আঘাতটা সেও সামলাতে পারে নি। মেজাজ তো খিটখিটে হয়েছেই—শরীরটাও ভাঙছে। হয়ত খুব একটা মজবুত ছিল না কোনদিনই, তবু— !...যাক গে। সত্যিই, এসব কথা তোর না শোনাই ভাল।'

দারোয়ানকে আগেই মোটা বকশিশ দিয়ে বিদেয় করেছিল, দিন আষ্টেক দেখে সুরেনকেও ছেড়ে দিল, হাতে পাঁচ-ছ'দিন ছুটি থাকতেই। বলল যে, 'থাকতে তো পাস না। দেশেই দু'টো দিন কাটিয়ে যা বরং—'

সুরেন বলে, 'তাই যাব। তবে ইচ্ছে আছে একদিন দু'দিন আগেই জয়েন করব। দরকারের বেশি থাকি নি, এটা প্রমাণ করা ভাল। তারপর—নতুন সেকশ্যন, নতুন কাজ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চোখের সামনে—বুঝে নিতেও দেরি হবে। তবে, হাতের লেখা দেখে আর দরখাস্তে ভুল হয় নি দেখে—উনি যেন একটু অবাক হয়েই গেলেন। বললেন, আগে জানলে এমনিতেই তোমাকে আমার আপিসে টেনে নিতুম।'

সুরেন চলে যেতে আবারও সেই একা। সেই বিরাট শূন্যতা।

তবে কলকাতার নিজস্ব বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোয় একা ঘুরে

বেড়াতে যেমন হঠাৎ এক-একসময় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করত, এ তেমন নয়। একটা পুরো তলা ঠিকই, তবে বলতে গেলে দু'খানাই মাত্র ঘর, ঘর বলতে যা বোঝায়। আর একটা যা, ছোট্ট এক ফালি অন্ধকার ঘর, তাতে ভাঁড়ার রাখা ছাড়া কিছু করা যায় না —আর একটা রান্নার জায়গা। তাও এর মধ্যে একটা ঘরই যা একটু বড়, তাতেই ওর শোওয়া বসা, ঠাকুর পুজো চলে যায়। একটা ক্যানেস্তারা তাক আছে, তার সঙ্গেই জলচৌকী পেতে, পুজোর উপকরণ গঙ্গাজল, ঠাকুরের পট, গুরুর ছবি সব সাজিয়ে নিয়েছে।

পাশের ঘরটা খালিই পড়ে থাকে, বাড়তি ঘর। যদিই কেউ কোনদিন আসে-টাসে—থাকবে। এই 'কেউ'টা যে কে—তা নিজেকেই প্রশ্ন করতে সাহস হয় না যেন। সে কি সুরেন? নিভা? না মণিকারাই?···কার আসার আশা করছে সে তা নিজেও জানে না। শুধু 'কেউ হয়ত আসবে'—এই অনিশ্চিত অস্পষ্ট একটা ঘটনার ওপর ভরসা ক'রে বর্তমানের নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে চায় হয়ত।···

কলকাতার মতো নিঃসঙ্গ নয়—এই একটা মস্ত সুবিধে।

সেখানে আশপাশের কোন বাড়িতে হেমন্ত যেত না, তারাও আসত না। এখানেও সে বড়-একটা কোথাও যায় না, তবে অপরে আসে। পাশেই বাড়িওলারা থাকেন, এ মহল ও মহলের মধ্যে একটা দরজার মাত্র ব্যবধান, তর্কচূড়ামণির মা বা স্ত্রী দোর ঠেলে খুলিয়ে সময়ে সময়ে আলাপ করতে আসেন।

নিচে এক 'কায়েৎ-গিন্নি' আছেন, ছেলে-বৌদের সঙ্গে বনে না বলে একা পড়ে থাকেন, তিনিও আসেন মধ্যে মধ্যে। একই মুখে ছেলেদের মহিমা কীর্তন এবং অবিবেচনার নিন্দে করেন বসে বসে। সবাই বড় বড় চাকরি করে, করত। বিশেষ যে দু'টি মারা গেছে তাদের তো তুলনাই নেই, রাজা ছেলে। যারা বেঁচে আছে তারাও নিহাৎ কেউকেটা নয়। আবার তারা আসে না খোঁজ নেয় না, হারামজাদী ছোটলোকের বেটি বৌয়েরা গুণতুক করেছে—এখানে

ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি, এখন উনি মলেই বাঁচে সবাই—ইত্যাদি, ইত্যাদি এও বলেন।

এছাড়া এ মহল ও মহলের নিচেতলায় অন্ধকার খোপে খোপে অনেক ভাড়াটে। তার মধ্যে স্বামী-পুত্রহীনা পরদয়া-নির্ভর বিধবা বুড়িও আছে, আবার সামান্য কাজ করে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঐরকম একটা অন্ধকার ঘরে কাটায়—এমন লোকও আছে। কেউ বাতাসার কারিগর, কেউ বা মুদীর দোকানে মাল ওজন করে। একজন সন্দেশ রসগোল্লা তৈরী করে কালীতলার মোড়ে কৃত্তিবাসের দোকানে। সামান্য আয়ে অনেকগুলি পেট চালাতে হয়—এই মাসিক আটআনা একটাকা ভাড়ার বেশি দেবার ক্ষমতা নেই। এও দিতে পারে না বেশির ভাগই—বাড়িওলাও তার জন্যে জুলুম করেন না। আশেপাশে নাকি চার আনা ভাড়ার ঘরও আছে - তবে সে ঘরে থাকলে ছেলেপুলে মরে যাবে এই ভয়েই যায় না কেউ। বুড়িদের মার্কণ্ডেয়র পরমায়ু, তারা থাকতে পারে।

এরা, এইসব ভাড়াটেরা, নিজেদের গরজে ওপরে উঠে এসে আলাপ করে, ঘন-ঘন কারণে অকারণে প্রণাম করে। কেন না প্রয়োজনে চারআনা আটআনা ধার করতে হয় প্রায়ই। আগে আগে সুদের কথা জিজ্ঞেস করত, বাটি-গেলাস হাতে ক'রে আসত বাঁধা রাখতে—এখন ধমক খেয়ে সেকথা আর তোলে না। তাতেই ভক্তি আরও বেড়ে গেছে। দায়ে অদায়ে এক-আধপলা তেল, দু'খানা তেজপাতা কি দু'টো আলু—এসব তো আছেই। তবে এ আর ফেরৎ নেয় না হেমন্ত। পয়সাটা নেয়। নইলে জানে যে, এ চাহিদা বেড়েই যাবে। শুধু তাই নয়—একেবারের দেনা শোধ না দিলে পরে আর দেয় না, হাঁকিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত এখানেও একটা বাড়ি কিনে ফেলে। পরে আরও।

সস্তায় বাড়ি চলে যাচ্ছে দেখলে—বিশেষ যদি পরে তার বেশী দাম ওঠার সম্ভাবনা থাকে—লোভ সামলাতে পারে না। পূর্ণবাবু

বলতেন, চড়ুকে পিঠ—সুড়-সুড় ক'রে ওঠে, চড়ক সন্নিসীদের মার খাওয়ার নেশার মতো।

কথাটা ঠিকই—হেমন্ত এখন দেখে। প্রথম বাড়ি কেনার পর দায়ে পড়ে মিস্ত্রী খুঁজে বার করে। দাঁড়িয়ে থেকে তদারক ক'রে মেরামতও করায়। সেই সঙ্গে একটু-আধটু পরিবর্তন। ফলে সহজেই বিক্রী হয়ে যায়, লাভও পায় শ'সাতেক টাকার মতো।

তবে এখানে এরকম বাড়ি কম, দেখেশুনে সাবধানেই কিনতে হয়। কখনও বিস্তর কাণ্ড ক'রেও মেহনতই সার হয়, সর্বসাকুল্যে একশটা টাকা হয়ত ওঠে। কি আর একটু বেশী। ছোটাছুটির মজুরী পোষায় না। লোকসান হতে দেয় না অবশ্য। কেনার সময় দেখেশুনে হিসেব ক'রেই কেনে। রাস্তাটাই এখানে বড় প্রশ্ন, বড় রাস্তা থেকে কতদূর—এইটেই সর্বাগ্রে দেখতে হয়—আর মেরামত করলে কিছু বদল করলে লোভনীয় মনে হবে কিনা!...

বাড়ি কেনে অবশ্য বেচবার জন্যেই—নিজে এখান থেকে নড়ে না। ঘরে বসে গঙ্গা দেখা—এ ওর বহুদিনের শখ। সুবিধেও অনেক। কেদারনাথ, বাজার সব কাছে। ইচ্ছে হলে নিত্য স্নান করাও যায়। যদিচ তা সে করে না। বিশেষ বর্ষাকালে—কাদা ঘোলা জল, যত রাজ্যের নোংরা ধুয়ে আসা—স্নান করতে প্রবৃত্তি হয় না তাতে।...এখান থেকে আরও যেতে চায় না দু'টো কারণে। সুরেন সযত্নে সব সাজিয়ে দিয়ে গেছে, যেখানে যা দরকার—এই তক্তপোশখানা কিনে এনে নিজে বিছানাটি পর্যন্ত পেতে দিয়ে গেছে পরিপাটি ক'রে—মনে হয় তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্পর্শ আছে এ ঘরের সর্বত্র। এখান থেকে গেলে সেটা হারিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কারণ—দু'বাড়ির নিচের তলায়, আশেপাশে অনেকগুলি হতভাগা জুটেছে—কুপোষ্য—তারা যেন ওরই মুখ চেয়ে থাকে।

এত দীন এত দুঃখী যে মানুষ হয় তা এতকালের জীবনে কখনও জানে নি। কলকাতায় সীমাবদ্ধ জীবনে এ অভিজ্ঞতা হয় নি।

এখানে সস্তাগণ্ডা ঠিকই—কিন্তু তাই বলে মাসিক দশ টাকা

আয়ে যে সংসার চলে—চলতে পারে—তা তো আজও অবিশ্বাস্য মনে হয়। বুড়ি যারা—তাদের কারও আয় মাসে তিন, কারও বা চার। যার পাঁচটাকা মাসোহারা—সে নিজেকে এদের তুলনায় অবস্থাপন্ন মনে করে। সেই চালে চলে।

এদের জীবন দেখে আর নিজের জীবনের কথা ভেবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। তারও কেউ নেই সত্যি কথা—তবু এরকম নিঃস্ব পরমুখাপেক্ষী তো করেন নি ভগবান। এদের মধ্যে অনেকেরই সন্তান হয়েছিল, হয়ত কারও কারও এখনও আছে—তবু এই অবস্থা। যাদের বেঁচে নেই তাদের তবু একটা সান্ত্বনা—কারও ভাইপো, কারও ভাগ্নীজামাই, কারও বা দূরসম্পর্কের নাতি এই টাকা পাঠায়—হয়ত এইটুকু পাঠাতেই তাদের কষ্ট হয়, হয়ত তাদের বৌরা গঞ্জনা দেয়—এ টাকাটা অসুবিধে ক'রে তাদের ছেলেমেয়ের পেট মেরে পাঠানো হচ্ছে বলে। খোঁজখবর তো কেউ নেয়ই না—সম্ভবত সেখানে বসে অসহিষ্ণুভাবে দিন গোনে—কবে এরা মরবে।

এদের অসুখ-বিসুখে কেউ দেখবার নেই, পাশের ঘরের প্রতিবেশী ছাড়া। তাদের নিজেদের শরীরেরই অপটু অবস্থা, তবু বাধ্য হয়েই—মরে-মরেও করে। নিজেদের মধ্যে সদ্ভাবও নেই তেমন, ফলে সে সেবার মধ্যে তিক্ততাও থাকে যথেষ্ট।

হেমন্ত এই ভারটাই নিজের হাতে তুলে নেয়।

কাউকে ডাকতে হয় না, এদের কারও অসুখ হয়েছে শুনলে নিজেই এগিয়ে যায়, প্রাণপণে সেবা করে, 'গুয়ে-মুতে করা' যাকে বলে তাই। তার জন্যে কোন কৃতজ্ঞতাও আশা করে না, ও জিনিসটা আশা করতে সে ভুলেই গেছে বহুকাল। ওর প্রাক্তন বৃত্তির কথাটা কিভাবে জানাজানি হয়ে গেছে, হেমন্ত নিজেই হয়ত বলেছে—সে ওসব ঢাকাঢাকি পছন্দ করে না—এত সেবা এবং সাহায্য করলেও বিধবারা ওর হাতে কেউ খেতে চায় না। ওরই মধ্যে, নিজেদের সুবিধামতো একটা শাস্ত্রও বার ক'রে নিয়েছে—সাবু-বার্লি পর্যন্ত নাকি ওর হাতে চলে, এমন কি লুচি-হালুয়াও,

'আতুরে নিয়মো নাস্তি'—তবে সে বাক্যের দোহাই দিয়েও ভাত খাওয়া নাকি চলে না। ভাতেই সমস্ত জাতধর্ম বাঁধা তাদের।

তা হোক, তার জন্যে কোন দুঃখ কি অভিমান নেই হেমন্তর। বরং সে হাসিমুখেই নিরিমিষ ঝোল বা সুক্তোটা রান্না ক'রে দিয়ে যায় — পাশের ঘরের কেউ ভাতটা রাঁধে।

দুঃখ হয়েছিল অন্য কারণে। প্রথম প্রথম খুবই আঘাত পেয়েছিল, ক্রমে সেটাও সয়ে গেল।

যারা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করে—প্রায়-অনাহারশীর্ণ তাদের ছেলেমেয়েদের অসুখ লেগেই থাকে, সেজন্যে—ঔষধপথ্যের প্রয়োজনে —ওর কাছেই ছুটে আসে। সে দেনাও নয়, দানই। হেমন্ত ইচ্ছে ক'রেই দেয়, বলে এ আর শোধ দিতে হবে না। কিন্তু তারাই, যখন হেমন্ত ছুটে যায় সেই সব রুগ্ন ছেলেমেয়েদের সেবা করতে—তখন বিরক্ত হয়। আগে সেটা বুঝতে পারত না। কেমন একটা আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব, নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, বিরসকণ্ঠে বলে, 'থাক থাক, আপনি আর কেন এসব—আমরাই তো আছি—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' সেবা-বিদ্যা যে শিখেছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান যার অধিগত—তার পক্ষে চোখের সামনে অনাচার অনিয়ম হতে দেখলে চুপ ক'রে দেখা শক্ত বলেই, আগে আগে ওদের ধমক দিয়ে জোর ক'রেই সেবা করত, কিন্তু পরে ওদের অনিচ্ছার কারণটা জেনে নিরস্ত হল।

ওর ঝি-ই প্রথম বলল ওকে। এখানে এসে সারাদিনের লোকই রেখেছে। বামুনের মেয়েই একটি—দরকার হলে যাতে রান্নাও করতে পারে। তবে ঘরমোছা বাসন-মাজা সব কাজই করে—শরীর খারাপ না হলে রান্নাটা হেমন্ত নিজেই ক'রে নেয়। সেই ঝি-ই বললে একদিন, 'আপনি কেন মিছিমিছি ভূতের বেগার দিতে যান মা, ওরা সব যা-তা বলে। যাদের জন্যে এত করেন তারাই যখন তার মর্ম বোঝে না, তখন কী দরকার আপনার জোর ক'রে যাওয়ার?'

'যা-তা বলে! কী বলে রে?' প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু কি বলে নিজের মধ্যেই যেন তার একটা আভাস পায়, ওর উত্তর পাবার আগেই।

'সে আমি বলতে পারব না মা আপনাকে।'

অনেক পীড়াপীড়িতেও বলল না সে।

শেষে একদিন নিজেই শুনল হেমন্ত, নিচের যে ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগছিল, তার মা বলছে, 'বুড়ী ডাইনী, নিজের সাতকুল খেয়ে বসে আছে, এখন আমার বাছার ওপর নজর পড়েছে।...এ এক হয়েছে জ্বালা। এ বাড়ি ছাড়তে না পারলে একটাকেও রাখতে পারব না!'

সেই দিনটাতেই খুব মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিল, বহুদিনের জ্বলে-যাওয়া চোখে আবারও নেমেছিল জলের ধারা—তবে সে সাময়িক। বিধাতার নিষ্করুণ পাঠশালায় সব আঘাত সামলে নেবারই শিক্ষা হয়েছে তার, সেই সঙ্গে অপরের দিকটাও দেখতে শিখেছে। কী বা ওদের শিক্ষা, ওদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী বিবেচনা আশা করাই তো নির্বুদ্ধিতা। আবারও সেই কালীয় নাগের কথাই মনে পড়ে—'ভগবান, তুমি আমাকে বিষই দিয়েছ, বিষ ছাড়া আর কি আশা করো আমার কাছ থেকে?'

তবে ক্ষমা করলেও—ওদের সাহায্য-দানে বিরত না হলেও—নিজে সেধে গিয়ে আর সেবা করতে বসে না। অন্তত ছোট ছেলে-মেয়েদের অসুখে নয়।

এক-একবার মনে হয়—ঈশ্বর এইসব প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে তার সংসারের প্রবল নেশা কাটিয়ে দিচ্ছেন, তার মনকে—বিরূপতা কাটিয়ে নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছেন। এই ঘটনার পর বিশেষ ক'রে—মনে মনে একটা ধারণা হয় যে, এতদিন পরে সে নেশা কেটেই গেছে। কিন্তু ভগবান আবারও বুঝি হাসেন। কঠিন কৌতুকের হাসি। আরও আকর্ষণ আরও আঘাত দেবার জন্যে তৈরী হন।

আর যা-ই হোক—এ খবর, এ পরিস্থিতির জন্যে হেমন্ত প্রস্তুত ছিল না। এখানে এসে পর্যন্ত সে নিমাইদের কোন খোঁজ নেয় নি, চিঠি লেখে নি। চিঠি নিমাই-ই লিখত মধ্যে মধ্যে, তার কোন জবাব যেত না। শুধু পুজোর সময় যখন মণিকা চিঠি লিখত—ইদানীং বড় ছেলে গোবিন্দও আঁকাবাঁকা হরফে প্রণাম জানাচ্ছে, তখন ওদেরই আশীর্বাদ জানাত, গোনা দু'টি ছত্র। তার মধ্যে নিজেরও কোন সংবাদ থাকত না, নিমাইয়ের সম্বন্ধেও কোন কুশল-প্রশ্ন না। নিমাই যে আছে—তেমন কোন আভাস পর্যন্ত পাওয়া যেত না হেমন্তর সেই আশীর্বাদী চিঠিতে।

তবু নিমাই মধ্যে মধ্যেই চিঠি লিখত। পোস্টকার্ডে—বানান ভুলে ভর্তি, অর্ধেক অক্ষর ও শব্দ ছাড়—প্রায় অপাঠ্য হাতের লেখায়। একেবারে না পড়ে ফেলে দিত না হেমন্ত—একবার চোখ বুলিয়ে উনুনের পাশে ঘুঁটে রাখবার খাঁজে ঢুকিয়ে রেখে দিত, পরের দিন উনুন ধরাবার প্রয়োজনে লাগবে বলে।

এবারে চিঠি এল খামে। হাতের লেখাটা দেখে বুঝল নিমাইয়ের চিঠি। কিন্তু খামে কেন? এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও তো খামে চিঠি দেয় নি নিমাই! খোলবার আগেই একটা যেন কী অমঙ্গলের আশঙ্কা মনে এল।

আবার পরক্ষণেই মনে হল—হয়ত সংসার চালাতে পারছে না, তাই ইনিয়ে-বিনিয়ে আবারও নতুন ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রূ দু'টো কুঞ্চিত হল একবার। তা যদি হয়—ভবিষ্যতে আর কোন চিঠি পড়বেও না—দেখামাত্র ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু চিঠি পড়ে দেখল আশঙ্কাই সত্য। তবে আর যা-ই হোক—এই দুঃসংবাদের কথাটা ভাবে নি সে। একেবারেই অভাবনীয়।

মণিকা মারা গেছে।

মাত্র সাত-আট দিনের জ্বর। প্রথম দু'দিন ডাক্তার দেখানো হয় নি, সর্দি-জ্বর—ইনফ্লুয়েঞ্জা ভেবেছিল সবাই। তারপর রকম-সকম ভাল নয় দেখে নিমাই পাড়ার চারুবাবু হোমিওপ্যাথকে ডেকে আনে। তিনি দিন-দুই দেখে রুগী ছেড়ে দেন। তখন পাড়ার ননী ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। দু' টাকা ফীয়ের ভাল পাসকরা ডাক্তার। কিন্তু আসলে তিনিই রোগ ধরতে পারেন নি। তিনি ম্যালেরিয়া ভেবে চিকিৎসা করেছিলেন, কুইনাইন ইঞ্জেকশ্যনও দেন নাকি। তাতেই রোগটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ভয় পেয়ে—বাড়িওলার পরামর্শে আট টাকা ফীয়ের এক ডাক্তারকে ডাকে নিমাই, তিনি এসেই নাক সিঁটকেছেন, বলেছেন—'এ তো রুগী শেষ ক'রে আমাকে ডাকা হয়েছে। হয়েছে টাইফয়েড—তার ওপর গাদাখানেক কুইনাইন খাওয়ানো হয়েছে, ইঞ্জেকশ্যনও পড়েছে; এখন আর চিকিৎসার এলাকায় নেই—এখন বাঁচাতে পারেন এক ভগবান।' তবুও তিনি ওষুধ দিয়েছেন কিছু কিছু—নিরাশার আশা হিসেবে—কিন্তু কোন ফলই হয় নি। কোন ওষুধেই কোন ফল হয় নি। হার্ট নাকি খারাপ ছিল, দিন-দুই পরেই সব শেষ হয়ে গেছে।

সংবাদ শেষ ক'রে নিমাই লিখছে :—

'কী বলিব জ্যাঠাইমা, অমন দাবদলনী যুবতী ভার্জা আমার, যেন তৈলহীন পিদীপের মতো দেখিতে দেখিতে নিভিয়া গেল। কোন প্রেকার নাড়াচাড়া করা গেল না, সেবাযত্ন হইল না। আমি আমার খমতা মতো যতটা পারিয়াছি ঔষধপত্যের কোন টটি করি নাই। ডাক্তারও তো তিনজনকে দেখাইলাম। তথাপি যে এত সত্তর তিনি চলিয়া যাইবেন তাহা কে বুঝিয়াছিল?—কাহাকেও খবর দেওয়া গেল না, উঁহার বাপের বাড়িতেও একটা খবর পাঠানো হয় নাই। মিত্যুকালে মা বাবা এমন কি আপন মায়ের অধিক আপনাকে পজ্জন্ত দেখিতে পাইল না—এই আমার সবচেয়ে বড় আফ্‌সোস। আপন মা তো ছাই, জম্মে এক নাইন পত্তর দিয়া উদ্দীশ লইত না, এক পয়সার বাতাসা লইয়াও কোনদিন কেহ আসে নাই। ইদানীং আপনার মম্ম

আমার পরিবার খুব বুঝিয়াছিল, কেবলই বলিত, চলো একবার মার পায়ে গিয়া সকলে আছড়াইয়া পড়ি, তা আপনার অপ্পিতীভাজন হওয়ার ভয়েই সে সাহস করি নাই।

'কী বলিব জ্যাঠাইমা, বোধহয় সেই মনানলে দগ্ধ হইয়াই বৌটা আমার এমনভাবে মরিয়া গেল। ডাক্তার বলিল, এ রুগীর বাঁচারও তেমন ইচ্ছা নাই। এ যেন মরিতেই চাহে। এ রুগীকে বাঁচানো ঔষধের কম্ম নয়। আমার তো মনে হয়—আপনার সহিত যে অসদ-বেবহার করিয়াছিল তাহার ফলেই তার মনের এই আবস্তা। আপনি এখ্খনে যদি নিজ গুণে খমা না করেন তাহা হইলে সে বেচারী বোধহয় সগ্গে গিয়াও সুস্তির হইতে পারিবে না। আপনি দয়া করিয়া তাহাকে মাপ করুন, বাবা বিশ্বনাথকে জানান যাহাতে সে পরলোকে সুখ পায়।

'পরিশেষে নিবেদন এই যে, জ্যাঠাইমা, আমার মনে আর এক বিন্দু সুখ নাই। মন সববদাই হুহু করিতেছে। সংসার যেন বিষ মনে হইতেছে। কেবলই মনে হইতেছে ভগবান যদি বা মনের মতো বৌ দিলেন—তবে আবার কাড়িয়া লইলেন কেন? আমার পাপেই কি এমন হইল? তবে কি তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, আমি ছেলেপিলে লইয়া সুখে ঘর সংসার করি?···যাহা হউক, এখ্খনে আপনার কাছে একটি ভিখ্খা—আপনি অনুমতি করুন ছেলেমেয়ে তিনটাকে আপনার পাদপদ্মে ফেলিয়া দিয়া যেদিকে দু চখ্খু যায় চলিয়া যাই। সন্নিসী হওয়াই আমার কপালের লিখন, আপনার কি খমতা তাহা খণ্ডাইবেন? মিথ্যাই বিবাহ দিয়াছিলেন।

'যাহা হউক, সে ভুল শুদ্রাইবার এই সময়। আপনি সব দিক বিবেচনা করিয়া যাহা হুকুম করিবেন তাহাই করিব। নিবেদন ইতি—অধম সেবক হতভাগ্গ নিমাইচরণ।'

চিঠি শেষ ক'রে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল হেমন্ত। আবেগ দুঃখ অনুশোচনা শোক এসব বহুকালের বিস্মৃত অনুভূতি ওর কাছে,

অনেকদিনের ভুলে যাওয়া জিনিস। তবু আজ, এতকাল পরেও বুকের মধ্যে এ একটা কিসের তুফান! কিসের আলোড়ন! বুকের মধ্যেটা এমন ব্যথা-ব্যথা করছে কেন? মণিকা ভাল মেয়ে নয়, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি, তার সম্বন্ধে বিদ্বিষ্টই ছিল বরং—তবু সে যে এমনভাবে টপ্‌ ক'রে স্বামী-পুত্র-কন্যা ভরা সংসার রেখে মারা যাবে, তা কে ভেবেছিল! হতভাগী মেয়েটা—ঈশ্বরদত্ত অনুপম লাবণ্য নিয়ে এসেও জীবনে এতটুকু সুখ পেল না। না পেল মনের মতো বর—না পেল নিজের মতো ঘর। তার সংসারে প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু সুখে ছিল না—এটা হেমন্তও মানতে বাধ্য। যেখানে কোন নিজস্ব অধিকার নেই—প্রতি মুহূর্ত যেখানে পরের মন যুগিয়ে থাকতে হয়, সর্বদাই ভয় কখন কোন ব্যবহারে রেগে যাবে আর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—সেখানে হাজার ভোগে থাকলেও কেউই সুখে থাকে না। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা—এ অবস্থা বাড়ির পোষা কুকুরের চেয়েও খারাপ। কুকুরেরও একটা জোর থাকে—অধীন হলেও—এদের সেটুকুও নেই।

এ মণিকারই কপাল। আপন হতেও পারল না, নিমাইয়ের মতো সয়ে থাকতেও না। অথচ ঈশ্বর জানেন, এই অপূর্ব রূপসী কিশোরী মেয়েটি যেদিন গাড়ি থেকে নেমে তারই পাঠানো গোলাপী বেনারসী পরে দুধে-আলতায় দাঁড়িয়েছিল, সেদিন হেমন্তর সর্ব অন্তঃকরণ চেয়েছিল ওকে আপন করতে—আপন ক'রে নিতে। মন যেন সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, চেয়েছিল বুকে টেনে নিতে। ওর পাশে নিমাইকে দেখে হেমন্তই মনে মনে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিল, অনুতপ্ত হয়ে বার বার প্রতিজ্ঞা করেছিল, ঐশ্বর্যে প্রাচুর্যে স্নেহে ভালবাসায় এই অভাবটা এই খামতিটা পুরিয়ে দেবে সে। স্বামী না পাক মনের মতো, ওর সন্তানকে দিয়ে যাতে এ অভাববোধ দূর হয়—এ দুঃখ ঘোচে—সেই ব্যবস্থাই করবে, সেই-ভাবে মানুষ করবে, মানুষের মধ্যে একজন হয়ে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সে।

মেয়েটাই পারল না। সম্ভব হতে দিল না এই স্বপ্ন। ওর দুর্গ্রহই ওর স্বভাবকে চির-অসন্তুষ্ট ক'রে রাখল—নিজের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে দিল না। তবু বেঁচেও থাকত যদি। যাই হোক, যেভাবেই হোক নিজের মতো ক'রে ঘর-কন্না গুছিয়ে নিয়েছিল, ছেলেমেয়ে নিয়ে একরকমভাবে সংসার করছিল—হয়ত ক্রমে ওর এই অশান্তি অতৃপ্তিও কমে আসত একদিন। একদিন এই ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই তৃপ্তি আর শান্তি খুঁজে পেত। ভগবান সে সুযোগটুকুও দিলেন না ওকে!

নিমাই লিখেছে, 'সেই মনানলে দগ্ধ হইয়াই আমার বৌটা মরিয়া গেল।' সেই মনানল—মানে হেমন্তর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে অনুতাপ। হেমন্ত এত নির্বোধ নয়—আর নিমাই নিজেও না; সেও জানে হেমন্ত এ টোপ গিলবে না, এত বোকা নয় সে। তবু কোন কোন বোকা লোকও এক-একটা জায়গায় খুব চাতুরীর পরিচয় দেয়। নিমাইও এটা বেশ হিসেব ক'রেই লিখেছে। এই রকম শোকাবহ সংবাদে মনটা অবশ্যই একটু নরম হয়ে আসবে—আর সেই সুযোগে পুরোটা না বিশ্বাস করুক, খানিকটা হয়ত করতে পারে। আর তাতেই যথেষ্ট কাজ হবে।

সে যাই হোক—এর মধ্যে মনানলটাই সত্যি। অতৃপ্তি আর অনুযোগ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর অভিমান। কে জানে কেন এত অতৃপ্তি! কেন কিছুতেই পারল না সহজ হতে, তিন-তিনটে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও স্বামীকে ভাগ্যকে মেনে নিতে—নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না কেন? বেচারী—কল্পিত ক্ষতির কথা ভেবে, কী পেতে পারত সেই চিন্তায়—যা পেয়েছে, হাতের মধ্যকার লাভ যেটা—সেটার দিকে ফিরে তাকাতে পারল না কোনদিন। না-পাওয়া সুখের নেশায়—হয়ত বা আশায়— করায়ত্ত সুখ দু' পায়ে দলে গেল চিরদিন।

অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ল হেমন্তর। বহু যুগ, মনে হয় যেন জন্মান্তরের কথা, তবু মনে আছে।

কমলাক্ষ বলেছিল কথাটা, হয়ত বা সেই জন্যেই মনে আছে।

বলেছিল—বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর কপালে নিজের গালটা চেপে ধরে বলেছিল, 'তোমার মনটি ভারী রোমাণ্টিক—তোমার ঐ রকম ঘরে পড়া ভগবানের একটা প্রচণ্ড ঠাট্টাই বলতে পারো।'

কথাটা বোঝে নি হেমন্ত। মানে জিজ্ঞেসা করেছিল। এক কথায় কোন মানে কমলাক্ষও বোঝাতে পারে নি। বলেছিল, 'এমনি ভালবাসা, মানে রোমাণ্টিক ভালবাসা যে চায় জীবনে—ঐ ছাখো, আবারও সেই শব্দটাতেই চলে এলুম। মানে কি জানো, শুধু ভালবাসার জন্যেই ভালবাসা, পার্থিব—এইসব সংসারের কথা ভুলে গিয়ে লাভ-লোকসান ইহকাল-পরকাল সব চিন্তা ছেড়ে নিজেদের স্বার্থের কথা না ভেবে মানুষ যে ভালবাসে আর ভালবাসা চায়, শুধুই সেই ভালবাসা—দৈহিক সম্পর্কটা যেখানে বড় কথা নয়, প্রতিদিনের জীবনের চিন্তা-ভাবনা যেখানে তুচ্ছ—এমন জীবন কাটাতে চায় একজনের সঙ্গে, যা পাচ্ছে কল্পনায় তার চেয়েও বেশী কিছুর স্বাদ উপভোগ করে—এমনি একটা রোমান্স, প্রেম, ভালবাসা—কী বলব— সে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না হিমু—তুমি যে ইংরিজী জানো না ছাই।'

ইংরেজী জানত না ঠিকই, মানে—অতটা জানত না, তবু বুঝেছিল।

আজ মণিকার কথা ভাবতে গিয়ে সেই কথাটাই মনে পড়ল। হয়ত এমনি একটা রোমাণ্টিক মনই ছিল, সে তার হাত নয়—ভগবানই তাকে তৈরী করেছিলেন ঐরকম ক'রে—তাই নিমাইয়ের মতো স্বামী অত খারাপ লেগেছিল; তাই বিবাহিত কয়েক সন্তানের পিতা ষোড়শীবাবুর সকাম ক্লেদাক্ত আকর্ষণও তত খারাপ লাগে নি, উদ্দেশ্য ভাল নয়, ভবিষ্যতে কোন আশা নেই জেনেও সে স্তুতি সে মুগ্ধতাকে অবহেলা করতে পারে নি। তাই সুরেনকে পুজো করতে গিয়েছিল মনে মনে, তৃষ্ণার্ত অন্তরে ছুটে গিয়েছিল একটি দরদী, সহানুভূতিশীল, ভদ্র—এবং হয়ত বা রোমাণ্টিকও—মনের দিকে।

সেইজন্যেই ইহসংসারের কিছুতে তার মন ভরল না, এমন কি সন্তানেও না। সেই প্রেম, ভালবাসা—লেখাপড়া না জানলেও, এমন ক'রে গুছিয়ে ভাবতে না পারলেও—সেই রোমান্সের জন্যই মনটা উৎসুক পিপাসু হয়ে ছিল—আর বোধহয়, সে আশা রইল না, সে অমৃত বা সুধা পাবার—এই কথাটা যেদিন বুঝল সেই দিনই মনটা ভেঙে গেল, জীবন ভবিষ্যৎ সব বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেল।…

আবারও ভগবানের সম্বন্ধেই অভিযোগ বা বিদ্বেষ ফেনিয়ে ওঠে—হেমন্তর মনে। যদি কেউ থাকেন এমন অস্তিত্ব, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা—তিনি ভারী নিষ্ঠুর, অকারণেই নির্মম। মানুষকে নিয়ে নিয়ত একটা অকরুণ কৌতুকের খেলা তাঁর। হেমন্তকে তিনি সারাজীবন বঞ্চিত করেছেন এরকমভাবে—আবার এই মেয়েটাকে সব দিয়েও অন্যরকমে চিরবঞ্চিত করলেন।

হেমন্তর কিছুই রইল না—এর সামনে হাতের কাছে সম্ভোগের সমস্ত উপকরণ সাজানো থাকতেও তার মন ভরতে দিলেন না—চির-বঞ্চিত রাখলেন।

কে জানে, এমন কত প্রাণ নিয়ে নিরন্তর এই হৃদয়হীন নিষ্করুণ খেলা খেলছেন তিনি!…

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল—হেমন্ত সেইভাবেই স্থির হয়ে বসে রইল। চিঠিটা এসেছিল বেলা তিনটে নাগাদ। তখন থেকেই—সেই একভাবে চিঠিটা কোলে নিয়ে বসে আছে সে, বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে পাথরের প্রতিমা। বুকে যে বিপুল ঝড় উঠেছে, মনের মধ্যে বহুদিনের স্মৃতি তার সহস্র দুঃখ সহস্র ব্যর্থতা, নিষ্ফলতার সেই সহস্র অনুভূতি নিয়ে রক্ততরঙ্গে তুফান তুলেছে—বাইরে তার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না।

ধীরে ধীরে বাড়ির পিছন দিকটাতে, পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়লেন, ঘাটের ওপরের বাড়িগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ঘাটের ধারে বহুদূর পর্যন্ত গঙ্গার জলকেও ছায়ান্ধকার ক'রে তুলল। প্রমোদভ্রমণকারীদের

নৌকোর সংখ্যা বাড়ছে একটি একটি ক'রে। ওপারে রামনগরে খরমুজের ক্ষেতে ঘূর্ণি বাতাস লেগে ছোট ছোট বালির স্তম্ভ উঠছে মধ্যে মধ্যে। পড়ন্ত রোদে সোনালী দেখাচ্ছে বালিগুলো। নিচে পথচারীদের ভিড় বাড়ছে—তাদের কথাবার্তার একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে এখানে বসেই। নিচের কায়েৎ-গিন্নী কাকে পাকড়াও করেছেন, তার কাছে সোৎসাহে নিজের বিগত জীবনের ঐশ্বর্য-সমারোহের বর্ণনা করছেন—তার একটা একটা শব্দ বা বাক্য মধ্যে মধ্যে বেশ সরব হয়ে উঠছে: 'বললে বিশ্বেস করবে না ভাই। আমার জ্যাঠামশাই হুকুম করলে তাবড় তাবড় সায়েবদের সুদ্ধু কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।'

সবই শুনছে, সবই দেখছে—কিন্তু কোনটাই ঠিক তাকে যেন স্পর্শ করছে না। এসবের কোন কিছুই তাকে আজ উত্তেজিত সক্রিয় ক'রে তুলতে পারছে না। এ যেন কী এক জড়তায় পেয়ে বসেছে তাকে—তার স্বভাব-বিরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায়। কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না তার, হাতটা পা-টা নাড়তেও না।

শোক?

দুঃখ?

অনুতাপ?

কিছুই না। নিজের ব্যর্থ নিষ্ফল জীবন দিয়ে আর একটা হতভাগ্য পীড়িত সর্ববঞ্চিত জীবনের হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে শুধু, নিজে নিজেই কান পেতে শুনছে নিজের বুকের বিক্ষুব্ধ স্পন্দন। আর কিছু নয়।···

অবশেষে ঝিয়ের ডাকে সম্বিত ফিরল হেমন্তর। সে বেচারী ভয় পেয়ে গেছে। এমন তো কখনও হয় না, কোনদিন তো দেখে নি এভাবে এই সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে। ঐ চিঠিটা পাবার পর থেকেই—। তবে কি ও চিঠিতে কোন দুঃসংবাদ আছে? কারও মৃত্যু-সংবাদ? কিন্তু তাহলে তো ডাক ছেড়ে না কাঁদুক চোখ দিয়ে জল পড়ত অন্তত। এ তো শোকের কোন বহিঃপ্রকাশই নেই কোথাও।

অনেক ভেবে অনেক ইতস্তত: ক'রে কাছে গিয়ে ডাকল, 'মা!'

যেন ঘুম ভেঙে চমকে উঠল হেমন্ত, 'কী গা বদ্যিনাথের মা ? কী হয়েছে ?'

'না, মানে—সন্ধ্যে হয়ে গেল, অমন একভাবে ঠায় বসে আছেন —কী জানি শরীর-টরীর খারাপ লাগছে কিনা—ও কার চিঠি মা, চিঠিটা পাবার পর থেকেই—চিঠিতে কোন অন্য খবর আছে নাকি মা ?'

'সন্ধ্যে হয়ে গেল ? তাই তো, ও ঘরটা তো বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে ! তা আলো জ্বালো নি কেন ?···বাবা, এতক্ষণ বসে আছি ! খবর—হ্যাঁ, খারাপ খবরই আছে একটু। আমার দেওর-পো-বৌ মারা গেছে। অশৌচ পড়ল। এখনও শ্রাদ্ধশান্তি হয় নি।—চলো দিকি একটু দাঁড়াবে—গঙ্গাচানটা ক'রে আসি।'

তারপর যেন কতকটা অর্ধস্বগতোক্তি ক'রেই বলল, 'আমিই অনেক খুঁজে বিয়ে দিয়ে এনেছিলুম—সরস্বতীর মতো রূপ ছিল। আবাগীর বরাত খারাপ—তিনটে অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে মরে গেল। স্বামী যা—তিনমাসের মধ্যে আর একটা বে করবে বোধহয়।'

'কী হয়েছেল মা ?'

'বলছে তো টাইফয়েড।'

আর কথা বাড়তে দিল না সে। উঠে তরতর ক'রে নেমে গেল গঙ্গার ঘাটের দিকে।

রাত্রে আহ্নিক ক'রে উঠে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল হেমন্ত।

লিখতে হবে—কিন্তু কী লিখবে ?

সন্ধ্যা থেকেই এই দ্বন্দ্ব চলছে মনে।

আবার সেই সংসার, আবার ছেলে মানুষ করা ?

বুদ্ধি-বিবেচনা বলে, 'না না, আর নয়—অনেক হয়েছে, ও পাপে আর দরকার নেই। এতদিনেও শিক্ষা হল না ? আরও কত লাঞ্ছনার সাধ আছে ? এ দায় ঘাড়ে না নিলে কেউ তোমাকে

দোষ দেবে না, কেউ কিছু বলবে না। সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে কবে, পরের ছেলে মানুষ করার আর বয়স নেই।'

কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত একটা বস্তু আছে--অন্তর। অত্যন্ত অবুঝ, অত্যন্ত যুক্তিবধির। সে চুপি চুপি বলে, 'মেয়েটা সারাজীবন মন গুমরে-গুমরে গেল, দুঃখই পেল জীবনভোর। যেখানে যেখানে তার সান্ত্বনা থাকতে পারত—একটু শান্তি—সে সব পথ তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েছিলে। তার একটা ছেলেও যদি মানুষ হয় তবু পরলোকে গিয়েও সে শান্তি পাবে একটু। এটুকু থেকে তাকে আর বঞ্চিত ক'রো না।'

আরও গভীরে—মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কোথায় চির-অমর, চির-অপরাজেয় আশা বাস করে, সে কানে কানে বলে, হয়ত এই সর্বশেষ পর্বে, জীবনের এই পশ্চিম দিগন্তে এসে বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন। হয়ত এতদিনের বিরূপতা ঘুচেছে এবার। সেই জন্যেই এখানে এনে ফেলেছেন। সমস্ত পরিচিত লোক থেকে দূরে, ওদের আত্মীয়-স্বজনের আওতার বাইরে—নিজের কাছে রেখে নিজের মতো ক'রে মানুষ করতে পারলে হয়ত মানুষ হতে পারে—এতকালের সাধ পূর্ণ হতে পারে। মৃত্যুকালে মুখে জল দেবার মতো লোক, সত্যিকারের আপনার লোক।

যুক্তি বাধা দিতে আসে বৈকি! কিন্তু যে শুনতে চায় না—তাকে কে শোনাবে!···

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর—আবারও ঝিয়ের আহ্বানেই সম্বিৎ ফেরে, 'মা, ভেবে আর কি করবেন! জগতের নেয়মই এই। যাদের ভরা সংসার তাদেরই ভগবান আগে টেনে নেন। আর এই যমের অরুচি আমরা পড়ে থাকি—আমাদের যমেও পোঁছে না।··· তা মা—এবার একটু উঠুন। রাত দশটা বাজে। এর চেয়ে বেশী রাত ক'রে খেলে আপনার অসুখ করবে যে। যতক্ষণ শরীরটা আছে ততক্ষণ তাকে দেখতে হবে তো!'

'হ্যাঁ, এই যে উঠি বদ্যিনাথের মা। যাচ্ছি, তুমি জায়গা করো

তারপর দৃঢ়হস্তে কলম ধরে পরিষ্কার স্পষ্ট হরফে সংক্ষিপ্ত চিঠি শেষ করে।

'তোমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে, যদি মনে করো—তো আমার কাছে রাখিয়া যাইতে পারো—তবে নিঃশর্তে। বাকী দু'জনের ভার লইতে আমি অপারগ। আমার অনেক বয়স হইয়াছে, বোধ করি তাহা তোমার স্মরণ নাই। তোমার এখনও বিবাহের বয়স পার হয় নাই, গরিবের ঘরের একটি মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করো,—সে-ই ছেলেমেয়েদের দেখিতে পারিবে। ইতি—'

॥ ৩১ ॥

চিঠি পাবার পর আর একদিনও দেরি করে নি নিমাইচরণ। যা মানুষ—মেজাজ ঘুরে যেতে কতক্ষণ? কালই হয়ত বলবে—'নেহি মাংতা! এনো না।'··· সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে যে অর্ধেক ত্যাগ করতে হয়—যথা-লাভই শ্রেয়, এটা সংসারেরই শিক্ষা, লেখাপড়া না শিখলেও এটুকু জানতে অসুবিধে নেই। নিমাইচরণও তা জানে, সে আর কাল-বিলম্ব না ক'রে বড় দু'টোকে তাদের মাসির বাড়িতে রেখে ছোটটাকে নিয়ে কাশী রওনা হয়ে গেল। চলেই তো গিছল বিষয়টা—গিছল কেন, গেছেই ধরে রাখা ভাল—আবার যদি এই ক্ষীণসূত্রটুকু ধরে কিছুটা আসে, সে-ই মহালাভ। এ ব্যাপারে দেরি করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়।

এখানে এসেও কিছুটা শোকার্ত (শোকটা যথার্থ—সেটা হেমন্ত বুঝতে পারে), কিছুটা অনুতপ্ত, এই ভাব নিয়ে মাথা হেঁট ক'রে বিষণ্ণ বদনে দু'টো দিন থেকে, যাওয়ার সময় অনেক ইতস্ততঃ, অনেক ভণিতা ক'রে মাথাটা চুলকে আবার একবার কথাটা পাড়তে যায়।

'যদি দয়া করো, ঘাট করো—ও দু'টোকেও তোমার চরণে ফেলে দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চেন্ত হই। বড় সাধ ছিল তার—ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে, কেবলই বলত—চলো, মার

পায়ে গিয়ে একবার পড়ি, নইলে এ সাধ আমার অপুন্নই থেকে যাবে। ও হো হো! ওঃ!'

কঠিন কাটা-কাটা উত্তর আসে ওদিক থেকে, 'হ্যাঁ, তোমার উপযুক্ত কথাই বটে। আমি আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে মার্কণ্ডর পরমায়ু নিয়ে বসে আছি কিনা—তোমার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে দিয়ে যাব, তোমরা নিশ্চিন্তি হয়ে সুখ করবে! আমার চরণে অত জায়গা নেই বাবা, চরণের অত শখও নেই। কেটে পড়ো দিকি, যে ক'টা দিন আছি এটাকে দেখবার চেষ্টা করব। তাও কতটা পারি, ক'দিন পারি তা জানি না। একেবারে নিশ্চিন্তি থেকো না বুড়ো-মড়ার ওপর সব দায় চাপিয়ে, মধ্যে মধ্যে খবর নিয়ো।'

আর কিছু বলবার ভরসা হয় নি, কেটেই পড়েছিল নিমাইচরণ।··· সে বেচারী সত্যিই অসুবিধায় পড়েছে, এমন যে হবে একবারও ভাবে নি। এরকম অবস্থায় দিদিমারাই এগিয়ে এসে নিয়ে যায়—তার কপালে সব উল্‌টো, তাঁরা একটা চিঠিতে শোক প্রকাশ ছাড়া কিছু করতে পারেন নি। গিয়ে ফেলে দিয়ে এলে কি হবে বলা যায় না অবশ্য, আর, যা-ই হোক—তাই দিয়ে আসতে হবে আপাতত। মাসে মাসে খরচ দিলে হয়ত এটুকু ভার নেবেন। গোপালের মাসির যা অবস্থা, একখানা ঘরে থাকে ভায়রাভাই সপরিবারে—তাকে বলাও যায় না কিছু।···দেশে পাঠাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। তার চেয়ে গলা টিপে মেরে ফেলাই ভাল।

বিয়েই করতে হবে আবার—কিন্তু সে তো সময়সাপেক্ষ!···

আবার শুরু হয়ে যায় সেই বহু পরিচিত কাজের পুনরাবৃত্তি। ছেলে মানুষ করা।

কিন্তু এ খাটুনী গায়ে লাগে না, বরং যেন মনে হয় হেমন্তর দেহ থেকে অন্তত কুড়ি বছর বয়সের ভার খসে পড়ে গেছে, নতুন ক'রে প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছে সে। নতুন উৎসাহ আর আশা পেলে মানুষের কর্মক্ষমতা যেমন বেড়ে যায়, তেমনিই বেড়ে গেছে হেমন্তরও।

তার পরিশ্রম করার শক্তি দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। বাড়ি-ওলার মা বলেন, 'তোমার এই দৌড়-ঝাঁপটা এতদিন কোথায় ছিল দিদি? মনে হত তো যে আর কিছুই করার ক্ষমতা নেই তোমার, ইচ্ছেও নেই—সংসারেই বিতৃষ্ণা। আবার এ নতুন জোয়ার এল কি ক'রে?' হেসেই বলেন ভদ্রমহিলা, তামাশা ক'রে।

হেমন্তও হেসেই নাতিকে দেখিয়ে দেয়—'এই যে, বাবা বিশ্বনাথ নতুন চাঁদ পাঠিয়ে দিলেন, পুরনো মজে-যাওয়া নদীতে জোয়ার আনবার জন্যে।'

ছেলেটা খুবই ফুটফুটে দেখতে—আরও উৎসাহ সেই জন্যে—মনে হয় সত্যিই চাঁদ নেমে এসেছে। মায়ের মতোই মুখ-চোখ পেয়েছে, হেমন্তর মনে হয় বরং আরও ভাল, আরও সাকারা, কাটা-কাটা চোখ-মুখ। রঙও একেবারে দুধে-আলতা। নিমাইয়ের ছেলে মনেই হয় না। ওরা কি একটা সুবীর না সুজিৎ নাম রেখেছিল—মণিকার পছন্দমতো, হালফ্যাশানের নাম, সে নাম পাল্‌টে দিয়েছে হেমন্ত, নতুন নামকরণ করেছে বিশ্বনাথ। বলে, 'বাবা বিশ্বনাথই আমার ওপর দয়া ক'রে এসেছেন এইবার।' বিশ্বনাথ পোশাকী নাম—বিশুই বলে সবাই, হেমন্ত মাঝে মাঝে চাঁদা বা চাঁদু বলেও ডাকে। তর্কচূড়ামণির মায়ের জোয়ারের উপমাটা ওর খুব ভাল লেগেছে। তারকই বলেছিল একবার—অনেক দিন আগে, হেমন্ত জানত না—যে চাঁদের টানেই সমুদ্রে জোয়ার আসে, আর সাগরের জল ফুলে ওঠে বলেই গঙ্গায় কি অন্য নদীতে জোয়ার লাগে। সাগর থেকে কিছু দূরে গেলে আর জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায় না।...অনেক দিনের কথা বলেই মনে আছে।

ছেলে মানুষ করার তোড়জোড়ের কোন ত্রুটি ঘটে না। একটা হিন্দুস্থানী ঝিও রাখে বাসন-মাজা ঘর-মোছা এই সব, তা ছাড়া বাজার-হাট বাইরের কাজের জন্যেও—বদ্যিনাথের মাকে সম্পূর্ণই ঘরকন্না দেখতে হয়—রান্নাবান্না তো বটেই। ছেলের 'কন্না'ও অনেক। হেমন্তই করে, তবে সব পেরে ওঠে না একা।

ঘড়ি ধরে খাওয়া নাওয়া অন্যান্য পরিচর্যা কোনটারই কোন ত্রুটি হতে দেয় না। বছরখানেক পরে পড়াশুনোর প্রশ্নও ওঠে। অনেক খুঁজে একটি মেয়ে বার করে। অল্পবয়সী বিধবা, বাংলা লেখাপড়া জানে। সে-ই এসে পড়ায়। এটুকু হেমন্তই পারত, ভালই পারত, কিন্তু তার আর অত ধৈর্য থাকে না। তাছাড়া—যা মনে হচ্ছে ছেলেটার মাথা তত সাফ নয়—এখন থেকেই বকতে হয় অনেক বেশী। এখানে চিন্তামণির বাংলা ইস্কুলে দেওয়ার কথা বলেছে অনেকে—পাঠশালাতেও দিতে বলেছে কেউ কেউ—কিন্তু এইটুকু ছেলেকে সে কোথাও পাঠাবে না।

এর মধ্যে নিমাই বিয়ে করেছে একটি, ছ' মাস না যেতেই। অবশ্য নাকি না ক'রে উপায়ও ছিল না, নিমাই লিখেছে। ছেলেমেয়েকে দিদিমার কাছে রেখে দিয়ে সে মাসে মাসে কুড়ি টাকা ক'রে পাঠাত, সে টাকা তাঁদের সংসারেই চলে যায়—ছেলেমেয়েরা এক ফোঁটা দুধ খেতে পায় না, দু'বেলা শুধু দু'টো ভাত আর এক গাল ক'রে মুড়ি—এছাড়া কোন খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, ছেলেমেয়ে দু'টো তিনমাসেই আধখানা হয়ে গেছে।

নতুন বৌকে নিয়ে বিয়ের পর নিমাই কাশীতে এসেছিল একবার। বৌ দেখাতে আসাটাই আপাত-কারণ—আসল কারণ হেমন্ত জানে—ছেলেকে দেখতে আসা। অর্থাৎ ছেলে কি হালে মানুষ হচ্ছে। দেখে যেন একটু দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই পড়ল নিমাইয়ের। এই রাজার হালের সঙ্গে নিজের এবং বড় দু'টো ছেলেমেয়ের জীবনযাত্রার মান তুলনা ক'রে। বললে অনেকেই শিউরে উঠবে—কিন্তু হেমন্তর মনে হল ছোট ছেলের 'হাল' দেখে সে একটু ঈর্ষিতই। হয়ত অনুতপ্তও—মৌখিক অনুতাপ তো অনেক বারই প্রকাশ করেছে, যথার্থ অনুতপ্ত—তখন ঐ হঠকারিতাটা প্রকাশ করার জন্যে।

এ বৌটিও ভাল দেখতে। 'ছোঁড়ার কপালটাই ভাল' মনে মনে বলে হেমন্ত। মণিকার মতো অত চটক নেই হয়ত—তবে মণিকার

ছবিটা এখনও চোখের সামনে না থাকলে আশাকেও সুন্দরী বলতে বাধত না। রঙ্ ফর্সা, খুবই ফর্সা, চোখও বড় বড়—এক ঢাল চুল—কেবল থাইমুখটা যা একটু বড়। তবে তেমন ত্রুটি মণিকারও বিস্তর ছিল। হেমন্ত ঠিক বুঝতে পারে না—মণিকার কি যেন বেশী ছিল, এর সেটা নেই। কি নেই তা ধরতে পারে না ঠিক। চটকটাই নেই হয়ত। পুরুষের বুকে অকারণ দোলা-লাগানোর মতো শক্তি।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সাতক্ষীরের ওদিকে বাড়ি। লেখাপড়া বিশেষ জানে না, বাংলা একটু পড়তে পারে এই পর্যন্ত, চিঠিও দু' লাইন লিখতে পারে—হাতের লেখা মন্দ নয়। তবে যত কমই বিদ্যে হোক, নিমাইয়ের কাছে সিংহবাহিনী। একখানা চিঠি দেখল, বরের মতো অত বানান ভুল তার হয় না।

ঠাণ্ডা স্বভাবের স্বল্পভাষিণী মেয়ে। ছেলেমেয়ে দু'টোকেও যত্ন করে। অন্তত এখানে যা চার-পাঁচ দিন দেখল। লোকদেখানো আতিশয্য নেই, তবে নজরটা আছে ঠিক, পরিচর্যার কোন ত্রুটি হয় না। যাবার আগের দিন আশা ওর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আমি থেকে যাই না মা, আপনার কাছে, অন্তত আরও ক'টা দিন? উনি না হয় যান, ওঁর আপিসের যদি ক্ষেতি হয়—?'

জোর আলো নেই ঘরে, তবু হেমন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করে, আশা নিজে থেকে বলছে, না কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। কেউ আর কে—নিমাই। কিন্তু খানিকটা ভাল ক'রে দেখে মনে হল যে, শেখানোর মতো নয়, এমনিই বলছে, হয়ত সাধারণ সৌজন্য হিসেবেই।

সে একটু যেন শিউরে উঠল, আশার মাথায় হাত রেখে বলল, 'না মা। ওকথা আর মুখে এনো না। এ নিয়ে অনেক কাণ্ড অনেক অশান্তি হয়ে গেছে। হয়ত—হয়ত এ হলে তোমার দিদি এত তাড়াতাড়ি মরত না, আমার কাছে থাকলে। অবশ্য নিয়তি ঘনিয়ে এলে যাবেই, আমি যা ভাবছি আমার এটা অহঙ্কারের কথাই

—তবু কথাটা ভুলতেও পারি না। তুমি মা স্বামীর ঘর করো মনের সুখে, তোমার নিজেরও যেটের দু-একটা হবে, নিজে সুখী হও, ওদের সুখী করো—এই আশীর্বাদ করি। আমার সংস্পর্শে না থাকাই ভাল।'

কথাটা তোলে নিমাইও, যাওয়ার দিন সকালে কতকটা যেন মরীয়া হয়েই বলে, 'বলছিলুম কি, যে ও যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, সবই তো করছ—তা ও দু'টোকেও অমনি এই সঙ্গে রেখে যাই না— ?'

'কেন আমার আময়দা পয়সা আর নিকড়ে গতর পেয়েছ? অক্ষয় পরমায়ু ?···ঢের হয়েছে, তোমার ঝাড় আর গুচ্ছের এখানে ঢোকাতে চাইনে, শখ মিটে গেছে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'চিরকাল বুদ্ধির দোষেই লাথি-ঝ্যাটা খেয়ে গেলে। নতুন বৌ এসেছে ঐ মেয়েটা, ওর সামনে আর বাপগুষ্টি তুলতে চাইনে—কিন্তু মানুষের ঘরে জন্মালে আর একটু অন্তত বুদ্ধি থাকত। ওদের রেখে যেতে চাইছ, আমি তো মরার বয়েস পার হয়ে এসেছি কবে—জাঁকড়ে আছি বলতে গেলে, আর দু' বছর কি তিন বছর বড় জোর—এখন ওদের রেখে গেলে তোমার বৌও ওদের আপন ভাবতে শিখবে না, ওরাও তোমার বৌকে মা বলে চিনবে না। তখন হঠাৎ গিয়ে পড়লে আশাও বিষ-চোখে দেখবে—এরাও পর হয়ে থাকবে। ঐ একটাকে পুষছি, তাই হয়ত অন্যায় হচ্ছে। এর পর আমার কিছু হলে তোমাদের সংসারে গিয়ে খাপ খাওয়াতে পারবে না।'

আর কিছু বলতে পারে নি নিমাই। রাগের কথা বা অভিমানের কথা নয় এসব—নিতান্তই যুক্তির কথা।

আশা যাওয়ার সময় বার বার বলে যায়—'একবার আপনি আমাদের ওখানে চলুন মা, নিদেন দু'টো দিনের জন্যেও। একখানা ঘরে বাস ঠিকই—তবু আপনার কোন অসুবিধা হতে দোব না। একবার চলুন—দয়া ক'রে, দু'টো দিন সেবা করি, নইলে বুঝব আমাকে আপনি মেয়ের মতো নেন নি।'

হাসে হেমন্ত, বলে, 'তোর বাবা উকিল ছিল বুঝি! খুব তো কথা শিখেছিস!'...তারপর বলে, 'বলতে পারি না মা, ভগবান কাকে দিয়ে কখন কি করান, হয়ত বাধ্য হয়েই যেতে হবে একদিন—তবে কলকাতাতে যাওয়ার আর আমার ইচ্ছে নেই মা। তাছাড়া কি জানো, চিরকাল স্বাধীনভাবে থেকে এসেছি, সেই শ্বশুর বাড়ির ক'টা বছর ছাড়া—তা সেও তো ধরো নিজের বাড়িই, আপনার জন সবাই —কখনও পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে এক কল-পাইখানা সরি নি। ও আর পেরে উঠব না। তাছাড়া বয়েস হয়েছে, একটু আচার-বিচারও মেনে চলি—তোমাদের ঐ একখানা ঘরে গিয়ে শুধু শুধু অশান্তি বাড়ানো।...তুমিই বরং এসো, ছেলেপুলে হলে, শরীর যদি খারাপ মনে হয়—এখানে এসে দু-একমাস থেকে যেয়ো। নিমে খরচ করতে না পারে—আমি গাড়িভাড়া যাতায়াতের টাকা পাঠিয়ে দোব। কিছু মনে করো না মা, লক্ষ্মীটি!'

ম্লানমুখে চলে যায় আশা। কে জানে কেন, তার এই চার-পাঁচ দিনেই বৃদ্ধার ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে। এমন কি, ওঁর এই অতিরিক্ত স্পষ্ট ভাষণও ভাল লেগেছে তার। নিমাই কেন যে পছন্দ করে না তা বুঝতে পারে না।

অবশ্য নিমাই কতকটা নিশ্চিন্তই থাকে। মনে হচ্ছে ভাগ্য তাকে খানিকটা ভয় দেখিয়ে—কিছুটা শাসন ক'রেই আবার তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। গুরুজনরা যেমন ছোটদের কোন অন্যায় দেখলে বলেন, 'যা, আজ তোর খাওয়া বন্ধ,' কি, 'বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিলুম!' কিন্তু তারপর নিজেই আবার কোমল হয়ে বলেন, 'আচ্ছা যা, এবারের মতো মাপ করলুম, আর কখনও করিস নি।' অদৃষ্টও বোধহয় তার সঙ্গে সেই রকমই কতকটা করল। ভয়টা অবশ্য সাংঘাতিক দেখিয়েছিল, তবু বিষয়টা যে আবার তার লাইনেই চলে আসছে—এটা তো নিশ্চিত। হয়ত একা ওকেই দিয়ে যাবে —বিশুকে—তা দিক, বুড়ি আর ক'দিন? তখনও বিশু নাবালক থাকবে নিশ্চয়, আর বাবা ছাড়া নাবালকের গার্জেনই বা কে হবে!

হাতে পেলে—নিজের সুবিধেমতো ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবে নিশ্চয়ই। ও ছেলেমেয়ে দু'টোর আখের তো বটেই, আরও যারা আসছে তাদেরটাও গুছিয়ে দিতে পারবে।

ভাবতে ভাবতে এত খুশী হয়ে ওঠে নিমাই—যত ভাবে ততই ভবিষ্যৎটাকে উজ্জ্বলতর মনে হয়—যে, নিজের মনের মধ্যে কথাটা আর চেপে রাখতে পারে না, কথায় কথায় আশাকেও বলে ফেলে।

আশা বলে, 'তুমি কি গো, তাঁর মরণ টাঁকছ বসে বসে—?'

অপ্রতিভ নিমাই বলে, 'বাঃ, মরণ টাঁকছি কৈ? বলছি মরবেই তো—এতখানি বয়েস হল। এ বয়স অব্দিই বা ক'টা লোক বাঁচে! মরার পরের কথা বলছি—আমি কি আর মরতে বলছি তাড়াতাড়ি!'

তবু তো আর একটা কথা আশাকে বলে না, ইদানীং যে কথাটা প্রায়ই তার মনে হয়। মণিকা মরে তার এই সুবিধাটা ক'রে দিয়ে গেল—এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নইলে বুড়ি এটুকুও নরম হত না। লোকে যে বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে, তার ক্ষেত্রে অন্তত কথাটা ফলে গেল।

তবে প্রতি সোনালী স্বপ্নের পিছনেই নাকি একটা আসন্ন বিপদের কালো ছায়া উঁকি মারে—নিমাইচরণেরও ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে একটি বিঘ্ন দেখা দিল। গলায়-বেঁধা কাঁটার মতো, খেতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু খচ্‌খচানিতে অস্বস্তি হতে থাকে।

বিশু কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হবার বছর-দুই পরেই এই ব্যাঘাত এসে জুটল—দুশ্চিন্তার এই কাঁটা ও তজ্জনিত একটা খচ্‌খচানি। বছরে একবার ক'রে আসে নিমাই, কোনমতে আসার গাড়িভাড়া যোগাড় ক'রে—অবস্থা বুঝে ফেরার গাড়ি-ভাড়াটা হেমন্তই দিয়ে দেয় আশার হাতে—সেবার এমনিই এক নিশ্চিন্ত সুখযাত্রায় এসে—সুখযাত্রা তো বটেই, অঢেল মাছ আর অঢেল মিষ্টি, দই, রাবড়ি, রামনগরের বেগুন, কাশীর বিখ্যাত কপি, এক বছর ধরে স্বপ্ন দেখার মতোই খাওয়া-

দাওয়া—দেখল একটি কে হিন্দুস্থানী ছেলে বিশুর সঙ্গে পড়ছে এবং প্রায় ওর মতোই সুখে ও আদরে এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে! 'মতো,' এইজন্যে যে, রাতটা এখানে থাকে না, মায়ের সঙ্গে ঘরে যায়, কিন্তু সে ঐ রাতটুকুই, ভোর না হতে হতেই এখানে এসে হাজির হয়—দিনভর এখানেই থাকে, এখানেই খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনো সব কিছু। পোশাক-আশাকের অবস্থা দেখেও মনে হয়, সে হেমন্তরই প্রতিপাল্য বা পোষ্যভুক্ত হয়ে গেছে।

বিশুরই বয়িসী হবে ছেলেটা, কি সামান্য দু-চার মাসের ছোট। দেখতে-শুনতে মন্দ নয়—বিশুর পাশে দাঁড়াবার মতো নয় অবশ্যই, তবে একেবারে কালো ভূতও নয়। মুখ-চোখ ভালো, মাজা-মাজা রঙ, স্বাস্থ্যটিও চমৎকার, গোলগাল।

পরিচয় নিয়ে জানা গেল হেমন্তর হিন্দুস্থানী ঝি মুনিয়ার ছেলে ও। ছেলেটার নাম ভোলা। হেমন্তই নাম রেখেছে নাকি ভোলানাথ, ওর মার রাখা নাম সরযূপ্রসাদ—ডাকত সূরজু বলে। ও এখানে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (ক্রুদ্ধ নিমাই-এর ভাষায় 'গেড়ে বসা') উপলক্ষটা শোনা গেল বদ্যিনাথের মার মুখে। ছেলেটা প্রতিদিনই মায়ের সঙ্গে আসে এখানে, মা কাজ-কর্ম করে, ও চুপ ক'রে বসে আপন মনে এটা-ওটা বিশুর পরিত্যক্ত জিনিস নিয়ে খেলা করে। কখনও বা, বিশুর সময় থাকলে, কাঠের ব্যাট আর বল নিয়ে তার সঙ্গে ব্যাট-বল খেলা করে। আসল কথা খাওয়া—এখানে এলেই বদ্যিনাথের মা দু'খানা-একখানা রুটি কি অন্য কোন খাবার থাকলে দিয়ে দেয়—বসে বসে একঘণ্টা ধরে একটু একটু ক'রে খায়, তাতেই অনেকটা সময় কেটে যায়, কাজ-কর্মের অবসর পায় মুনিয়া। সকালের জলখাবারটা নিশ্চিত এবং দুপুরের খাওয়াটাও প্রায়-দিনই এখানে সারা হয়ে যায়, সেই লোভেই মুনিয়া এখানে নিয়ে আসে। নইলে মুনিয়ার মাসী আছে পাশেই, স্বচ্ছন্দে সেখানে রেখে আসতে পারে।

আরও পরিচয় পাওয়া গেল, মুনিয়ার স্বামীর ঔরসজাত ছেলে

এ নয়—(এটা বদ্যিনাথের মা চোখ-টিপে ফিসফিস ক'রে জানায়) মুনিয়ার মরদ আজ আট বছর নিরুদ্দেশ! মুনিয়া এক বাঙালীবাবুর বাড়ি কাজ করত, ব্রাহ্মণ, ইঞ্জিনীয়ার না কি—সেইখানেই গর্ভবতী হয় মুনিয়া। এ নিয়ে গোলমাল করা বা চেঁচামেচি করার কথা ওরা ভাবতেও পারে না, দোষটা বরং নিজেদেরই ভেবে চোর হয়ে থাকে। বাবুর স্ত্রী ব্যাপারটা বোঝামাত্র ঝাড়ু মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য সে বাবু নাকি মধ্যে মধ্যে টাকাটা সিকেটা দেয়—পথে-ঘাটে দেখা হলে।

তবে এ পরিচয় জানা সত্ত্বেও কিছু আটকায় নি—এখানে, এ বাড়ির ছেলের মতো মানুষ হতে থাকায়।

ঘটনাটা সামান্য। যেমন একা বসে খায় তেমনিই খাচ্ছে, উঠোনের মাথার ওপরে জাল দেওয়া আছে বলে বানরের উপদ্রব নেই। নিশ্চিন্ত হয়েই বসে খাওয়া চলে। সেদিন কে বোধহয় ছাদের দরজা খুলে রেখে এসেছিল, কিংবা পাশের বাড়ি—অর্থাৎ বাড়িওলার বাড়ি দিয়েই এসেছে। এক বিরাট গোদা বানর এসে উপস্থিত, লক্ষ্যটা সামনেই ভোলার হাতে ধরা ছু'খানা রুটি। ঠিক সেই সময়টায় হেমন্ত পুজো সেরে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, ছেলেটা বানর দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে 'মায়ী গে'—বলে এসে ছু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে—হেমন্তকে। সেখানে মুনিয়াও ছিল, কলতলায় বসে বাসন মাজছিল, তার কাছে না গিয়ে হেমন্তকে এসে জড়িয়ে ধরল, এবং 'মা' বলে—সে-ই ওর সৌভাগ্যের সূত্রপাত। বদ্যিনাথের মায়ের মতে, ওর সুগ্রহই ওকে দিয়ে এটা করিয়েছে। 'ওর ললাটের লেখন, সুখভোগ আছে অদেষ্টে, ঝিয়ের ঘরে জন্মালে কি হবে, বেজন্মা হলেই বা কি হবে—বিধেতা-পুরুষ হাত ধরে এখানে এনে ফেলেছে, বিধেতা-পুরুষই ঐ বাক্যি বলিয়েছে ওকে দিয়ে—কাউর কিছু করবার নেই তো!'

এসব কথা বিশ্বাস করে না নিমাই। দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলে, 'বিধেতা-পুরুষ না ছাই, ঐ হারামজাদী মাগীই শিখিয়ে দিয়েছে।

নইলে নিজের মা থাকতে আর একটা ভিনজাতের বুড়িকে কেউ মা বলে ?'

তবে বঙ্কিনাথের মায়ের কাছে যা-ই বলুক, হেমন্তকে সোজাসুজি কিছু বলতে সাহস হয় না। আবার একেবারে চুপ ক'রে থাকতেও পারে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে বলে।

'যতই হোক, ছোটলোকের ছেলে তো, ঝিয়ের ছেলে—তায় খোট্টা—এতটা নাই দেওয়া বোধহয় ভাল হচ্ছে না।' তারপরই সামলে নিয়ে বলে, 'অবিশ্যি তোমাকে বলতে যাওয়া ব্রেথা, তুমি আমাদের থেকে ঢের বেশী বোঝ এসব—তবু—'

হেমন্তর মুখ সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হয়ে ওঠে, বলে, 'ছোট-লোকের ছেলে বলছ কাকে ? তোমাদের গুষ্টির মতো ছোটলোক ভূ-ভারতে কোথাও আছে নাকি ? তোমার ছেলেকে যদি মানুষ করতে পারি—মানুষ নয়, মানুষ হবে না তা জানি—বড় করা, এ যদি পারি, ওকে মানুষ করার চেষ্টা করব—এ আর বেশী কথা কি ?'

তারপর, নিমাইয়ের মুখের উপর কঠিন ভ্রূকুটি-বদ্ধ দৃষ্টি স্থির রেখে বলে, 'তবে যদি মনে করো—এখানে ওর সংস্পর্শে থাকলে তোমার ছেলের ক্ষতি হবে—স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো, পোশাক-আশাকসুদ্ধ সব গুছিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। তাই বলে, তুমি কি ভাববে—তোমার ছেলের ভাগে কতটা কম পড়বে বলে তোমার কি দুশ্চিন্তা হবে—বলে, যাকে ভেবে বুঝে আশ্রয় দিয়েছি তাকে ত্যাগ করতে পারব না, কোন দোষ না দেখে।'

এর পর পালিয়ে আসা ছাড়া পথ থাকে না।

পথে আসতে আসতে আশা তিরস্কার করে—'কেন তুমি ওসব কথা তুলতে গেলে ? বুড়ির এখনও যা বুদ্ধি, আমাদের এক হাটে বেচে আর এক হাট থেকে কিনতে পারে। ওকে জ্ঞান দিতে যাও তুমি ! দিলেও নেবে কে ?'

তারপর বলে, 'ভোলা ছেলেটা কিন্তু ভাল। হাজার হোক

বাঙালী ভদ্দরলোকের জন্মিত তো, এরই মধ্যে বেশ সভ্য-ভব্য হয়ে উঠেছে, না ?'

নিমাই ধমক দিয়ে ওঠে, 'ছাই হয়েছে, তুমি আমার যা হয়েছ না —প্যাজ পয়জার গুনগার। কাঠ বোকা। তোমার সঙ্গে যে দু'টো পরামর্শ করব সে জো-ও নেই।'

আশা ম্লানমুখে চুপ ক'রে যায়। সে ভাল মানুষ। দ্বিতীয় পক্ষের দর্প ও তেজ প্রকাশ করতে তো পারেই না, মণিকার যে জোর ছিল সেটুকুও দেখাতে পারে না। এমন কি দোজবরের বিশেষ আদরটাও ভোগ করা হয়ে ওঠে না, কী হাত শুনতে হয় যে, মণিকা ঢের বেশী রূপসী ছিল, লেখাপড়া জানত, গান জানত। বড়লোকের ঘরে গেলেও মানিয়ে নিতে পারত।

শোনে আর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে আশা।

তাদের অবস্থা খারাপ, এই পাত্র পাওয়াই দুরাশা ছিল। ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে—এই জেনে-বুঝেই সে এসেছে। দুঃখ করা ছাড়া অন্য উপায় কি ?

জোর করা কি ঝগড়া করার সাহস তার নেই।

॥ ৩২ ॥

ভাগ্যবানের বৌ মরে—সেটা কিছু মর্মান্তিকভাবেই নিমাইয়ের জীবনে সত্য হয়ে যায়।

মণিকা নিজে মরে জ্যাঠাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলনের সেতু রচনা ক'রে তার যে কত উপকার ক'রে দিয়ে গেছে, সেটা ক্রমশঃ আরও বেশী ক'রে বোঝে নিমাই।

যুদ্ধ বেধেছে অনেক দিনই—কিন্তু সে যুদ্ধের ঢেউ এখানে এমনভাবে এসে লাগবে, এখানের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত ক'রে দেবে—তা ভাবে নি কেউ। কোথায় কোন মুলুকে, বিলেতে না আমেরিকায় লড়াই হচ্ছে—তাতে আমাদের কি? নিমাই

রাজনীতি অত বোঝে না, নিজে খবরের কাগজও পড়ে না, যা আপিসে সহকর্মীদের মুখে শোনে তাই পথে-ঘাটে বা ঘরে বৌয়ের কাছে এসে সাড়ম্বরে, কিছু বা রঙ চড়িয়ে বলে নিজের প্রজ্ঞা প্রকাশ করে। তাদেরই সমীক্ষা নিজের বলে চালিয়ে দেয়, মনকে প্রবোধ দেয়—তাতে দোষই বা কি—যদি কিছুটা নিজের লেখাপড়ার ও বুদ্ধির অভাব ঢাকা পড়ে ?

আপিসে শুনেছিল ইংরেজ আর ক'দিন, ছাখো না—জার্মানী সাত দিনের মধ্যে দেবে ঠাণ্ডা ক'রে, খাস বিলেতটাই দখল ক'রে নেবে। তারপর ইংরেজ বাছাধনরা যাবেন কোথায় ? এদেশে থেকেও পাত্তাড়ি গুটোতে হবে না ? আরে, নিজেদের দেশই যদি যায়, এদেশ রাখবে কি ক'রে ? জার্মানরা তো আমাদের বন্ধু, খুব ভক্তি করে, আমাদের শাস্ত্র রামায়ণ মহাভারত কালিদাস সব ওদের মুখস্থ, মোক্ষমূলর সংস্কৃত জেনেই তো অত বড় পণ্ডিত হয়েছিল। ওরা আমাদের অধীন রাখবে না এটা ঠিক—এদেশে এসে আমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে—সুভাষ বোস হবে প্রেসিডেন্ট। কিংবা গান্ধী প্রেসিডেন্ট, সুভাষ বোস প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে যে বিরাট লড়াই হয়ে গেছে—নিমাই তখন ছেলেমানুষ, তবু সেকথা মনে আছে। কাপড়ের খুব দর হয়েছিল—বিলেত থেকে কাপড় আসত না বলে, নুনেরও খুব অসুবিধা গেছে। অন্য জিনিসপত্রের দামও কিছু কিছু বেড়েছিল, দু-একটা জিনিস পাওয়াই যেত না। তারপর লড়াই থামতে তেমনি হু-হু ক'রে নেমে গেল দর। লোকের কাজ নেই, জিনিস কিনবে কে ? লড়াইয়ের জন্যে অনেক বাড়তি কাজ পাওয়া যাচ্ছিল, সে-সব পাট উঠে গেল। আবার যে-কে সেই। আমেরিকায় না কোথায় একমাসে বুঝি এক-লাখ লোক 'আপ্তঘাতা' হয়েছিল, কাজ না পেয়ে।

সুতরাং খুব ভয়াবহ অবস্থা হবে এমন ভাবে নি কেউ। বরং মুখরোচক আলোচনা করার মতো খোরাক পেয়ে খুশী হয়েছিল। বোমার হিড়িকে সবাই যখন পালায় তখন একটু মুখ শুকিয়ে

গিয়েছিল ঠিকই—তবে নিমাই কোথাও পালায় নি, সে অবস্থা ছিল না। জায়গা ছিল, কাশীতে পাঠানো চলত, কিন্তু টাকা? এত টাকা হাতে জমে নি যে, এতজন দুম ক'রে পাঠিয়ে দেবে। তারপর আপিসে ছুটিও গেল বন্ধ হয়ে, তাদের নাকি 'এসেন্‌সিয়াল সার্ভিস', ছুটি হবে না। তাতে একটু ভয়ে ভয়ে মুখ শুকিয়ে থাকতে হয়েছিল ঠিকই, সন্ধ্যের সময় আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে গা ছমছম করত, রাত্রে ডিউটি পড়লে সন্ধ্যের আগে থাকতে আপিসে গিয়ে বসে থাকত। কিন্তু সে যা-ই হোক, এমনভাবে পেটে টান পড়ে নি। হঠাৎ সেইটেতে হাত পড়তেই চিন্তিত হয়ে উঠল। চাল চড়তে চড়তে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর টাকা মণ হয়ে গেল, যে চাল সে তিনটাকা মণ দরে কিনেছে উনিশ শো উনচল্লিশেও। জ্যাঠাইমা বেশী দামের চাল খেত, পাঁচটাকা সওয়া পাঁচটাকায় চামরমণি চাল আসত, নিজের হাতে সংসার পড়ে তিন সওয়া তিনের ওপর ওঠে নি নিমাই। সত্তর, শুনেছে কোথাও কোথাও আশিতে পর্যন্ত উঠেছে। ওদের বাজারের মালই রইল না—উধাও হয়ে গেল একেবারে। তবু তখনও অন্য জিনিসের দর অত বাড়ে নি—ভাত কাপড় চিনি কেরোসিন তেল—এইতেই প্রথম টান পড়ল। সরকারী কর্মচারীদের জন্যে আগেই রেশনের ব্যবস্থা হল বটে, তবে তা হতে হতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল নিমাই। স্ত্রীর গায়ে সোনারত্তি বলতে কিছু রইল না, এমন কি কমলা হবার পর হেমন্ত যে হার-বালা দিয়েছিল, সেগুলো পর্যন্ত চলে গেল এই হিড়িকে। কাপড়-জামা পোশাক-আশাক বহুকালই কেনা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন তো প্রায় উলঙ্গ অবস্থা সকলকার। রেশনে যেটুকু কাপড় বরাদ্দ হয়েছে তাতে লজ্জা নিবারণ হয় না। এত লাইনেই বা দাঁড়ায় কে? গোপালের পৈতে দেবে বলে গোপনে কিছু সরিয়ে রেখেছিল আশা, তাও ধুয়ে বেরিয়ে গেল বলতে গেলে।

এ অবস্থায়—উপোস ক'রে মরা এবং বেইজ্জৎ হওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাবার আর কোন পথ না দেখে—শেষে কাশীতেই চিঠি লিখল। লিখতে হল। নিজে লিখল না—আশাকে দিয়ে

লেখাল। 'এই অবস্থায় ছেলেমেয়ে লইয়া অনাহারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি—এক্ষণে আপনি যদি কিছু দয়া করেন তবেই এতগুলি প্রাণীর জীবন রক্ষা পায়।'

দয়া করেছিল হেমন্ত। চিঠির উত্তর দেয় নি, তবে চিঠি পাওয়া-মাত্রই আশার নামে মণিঅর্ডার ক'রে একশ' টাকা পাঠিয়েছিল। তারপর থেকে মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ ক'রে পাঠায়। তাতেও হেমন্তর লোকসান নেই, এই মাগ্‌গীগণ্ডা মন্বন্তরের ফলে নিমাইয়ের কাশীতে আসা বন্ধ হয়েছে, ওরা এলে যে খরচটা হত সেইটেই পাঠাচ্ছে সে, মাসে মাসে ভাগ ক'রে। হয়ত হিসেব ধরলে ঠিক এতটা যায় না—তা হোক, ঝঞ্ঝাটটা অনেক কম। তাছাড়া, ঐ বছরে একবার আসাতেই বিশুর মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেটা বেশ বোঝা যায়।

আর তা হতেই পারে। এখানে কতকটা বন্দী হয়ে থাকা, দু'টো বুড়ির মধ্যে, নিচে যে ভাড়াটে সেও বুড়ি। একতলায় অনেক অল্প-বয়সী ছেলেমেয়ে আছে বটে—তবে হেমন্ত তাদের সঙ্গে বেশী মিশতে দেয় না বিশুকে। দেয় না—কারণ এরাই কিছুদিন আগে, এদের ছেলে-মেয়েদের যখন উপযাজক হয়ে দেখাশুনো করতে যেত, রোগে সেবা করা কি পথ্য যোগানোর জন্যে—তখন ওকে ডাইনী বলেছে, ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য ও আয়ু সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, অথচ এখন বিশু আসতে তাদের ছেলে-মেয়েদের আর আগের মতো খাবার ওষুধ কি কাপড় জামা দেবে না—এই অনুমান ক'রে তারাই দস্তুরমতো ঈর্ষিত। কে জানে—শেষ পর্যন্ত যদি ছেলেটার কোন অনিষ্ট করে?

অবশ্য খেলার সাথী একজন বাড়িতেই আছে, ভোলা। প্রায় সমবয়সী। ভোলা এক ক্লাস নিচেয় পড়ে, তার কারণ সে অন্য ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী বয়সে অ-আ-ক-খ থেকে পড়তে শুরু করেছে। তাতে খেলুড়ে কি বন্ধু হতে আটকায় না। কিন্তু কে জানে কেন—বিশু ভোলাকে কেমন যেন বিদ্বেষের চোখে দেখে, ভাল ক'রে মিশতে চায় না, বন্ধুর মতো তো নয়ই। বরং—ওদের যে সাংসারিক পদমর্যাদা সমান নয়, ভোলা ঝিয়ের ছেলে, বিশুর চাকর হওয়ারই

কথা তার, বড়জোর ওর ব্যক্তিগত ভৃত্যের পদবী দাবী করতে পারে—এই ইঙ্গিতটাই ওর আচারে-আচরণে কথায়-বার্তায় অহরহ প্রকাশ পায়। স্পষ্ট ক'রে তেমন কিছু বলতে পারে না হেমন্তর ভয়ে—তবে শব্দের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বলা ছাড়া, সব রকমেই তা জানিয়ে দেয়।

হয়ত সহজাত ঈর্ষা, স্বভাবটাই ঐ রকম, কিন্তু হেমন্তর বিশ্বাস এর মধ্যে নিমাইয়ের কিছু হাত আছে। সে যে আগে বছরে বছরে আসত পাঁচ-সাতদিনের জন্যে, তার মধ্যেই এই বিষটি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। সেদিক দিয়েও ওদের আসা বন্ধ হওয়াতে হেমন্ত খুশী অনেকটা। সেই জন্যেই—সে আসবার ভাড়া পাঠাতে পারে—এমন আভাস পর্যন্ত দেয় না আশার চিঠিতে।

বিশুকেও সোজাসুজি শাসন করতে পারে না। কেন না—যে অপরাধ প্রত্যক্ষ নয়, তার জন্যে প্রকাশ্য বিচার করা বা শাস্তি দেওয়া যায় না। তা ছাড়া আর সব রকমেই এই অবজ্ঞার মনোভাব বদলের চেষ্টা করে। তবে তাতে যে বিশেষ ফল হয় না—হতাশভাবে সেটাও লক্ষ্য করে। জোর ক'রে পাশাপাশি বসিয়ে খেতে দেয়, একরকমের জামাপোশাক কিনে দেয় পুজোর সময়—ফল হয় বিপরীত, আরও বিরূপ হয়ে ওঠে বিশু।

অবশ্য একটা কাজ করে নি হেমন্ত, মার কাছ থেকে কেড়ে ভোলাকে স্থায়িভাবে এ বাড়িতে এনে তোলে নি। মুনিয়ার তাতে আপত্তি ছিল না, হয়ত ইচ্ছাই ছিল। মুখে বলেওছে বার বার, কিন্তু হেমন্ত তা করতে দেয় নি। স্পষ্টই বলেছে যে, 'যে যা—তাই থাকাই ভাল। অন্তত সে জ্ঞানটা থাকা দরকার। গোড়াটাকে যে ঘেন্না করতে শেখে তার আর ওপরে ওঠা হয় না। তোমার ঘরের ছেলে, কী ভাবে তুমি থাকো, কত কষ্ট ক'রে ওদের মানুষ করেছ—সেটা জানা দরকার। মায়ের ওপর থেকে ভক্তিছেদ্দা না চলে যায়। তাছাড়া মার কাছ থেকে ছেলে কাড়া আমি পছন্দ করি না। নিজের মাকে যে আপন ভাবতে শিখল না, ভালবাসল

না—সে আমাকে আপন ভাববে ?…তাই কথনও হয়!…ওতে ক'রে আত্মসম্মানহীন স্বার্থপর অমানুষ তৈরী হয়। না, তোর জিনিস তোর কাছেই থাক, তোকে, তোর মাসীকে, তোর অন্য ছেলেকে আপন ভাবতে শিখুক, সে যে ওদেরই একজন এইটে যেন মন থেকে না যায়। আমি ওর কেউ নয়—সেই বোধটা জন্মালেই ভাল। কতজনের কাছে কত স্নেহ-ভালবাসা পেলুম—তাই আবার ওর কাছ থেকে আশা করব! হায় রে! নাঃ, এতকাল পরে মরবার বয়স পার হয়ে সে লোভ আর নেই।'

লোভ থাক বা না থাক, আশাতীতই পায় কিছু কিছু। হয়ত লোভ বা আশা নেই বলেই পায়।

ভোলা ছেলেটা যে এদের মতো—ওর শ্বশুরগুষ্ঠির মতো নয়, সেটা মনে মনে ক্রমশ স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রথম সে সম্বন্ধে সচেতন হল হেমন্ত, নিজের একটা অসুখের সময়। সামান্যই অসুখ, সর্দিজ্বর, গায়ে ব্যথা—আগে এরকম জ্বরে উঠে ঘর-সংসারের কাজ সবই করেছে, এমন কি স্নান করতেও আটকায় নি। এখন এতখানি বয়স বলেই কাবু হয়ে পড়েছিল, শয্যাশায়ী ছিল তিন-চারদিন। ভোলা এই ক'টা দিন ওর ঘর ছেড়ে, বিছানার পাশ ছেড়ে কোথাও নড়ে নি। কে ওকে 'বড়মা' বলতে শিখিয়েছিল, 'বড়মা' বলেই ডাকে ভোলা। কেবলই মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে, 'জল খাবে বড়মা? বড়মা, বাতাস করব? এখন কেমন আছ বড়মা, শির-দরদ কমেছে? জলপট্টি লাগাব? পিসিমাকে ডাকব বড়মা, বাহার যাবে?'

আগে হেমন্ত ভেবেছিল মুনিয়াই বুঝি এটা শিখিয়ে দিয়েছে—এই অষ্টপ্রহর মুখের কাছে বসে থাকা—কিন্তু পরে, বদ্রিনাথের মার মুখে শুনল যে, ঘটনাটা কিছু অন্য রকমই—মুনিয়া গোপনে বরং ওকে এজন্যে শাসন করারই চেষ্টা করেছে, 'ইনফ্লু বেমারি হয়েছে মা-জীর, ভারী ছোঁয়াচে রোগ—তুই কেন ওখানে বিছানায় মুখ দিয়ে পড়ে

আছিস ? তোর বুখার হলে কে দেখবে ?'—ইত্যাদি বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ভোলাকে নড়াতে পারে নি কিছুতেই, কোন কথাই শোনে নি সে। বলেছে, 'তোর ঐ বেমারি হলে আমাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতিস ? না আমিই পালাতুম ? বড়মা বুড়ো মানুষ, যদি বুখার খুব বেড়ে যায় ? চেঁচাতে পারবে না, কত তকলীফ হবে বল দিকি ? তুই যা বাড়ি যা, আমি ঠিক আছি।'

বাড়িও যায় নি, ইস্কুলেও না। হেমন্ত নিজেও বকাঝকা করেছে এ জন্যে, 'ওকি রে, ইস্কুল যাবি নি কি রে ? শুধু শুধু ইস্কুল কামাই, পড়ার ক্ষতি করবি ? ··এই তো বঙ্কিনাথের মা আছে, তোর মা আছে —আমাকে ওরা দেখবে এখন। তুই যা—'

ভোলা যায় নি তবুও। বেশী বকাবকি করতে কাঁদতে শুরু করেছে। বঙ্কিনাথের মা বলে, 'ও আর-জন্মে তোমার কে ছেল মা, নইলে তোমারই বা এত টান কেন, আর তোমার না হয় হল,— তোমার মায়াবী শরীর—ওরই বা এতখানি টান এল কোথা থেকে ? কী-ই বা বয়েস, দশ-বারো বছর হবে বড় জোর, এমন কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা হয় নি। তাছাড়া এরকম বয়েসের ছেলে অসুখের কাছে ঘেঁষতে চায় না বড় একটা, আপন মা-বাপের অসুখেই থাকে না— ফাঁক খোঁজে কেবল, কখন বাইরে যাবে—কোন্ ছুতোয়, ইয়ার বক্শী নিয়ে খেলে বেড়াবে।···এ ছেলে একেবারেই দলছাড়া বাপু, যা-ই বলো। এর টানটা আন্তরিক, দেখলেই বোঝা যায়।'

হেমন্তর চোখে জল এসে যায়। সেই সঙ্গে বহুদিনের ভুলে-যাওয়া একটা হৃদয়াবেগে রুগ্ন মস্তিষ্ক কেমন যেন ঝিম-ঝিম ক'রে ওঠে। এই জীবনে কোন আন্তরিক ভালবাসা, সত্যিকারের টান আর পাওয়া সম্ভব, অযাচিত নিঃস্বার্থ ভালবাসা—এ যে বিশ্বাসই হয় না। এমন কোন যত্ন-আদরের আতিশয্য সে দেখায় নি, তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়াবাড়ি করেছে বিশুকে নিয়ে—সে তো দিব্যি খেলে-ধুলে বেড়াচ্ছে, বরং চোখে চোখে রাখার লোক নেই বলে আরও বেশী বেপরোয়া—আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে বলতে গেলে। সে তো

এ ঘরের ত্রিসীমানায় আসে না, 'ঠাকমা কেমন আছে' দিনান্তেও একবার এ প্রশ্ন করে না।

তবে কি—এ সত্যি-সত্যিই পূর্বজন্মের সংস্কার? বদ্যিনাথের মা যা বলছে তাই? গতজন্মে কেউ ছিল ছেলেটা?

যে চিন্তাটা মনে আনতে সাহস হয় না, সেইটেই আপনা থেকে মনে এসে যায়—বাধা দেবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও—তবে কি এতকাল পরে তারকই এল আবার, মধ্যে অন্য একটা জীবন সেরে? ...সে জন্মের কোন দুষ্কৃতির ফলেই নীচ কুলে জন্ম হয়েছে, কিন্তু তার আগের জন্মের সংস্কার ভুলতে পারে নি, অথবা সেই স্নেহের ঋণ, সেবার ঋণ শোধ করতে এসেছে?

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠে যেন, 'ষাট ষাট! এসব কি ভাবতে বসলুম! ওর মার বাছা বেঁচে থাক, আমার ছেলে হয়ে আর কাজ নেই। ও আমার সইবে না সে বেশ জানি। অনেক-বারই তো দেখলুম! ষাট ষাট!...তারকের আর এসে কাজ নেই, সে তো থাকতে আসবে না, আবারও জ্বালিয়ে চলে যাবে।... না, একা আছি এই ভাল। আর কারও টানে জড়াতে চাই না।'

দুর্বল শরীরে মনের চিন্তাটা অর্ধ-স্বগতোক্তি হয়ে বেরিয়ে আসে। বিড়বিড় ক'রে বলে কথাগুলো। তর্কচূড়ামণির স্ত্রী সেই সময়টাতে দেখতে এসেছিলেন, তিনি ভুরু কুঁচকে হেঁট হয়ে কথাগুলো শোনবার চেষ্টা ক'রে বলেন, 'কী বলছেন? ও কাকীমা? কাকে কি বলছেন?' তারপর বেরিয়ে গিয়ে বদ্যিনাথের মাকে বলেন, 'অ খোকার মা (বৈদ্যনাথ তার মামাতো ভাশুরের নাম), ইদিকে এসো না একবার। এ যে পূর্ণ বিকার বলে মনে হচ্ছে, ভুল বকছে যে!'

'সে কি! জ্বর তো ছিল না, কৈ, বেশ জ্ঞান, সহজ মানুষ, এই তো আমি কথা বলে এলুম এক্ষুণি—'

বদ্যিনাথের মা ছুটে আসে।

হেমন্ত হেসে বলে, 'ও কিছু নয়। অ বৌমা, এসো এসো। বসো। বুড়ো মানুষ মা আমরা, মনে মনে কিছু ভাবতে থাকলে

সেটা অনেক সময় আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তোমার শাশুড়িকে ছাখো নি, একা হলেই আপন মনে হাত-পা মুখ নাড়ত, যেন কার সঙ্গে কথা কইছে কি ঝগড়া করছে—? এসব বয়সের দোষ মা। এসো, এসো, বসো এখানে।'

তর্কচূড়ামণির স্ত্রী ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে বসে বলেন, 'তাই বলুন, সর্বরক্ষে। আমি সত্যিই কিন্তু ভয় পেয়ে গিছলুম!'

'না না, ভয় নেই। ভাল আছি আজ। নইলে ভোলাটা আমার বিছানার ধার ছেড়ে নড়েছে! ভাল আছি দেখেই না—'

কেমন একরকম গর্বমেশানো হাসি ফুটে ওঠে হেমন্তর দন্তহীন মুখে।

'তা ঠিক', ভদ্রমহিলাও সায় দেন, 'ও সত্যিই আর-জন্মে আপনার কে ছিল মা। নইলে এ বয়সে এমন টান হয় না।'

আবারও সেই কথা। ষাট ষাট! বিশ্বনাথ ওকে রক্ষে করুন। মা সংকটা রক্ষা করুন।

ভোলার সম্বন্ধে বিশুর বিরূপতা ও বিদ্বেষ কিন্তু বেড়েই যায় ক্রমে ক্রমে। ছোটবেলায় যেটা অত চিন্তার কারণ ছিল না, বড় হতে সেটাই উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে ওঠে। কারণ এখন—অন্য ভাল দিকে না হোক—বুদ্ধি খুলেছে, সে বুদ্ধি বিরূপতা প্রকাশ করার বা আঘাত দেওয়ার সহস্র পথ খুঁজে বার ক'রে দেয়ও। হেমন্তর সামনে অতটা নয়। সামনে নয় বলেই হেমন্ত শাসন করতে পারে না। কারণ সে জানে, বিশু এই সুযোগই খুঁজছে, বলবে—'আমার নামে তোমার কাছে এসে কুট-কুট ক'রে লাগায়, কী রকম শয়তান এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।' তবে চোখ এবং কান খোলা থাকায় হেমন্তর কিছুই বুঝতে বাকী থাকে না। সে চিন্তিত হয়ে ওঠে—অথচ উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না।

বিদ্বেষের কারণ অনেক।

এখন যেটা প্রবল হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে—বিশুর লেখাপড়া হয়

না, ভোলার হয়। ভোলা যে প্রতিবারেই ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয় ক্লাসে —তেমন কিছু নয়, কিন্তু সব বিষয়েই মোটামুটি ভাল নম্বর পেয়ে পাস করে। বিশু ক্লাস ফাইভ থেকেই এটা-ওটা নানা বিষয়ে ফেল করছে। 'পাস' যাকে বলে তা করে না, হেডমাস্টারমশাই 'প্রমোটেড' বলে ক্লাসে তুলে দেন।

হেমন্ত বিশুকে বাড়িতে পড়াবার জন্মে মাস্টার রেখেছিল। ভোলা নিজে নিজে এক পাশে বসে লেখাপড়া করত। বড়ই বিসদৃশ দেখায় বলে একদিন মাস্টারমশাইকে বলল, 'ওকেও একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবেন, যদি দরকার হয়। আমি বরং তার দরুন পাঁচটা টাকা বেশী দোব।'

আজকাল সব জিনিসেরই দাম চড়েছে, প্রাইভেট টিউটরও অল্পে হয় না আর। আগে এখানে নাকি চার-পাঁচ টাকাতে ভাল মাস্টাররা ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতেন। তর্কচূড়ামণির স্ত্রী বলেন, 'বাড়িতে গিয়ে পড়ে এলে এক টাকা, নয় তো বড়জোর তু' টাকা ক'রে রেট ছিল। তা এখন সব দিকেই আগুন লেগেছে, মাস্টারদের মাইনেও বাড়বে বৈকি! আর ওদেরও তো খেতে হবে, সত্যিই—চলে কিসে বলুন!'

হেমন্তও তা বোঝে, সেও অযথা কৃপণতা করে না। ডাক্তার উকিলের বেলাতেও যেমন, শিক্ষকদের বেলাতেও তেমনি—তু-চার টাকার জন্মে সস্তা খুঁজলে আখেরে ঠকতে হয়।

মাস্টার অবশ্য ভালই পেয়েছে, ঐ ইস্কুলেরই শিক্ষক, যত্ন ক'রেই পড়ানোর চেষ্টা করেন। হেমন্তর সামনে বসে পড়াতে হয়—ফাঁকি দেবার সুবিধেও হয় না বিশেষ। কিন্তু তিনিও মানুষ, যে ছাত্রের মাথাতে কিছুই ঢোকে না, তার থেকে যার পেছনে অল্প পরিশ্রম করলেই ভাল ফল হয়—তার দিকে আকৃষ্ট হবেন এ তো স্বাভাবিক। এটাও বিশুর অসহ্য লাগে। একদিন রাগ ক'রে বইখাতা ফেলে উঠে এসে বলে, 'আমাদের আলাদা আলাদা পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। এরকম একসঙ্গে বসলে পড়া হবে না।'

'কেন ?' হেমন্ত প্রথমটা অত বুঝতে পারে না।

'মাস্টারটা যা-কিছু ঐ ভোলাকে পড়ায়, আমার বেলায় একেবারে ফাঁকি দেয়, কিচ্ছু বোঝাতে চায় না। ঐ জন্যেই আমার রেজাল্ট্ ভাল হচ্ছে না।'

এবার হেমন্ত জ্বলে ওঠে।

'তোমার রেজাল্ট্ কেন ভাল হচ্ছে না তা আমি বেশ জানি, সেটা তোমার মাথার দোষ, বংশের ধারা।···আর মাস্টার নয়— মাস্টারমশাই, পড়ায় নয়—পড়ান। ফের যদি কখনও ঐ রকম অসভ্যর মতো কথা শুনি জুতিয়ে খাল খেঁচে দোব। জানোয়ার কোথাকার! উনি কাকে কতটা পড়ান তা আমি জানি, পাশের ঘর থেকে সব কানে আসে, লক্ষ্য করি। কাজেই সেকথা তোমার কাছ থেকে জানতে চাই না। তোমার পেছনে মাস্টার রাখাই আমার ভুল হয়েছে—আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলে না সে তো জানা-কথাই।···কচুর বেটা ঘেঁচু—বড় জোর মান।···যা আমার সামনে থেকে! পড়াশুনোর নামে সম্পর্ক নেই, মাস্টারমশাইয়ের নামে নালিশ করতে এসেছে! দূর হয়ে যা! আপদ বালাই কোথাকার!'

বিরোধ ও বিরূপতা চরমে পৌঁছল যখন ভোলা তৃতীয় হয়ে ক্লাস এইট-এ উঠল এবং বিশু চারটে বিষয়ে ফেল ক'রে সেই ক্লাস এইট-এই রয়ে গেল। এবার আর কোনমতেই ক্লাসে তুলে দিতে পারলেন না হেডমাস্টারমশাই।

প্রথমটা ভয়েই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল বিশু। ঠাকুমা যতই ভালবাসুক, রাগলে যে সে-সব কোন বিবেচনা থাকে না—এটা এতদিনে ভাল রকমই বুঝেছে সে। হয়ত মার-ধোর দেবে। তার এক জ্যাঠতুতো ভাইকে নাকি বেশ বড় বয়সেই ন্যাংটো ক'রে চাবুক মেরেছিল, বাবার মুখেই শুনেছে। কি করবে কে জানে—কী তার অদৃষ্টে আছে! তাই বলির পাঁঠার মতোই বাড়ি ঢুকেছিল কাঁপতে কাঁপতে।

কিন্তু কে জানে কেন—হেমন্ত সামান্য একটু ধিক্কার দেওয়া ছাড়া এমন কোন বকাঝকা কি চেঁচামেচি করল না, মার-ধোর তো নয়ই। আসলে তার মনটা অন্য এক আনন্দে ভরপুর ছিল। ভোলা সম্বন্ধে তার হিসেবে ভুল হয় নি, ভোলা তার মান রেখেছে। তাই বিশুর কথা ভাসা-ভাসা ছাড়া ভাবতেই পারে নি, এ ক্ষতি মনে লাগে নি।

সেবার সেই অসুখের পর থেকে হেমন্ত ভোলাকে একটু দূরে দূরেই রাখার চেষ্টা করে। কেন—সেটা মুনিয়া বা ভোলা কেউই বুঝতে পারে না, ভাবে কোথাও কোন অপরাধ ঘটল কিনা। কেমন একটা ভয়ই হয়ে গেছে হেমন্তর, অকল্যাণের ভয়, কেবলই মনে হয় জীবনের এই শেষ পাওনা, এ ভালবাসাও বোধহয় তার অদৃষ্টে সইবে না। বেশী আপন হলেই ভগবান কেড়ে নেবেন। কিন্তু বাইরে যত দূরে ঠেলতে গেছে ততই বেশী ক'রে মনের কাছে এসে পড়েছে ছেলেটা, হেমন্তর মন আরও যেন আঁকড়ে ধরেছে ওকে। সর্বদা একটা চোখ ও একটা কান ওর দিকেই অতন্দ্র থাকে। একটা সম্ভ্রমের ভাব তো আছেই—হেমন্ত দূরে রাখতে চেষ্টা করে দেখে একটা ভয়ও—তৎসত্ত্বেও ভোলা তাকে ভালবাসে এটা ছাপা থাকে না। ভারী ভদ্র মিষ্ট স্বভাবের ছেলে হয়ে উঠেছে, তেমনি বিনত, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সদা-সচেতন, চাল বিগড়োতে দেয় না। সেই জন্যেই—ভোলা যে বিশুকে হারিয়ে টেক্কা দিয়ে ওপরে উঠে গেছে—এতে একটা অনাবিল অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করছে সে। বিশু ফেল করাতে তার যতটা দুঃখ বা ক্ষোভ হওয়া উচিত—তার কিছুই হয় নি বলতে গেলে।

মুশকিল হল এই—বিশুর এই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বোঝার কথা নয়—বুঝলও না। এমন কিছু মহাপ্রলয় ঘটল না দেখে তার সাহস বেড়ে গেল। সেদিন আর কিছু বলল না, পরের দিন মুখ গোঁজ ক'রে গিয়ে বলল, 'ও ইস্কুলে আমি আর পড়ব না, আমাকে অন্য ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দাও।'

বিগত দিনের অননুভূতপূর্ব (এবং বিস্ময়করও—নিজের মনোভাব দেখে আনন্দের সঙ্গেই একটা প্রবল বিস্ময়ও বোধ করছে সে) মাধুর্য-অবগাহনের সুখানুভূতির রেশ তখনও বুঝি একটু ছিল। সেটা যেন একটা কুশ্রী রূঢ় আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠল মন ও কণ্ঠ—দুই-ই।

'কেন ?'

'আমি ফেল ক'রে ঐ ক্লাসে থেকে যাব—আর ঐ ভোলাটা টেক্কা মারবে—সে আমি সহ্য করব না। এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়তে পারব না ওর সঙ্গে।' বেশ একটু যেন মেজাজের সঙ্গেই বলল। যেন ওটা এদেরই ষড়যন্ত্র—এই ফেল করাটা।

আর সহ্য হয় না হেমন্তর। এই মধুর প্রভাত, মধুরতর আনন্দ-স্মৃতি নষ্ট ক'রে দেওয়ার জন্যেই উষ্মা দেখা দিয়েছিল মনে—সবে এখন স্নান সেরে সঙ্কটমোচনে পুজো দিতে যাবে ভাবছিল—তার ওপর এই অসহনীয় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতায় যেন মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। টেনে একটি চড় কষিয়ে দিল বিশুর গালে।

এর জন্যে বিশু প্রস্তুত ছিল না, বিশেষ এখনও পর্যন্ত যে এই পরিমাণ শক্তি আছে বুড়ির হাতে—সে হিসেবটাও ধরা ছিল না। সে ধপ্ ক'রে বসে পড়ল। হয়ত পাঁচ আঙুলের ছাপই পড়ে থাকবে গালে। অন্তত শব্দটা বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছল, সেই শব্দ শুনেই ওদিক থেকে বদ্রিনাথের মা ও ছাদ থেকে মুনিয়া ছুটে এল।

'হারামজাদা, শুয়ারকা বাচ্ছা! তুমি আমার কাছে এসেছ মাম্‌দোবাজি করতে! আমাকে চেন নি এখনও! আব্‌দার! ফেল ক'রে মাথা কিনেছ কিনা—তাই যা হুকুম করবে তাই শুনতে হবে আমাদের! ইস্কুল বদলাব কিরে হারামজাদা—ঐ ক্লাসে ঐখানেই পড়তে হবে—যদি আমার এখানে থাকতে হয়। তাতে হয়েছে কি, ফের যদি ফেল করো ঐ ভোলাকে দিয়ে কান ধরিয়ে উঠবোস করাব তবে ছাড়ব।···না হয়, সিধে রাস্তা পড়ে আছে, সটান বেরিয়ে চলে যাও—কোথায় কোন্ বাবা, ক'টা বাপ আছে—তাদের কাছে।···

তোর বাবাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি—তা তুই তো ছেলেমানুষ! বাঁদরামির জায়গা পাও নি, ফেল ক'রে কালামুখ নিয়ে বাড়ি এইছিস, আবার আব্দার—অন্য ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দাও! কেন, তার আগে মণিকর্ণিকায় গিয়ে শয়ে ভর্তি হতে পারো নি! নাৎখোর বেশরম কাঁহিকা।'

আজকাল বয়স হয়ে—এ ধরনের প্রচণ্ড রাগ সহ্য করতে পারে না, দুই চোখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে, হাত-পা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। বদ্যিনাথের মা ভয় পেয়ে জোর ক'রে বসিয়ে মাথায় মুখে জল থাবড়ে দেয়—মুনিয়া বাতাস করে।

খানিকটা পরে একটু শান্ত হয়ে বদ্যিনাথের মাকে বলে, 'ও যেখানে খুশি যেতে পারে মেয়ে, ওকে বলে দাও। তবে আমার কাছে থাকতে গেলে ওসব আব্দার চলবে না, ঐ ইস্কুলে ঐ ক্লাসেই পড়তে হবে। নইলে বাপের কাছে চলে যাক—মাস্টারমশাইকে বলে দোব, কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে আসবে।'

এইটেই সম্ভব নয়—বিশু তা জানে। এই জোরটা তার একেবারেই নেই।

প্রতি মাসেই কাঁদুনিভরা চিঠি আসে ঠাকুমার কাছে। কোনমতেই সংসার চালাতে পারছে না তারা। গোপালকে ইস্কুল ছাড়িয়ে একটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে তার বাবা, সেই খবর পেয়ে ঠাকুমা এখান থেকে যে টাকাটা পাঠাত সেটা বন্ধ করেছে। কাঁদুনিটা বোধ হয় আরও সেই জন্যেই।

তবে যে-সব ফিরিস্তি দেয় বাবা—সেগুলোও অবিশ্বাস্য নয়। না খেয়ে খেয়ে নিমাইয়ের শরীর ভেঙে পড়েছে, ডাক্তার বলেছে টনিক খেতে দুধ খেতে—কিন্তু ছেলেমেয়েদেরই দুধ দিতে পারে না—দু'বেলা ভাত যোগানোই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, জলখাবারের পাট তো ঘুচেই গেছে—নিমাই টনিক দুধ খায় কোথা থেকে? ইস্কুলে ফ্রী পড়ে ছেলেমেয়েরা, তাও বইয়ের অভাবে পড়া বন্ধ হয়ে আছে একরকম। বিশুর নতুন-মার শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেছে, খেটে-খেটে আর

ভুগে-ভুগে—নিমাইয়ের এমন সাধ্য নেই যে, একটা বাসনমাজার লোক রাখে। যেদিন শয্যাগত হয়ে পড়ে সেদিন কমলা রান্না করে · নিমাই এসে বাসন মাজে, ইত্যাদি—

শেষ চিঠিতে বিস্তৃত একটা হিসেবও পাঠিয়েছিল আয়-ব্যয়ের। সেই চিঠি পেয়ে ঠাকুমা একশোটা টাকা পাঠিয়েছে আর লিখেছে আশাকে কী ওষুধ খেতে বলেছে ডাক্তার জানালে সে টাকা নয়—এখান থেকে ওষুধই পাঠানোর ব্যবস্থা করবে, ছেলেমেয়েদের বই-খাতাও।

এরপর আর সেখানে গিয়ে সেই অর্ধভুক্ অনাহারক্লিষ্টদের দলে নাম লেখাতে সাহস হয় না, তাই চড় ও অপমান দুই-ই হজম ক'রে নীরবে সামনে থেকে সরে যেতে হয় শেষ পর্যন্ত। এবং পরের দিন পুরনো বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে সেই পুরনো ক্লাসেই নতুন ছেলেদের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হয়।

॥ ৩৩ ॥

অবশ্য ভোলার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ার দুঃখ এক বছরের বেশি সহ্য করতে হল না বিশুকে। কারণ পরের বছরও বিশু ফেল করল এবং ভোলা সগৌরবে সেকেণ্ড হয়ে ক্লাস নাইন-এ উঠে গেল। এতে বিদ্বেষ আরও বাড়লেও মাথাটা একটু হেঁট করতেই হল। হেমন্ত যথেষ্ট কটূক্তি করল—মর্মভেদী ব্যঙ্গোক্তিও—কিন্তু পড়া ছাড়াল না। তবে বলে দিল, 'এই আর একটা বছর দেখব, বার বার তিনবার—তাতেও যদি না পারো, তাহলে ঐখানেই ইতি, মনে রেখো। যা বাপ-দাদা করেছে তাই করবে—বিড়ি খেয়ে ভ্যাগাবেনের মতো ঘুরে বেড়াবে। বিড়ি পাকিয়েই খেতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

বলল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, বছরের শেষ দিকে—বড়দিনের পর থেকে আরও একজন টিউটরও ঠিক করল। শুধু অঙ্কটা দেখবেন তিনি। ঐ ইস্কুলেরই মাস্টার কমলবাবুও। তিনি বললেন, 'মা,

বলছেন আমি আসব, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—আপনার কাছ থেকে মাইনে নিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে, কেন না—ওর যে কিছু উন্নতি করতে পারব সে ভরসা বিশেষ নেই। আসলে ওর মাথাও নেই—মনও নেই আর পড়াতে। বরং এই দোষটাই বেশী, যেটুকু মাথা আছে, সেটুকুও এদিকে দেয় না।'

এই রকম কথা এর আগেও কে বলেছিল না?

কার সম্বন্ধে যেন—?

খানিকক্ষণ ভাবতে হয়। আজকাল সহজে কিছু যেন মনে পড়ে না।...একটু পরেই স্মরণ হয় অবশ্য। গোরা—গোরার কথাই বলেছিলেন সেখানের মাস্টারমশাই।

হবেই তো। একই ঝাড়ের বাঁশ যে।

গোরারই আপন খুড়তুতো ভাই।

তবে—ব্যতিক্রমও আছে বৈকি! নিমাই লিখেছিল যে, গোপালের নাকি পড়াশুনো ভালই হচ্ছিল, আর একটা বছর পড়লেই পাস দিতে পারত। অভাবের জন্যেই ছাড়িয়ে নিতে হল। ওকে পড়াতে গেলে নিচেরগুলোর কিছুই হয় না। তাছাড়া সংসারেরও অভাব। যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সেভাবে আয় বাড়ছে না। মানুষও বেড়েছে ঢের আগের চেয়ে। এ পক্ষেও একটা মেয়ে, দু'টো ছেলে।

এর মধ্যে আনুষঙ্গিক দোষও কিছু কিছু ঢুকেছে বৈকি বিশুর।

বার্ডসাই খেতে শিখেছে (হেমন্তদের প্রথম বয়সে বার্ডসাই বলত, যে বার্ডসাই নিজে কাগজে পাকিয়ে খেতে হত--সেই থেকে পাকানো সিগারেটকেও ওরা বার্ডসাই বলেই জানে)। অভাবে বোধহয় বিড়িও খায়।

গন্ধ পায় হেমন্ত ঠিকই। এখনও কোন ইন্দ্রিয়ই দুর্বল হয় নি, না চোখ না নাক না কান। সেইটেই বুঝতে পারে না ব্যাটারা। ভাবে অন্তদন্তহীন বুড়ি—ও কিছুই টের পাচ্ছে না। বুড়োবুড়িদেরও যে এককালে অল্প বয়স ছিল, যৌবনকালটা পার হয়েই এসেছে তারা—সে কথাটা এই আহাম্মুকগুলোর মনে থাকে না।

পয়সা দু-চারটে এদিক-ওদিক থেকে পায়—তা জানে।

আজকাল বাজারে যায় মধ্যে মধ্যে। আগে মুনিয়াই বাজার করত—এখন ভোলা করে। ছুটিছাটায় বিশু নিজে যায় জোর ক'রে। হেমন্ত বোঝে যে, পয়সার দরকার। টিফিন বাবদও দু-চার পয়সা দেয় হেমন্ত। তা ছাড়া আজ পুজোর চাঁদা, কাল কারও ফেয়ারওয়েল—এসব তো আছেই। তা ছাড়াও পায়—বন্ধুবান্ধব জুটেছে অনেক-গুলি। সুন্দর দেখতে, তায় বড়লোকের ছেলে (এটা খুব রটেছে—বুড়ির হাতে অনেক পয়সা, তারই পুষ্যি; এ-ই সব পাবে)—'মোসায়েব' 'ইয়ারবগ্‌গ' জোটাই স্বাভাবিক। তার মধ্যে দু' একজন বেশ অবস্থা-পন্ন লোকের ছেলেও আছে—ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে, তারা সকলেই লেখাপড়ায় যত না হোক, বিড়ি-সিগারেটে পরিপক্ক, ভাঙ্‌ জর্দা এসব তো খেলার জিনিস। তারাও কতক কতক নেশার রসদ যোগায়, কিছু কিছু অন্য সুবিধার পরিবর্তে।

প্রথম প্রথম বকাবকি করত, চড়চাপড়ও দিয়েছিল—তার পর হাল ছেড়ে দিয়েছে। 'আগ-ন্যাংলা যেমনে যায়, পেছ-ন্যাংলা তেমনে ধায়'—এ তো কথাই আছে। বাপ জ্যাঠা কাকা দাদা—সকলেই পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে বিড়ি তামাক—এমন কি গাঁজা পর্যন্ত খেতে শিখেছে—ও-ই কি আর অন্যরকম হবে?···মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, অমন সুন্দর মুক্তোর মতো দাঁত—ছোঁড়ার চেহারার অহঙ্কারে তো মাটিতে পা পড়ে না—ঐ দাঁত কালো ঝিঙ্গেবীচির মতো হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। পুরুষই হোক মেয়েই হোক, দাঁতটা সৌন্দর্যের প্রধান অঙ্গ।

একজন শিক্ষক রেখে যা হয়েছিল—দু'জন রেখেও তার থেকে বেশী হল না।

ঠিক সেই গোরার ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। তিনটে বিষয়ে ফেল, একটায় পরীক্ষাই দেয় নি। সুতরাং এবারও ক্লাস এইট-এর গণ্ডী পার করানো গেল না।

এবার আর হেমন্ত বকাবকি করল না। ভোলা স্কুললিভিং পরীক্ষা দেবে, এই আনন্দেই সে মশগুল। মুশকিল হয়েছে যে, এ আনন্দ প্রকাশ্যে করতে পারে না, ভোলাকে নিয়ে ঠাকুরমন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে পারে না। লোকে বলবে বাড়াবাড়ি। বিশুর চোখে আরও বিষ হয়ে যাবে ভোলা—এমনিই যা হিংসে, বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়। তা ছাড়াও, নিজেরও আতঙ্ক একটা আছে। যে ভাল, যাকে নিয়ে সুখী হতে পারবে—সে ওর কপালে সইবে না। ভোলার পাছে কোন অনিষ্ট হয়, সেই জন্যেই আরও পারে না বেশী আনন্দ-সমারোহ করতে।

পরীক্ষার ফল বেরুনোর দিন বিশু ইস্কুলে যায় নি, ফল কী হয়েছে জানত বলেই বোধ হয়। ভোলার মুখেই শুনল এই অ-ফল এবং বিশুর অনুপস্থিতির কথা—দুই-ই। সবই শুনল, কিন্তু কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই। সে ভাবছিল অন্য কথা, পুজো দেওয়ার কথা। ঠাকুরদেবতা যে সে খুব বিশ্বাস করে তা নয়—তবে যদি থাকেন তাঁরা—তাঁদের প্রসন্ন করলে যদি এদের উপকার হয় তো হোক, এই জন্যেই পুজো দেওয়ার জন্যে এত ব্যস্ততা।

নিজে আর গেল না, টাকা দিয়ে ভোলাকেই পাঠাল—সংকট-মোচনে পুজো চড়িয়ে আসতে। নিজে সামনের শুক্রবারে কোন এক ছুতোয় বেরিয়ে সংকটার পুজো দিয়ে আসবে। বৈশাখ মাস, গঙ্গার জল অনেক নেমে গেছে—নৌকো ক'রে পঞ্চগঙ্গার ঘাট পর্যন্ত গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা, সংকটা যাওয়ার সোজা পথে যাওয়া এখন আর হবে না, পারবে না সে অত সিঁড়ি ভাঙতে। নইলে তো কাকে-বকেও টের পেত না। অনেক চেনা নাও-ওয়ালা আছে, ঘাটিয়াল পাণ্ডা তো সর্বদা তটস্থ থাকে সে গেলে—বছরে বছরে ছাতা দেয়, মেয়ের বিয়েতে সেদিনও একশো টাকা দিয়েছে, ঐ বাধাটা না থাকলে চান ক'রে পাণ্ডার কাছে ভিজে কাপড়টা রেখে নিঃশব্দে চলে যেতে পারত—আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টারে ফিরে আসত। এখন এই নব্বুই বছরে অত সিঁড়ি ভাঙতে পারবে না। (নব্বুই হয়েছে?

না আরও বেশী? কে জানে এখন অত হিসেব আর মনেও থাকে না) গাড়ি ক'রেই যেতে হবে—চক দিয়ে ঘুরে। তাই যাবে চুপি-চুপি—সামনের শুক্রবার।...

বিশু ফিরল সন্ধ্যার পর, ঠাকুমা যখন ঠাকুরঘরে পুজোয় আটক থাকবে—সেই সময়টা হিসেব ক'রে। শুকনো মুখে অন্ধকারে গিয়ে বারান্দায় বসল।

কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা চোখে পড়েছে হেমন্তর—পুজোর আসন থেকেই। অনাহারক্লিষ্ট মুখ নয়। কোথাও কোন বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে ঘুমিয়ে—তবে এসেছে। ফল কী হবে তা তো জানতই, হয়ত বন্ধুদের সঙ্গে সকালেই কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল কিংবা সাঁতরে ওপারে গিয়ে রামনগরের খরমুজ ক্ষেত থেকে খরমুজ চুরি করেছে।

পুজো সেরে এ ঘরে এসে প্রতিদিনের মতো হিসেবের খাতা নিয়ে বসতে দরজার কাছে এসে অপরাধীর মতো দাঁড়াল বিশু।

এই সময়টার জন্যে বহুক্ষণ থেকেই মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে সে। তিরস্কার গালাগালি তো বটেই—মার-ধোর খাওয়াও বিচিত্র নয়। পরীক্ষা যে আদৌ দিতে যায় নি সেটাই বড় অপরাধ বলে গণ্য হবে—হেমন্তকে সেকথা জানায় নি বলে।

কিন্তু দেখা গেল তেমন কোন তুফান উঠল না।

হেমন্তই মুখ তুলে দেখে প্রথম কথা কইলে। বললে, 'এতক্ষণ ছিলে কোথায়? বন্ধুর বাড়ি? দিব্যি তো খেয়ে ঘুমিয়ে এসেছ। তা তার কি দরকার ছিল? এতটাই করতে পেরেছ যেকালে—সেকালে তুচ্ছ এটুকু চক্ষুলজ্জা কেন?...এ তো ভালই হল, বাঁচালে আমাকে। মিছিমিছি এক কাঁড়ি টাকা খরচ হচ্ছিল মাস মাস—ন দেবায় ন ধর্মায়, একটা ভবিষ্যতের চিন্তাও ছিল। এ নিজের ভার নিজের হাতে তুলে নিলে—আমি অব্যাহতি পেলুম। আর বয়েসও তো আঠারো পেরিয়ে গেল, সাবালক তো হয়েই গেছ। এখন তো আর কারও কিছু বলবার নেই, গার্জেনকে থোড়াই কেয়ার!...তা তবে, যদি একেবারেই পড়বে না জানো, পড়ার ইচ্ছে নেই—আঙ্কেক

দিন ইস্কুলে যাও না, পরীক্ষা দাও নি, এ তো ফেল করবারই চেষ্টা— এইটে পষ্টাপষ্টি এবারের গোড়াতেই বলে দিলে হত। আমারও এতগুলো টাকা খরচ হত না—তোমারও এই বুড়ো বয়েসে ক্লাস এইট-এ তিনবার ফেল—এ লজ্জাটাও নিতে হত না।·· এটুকু বুদ্ধি থাকা উচিত ছিল অন্তত।'

দরজার কাছে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বঙ্কিনাথের মা, নিচের কায়েৎ-গিন্নি। না জানি কি প্রলয় কাণ্ড ঘটে আজ—সেই ভাবনা। ভোলা তো ওকে আসতে দেখেই পালিয়েছে—পাছে তার সামনেই মার-ধোর করে। এই অস্বাভাবিক শান্ত ভঙ্গীতে সকলে অবাক হয়ে গেল। কায়েৎ-গিন্নি আড়ালে বঙ্কিনাথের মাকে বললেন, 'এখন হয়েছে কি, এই সবে শুরু। ধাপে ধাপে উঠবে।···আসলে মোক্ষম কোন মার মারবে বলে তৈরি হচ্ছে, ঝড়ের আগে যেমন বাতাস শান্ত হয়ে যায়—ছ্যাখো নি?···সত্যি বাপু, মাগীরও কপাল, কী কাণ্ডটাই না করলে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে! কত ভাল ছেলেপিলের ছ্যাখো পয়সার অভাবে সুবিধের অভাবে পড়াশুনো হচ্ছে না, আর এর সব থাকতেও, সব পেয়েও হেলায় হারাল। মাগী যে আবার এক রকম—নইলে আমার সেজ নাতিটাকে এনে রাখলে তার লেখা-পড়াটা হত। পয়সার অভাবে গোমুখ্খু হয়ে রইল।······ছ্যাখো না, ঐ ঝিয়ের ছেলেটা—কোন শৌখীন শখের ঝি তো নয়—বাসনমাজা ঘরমোছা ঝি—তার ছেলে কীরকম চালাক, একমনে নিজের কাজ গুছিয়ে যাচ্ছে, দিন কিনে নিচ্ছে!'

বঙ্কিনাথের মা চুপি-চুপি বলে, 'অতিরিক্ত আদরেই গেল মাসিমা, সত্যি যা বলব। মাওড়া ছেলে, গরিবের ঘরের—বলি নোয়া-কাটা মিস্তিরি ছাড়া তো কিছু নয় বাপটা—তাকে একেবারে অমন সিরাজুদ্দৌলার নাতির মতো মানুষ করলে কি হয়? চাল বিগড়ে গেল যে। ভাবলে কে না কে আমি—লাট-বেলাট, ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগল। কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা মা, যেন আমি ওরই ঝি, ও-ই আমাকে মাইনে দেয়। যার থাচ্ছি সে আমাকে মেয়ে বলে ডাকে

—মিথ্যে বলব কেন, কখনও একটা কুবাক্যি বলে নি মুখে, তুমি ছাড়া তুই বলতে জানে না—ইনি সে জায়গায়—বলে কি না ঝি ঝিয়ের মতো থাকবে! ঐ তো ভোলাটা, খোট্টার ঘরের ছেলে হলে কি হবে, দিদি, দিদিজী ছাড়া ডাকে না।...'

বিস্ময়ের সীমা ছিল না বিশুরও।

আর যা-ই হোক, সে এত মোলায়েম অভ্যর্থনা আশা করে নি। তার ফলে সেও তখন দাঁড়িয়ে ঘামছে আর ভাবছে যে, আসল মারটা কখন কীভাবে পড়বে না জানি। এটা যে তারই প্রস্তুতি—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না, বলির আগে মোষের গর্দানে মাখন লাগানোর মতো।

কিন্তু হেমন্ত সহজভাবেই আবার হিসেবের খাতায় মন দিয়েছিল। সেটাকে যে এরা চরম আঘাতের উপক্রমণিকা ভাবছে, তাও অত খেয়াল করে নি। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চেয়ে—বিশু তখনও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললে, 'যাও, আর অমন মিথ্যে লজ্জা দেখাতে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? চান-টান যা করবার সেরে নিয়ে বামুন মেয়েকে অব্যহতি দাও, সে মানুষটা তোমার জন্যে আর কতক্ষণ বসে থাকবে?·· নাকি, এ বেলারটাও কোন ইয়ারবক্শীর বাড়ি থেকে সেরে এসেছ, না সারতে যাবে?'

বিস্ময়ের ঘোরটা তবু যেন কাটে না বিশুর।

বরং আরও যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে।

আসল কথাটা কি বুঝতে না পেরে তেমনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার হেমন্তর মাথাতে যায় ব্যাপারটা। বলে, 'ভয় নেই, শাসন করার এক্তিয়ার যতদিন ছিল ততদিন যা হয় করেছি। আর কিছুই বলব না। সাবালক স্বাধীন হয়েছ—নিজের পথ নিজে দেখতে শিখেছ—আর কেন কথা কইব আমি?'

তারপর একটু থেমে বলে, 'আজ এখন চান-খাওয়া ক'রে নাও। কাল আমাকে জানিও, কী করবে। আমার পয়সায় দিব্যি বসে খেয়ে

ফূর্তি ক'রে বেড়াবে—অতটা এখানে হবে না। লেখাপড়া যা শিখেছ তাতে দু'টো দরজা খোলা আছে—বামুনের ছেলের ন চ বিদ্যা উনুনে ফুঁ—তা তাও তো পারবে না, হয় কোন কারখানায় ঢুকে কুলীর কাজ করা, নয়তো বিড়ির দোকানে গিয়ে বিড়ি পাকাতে শেখা। এর কোন্‌টা করবে, কোন্‌টা পছন্দ—মন ঠিক ক'রে ফ্যালো। যদি কারখানায় ঢুকতে চাও—কালই টিকিট কেটে দিচ্ছি, বাপের কাছে চলে যাও, তোমার দাদাকে যেমন ঢুকিয়ে দিয়েছে তেমনি কোথাও কারও হাতে-পায়ে ধরে ঢুকিয়ে দেবে—নইলে এখানে থেকে যদি কোন কাজ-কারবার করবে ভেবে থাকো, নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছ, নইলে লেখা-পড়া ছাড়লে কিসের ভরসায়, কী ভেবে—তা সেটাও পষ্ট ক'রে খুলে বলো। যা করবে এখনই লেগে যাও। নামকাটা সেপাই হয়ে দাগাষাঁড়ের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, আমার ভুজ্যি ধ্বংস করবে আর নেশা-ভাঙ্‌ করবে, সে হবে না। এখানের নবাবী এবার ঘুচল। খাটো খেতে পাবে, নইলে পথ দেখতে হবে!'

মুখে যা-ই বলুক একটা কিছু কাজ-কারবারের ব্যবস্থায় হেমন্তকেই উদ্যোগী হতে হয়। ভেবে একটা বারও করে। আর একটু আপন হলে সে বাড়ির ব্যবসাটাই বুঝিয়ে দিত—বাড়ি বেচা-কেনা কাশীতে এসে কিছু কিছু করেছে নিজে, তাতে লাভও হয়েছে। একটা বাড়ি ছাড়া সব বাড়িই তাকে কিছু না কিছু দিয়েছে। একটায় কিছু লোকসান গিছল, বাইরেটা দেখে অতটা বুঝতে পারে নি, মেরামত করাতে গিয়ে দেখল বাড়িতে কিছু নেই, রাণী ভবানীরও আগের আমলের বাড়ি, মাটির-গাঁথুনি, কড়ি-বরগাগুলো পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য. যেখানে হাত দিতে যায় সেখানটাই ঝরঝর ক'রে খসে পড়ে। যা ভেবেছিল তার থেকে ঢের বেশী খরচ করতে হল সে বাড়ির পিছনে।

তবে সে আর কত, মোট যা লাভ হয়েছে, লোকসান তার তুলনায় কিছুই নয়। বিশ-ভাগের এক ভাগ হবে বড় জোর। এখন করতে

পারলে আরও লাভ। দিন দিন বাড়ি জমির দাম বাড়ছে হু-হু ক'রে। কিন্তু এখন আর নিজে পারে না অত ঘোরাঘুরি অত পরিশ্রম করতে। ক্রমশই স্থানু হয়ে পড়ছে। তাছাড়া বেশী বকাবকি চেঁচামেচি করলে, কি বেশী হিসেবের কাজ দেখলে—আজকাল শরীর বড় খারাপ লাগে।

যদি কিছুটাও মানুষ হত বিশু। বোকা হোক—কাজে আগ্রহ আছে, উন্নতির ইচ্ছা আছে, খাটতে পারবে—এরকম জানলেও নিজে হাতে ক'রে কাজ শেখাত। কিন্তু এদের বংশকে সে হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছে, সত্য-পথে থেকে বিশ্বস্তভাবে কাজ করা— যথার্থ উন্নতির চেষ্টা করা—এদের রক্তে নেই। তাছাড়া একে তো দেখছেই, মিথ্যা কথা বলা ফাঁকি দেওয়া আজ থেকে শুরু হয় নি, এতদিনে পাকা হয়ে গেছে। আড্ডা দেওয়াটাই চায়, আর চায় বড়মানুষী দেখাতে। আরাম আর আয়েসের ওপর প্রচণ্ড লোভ। হাতে টাকা পেলেই উড়িয়ে দেবে, বদ-খেয়ালের কিছু বাকী থাকবে না। আখেরের কথা ভাবার মতো বুদ্ধি ওকে ভগবান দেন নি।

না, বিশু তার মন থেকে গেছে। এখন কোনমতে ভালয়-ভালয় ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই বাঁচে। ওর বাপের কাছ থেকে ওকে যেচে নিয়েছিল—ছোট থেকে কাছে রাখলে মানুষ করতে পারবে এই আশায়। আক্ষরিকভাবে সে প্রতিশ্রুতি না দিলেও সেই রকম আশ্বাসই একটা ছিল কথার ভাবে। এখন সেই রুগ্ন, প্রায়-অসমর্থ লোকটার কাছে মিস্ত্রী কি কুলীর চাকরির জন্যে ফেরত পাঠাতে মন চায় না, ভাবলেও মাথা কাটা যায়।

অনেক ভেবে শেষপর্যন্ত অল্প পুঁজির একটা কারবার ঠিক করে। অনেকদিন ধরেই এদিকে নজর ছিল তার, অনেকবার ভেবেছে নিজেই করবে। সাইকেল রিক্শার ব্যবসা। কাজ এমন কিছু নয়, কতটা টাকা বার করতে পারবে বা করবে সেইমতো পাঁচ সাত বা দশখানা রিক্শা কেনা। তারপর দৈনিক ভাড়া বন্দোবস্ত ক'রে চালকদের কাছে ছেড়ে দেওয়া, সন্ধ্যায় ও ভোরে সেই পয়সা বুঝে নেওয়া—এবং গাড়ির ছোটখাটো মেরামত দরকার থাকলে সেদিকে

নজর রাখা, ভারী রকমের জখম হল কিনা কোথাও সেদিকেও হুঁশ রাখা। চালকের দোষে—তার অসাবধানতায় জখম হলে তার কাছ থেকে খরচা আদায় করতে হবে।

সব রকম মেরামতিই তার করার কথা—তবে সেটা প্রায় দুঃসাধ্য, সে খরচ আদায় করা। দৈনিক ভাড়াই সহজে দিতে চায় না, নানা অজুহাত দেখায়, ডুবই মারে এক-একসময়—গাড়ি সুদ্ধ। সেই জন্যেই এমন একটি লোক দরকার, যে ঘোরাঘুরি করতে পারবে, ধরে-পাকড়ে ভাড়া আদায় করবে—দরকার হলে কিছু গালিগালাজ ও গায়ের জোরও প্রয়োগ করতে পারবে। সেই জন্যেই হেমন্ত এতকাল এ ব্যবসা করতে পারে নি। এখন তাই—বিশুর জন্যে কী করা যায় ভাবতে গিয়ে আগেই এইটের কথা মনে পড়ল। হিসেব-টিসেবগুলো সে নিজেই দেখতে পারবে—বাইরের ঘোরাঘুরির কাজটা যদি ওর দ্বারা অন্তত হয়।

বিশুকে ডেকে আগে প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে বললে। বললে, 'এই শেষ, এইটুকু ক'রে দিতে পারি। চারখানা রিক্‌শা কিনে দোব, ঠিক মতো চালাতে পারো হেসেখেলে রোজ আট-দশটাকা হাতে পাবে। এখানে কোন খরচ নেই তোমার—কিছু কিছু জমাতে পারো, ঐ টাকা থেকেই আরও রিক্‌শা কিনতে পারবে, আর আয়ও বাড়বে। আর যদি উড়িয়ে দিতে চাও তাও দিতে পারো। তবে সে নিজের আখের ভবিষ্যৎই উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমার কাছ থেকে আর কোন সাহায্য পাবে না—সেই বুঝে কাজ করবে, আমায় তো জানোই, যে কথা সেই কাজ!'

প্রস্তাবটা যে খুব ভাল লাগল না বিশুর, তা সেই ম্লান আলোতেও বুঝতে অসুবিধা হল না হেমন্তর। সে নিজেকে একটা বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী বলেই জেনে এসেছে এতদিন, বুড়ি মলেই সে যথেচ্ছ আমোদ ফুর্তি করবে—সেই স্বপ্নই দেখেছে। সেই জন্যেই আরও, লেখাপড়া ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করতে মন চায় নি—অধীর আগ্রহে সেই সোনালী ভবিষ্যতের ছবি দেখেছে, প্রতীক্ষা

করেছে ভাগ্যনির্ধারিত সেই দিনটির। দু'হাতে সরিয়ে দিতে চেয়েছে বর্তমানের সময়টাকে—ঐ বুড়ির অকারণ দীর্ঘ পরমায়ুকে।

(একথা—এ হিসেবটা একবারও মাথায় যায় নি তার যে, বুড়ির পরমায়ু এত দীর্ঘ না হলে, সাধারণ হিসেবে সে মারা গেলে বিশুর জন্মের আগেই চলে যেত, এ সম্ভাবনাও থাকত না।)

সেই মানসিক উচ্চ স্বর্গ থেকে এ কী শোচনীয় অধঃপতন! ঐ 'ছোটলোক' রিক্শাওলাদের (তার মতে) পিছু পিছু ঘুরে ওদের সঙ্গে ছোটলোকমি কাজিয়া ক'রে গলায় গামছা দিয়ে এক-এক বেলার জন্যে একটাকা-পাঁচসিকে আদায় করা! এই ছিল তার অদৃষ্টে!

এ ছাড়াও কথা ছিল, সে খবরটা হেমন্ত জানত না। এসম্বন্ধে তার কোন ধারণাও নেই—কারণ জিনিসটা তার হুদ্দোর মধ্যে পড়ে না—তার চেনা ও জানা জগতের বাইরে এটা।

বিশু খুবই সুশ্রী—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি বা সে সম্বন্ধে কারও কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে—বিশু নিজে অন্তত সে দলের মধ্যে পড়ে না। তার ধারণা—বদ্যিনাথের মা, নিচের কায়েৎ-গিন্নি, একতলার ভাড়াটেরা—এবাড়ি ওবাড়ি আশপাশের বাড়িরও—প্রভৃতি তার পরিচিত জগতের অধিবাসীরা এবং তার মাথাখাওয়ার জন্যে যারা নিরন্তর ব্যগ্র সেই বন্ধুর দল—সে ধারণা অবিরত বাড়িয়েই দিয়ে গেছে অকারণ ওর রূপের স্তুতিতে—তার মতো সুন্দর চেহারা পৃথিবীতে কারও নেই। এবং সেই কারণেই—বন্ধুরা তো বলেইছে, তার নিজেরও বিশ্বাস একবার বোম্বাই কি কলকাতায় পৌঁছতে পারলে ওখানের ফিল্ম ডিরেক্টররা তাকে লুফে নেবে। তবে সবদিক ভাবতে গেলে বোম্বাই-ই ভাল—পয়সা আছে সেখানে, কলকাতায় সব 'মক্ষীচুষের দল'।

কিন্তু যে তথ্যটা জানত না, যে কথাটা তাকে কেউ বলে নি, সেটা হচ্ছে এই—তার সৌন্দর্যটা মেয়েলি ধরনের, মার মতোই দেখতে হয়েছে সে, রঙটা হয়ত আরও চড়া, এ চেহারাতে গোঁফ কামিয়ে যাত্রার দলে কি য়্যামেচার থিয়েটারের দলে নায়িকা সাজা যায়—

ক্যামেরার সামনে 'হিরো' সাজা কঠিন। বোধহয় কোন ডিরেক্টারই তা নেবে না। বিশেষ গলাটাও মেয়েলি ধরনের। সেই জন্মেই বন্ধুমহলে তার এত সমাদর—বিকল্প হিসেবেই—এটাও সে জানে না সম্ভবত।

এই কথাটা জানত না বলেই আরও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল বুড়ির সরে পড়বার—মৃত্যুর। হাতে টাকা পেলেই বোম্বে যাবে, সেখানে কোন বড় হোটেলে উঠবে, ডিরেক্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যদি তেমন হয়—তারা খুব উৎসাহ না দেখায়—বিশু কারও খোশামোদ করবে না, নিজেই টাকা দিয়ে ছবি তোলাবে একটা, তাতে হিরো সেজে ওদের দেখিয়ে দেবে নিজের দাম।

এই যার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—তাকে চারখানা রিক্শা দিয়ে নিজের জীবিকার চেষ্টা করতে বলা—মর্মান্তিক প্রস্তাব বৈকি, অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

তবে—এটুকুও এতদিনে বেশ চিনেছে সে হেমন্তকে—এখন রাজী হলে হয়ত ভবিষ্যতে সবদিক বজায় থাকবে, এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত থাকলে—বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কথা যখন বলছে না, বরং বলছে যে, 'তোমার এক পয়সা খরচ নেই,' তার মানে থাকা-খাওয়াটা এ বাড়িতে হবে, বলেই দিচ্ছে—বুড়ির হঠাৎ 'ভালমন্দ' কিছু হলে এ সবই সে পেতে পারবে—অনায়াসে ও সহজেই। জীবন কল্পনা-মতোই উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু, রাজী না হলে, হয়ত—এই মুহূর্তেই লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

আইনকানুনের জ্ঞান অবশ্যই তার নেই, এসব বাতলে দেবার লোকও তার আশপাশে কেউ নেই। কোন উইল ক'রে না গেলে সব যে সে পেতে পারে না—সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। তার বিশ্বাস সে-ই যখন একমাত্র এখানে 'পুষ্যিপুত্তুরে'র মতো প্রতিপালিত হচ্ছে—এরা সবাই সেকথা জানে—তখন বুড়ি চোখ বুজলেই এই কুবেরের ঐশ্বর্য তার হাতে এসে পড়বে—যথেচ্ছ খরচ করার কোন বাধা থাকবে না।

অগত্যা ঢোঁক গিলে, শুকনো মুখেই বলল, 'তা—তা বেশ তো। তুমি যা ভাল বোঝ। হ্যাঁ, তা আর পারব না কেন, সকাল-সন্ধ্যেয় একটু ওদের সঙ্গে খেচাখেচি করা—এই তো!' যেন নিজেকেই বোঝায় সে।

হেমন্ত আর কিছু বলে না। এ যে অনেকখানি আশাভঙ্গ—তা সেও কিছু বোঝে। এর চেয়ে বেশী উৎসাহ সে আশাও করে নি।

তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। রিক্শা পেতে, চালু অবস্থায় পেতে মাস দুই দেরি হয়, লাইসেন্স পেতে আরও কিছু দিন। তাও হেমন্তর এখানেও এতদিনে অনেক চেনাশুনো হয়ে গিয়েছিল—অনেকেই মান্য করে—তার তদ্বিরেই তবু কিছুটা তাড়াতাড়ি হল। ইতিমধ্যে এই সময়টা, সে হেমন্তর প্রস্তাবে রাজী হয়েছে—এরই মূল্যস্বরূপ নিশ্চিন্ত হয়ে আড্ডা দিয়ে, সিনেমা দেখে ও সিগারেট খেয়ে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু অবেশেষে একদা সে দুর্দিনও এসে গেল। রিক্শা এল, রিক্শাওলাও এল। তাদের সঙ্গে দরদস্তুর, শর্ত ঠিক করা—হেমন্তই সব ক'রে দিলে, কে সকালে নেবে, কে রাত্রে—তাও ঠিক হল। খাতা ক'রে দিলে, কেমন ক'রে হিসেব রাখবে প্রত্যহের আদায়—রিক্শাওলাদের নামে নামে আলাদা ক'রে,—সব দেখিয়ে দিলে। আরও শিখিয়ে দিলে ভাড়া আদায় না হলে এদিক-ওদিক ওদের সন্ধানে ছুটোছুটি করার কোন দরকার নেই, দেঁড়শিকে পুল অর্থাৎ বিশ্বনাথের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই সব রিক্শাওলাকে ধরতে পারবে। যে যেখানেই পালাক, ওখানে আসতেই হবে—কখনও না কখনও!···

মাসখানেক চালালও বিশু কোনমতে, চোখ-কান বুজে—ওষুধ-গেলার মতো ক'রে। এর মধ্যেই অনেক বাকী পড়ল। 'বেটারা মহা শয়তান, কিছুতে ভাড়া দিতে চায় না। তবে আমিও দেখে নোব—এখন ক'দিন নতুন নতুন—' ইত্যাদি বলে কোনমতে এড়িয়ে এড়িয়ে যেতে লাগল। সত্যি-সত্যিই রিক্শাচালকদের পিছু পিছু ঘুরে তাদের

কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি ক'রে টাকা আদায় করার জন্যে কি ভগবান তাকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ?

শেষে হেমন্তও যখন আদায়ের জন্যে চাপ দিতে লাগল—হঠাৎ একদিন আর রাত্রে বাড়ি ফিরল না বিশু। তখন, সন্দেহ হতে খোঁজ ক'রে দেখা গেল ট্রাঙ্কের মধ্য থেকে ছ'শ টাকাও উধাও হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরের দিন সকালে জানা গেল, এছাড়াও—হাড়ার বাগের বাড়ির ভাড়াটের কাছ থেকে হেমন্তর নাম করে পঞ্চাশ টাকা ধার ক'রে এনেছে। একশো টাকাই চেয়েছিল, ভদ্রলোকের হাতে ছিল না বলে দিতে পারে নি। সেই বাকী পঞ্চাশ টাকা নিয়ে দিতে আসাতেই জিনিসটা ধরা পড়ে গেল।

ভোলা ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ ক'রে আনল। বিশু একা যায় নি, ত্রিপুরাভৈরবীতে ওর যে হিন্দুস্থানী বন্ধু থাকে কমলেশ্বর বলে--সেও গেছে। কমলেশ্বরও বাড়ি থেকে মার গহনা নিয়ে পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দিয়ে প্রায় হাজার টাকার মতো নিয়ে গেছে। কমলেশ্বরের বাবার ধারণা দু'জনেই বোম্বে গেছে, ঐদিকেই তাঁর ছেলের ঝোঁক, তা তিনি জানেন। তবে সে যে এত নির্বোধ হবে ঠিক—কত (তা তিনি বুঝিয়ে বলেছেন, বেশির ভাগই ছেলে এমনি 'স্টার' হবার আশায় পালিয়ে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে--দুর্দশার শেষ থাকে না, ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হয় কীভাবে—তাও উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, জানাশুনোর মধ্যে থেকে নাম ক'রে ক'রে, তা সত্ত্বেও সে যে এমন বেকুফি করবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

যা হোক্, তিনিও ছাড়ার লোক নন, তিনি আজই বোম্বে রওনা হয়ে যাচ্ছেন। বিশুর কথা তিনি বলতে পারবেন না, তবে কমলেশের কান পাকড়ে ধরে আনবেন ঠিকই। খুঁজে বার করবেন যেমন ক'রেই হোক। 'ফিকির না করো।' বার বার বলেন।

সব জানিয়ে ভোলা বলল, 'আমি কি একবার বোম্বে যাব তাহলে বড়মা ?'

'পাগল! ও চেষ্টাই করিস নি। আমি বেঁচেছি। কী ক'রে ঘাড় থেকে নামাব তা-ই তো ভাবছিলুম। গেছে না মুক্তি দিয়েছে। ধরে এনে কি করব? তাকে দিয়ে কোন্ কাজ হবে?…ঐখানেই কোন হোটেলে চায়ের কাপ ধোবে, কি কারও বাড়ি চাকরের কাজ করবে, ও-ই তার ভাল।…আমার খালি নিমেকে একটা চিঠি লিখতে হবে। সে দুয়ো দেবে—সেই যা ভাবনা। মাথা হেঁট হল। নইলে আর কোন দুঃখ নেই আমার! এই ভাল হয়েছে!'

॥ ৩৪ ॥

স্কুললিভিং পরীক্ষাতেও—হেমন্ত অত বোঝে না, বলে এণ্ট্রেন্স—ভোলা পাস ক'রে বেরিয়ে গেল। স্কলারশিপ পেলে না, তবে প্রথম বিভাগেই পাস করল। হেমন্ত বলল, 'কলেজে যা, ফর্ম নিয়ে আয়।'

ভোলা কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখায় না, চুপ ক'রে থাকে।

'কিরে, চুপ ক'রে আছিস কেন? কলেজে ভর্তি হবি না?'

ভোলা একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলে, 'ইচ্ছে নেই খুব।'

'সে কি! ভালভাবে পাস করলি, কলেজে পড়বি না? ছেলেদের-ছেলে কেন আজ-কাল মেয়েদেরও তো খুব শখ শুনেছি, একখানা খাতা নিয়ে কলেজ যাবে। তোর ইচ্ছে হয় না?…কেন রে, ইচ্ছে নেই কেন?' সস্নেহে উদ্বেগের সঙ্গে শেষের প্রশ্নটা করে হেমন্ত।

'পড়তে খুব যে অসাধ তা নয়। তবে কি জানো, ভাইটা মানুষ হল না, মার যে দুঃখ সেই দুঃখই রয়ে গেল। এভাবে আর কতদিন টানবে মা? তোমার পয়সাতেই বা কত নবাবী করব? সত্যি কথা বলতে কি, তুমিই বা ক'দিন আর? তার চেয়ে আমি যা-হোক কিছু কাজ-কর্ম করছি, রোজগারপাতি করছি, মা একটু বিশ্রাম পাচ্ছে এইটে দেখে যেতে পারো—সে-ই ভাল না?…আর তা ছাড়া, তুমিই তো বলো, যে যেমন সে তেমন থাকাই ভাল। আমি যে ঘরের

ছেলে—আমার হয়ত একটা পাস করাই উচিত হল না, চাল বিগড়ে যাবে কিনা কে জানে!'

হেমন্ত চুপ ক'রে ভাবল একটু। তারপর বলল, 'তা বটে। ভেবেছিলুম, ভালভাবে বি-এ এম-এ পাস ক'রে উকিল হবি কি ডাক্তার—। তা সেও ঠিক, আমার আওতায় থেকে আমার আশা-মতো মানুষ হলে টিকবে না। আমার যে কপাল!'

আর একটু চুপ ক'রে থেকে, আরও আস্তে বলে, 'ঐ জন্যেই তো এ বাড়িতে এনে রাখি না। আমার আপন কেউ হবে না, হলেও সইবে না—এ-ই বিধাতার লিখন। মিছিমিছি সে চেষ্টা আর করি না তাই। তা তাই কর, তুই তোর মতো যা হোক কিছু রোজগারপাতির চেষ্টা দেখ।...সত্যিই তো, তোর মা আর কতকাল এমন পরের দোরে ঝাঁট দিয়ে চালাবে! তাছাড়া—তুই কলেজে পড়বি, কে কোথায় বলবে তোর মা লোকের বাড়ি কাজ করে, কে হয়ত ঠাট্টা-তামাশা করবে তাই নিয়ে—শুনেছি ছড়া কাটায় এসব ক্ষেত্রে—মিছিমিছি একটা আঘাত। ছোটবেলা থেকে ঐ ইস্কুলে পড়ছিলি—কেউ আর নতুন ক'রে কিছু ভাবে নি তোর সম্বন্ধে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখানে আবার—। তা তোর দাদাটা কোথায়? তার বাবার মতো হয়েছে বুঝি? মদ-ভাঙ্ খায় খুব?'

'তা খায়। কিছু যদি ভাল কাজ-কর্ম করত সেই সঙ্গে তো বুঝতুম। কী যে করে তাও ঠিক জানি না। ভয় হয়, গুণ্ডামি ক'রে বেড়ায় কিনা।...তবে আমার মা লোকের বাড়ি কাজ করে এটা জানতে পারলে কে কি বলবে—সে আমি পরোয়া করি না। ইস্কুলেও তো জানত, বিশুর দয়ায় কি আর জানতে কারও বাকী ছিল, না কেউ তা নিয়ে টিটকিরি দেয় নি? ও আমি গ্রাহ্যও করি নি কোন দিন। বলেছি, হ্যাঁ তাই। তার পর? আমার সঙ্গে মিশতে ঘেন্না হয়, মিশো না। এসব ব্যাপারে কি জানো বড়মা, লজ্জা পাচ্ছি কি ঢাকতে চেষ্টা করছি এটা বুঝলে লোকে আরও রগড় পেয়ে যায়, আরও বেশী লাঞ্ছনা শুরু করে।'

হেমন্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভোলার দিকে। চমৎকার ছেলে, ছেলের মতো ছেলে। দেখতেও তেমনি। এরই মধ্যে তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠেছে। এই বুকের ছাতি, কোমরের কাছ সরু—পুরুষের মতোই চেহারা। খাটে খুব, মাকে সাহায্য করে যতটা সময় পায়—কে জানে হয়ত ব্যায়ামও করে কিছু কিছু। হাতের, কাঁধের গঠন দেখলে তাই মনে হয় অন্তত। একেই বলে সুন্দর। রঙ ফরসা নয়, মুখ-চোখও খুব একটা যে সাকারা তাও না—চোখটা আর একটু বড় হলে মুখখানা সুশ্রী দেখাত হয়ত—তবু দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় যেন। পুরুষ মানুষের এমনি চেহারা হওয়াই উচিত। নেশা করতে শেখে নি। দাঁতগুলো মুক্তোর মতো সাজানো, ধপধপ করছে সাদা—আর তেমনি, এখনও এমন ছেলেমানুষের মতো হাসে, ভারি মিষ্টি লাগে।

দেখতে অত বড়টা হলে কি হবে—ছেলেমানুষই আছে এখনও, সব দিক দিয়েই। বাতের শরীর হয়ে গেছে, পুজোর আসনে বসে জপ-আহ্নিক ক'রে ওঠার সময় হেমন্তকে অনেক চেষ্টা ক'রে বেঁকে-চুরে উঠতে হয়। এক-একদিন ভোলা সামনে থাকলে টপ ক'রে কোলে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়, নয়তো পা টেনে কোমর দলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সক্রিয় ক'রে তোলে। হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে হেমন্ত, 'এই, তোর কী কাপড় তার ঠিক নেই, রাস্তা বেড়ানো নিশ্চয়—আমাকে ছুঁয়ে দিলি!'

'বেশ করেছি। তোমার তো পুজো হয়ে গেছে। আর শুদ্ধ কাপড় পরে আছ তো!'

সত্যিই আপন মনে করে হয়ত—নইলে এমন জোর খাটাতে পারত না।

এখনও, সেই ছেলেবেলার মতো হেমন্তর এতটুকু অসুখ করলে আর বিছানার ধার ছেড়ে নড়ে না, হাঁ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। ইস্কুলে পর্যন্ত যায় না। 'তোমার মাথা টিপে দোব—বড়মা?' 'বড়মা—হাওয়া করব?' 'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে বড়মা?'

'কিছু খাবে না—খেতে ইচ্ছে করছে না?' অবিরাম এই ধরনের প্রশ্ন করে বসে বসে। এই সময়গুলোয় আনন্দে চোখে জল এসে যায় হেমন্তর। কে জানে, তারক বেঁচে থাকলে, তার আপন নাতি হলেও এমন করত কিনা!

[সঙ্গে সঙ্গে একটা অবান্তর কথাও মনে হয়। তারকের ছেলেও এত দিনে বুড়ো হয়ে যেত। তার নাতিই এত বড় হত হয়ত।]

শেষ—গত শ্রাবণ মাসের জ্বরটাতে একেবারেই উত্থানশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল—এই ছেলেটাই কোলে ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে নর্দমায় বসিয়েছে, শৌচ পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছে। খুব স্বাভাবিক-ভাবেই করিয়েছে। এতটুকু ঘেন্না করে নি, এতটুকু ইতস্তত: করে নি। নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করেছে। বদ্যিনাথের মা কি নিজের মাকেও আসতে দেয় নি। কেবলই মনে হয়েছে হেমন্তর তখন—এত সুখ ওর কপালে কি সইবে? বাচ্ছাটার না কিছু খারাপ হয়!···

একদৃষ্টে চেয়েই আছে ভোলার দিকে—মন চলে গেছে কোন সুদূরে—সাধারণ চলচ্চিত্রের চেয়ে ঢের দ্রুত, গত প্রায় এক শতাব্দীর ছবি, ভাগ্যের কাছে বার বার মার খাওয়ার ইতিহাস সরে সরে যাচ্ছে মনের সামনে দিয়ে—হঠাৎ ভোলার হা হা হাসিতে চমক ভাঙল, 'অমন অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে কি ভাবছো বলো তো? চোখটা আছে কিন্তু মনটা নেই—তা চাউনি দেখেই বুঝতে পারছি!'

'ভাবছি?···না রে, ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি যে, বিশেটা গিয়ে তো ঐ রিক্শার পিণ্ডি আমার ঘাড়েই এসে পড়েছে, ফেলতেও পারছি না গিলতেও পারছি না—এই অবস্থা, ঐটের ভার বরং তুই নে না, এমন তো কিছু কাজ নয়। সকাল-সন্ধ্যে একটু হারামজাদা-গুলোকে সামলানো, তোর সাইকেল আছে—সেটা খুব শক্ত হবে না। টাকাপয়সা আদায়, গাড়িগুলো আছে না ভেঙেচুরে রেখেছে সেইটে দেখা, আর রোজ হিসেবটা রাখা। ওর যা আয় হবে, সবই তোর, ও আমি তোকে দানই করলুম, আরও দু'টো কিনে দোব বরং—দু'টো

বা চারটে—সংসার চালিয়েও কিছু বাঁচবে, সময়ও থাকবে, তুই কলেজে ভর্তি হয়ে যা—'

'তোমার খুব ইচ্ছে—বড়মা ? আমি কলেজে পড়ি ?' বিচিত্র উৎসুক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে ভোলা।

'না, তা নয়। তুমি কলেজে পড়ে আর আমার কি চোদ্দপুরুষের মাথা কিনবে! তবে—পড়াশুনো হচ্ছে, কত ছেলের পিছনে তো কত চেষ্টা ক'রেও হয় না, মিছিমিছি বন্ধ করবি কেন ? এই আর কি, এই জন্যে বলা। একটা তো মাস্টারও লাগে নি তোর—এমনভাবে পাস করলি। মাস্টার রাখতে চাইলুম, তখন বারণ করলি—রাখলে জলপানি পেতে পারতিস।'

'তা যদি তুমি বলো তো ভর্তি হব। রিক্‌শাও দেখব, তবে দান করতে হবে না। অর্ধেক তুমি নিও, অর্ধেক আমাকে দিও। আমিই বা বিনিপয়সায় খাটব কেন, তুমিই বা শুধু শুধু অতগুলো টাকার কারবার ছাড়বে কেন ? তাছাড়া—বিশু যখন ফিরবে—ফিরতে একদিন হবেই—'

'উঁহু, সে হবে না।' দৃঢ়কণ্ঠে বলে হেমন্ত, 'তাকে আর এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে দোব না, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্তি থেকো। সে পাট চুকে গেছে। এখানেই আসুক কি যমের বাড়িই যাক—আমার তা দেখার দরকার নেই।...আমি ওকে চিনি বিলক্ষণই, বিশ্বাস করি নি কোনদিনই, ও ঝাড়ের কাউকেই আমার বিশ্বাস নেই।...তাই গাড়ি কিনেছি আমার নামে, লাইসেন্সও আমার। তুই নিলে তোকে লিখেপড়ে দোব।'

'সে যাক। এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই। ছাখো আমিই বা কি দাঁড়াই—কী মূর্তিধারণ করি! আমাকেই বা এত কিসের বিশ্বাস ?'

'তা বটে।' হাসে হেমন্ত। বলে, 'তবে পরে কি মূর্তি দাঁড়াবে তার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। যা পেয়েছি তাই আমার ঢের। তোকে থিতু ক'রে যাওয়াই আমার শেষ কাজ।'

আরও একটি বিয়োগান্ত ঘটনার আঘাত অদৃষ্টে ছিল হেমন্তর।

নিমাই।

নিমাই যে এমন হঠাৎ যাবে—চাকরি করতে করতেই—তা কেউ ভাবে নি। রিটায়ার করার সময় হয়ে গেছে কবেই, ওপর-ওলাদের হাতে-পায়ে ধরে একসটেনশ্যন নিয়েছিল। এই ক'টা মাস গেলে কী খাবে ছেলেপুলে, এই কথাই লিখত সে বার বার। গোপাল আর কতই বা আনতে পারবে। বিশুটাও যদি এই সময় মাথা দিয়ে দাঁড়াত সংসারে। কোথায় যে গেল হতভাগাটা!

এর প্রচ্ছন্ন অভিযোগটা বোধহয় হেমন্তর ওপরই। শুধু যে মানুষ করতে পারে নি তা-ই নয়, এমন যে নষ্ট হয়ে গেল, হারিয়ে গেল, সে জন্যেও সে-ই দায়ী।

ওদের দিক থেকে বলারও কিছু ছিল। ভোলা ঠিকই ধরেছিল—বছর দুয়েক বাদে বিশু ফিরেছিল এখানে। কঙ্কালসার চেহারা, অমন গোলাপী রঙ পুড়ে তামাটে দাঁড়িয়েছে, রুক্ষ চুল তাও বেশির ভাগই যেন উঠে গেছে, গাল চড়িয়ে রগ সুদ্ধ ভেতরে ঢোকা—মনে হল যেন, কোন রাক্ষসের পুরে গিয়ে পড়েছিল, ভেতরের রক্তমজ্জা সব তারা শুষে নিয়েছে। ছেঁড়া ময়লা কাপড়জামা পরে দীনভাবেই এসে ঢুকতে গিয়েছিল—মাথা হেঁট ক'রে, কিন্তু হেমন্ত ঢুকতে দেয় নি, দরজার কাছ থেকেই একরকম দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বস্তিনাথের মা বলতে গিয়েছিল, 'তা বাপু একটু না হয় চান ক'রে দু'মুঠো খেয়েই যেত, এত বেলায় এইভাবে চলে যাবে—গেরস্তর একটা কল্যেণ অকল্যেণ তো আছে—'

হেমন্ত জবাব দিয়ে দিয়েছিল, 'আমি কল্যেণ অকল্যেণের বার হয়ে আছি অনেকদিন বস্তিনাথের মা, আমার আর কিছু বাকী নেই—মরা ছাড়া।...চান ক'রে খেয়ে একবার গেড়ে বসলে তুমি তাড়াতে পারতে? এমনিতেই চোর ছিল, চুরি ক'রে বেরিয়ে গেছে—চুরি জুচ্চুরি দুই-ই—এতদিন কোথায় আরও কি শিক্ষা ক'রে ডাকাত খুনে হয়ে এসেছে কিনা জানো তুমি?...তোমার আর কি, শুকনো

সোহাগ দেখিয়েই খালাস, যদি গলা টিপে খুন ক'রে রেখে যথাসর্বস্ব নিয়ে যায় তো আমারই প্রাণটা যাবে। না, ও দায়িত্ব নিতে পারব না, যার শখ হয়েছে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে!'

সে শখ মেটাতে কারও সাহসে কুলোয় নি—বলা বাহুল্য। সেদিন বেরিয়েই যেতে হয়েছিল বিশুকে। বিশ্বনাথের মার তো আলাদা বাসাই নেই, সে নিয়ে যাবে কোথায়?

তবে এদের কারও আশ্রয় দেবার উপায় না থাকলেও সেদিনের মতো দুর্গতিটা নিবারিত হয়েছিল।

ওখান থেকে বেরিয়ে সেই অবস্থাতেই গিয়ে সোনারপুরার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল—ইচ্ছে ক'রেই খুব সম্ভব—ভোলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভোলা আগেই মান-সরোবরের বাড়িতে গিয়ে পড়ে সব শুনেছে, সে কতকটা ওর খোঁজেই বেরিয়েছিল। ভোলাই টেনে নিয়ে গিয়ে একটা হোটেলে খাইয়েছে, সেখানেই জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছে সব কথা। বোম্বেতে ফিল্ম-স্টার তো নয়ই—অন্য কোন জীবিকারও কোন ব্যবস্থা হয় নি, কমলেশ্বরের বাবা তাকে ধরে এনেছিল, কিন্তু বিশু আসে নি। তখনও তার মোহভঙ্গ পুরোপুরি হয় নি। আরও যত দিন পেরেছে বোম্বেতেই থেকেছে, শেষে এক চায়ের দোকানে ক'দিন কাজ করে, সেখান থেকে একজনের বাড়িতে বাসন-মাজা কয়লা-ভাঙার কাজ—তারপর এক সার্কাসওলার দলে ভিড়ে যায়।

খেলা শেখাবার নাম ক'রে নিলেও, সেখানেও বেশির ভাগ সময়েই ম্যানেজারের তাঁবুতে চাকরের কাজ করতে হত—মাতাল হয়ে মারধোরও করত, এক-একদিন সারা রাত্ জেগে দৈহিক সেবা করতে হত। অনেক রকমের সেবা। তবু উপায় ছিল না বলেই ছাড়ে নি, পাঁচজনের খোশামুদি ক'রে কিছু কিছু খেলাও শিখেছিল। এইভাবে তাদের সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে কোচিনে এসে রক্তআমাশা ধরে—তাতেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। কোম্পানীর অন্যত্র বায়না ছিল, ওকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে তারা চলে গেল।

মাইনে কিছু ঠিক হয় নি, কথা ছিল কাজ শিখলে মাইনে ধার্য হবে। তারা টাকা-কড়ি কিছুই দিয়ে যায় নি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে একরকম ভিক্ষে করতে করতে এত দূরে এসেছে। হাতে এমন একটিও পয়সা নেই যে, এক কাপ চা কি একটা বিড়ি খায়।

ভোলা হোটেল থেকে নিয়ে গিয়ে জামা-প্যান্ট কিনে দিয়েছে, গেঞ্জি জুতো—মায় গামছা পর্যন্ত। নিজের বাড়িতে রাখতেও চেয়েছিল, বিশু রাজী হয় নি। বলেছে, 'যেখানে রাজত্ব করেছি সেখানে ভিখিরি সেজে থাকতে পারব না। আর বামুনের ছেলে ঝিয়ের বাড়ি থাকব কি! তুই আমাকে কলকাতায় যাবার গাড়ি-ভাড়াটা ধার দে, আমি এসব পরে কড়ায়-ক্রান্তিতে শোধ দোব। মনে করিস নি আমাকে ভিক্ষে দিচ্ছিস!'

আরও হয়ত কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন আর বলে নি। টাকাটা হাতে পেয়ে বলেছে, 'টাকা হলে দোব ঠিক। তুই জুচ্চুরি ক'রে ঠাকমাকে তেলিয়ে আমার রিক্‌শাগুলো নিয়েছিস, আরও কত আদায় করছিস মাথায় হাত বুলিয়ে কে জানে! আমারই হক্কের পয়সা—তা হলেও এভাবে নোব না। টাকা ফেরত পাবি জেনে রাখিস। আমরা ভিক্ষে দিতেই শিখেছি—নিতে নয়।'

ভোলা এই ইতর আঘাতের বদলে কোন প্রত্যাঘাত করে নি, হেসেছে শুধু—ওর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি। বলেছে, 'থাক না ভাই, এই তো ক মিনিটের দেখা, আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই। মিছিমিছি এইটুকুর জন্যে এসব কথা তুলে লাভ কি? রিক্‌শা তোমারও নয়, আমিও নিই নি। বড়মার রিক্‌শা তাঁরই আছে—প্রত্যহ তাঁকে হিসেব বুঝিয়ে দিই। তিনিই আমাকে যেটুকু পারিশ্রমিক দেবার সেইটুকুই দেন। তার বেশী আমার দরকারও নেই। এও আমি চাই নি, তিনিই দেন।'

তার জবাবে মুখ ভেঙিয়ে বলেছে বিশু, 'থাক না চাঁদু, ও সব কাকে শেখাচ্ছ! আমি সব জানি। ছোটবেলা থেকে বুড়ির

খোশামোদ ক'রে ক'রে আর আমার নামে লাগিয়ে লাগিয়ে কাজ গুছনো হয়েছে। তোমার শয়তানী আমার জানতে বাকী নেই।'

বলতে বলতেই একটা রিক্‌শায় উঠে পড়েছে, 'সিকরোল চলো' বলে।

কিন্তু কলকাতায় যায় নি। হেমন্তর নির্দেশমতো ওর জবানীতে আশাকে একটা চিঠি দিয়েছিল ভোলা। তার উত্তরে ওরা উৎকণ্ঠিত হয়ে জানিয়েছিল যে, বিশু আসেও নি, কোন খবরও দেয় নি। তার কোন খবরই এতাবৎ পাওয়া যায় নি কোথাও থেকে।

খবর পেয়েছে অনেক দিন পরে। বিশুরই আর এক বন্ধু গৌতম এলাহাবাদ গিছল বোনের শ্বশুরবাড়ি, সেখানে দেখেছে বিশুকে, কোন এক হোটেলের হয়ে স্টেশনে ট্রেন 'য়্যাটেণ্ড' করে—প্যাসেঞ্জার পেলে ধরে নিয়ে যায়। তারা শুধু থাকতে আর খেতে দেয়, লোক নিয়ে যেতে পারলে বিলের ওপর একটা কমিশন, তাও নামমাত্র।

তার কিছু দিন পরে অন্য একজন কে এলাহাবাদ গিছল—ভোলার চেনা লোক, ভোলা তাকে খবর নিতে বলেছিল। সে প্রথমে স্টেশনেই খুঁজেছে। সেখানে না দেখতে পেয়ে পরে এক সময়ে হোটেলেও খোঁজ করেছে। হোটেলের ম্যানেজার কিছু বলেন নি, এক 'বয়' খবরটা দিয়েছে। কি একটা সার্কাসের দল এসেছিল এলাহাবাদে—ওর সে আগেকার দল নয়—তবে আগে সার্কাসের দলে কাজ করেছে শুনে তারা নিতে রাজী হয়েছে—তাদেরও নাকি লোক দরকার ছিল—তাদের সঙ্গেই চলে গেছে রাজস্থানের দিকে।

তার পর থেকে এরাও আর কোন খবর পায় নি বিশুর।

প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য অভিযোগ যা-ই হোক, হেমন্ত গ্রাহ্য করে না।

এখানেও যে মেয়েমহলে অনুযোগ একটু না উঠেছিল তা নয়, 'কি কাঠ প্রাণ বাবা, সেই এতটুকুটি থেকে মানুষ করলে—ছেলের মতো, কত আদর-যত্ন-আদিখ্যেতা ত্যাখন, অমনি এক কথায় চিত্তির এত চটে গেল যে, পথের ঘেয়ো কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিলে। আজকালকার ছেলেপিলেরা অমন কত কি করছে, মা-বাপের বাক্স

ভেঙে পালানো—এ তো আকছার। তাই বলে কে আর অমন ক'রে তাড়াচ্ছে!···নিজের ছেলে হলে কি আর ও-ই পারত!···অমন ছেলেটা রাজপুত্তুরের মতো—জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল হয়ত।'

এসব কানে আসে বৈকি। এই ধরনের নানা কথা।

ভোলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দোব নাকি বড়মা?'

'কেন, পয়সা খুব সস্তা হয়েছে—না কামড়াচ্ছে? বিজ্ঞাপন দিয়ে কি করবি? ফিরে এলে রাখবি কোথায়? আমি এখানে আর ঢুকতে দোব না এটা নিশ্চিত জেনো। শ্বশুরের বংশের নেশা আমার ছুটে গেছে। ওদের হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছি—সব এক ক্ষুরে মাথা কামানো। ওরই মধ্যে দৈত্যকুলের পেল্লাদ যা নিমেই বরং—চোর-জোচ্চোর নয়, এটা বলব হক কথা। হয়ত সবটা পাবার লোভেই ছোট ছোট লোভ সামলে ছিল, তা সেটুকু ধৈর্যও তো ওদের গুষ্টির আর কারও দেখলুম না।···না, ও আমার মন থেকে চলে গেছে। ঢের করেছি, আর না। লোকের আর কি—লোকে অনেক কথা বলে। যার নিজের বাজে সে-ই জানে কতটা বাজল। অপরের ওপর দিয়ে আহা-উহু করা খুব সোজা।···তুই সেই কথামালার গল্প পড়িস নি—লোকের কথা শুনতে গিয়ে সেই বাপ-বেটার কি হয়েছিল?—সেই যারা গাধা নিয়ে হাটে যাচ্ছিল বিক্রী করতে? কথামালাই তো? কে জানে ঠিক মনে নেই কোন্ বই, তবে পড়ানো হয়—পড়ে সবাই। এ গল্পগুলো ছোটবেলায় পড়ানো হয় জীবনে কাজে লাগবে বলে—অমনি অমনি নয়। সংসারে ঢুকলে পদে পদে ঠেকতে হবে, তখন ঐ সব দৃষ্টান্তের কথা ভাবিস—রেহাইয়ের পথ পেয়ে যাবি।'

আর কিছু করা হয় নি। অন্য কোন খোঁজ-খবরের ব্যবস্থা।

তারপরই এই খবর।

কিছুদিন ধরেই ভুগছিল নিমাই। আজ আমাশা, কাল বাত—

বাতই বেশী। বাতে শয্যাগতও থেকেছে ক'দিন ধরে। মধ্যে একবার নাকি নিমোনিয়াও হয়ে গেছে—অর্থাৎ শরীর ভেঙে এসেছিল। কিন্তু ঘরে বসে বিশ্রাম করার উপায় ছিল না, ও পক্ষের দু'টি এ পক্ষেও তিনটি ছেলেমেয়ে। কমলা মাথায় মাথায়—বিয়ের বয়স পেরিয়েই গেছে বলতে গেলে, পরের মেয়েটিও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে অনেক দিন। লেখাপড়া শেখাতে পারে না। হেমন্ত কিছুদিন সাহায্য করেছিল, মধ্যে বন্ধ ক'রে দেয়—এখন আবার কিছু কিছু দিচ্ছে। সে টাকা ছোট দু'টোর পড়ার খরচেই বেরিয়ে যায়।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন আপিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সবাই ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এল, ডাক্তারও ডাকা হল তখুনি—দেখা গেল প্রচণ্ড ব্লাড প্রেসার। ওর যে এত প্রেসার আছে, এত প্রেসার হতে পারে তাই কেউ ভাবে নি। আজকাল তো খেতেই পায় না বলতে গেলে, রোগা চিমড়ে চেহারা, তার হাই প্রেসার কি ক'রে হয় কে বুঝবে! ইদানীং মাঝে মাঝে বলত, 'বিকেলের দিকে বড় মাথার যন্ত্রণা হয়—বোধহয় চশমাটা পাল্‌টাতে হবে—কি যে করি, কোন মাসেই তো আর হাতে কিছু থাকছে না।' কিন্তু প্রেসারের কথা কারও মনে হয় নি। বরং এর ঠিক আগে দু' দিন মাথা ঘুরেছে, আপিসে সবাই বলেছে, 'লো প্রেসার, ভাল খাওয়া-দাওয়া করো। ডিম মাংস খাও।'

ডাক্তার দেখিয়ে জ্ঞান হয়েছে, ওষুধ ইঞ্জেকশ্যন পড়েছে—আপিস থেকে আজকাল চিকিৎসার খরচ পাওয়া যায় কিন্তু সে পরে হিসেব ক'রে নিতে হয়, এখন কে করে? তবু আপিসের বন্ধুরা, এই বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা—কিছু কিছু চাঁদা তুলে সব ব্যবস্থাই করেছে; সবাই ভাবল এ যাত্রা সামলে গেল।

কিন্তু হঠাৎ দিন তিনেক পরে একদিন ভোরবেলা বলেছে, 'বুকটায় বড্ড ব্যথা করছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো।' আশা ভয় পেয়ে তখনই গোপালকে ইশারা করেছে, গোপালও খালি-পায়ে

খালি-গায়ে—যেমন ছিল তেমনি দৌড়েছে ডাক্তার ডাকতে—কিন্তু ডাক্তার এসে পেঁৗছবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

আশা আগে একটা টেলিগ্রাম করেছিল, পরের দিন চিঠি লিখেছে। লিখেছে বোধহয় কমলা—আশার জবানীতে, আশার হাতের লেখা নয়, এ চিঠি তার পক্ষে লেখা সম্ভবও নয়, এত তাড়াতাড়ি—কিন্তু শেষ যে করুণ ক'টি ছত্র, সে আশারই, আঁকাবাঁকা লেখা, এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে, অতিকষ্টে পাঠোদ্ধার করে হেমন্ত।

লিখেছে 'একবারটি আসুন মা, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি। এ বিপদে কেহ একটা উপদেশ কি পরামর্শ দিবে এমন লোক নাই। এই সব অপোগণ্ডর দল আমার মুখ চাহিয়া আছে, প্রতি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—আমি কাহার কাছে যাই, কি করি? এমন অসহায় কখনও বোধ করি নাই, মাথার উপর এমন একজনও নাই যে, এ বিপদে বুক দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। পাড়ার লোক আপিসের লোক অনেক করিতেছে—তবে পরে আর কত করিতে পারে, তাদেরও তো অবস্থা ভাল না। বাপের বাড়ির দিকে এমন কেহ নাই যে, আসিতে পারে—বা আমি গিয়া দাঁড়াই। এ বিপদে ত্যাগ করিবেন না মা, টাকা নয় শুধু, আপনি না আসিলে চলিবে না। একবারটি আসুন, দোহাই আপনার।'

চিঠি পড়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল হেমন্ত।

অপরাহ্ণ তখনও ম্লান হয় নি—বেলা দু'টো কি আড়াইটে হবে, গঙ্গাবক্ষ জনহীন, নৌকাহীন। নিচে ঘাটের দিকেও বিশেষ কেউ নেই। ওপারে রামনগরের চড়া প্রখর সূর্যালোকে ঝকঝক করছে, সেদিকে চেয়ে থাকলে একটু পরে চোখে লাগে। বাতাস বিশেষ নেই, সামান্য এক এক ঝলক যা আসছে মধ্যে মধ্যে—গরম।

কিন্তু এসব কিছুই দেখতে পেল না হেমন্ত।

না, দৃষ্টিশক্তি এখনও তেমন ক্ষীণ হয় নি, দূরের জিনিস স্পষ্ট না হোক, ভালই দেখে। এমনিই, চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে বলেই

কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সব যেন লেপে-মুছে একাকার হয়ে গেছে, বাইরের জগৎ তো বটেই—মনের মধ্যে স্মৃতিগুলোও বুঝি সেই সঙ্গে।

দুঃখ নিমাইয়ের জন্যে তত নয়—তবে কিছুটা হচ্ছে ঠিকই। শ্বশুর বংশের যাকে যাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাদের মধ্যে নিমাই-ই তবু কিছুটা মানুষের মতো। ভুল করেছে বোকা বলে—খুব একটা অসৎ বা কর্মবিমুখ নয়। তবু—দুঃখ আজ বেশী হচ্ছে আশাটার জন্যেই। এ যে কি অসহায় অবস্থা মেয়েদের, কি সাংঘাতিক বিপদ তা হেমন্ত বেশ জানে।

আশার চিঠিটা পড়ে, আজ এত কাল পরে—এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ কি আরও একটু বেশী পেরিয়ে এসে নিজের এই দিনের কথা মনে হচ্ছে। ঠিক এমনি অসহায় বোধ হয়েছিল। না, আরও বেশী, তার চারিদিকে নির্মম শত্রুই ছিল সেদিন, মিত্র একটিও নয়—আশাকে তবু পাড়া-প্রতিবেশীরা সাহায্য করছে, আপিসের বন্ধুরাও। অন্তত মরণ টেঁকে কেউ বসে নেই। তাছাড়া—আশার সে বয়সও নয়, যে বয়সে হেমন্ত এমনি পথে বসেছিল।

তা হোক, তবু নিজের অবস্থা দিয়েই অবস্থা বুঝেছে। আর সেই জন্যেই দীর্ঘ দিনের ক্ষয়ে-যাওয়া শুকনো চোখ দু'টো আবার ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছে বার বার, কিছুতেই যেন চোখের জল সামলানো যাচ্ছে না।

ভোলা চুপ ক'রে পিছনে বসে ছিল। চিঠিটা সে পড়েছে। অথবা বলা উচিত সে-ই পড়েছে, পড়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় বড়মার মনের ভাব কি হচ্ছে তা তার বুঝতে বাকী নেই। তেমনি এও জানে যে, এখন বাজে কথা বলার কি বাজে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করাও—শুধু বৃথা নয়, এ মানুষের কাছে বিরক্তিকর।...

অনেকক্ষণ সময় লাগে নিজেকে সামলে নিতে, তারপর চুপি চুপি প্রায় বুজে-আসা গলায় বলে, 'তাহলে তো যেতে হয় রে একবার, কি বলিস?'

'হ্যাঁ, চলো তাই যাই। তাড়াতাড়িই তো যাওয়া দরকার

তাহলে, দশ দিন তো অশৌচ তোমাদের—তার মধ্যে চার দিন তো কেটেই গেল। টিকিট নিয়েই হবে মুশকিল। দেখি আমার এক বন্ধুর দাদা আছেন, বাবুলালদা—তাঁকে ধরে যদি পাই—'

'চলো মানে, তুই যাবি নাকি?' যেন চমকে ওঠে হেমন্ত, শুধু বিস্ময়ে নয়—আনন্দের আঘাতেও খানিকটা। নতুন একটা আশার আনন্দ।

'ওমা, তা তোমাকে কি একলা ছেড়ে দোব নাকি? এই অবস্থায়?'

'না, তা নয়, মানে ভাবছিলুম যে, তুই যদি তুলে দিতিস এখান থেকে, একটা রাত্তিরের তো মামলা—ওখানে গোপালকে টেলিগ্রাম ক'রে দিলে সে নামিয়ে নিত—'

'সে হবে না। তোমাকে একলা আমি যেতে দোব না। এক রাত্তিরও অনেক সময়। তাছাড়া সে ঠিক সময়ে তার পাবে কিনা, এসে খুঁজে পাবে কি না—। ওকথা বাদ দাও।'

'তবে চ'। তুই গেলে তো ভালই হয়। আমি কি খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলুম? তা নয়। তুই সঙ্গে থাকলে তো নিশ্চিন্তি, তেমন কিছু হলে তুই-ই আমার মুখে জল দিতে পারবি। তবে, এখানের কথাও ভাবছি। বত্তিনাথের মাও নেই। যা দিনকাল। কে দেখবে—!'

'সে বাড়িওলারাই তো আছেন। ওঁদের তো একপাল ছেলে—কেউ এসে শুতে পারবে না? না হয় আমার মা-ই থাকবে ক'টা দিন। এমনি দিনের বেলা তো থাকবেই—'

'তবে তাই হোক, তুই এখনই চলে যা—টিকিটের চেষ্টা দেখ গে। দু'খানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট করবি—'

'দু'খানা কেন—তোমার একটা করি, আমি থার্ড ক্লাসে দিব্যি চলে যাব!'

'উঁহু। তা হবে না। গেলে একসঙ্গেই যাব। এক গাড়িতে যদি না রইলি তাহলে আর সঙ্গে থেকে কি লাভ হল?'

হা-হা ক'রে হেসে ওঠে ভোলা, 'বদলা নিচ্ছ বুঝি? কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে আমি শুতে পারব? সইবে?'

'খুব সইবে। বিধাতা তোর কপালে অনেক দিয়েছেন—আমি বলে যাচ্ছি। আমার দয়া নিতে হবে না তোকে, তুই নিজেই নিজের উন্নতির পথ ক'রে নিতে পারবি। দেখে নিস একদিন বুড়ির কথা সত্যি হয় কিনা।'

ভোলা হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেয় একবার।

॥ ৩৫ ॥

হেমন্ত আগে ভেবেছিল শ্রাদ্ধশান্তি চুকলেই কাশীতে ফিরে যাবে—কিন্তু তা হল না। আশা এত কান্নাকাটি করতে লাগল, তাদের এমনই অসহায় অবস্থা যে, সে দেখে আর ফেলে যেতে পারল না। ভোলাকেই পাঠিয়ে দিল, বলে দিল, 'আমি চিঠি লিখলে কি তার করলে এসে নিয়ে যাস।'

ভোলার অবশ্য বড়মাকে এভাবে একা রেখে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এরাও মাত্র দেড়খানা ঘরে বাস করে এতগুলি প্রাণী—এর মধ্যে অপরিচিত ও আপাত-পরিচয়ে-হিন্দুস্থানী জোয়ান ছেলেকে কোথায় রাখে, কোথায় শুতে দেয়। যে দু'দিন ছিল, বাড়িওলাদের বলে ছাদে শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল আশা, কিন্তু সে খোলা ছাদ, মশারি টাঙাবার কোন উপায় নেই, দু'রাতই মশার কামড়ে চোখে-পাতায় করতে পারে নি বেচারী। তবু সে নিজে থেকে যেতে চায় নি। হেমন্তই বুঝিয়ে বলে ফেরত পাঠাল।

এদের যে অবস্থায় ফেলে গেছে নিমাই তা অবর্ণনীয়। মাইনে—মাগ্‌গীভাতা সব জড়িয়ে মাস গেলে গোপাল পায় মাত্র একশো ত্রিশটি টাকা। সবদিন ওভারটাইম হয় না—হলে আর কিছু বেশি। এ-ই এদের এখন একমাত্র ভরসা। আর কোথাও কিছু নেই—পোস্ট-আপিসে বোধহয় গোটা চল্লিশ টাকা পড়ে আছে, সেও

নিমাইয়ের নামে, সে এখন বিশ হাত জলে। গহনা বলতে আশার হাতে ব্রোঞ্জের ওপর সোনা-বাঁধানো তিনগাছা ক'রে চুড়ি, চারগাছা ক'রেই ছিল—অতবড় মেয়ে কমলা শুধু হাতে ঘুরে বেড়ায় বলে তাকে একগাছা ক'রে পরিয়ে দিয়েছে।...ভাল খবরের মধ্যে এ পক্ষের বড়ছেলে আশিস এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে—যতদূর যা মনে হয়—অন্য পরীক্ষার ফলাফল দেখে—পাসও করবে। তারপর দু'টি ছেলেমেয়ে—মেয়েটি ক্লাস এইট, ছেলেটি সেভেন্-এ পড়ে।

আশিসের আর পড়া হবে না—নিমাইয়ের বন্ধুরা আশ্বাস দিয়েছে যে—তারা 'সায়েব'কে বলে রেখেছে (এখনও আপিসের ওপরওলা মাত্রেই সাহেব)—নিমাই বেচারী পেন্‌সন্ গ্রাচুইটি কিছুই পেল না, এতকাল কাজ ক'রে গেল—সেই হিসেবেই ইউনিয়নের অনুমতি নিয়ে তিনি ওকে একটা চাকরি দেবেন, আপাতত অস্থায়ী—তারপর লোক দেখানো একটা পরীক্ষায় বসিয়ে পাকা ক'রে দেবেন। এ সুযোগ কোনমতেই ছাড়া উচিত নয়, জিনিসটা পুরনো হয়ে গেলে এর কোন গুরুত্বই থাকবে না; নিমাইয়ের কথা ভুলেই যাবে হয়ত—আজ যারা এত চেষ্টা করছে তাদেরও উৎসাহ জুড়িয়ে যাবে, এ সাহেবও হয়ত বদলি হয়ে যাবেন। ইউনিয়নের কে নতুন সেক্রেটারী হবে—সেও তখন বাগড়া দিতে পারে, আজকের সহানুভূতির আবেগ তাকে স্পর্শ করবে কেন ? সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্।

এদিকে কমলার একটা সম্বন্ধ অনেকদূর এগিয়ে আছে, মেয়ে সুশ্রী দেখে তারা অল্পেই রাজী হয়েছে। ছেলেটি গোপালের কারখানাতেই কাজ করে, অনেক আগে ঢুকেছে—একটা পাস—মোটামুটি শ' তিনেকের মতো পায়, আগড়পাড়ায় নিজেদের বাড়ি আছে। পাঁচশো টাকা নগদ, হার-চুড়ি—তা চুড়ি ব্রোঞ্জের ওপর হলেও চলবে—বাকী যা সাধারণ দান, বরের আংটি বোতাম ইত্যাদি। ঘড়ি দিতে হবে না, বর নতুন ঘড়ি কিনেছে সম্প্রতি। তাহলেও—সব সুদ্ধ, ঘরখরচা ধরে হাজার তিনেকের কম নয়। যার হাতে

এক পয়সা নেই, সে এ সম্বন্ধ করছিল কী ভরসায় কে জানে—হয়ত হেমন্তরই ভরসায়। সবাই মিলে গিয়ে পায়ে পড়বে ভেবে রেখেছিল।

এখন সব শুনে হেমন্ত আশাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কি বুঝছিস, ছেলে ভাল ?'

আশা মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিল, 'যতদূর শুনেছি—খুবই ভাল। খোকার সঙ্গে এসেও ছিল দু'একবার, কথাবার্তা তো মন্দ নয়। দেখতেও মোটামুটি ভালই, কমলার সঙ্গে বেমানান হবে না।'

'তবে ছ্যাখ—বিয়ের দিন ঠিক কর।'

'এখনই—?' চমকে ওঠে আশা, 'কালাশৌচ চলছে তো, তা ছাড়া—এই মনের অবস্থা—'

'আমার সাহায্য যদি পেতে হয় তাহলে আর দেরি করা চলবে না।' স্পষ্টভাষণই করতে হয় হেমন্তকে। আশা এত ভেঙে পড়েছে—দেহে ও মনে দুই-ই যে, এখন এধরনের কথা বলতে কষ্টই হয়—তবু, ওরও আর সময় নেই। একটু থেমে তাই আবার বলে, 'আমার বয়েসের অবস্থাটা ভেবেছিস ? তাছাড়া—মন খারাপ, চুপ ক'রে বসে থাকলে আরও খারাপ লাগবে, আরও মুষড়ে পড়বি। আমার কথাটা ভাব দিকি, যেমন আমাপা পরমায়ু দিয়েছেন বিধাতা—তেমনি শোকও যুগিয়ে রেখেছেন ছালা বোঝাই ক'রে। কতগুলো শোক পেলুম বল্ দিকি, জীবনে! ও কিচ্ছু না, কাজ করতে হবে, ছেলে-মেয়েদের মানুষ ক'রে সংসার দাঁড় করাতে হবে—এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন ? ··এদের ওপরই তো ভরসা। তোরও একটা গলার কাঁটা রয়েছে—সেটা ওলাবার কথাও তো ভাবতে হবে, তার বে-র কথা। এটাকে পার না করলে চলবে কেন ? লেখাপড়া শিখলেও না হয় চাকরি-বাকরি ক'রে খেতে পারত। এমনি ধুম্বো মেয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখলে—শেষে হয়ত একটা রিক্শাওলার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। না না, এসব কোন কাজের কথা নয়, তুই পুরুত ডাক। আমি যতদূর জানি বে-র ব্যাপারেই কালাশৌচ কাটিয়ে নেওয়া যায়—আগাম সপিণ্ডিকরণ করিয়ে। তা যদি হয়, সামনের কেষ্টপক্ষে একটা

একাদশী দেখে সেরে নিক গোপাল। বসে বসে কাঁদলে চলবে না এখন, কান্না তো পড়েই রইল জীবনভোর।'

হেমন্তর মনের জোর ওদের ঠেলে নিয়ে যায়। সক্রিয় হতে বাধ্য হয় ওরা। এইটুকু জায়গার মধ্যে থাকা, পাঁচটা ভাড়াটে, ক্যালব্যাল করছে ছেলেমেয়েরা—খুবই কষ্টকর, কিন্তু এদের একটা কিছু সুব্যবস্থা না ক'রে যেতেও পারে না, আরও আশার মুখ চেয়ে। আশাটা যেন কী পেয়ে বসেছে ওকে। ছোট্ট মেয়েরা অপরের কাছে মার খেলে বা ভয় পেলে যেমনভাবে মাকে জড়িয়ে ধরে—তেমনিভাবে যেন আঁকড়ে ধরেছে ওকে।···যাকে বিয়ে দিয়ে এনেছিল, সে কখনও এমনভাবে ওর ওপর নির্ভর করতে পারল না—যে কখনও দেখে নি ওকে, বোধহয় হাতে গোনা যায় সব সুদ্ধ ক'দিনের পরিচয়—সে-ই আপন ক'রে নিল অনায়াসে। একেই বোধহয় বলে প্রারব্ধ—পূর্ব-জন্মের সংস্কার।

যত তাড়াতাড়িই করুক—কমলার বিয়ে চুকতে প্রায় তিনমাস গড়িয়ে গেল। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ ছাড়া বরপক্ষ রাজী হল না। তাদের বড় ছেলে, জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবে না, বৈশাখ ছেলের জন্মমাস।

অগত্যা থাকতে হল হেমন্তকেও।

খুব খারাপও লাগে না বোধহয়।

আশা খুবই যত্ন করে। জীবনে এমন সেবা কখনও পায় নি সে। এমনি যতই অসুবিধে হোক—এই লোভেই আরও থেকে যায়। রোজ রাত্রে গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে পা টিপে ঘুম পাড়ায়। পাখা নেই বাড়িতে, রাত্রে উঠে উঠে গায়ে হাত দিয়ে দেখে ঘাম হচ্ছে কিনা, তা বুঝে বসে বাতাস করে হাতপাখা দিয়ে।

অবশ্য একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই এই তিনমাস।

ব্যাপারগতিক দেখে কী করতে হবে আগেই মনস্থির ক'রে ফেলে-ছিল। আপিস তখনও আপিসে ঢোকে নি—যে-সব পুরনো দালাল কাজ-কারবার করত ওর সঙ্গে—ঠিকানা দিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছিল তাদের খোঁজে। দেখা গেল, সবাই মরে গেছে—এক যাদুবাবু ছাড়া।

যাদুবাবু যখন প্রথম ওর সঙ্গে কাজ করে, একটা জমি বিক্রী করিয়ে দেয়—তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ, এখন ষাট পেরিয়ে গেছে। তবু হেমন্তর নাম করতেই এসেছে সে এতখানি পথ পাতিপুকুর পর্যন্ত।

কার জন্যে কী জন্যে তখনও বলে নি কাউকে। যাদুগোপালকেও বলল না। শুধু বলল, 'কাশীপুর অঞ্চলে কি দমদমে—যদি খাস কাশীপুরে না পাওয়া যায়—একটা ছোট বাড়ি দেখে দিতে পারেন? এমনভাবে বাড়ি হবে—হয় ওপরে থেকে নিচে ভাড়া দেওয়া যাবে, নয়তো—একতলা হলে—একদিকটা অন্তত তিনখানা ঘর দরকার। দেখে দিতে পারেন?'

'টাকা? কত টাকার মধ্যে হবে—কিছু বাঁধাবাঁধি আছে?' যাদুগোপাল জিজ্ঞাসা করে।

'যতটা কমে হয়। এ তো সোজা কথা। যে কিনবে সে চাইবে কম দিতে, যে বেচবে সে চাইবে যতটা বেশী পাই—এই তো? তবে তিরিশের মধ্যে হলেই ভাল হয়।'

'উঁহু! হবে না। এখন অত্যাধিক দাম জমিবাড়ির, সেদিন আর নেই। দিন দিন হু-হু ক'রে বাড়ছে।'

'নেই সে আমিও জানি। নইলে তিরিশ বলব কেন, দশই তো বলতুম। তা দেখুন কতয় পান। তবে কোন গোলমাল না থাকে, কিংবা একশো বছরের পুরনো না হয়।'

দু' একটা খবর নিয়ে এল যাদুগোপাল দু-চার দিনের মধ্যেই—কিন্তু কোনটা জুৎ লাগল না। তার ভাষাতে 'অত্যাধিক' দাম, 'অত্যান্ত' বেশী। যেটা কম দাম—একটু খোঁজ নিতেই দেখা গেল ওয়ারিশন নিয়ে গোলমাল।

শেষে, দিন পনেরো পরে একদিন এল লাফাতে লাফাতে।

'পাওয়া গেছে মা, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন। বামুনের গরু একেবারে যাকে বলে। কাশীপুরে হল না, এ সিঁথির মধ্যেই—একটু ভেতর দিকে, মানে বড় রাস্তা থেকে খানিকটা যেতে হয়—তবে বেশ পাড়াগাঁয়ের মতো। রিক্‌শা যায় ভেতরে, বাড়ির দোর পর্যন্ত, সেদিক

দিয়ে কোন অসুবিধে নেই। পনেরো বছরের বাড়ি, মাল মেটিরিয়েল ফার্স্ট কেলাস, বলেছে ভাল ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে দেখাতে পারেন, যদি খারাপ বলে তার খরচা আমি দোব। একতলা বাড়ি, দোতলার ভিত—চাই কি হাল্‌কা ক'রে তেতলাও উঠবে। খালি জমি পড়ে আছে সেও পেরায় ধরুন দেড়কাঠার মতো, দু'টো নারকোল গাছও আজ্যেছে ভদ্দরলোক। বাড়িওলা থাকে দু'খানা ঘর নিয়ে, একটা বেশ বড়—মাঝে পার্টিশান দিলে দু'টো মাঝারি ঘর বেরোবে, তাছাড়া রান্নাভাঁড়ার আছে, য়্যাসবেস্টশের চাল, সেও স্বচ্ছন্দে রান্নাঘরে ভাঁড়ার রেখে একটা শোয়ার ঘর ক'রে নেওয়া যায়। রাস্তার দিকে এক ফালি বারান্দাও আছে, সেও ধরুন ঘিরে নিতে পারেন। যেদিক দিয়ে যাবেন—ফার্স্ট কেলাস একেবারে!'

'আর? আমি যা চেয়েছিলুম?' হেমন্ত প্রশ্ন করে।

'আছে, সেও আছে। বলছি। সবদিক না দেখে কি আর উদ্ধ্‌শ্বাসে এইছি? দেড়টা ট্যাকাই খরচা হয়ে গেল এখেনে আসতে।... একদিকে একখানা ঘর, একটা ছোট রান্নার জায়গা, আলাদা কল-পাইখানা নিয়ে একঘর ভাড়াটে আছে, ষাট টাকা ভাড়া দেয়। হিন্দুস্থানী, কোথায় কি কারবার আছে, স্বামী স্ত্রী, একটা বাচ্চা—কোন ঝঞ্ঝাট নেই, খুব ভাল ভাড়াটে ওঁরা বললেন, কোন মাসে দু'-তারিখ হয় না ভাড়া দিতে। বললে, সময় দিলে ওঁরা ভাড়াটে তুলে দিতে পারবেন—তবে লাভ কি? বাড়িওলারা বললেন, ভাড়াই যখন দেবেন তখন এমন ভাড়াটে তুলবেন কেন? এখানে একখানা ঘরে কে এত ভাড়া দেবে? নিহাৎ ওর এইখানে দোকান, তাই—।'

'তা বাড়িওলা বেচছে কেন?'

'ছেলের দিল্লীতে চাকরি হয়েছে, পাকা চাকরি, সেইখানেই থাকতে চায়। একই ছেলে। তাই ইচ্ছে এদিকের সব বেচে-কিনে সেখানেই একটা কিছু করে, মাথা গোঁজবার জায়গা। দিব্যি বাড়ি মা, কী বলব, নিজেরা থাকবে বলে শখ ক'রে করেছে, দক্ষিণ খোলা, একটু বাগান-মতোও রয়েছে, আর চাই কি?'

'তা দক্ষিণে কত ?' একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করে হেমন্ত।

'ঐখানেই যা একটু গোলমাল। পঁয়ত্রিশ হাজারের এক পয়সা কমে দেবে না। লোকটা একটু রোখা আছে। বলছে, দর করার হলে খদ্দের আনবেন না, এই দামে কেনবার হিম্মৎ থাকলে আনবেন, পছন্দ হলে নেবে, নয়ত নেবার দরকার নেই।'

বলে যাদুগোপালই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাত কচলাতে থাকে।

'কথা শুনে তো মনে হচ্ছে লোকটা ভাল।' হেমন্ত বলে, 'আমি রোখা লোকই পছন্দ করি। কিন্তু তুমি কি বলো ? অত ভেতরে—সে হিসেবে দামটা একটু বেশী হচ্ছে না ?'

'ভেতরে বলেই এত কম, ঐ বাড়ি কালীচরণ ঘোষ রোড কি সাউথ সিঁথি রোডের ওপর হলে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশের কম হত না মা !'

'বেশ চলো, একটা রিক্‌শা ডাকো, দেখে আসি।'

'এখনই যাবেন ? এক্ষুণি ?' যাদু যেন একটু হকচকিয়ে যায়।

'হ্যাঁ। তা কি ? এখন এমন তো কোন রাজকার্য করছি না। আর এটাও তো কাজ, যা করতেই হবে তা সেরে ফেলাই ভাল। শিয়রে শমন এসে দাঁড়ানো—দেখতে পাচ্ছ না, তুমি যখন ছেলে-মানুষ আমাকে বুড়ি দেখেছ, তুমিই বুড়ো হয়ে গেলে। আমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে ? নাও, নাও—চলো। রিক্‌শা ডেকে আনো।'

তাড়া লাগিয়ে ওঠে হেমন্ত।

বাড়ি দেখে পছন্দ হল। পছন্দ হবার মতোই বাড়ি, বেশ খোলামেলা। ভাড়াটে বৌটির সঙ্গেও আলাপ হল, তার বাপের বাড়ি গাজিপুর জেলায়। বেনারসী বুলি শুনে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, দেশী মানুষ ভেবে। একটা তারের ফাইল খুলে পর-পর ভাড়ার রসিদ দেখালে, পয়লা দোসরা তারিখের রসিদ সব, এমাস পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া আছে।

তখনই বাড়িওলার সঙ্গে কথা বলে এল, ভাল দিন দেখে বায়না করবে। বায়না য়্যাটর্ণীই করবেন, তাঁর কাছেই কাগজ-পত্র দিতে হবে। সার্চ শেষ হলে তিনিই দিন বলে দেবেন—কবে রেজেস্ট্রী হবে।

বাড়িওলা বললেন, 'সার্চ করার কোন দরকার ছিল না—তবে সে আপনার যেমন অভিরুচি।'

হেমন্ত বললে, 'এ তো সব বাড়িজমির মালিকই বলে থাকেন—কিন্তু কে সত্যি কথা বলছেন আর কে মিথ্যা বলছেন তা তো বোঝার উপায় নেই। যাতুগোপালের কাছে শুনলুম আপনি স্পষ্ট কথা শুনতে কইতে ভালবাসেন—কিছু মনে করবেন না আশা করি, বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে বিশ্বাস নিজের ছেলেকেও নেই। এতগুলো টাকার জিনিস, গোলমাল বেরোলে আপনাকে কোথায় পাব বলুন! আপনি তো বেচে দিয়ে সরে পড়বেন। শেষে—আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে—সেই অবস্থা হবে তো আমার!'

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

পরের দিন যাতুকে নিয়েই খুঁজে খুঁজে য়্যাটর্ণী আপিসে গেল হেমন্ত। ধন্নুবাবুর ছেলে এখন বুড়ো হয়ে গেছে, তবু চিনতে পারল, উঠে এসে প্রণাম করল।

হেমন্ত বাড়ির বিবরণ এবং কেনার অভিলাষ জানিয়ে বললে, 'আমার এটুকু আসতেই দম বেরিয়ে গেছে, আমি আর ছুটোছুটি করতে পারব না। সই-সাবুদ যদি আমার কিছু করার থাকে তুমি করিও। এই বাড়ি, পঁয়ত্রিশ হাজার দাম—নিমের বৌ আশার নামে কেনা হবে—আশালতা চাটুয্যে। বায়না করা সার্চ করা—সব তোমার ওপর ভার—মায় রেজেস্টারী পর্যন্ত। টাকা—এখানের ব্যাঙ্কে যা আছে তা থেকেই নিতে হবে, কবে কোথায় সই করতে হবে বলো, একদিন মরিবাঁচি ক'রে এসে না হয়—'

'না না। তার দরকার নেই। এই ভদ্রলোক যদি আসেন—সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে আপনি যেখানে আছেন আমি গিয়ে করিয়ে আনব। আপনার এভাবে আসা উচিতই হয় নি।'…

এরা কিছুই জানত না, য়্যাটর্ণীপাড়া থেকে ফিরে এসে আশাকে খবরটা দিল হেমন্ত।

একটা বাড়ি দেখেছে, ছেলেদের একটু হয়ত অসুবিধে হবে,—বাস-এর পথ বড়রাস্তা থেকে একটু দূর—কিন্তু সব দিকে তো আর সুবিধে হয় না। ভাল বাড়ি, সে হিসেবে দাম কম—বামুনের গরু, এমন আর কোথায় পাওয়া যাবে? বড়রাস্তার ওপর হলে এ বাড়িরই ঢের দাম হত।

বাড়ির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে, মায় ভাড়াটের কথা সুদ্ধ জানিয়ে বলে, 'বাড়ি তোর নামে কিনতে বলেছি। ছেলেমেয়ে নিয়ে বৌ-নাতি নিয়ে থাকবি বৈকি, আশীর্বাদ করি শান্তির সংসার হোক—কিন্তু খবরদার, কোন কারণেই বাড়ি ছেলেদের নামে লিখে দিস নি কি বিক্রী ক'রে টাকাটা ওদের হাতে দিস নি। যদি বলে যে, আরও ভাল বাড়ি কিনবে এই বাড়ি বেচে—সে বাড়ি নিজে দেখে, দর-দস্তুর ক'রে, এ বাড়ি বেচার দরকার হলে সে টাকা নতুন বাড়িওলাদের ডেকে এনে সোজা তাদের দিবি। অনেক দেখলুম সংসারে—বুড়ো বয়সে দুগ্‌গতির শেষ থাকবে না—বেটা-বোয়ের এক্তাজারী হলে। বাড়িখানা থাকলে তবু ওর লোভেও কেউ দেখবে। জ্যান্তে ছেলেদের ভাগ-বাটোয়ারা ক'রেও দিস নি—মরার পর যা হয় ওরা করুক গে—চুলোচুলি। আর এই ভাড়ার টাকাটা নিজে রাখবি- স্ত্রীধন। এখন তো জমাতেই হবে মেয়ের বে পর্যন্ত, তার পরও জমাবি, সংসারে যেন ঘুষ দিস নি। এখন তো দু'ছেলের রোজগার হল—যেমন চলে ঐতেই সংসার চালাবি। আরও একটা কথা বলে যাই, ছোট মেয়েটার বিয়ে না হলে যেন আহ্লাদ করে গোপালের বিয়ে দিয়ে বসো না। বিয়ে হলেই বোয়ের অধীন। ছেলের নিজের ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারবে না।'…

এসব উপদেশে আশার কান ছিল কিনা কে জানে, তার দুই চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছিল। অনেকক্ষণ পরে অশ্রু-বিকৃত স্বরকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এদান্তে প্রায়ই

বলত, আমি যদি এই বেলা মরতে পারি তবু তোমাদের একটা হিল্লে হয়ে যায়। জ্যাঠাইমা তোমাকে ভালবাসে, তোমাকে দেখবে। আমিই বিষ-নজরে পড়ে আছি, সেই জন্যে কিছু হচ্ছে না।···আমি বলতুম, দেখছেন না আর কোথায়—এই তো যখনই যেদিকে জল পড়ছে সেদিকে ছাতা ধরছেন। বুড়ো মানুষ তিনি, আর কত দেখবেন, এখন তো উল্টে আমাদেরই তাঁকে দেখা উচিত, খাওয়ানো উচিত। তা বলত, তুমি জানো না, আমার একটু ভুলেই সর্বস্ব ক্ষোয়ালুম। নইলে আমি তো রাজা। আবার বিশেটাকে দিলুম, সেও জীবনটা ছারেখারে দিলে।··বলত আর চোখের জল ফেলত।'

হেমন্ত ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'একটা কথা ভুল বলেছে মা, শুধু ও বিষ-নজরে পড়ে নি, সমস্ত শ্বশুর-গুষ্টির ওপরই আমার ঘেন্না হয়ে গেছে। ঝাড়ে-বংশে বেইমান ওরা, বেইমান আর বদ। তার ওপর বোকা—নিজেদের পায়ে চিরকাল কুড়ুল মারে।··যেখানে এদের এক ফোঁটা রক্ত আছে সেখানেই অশান্তি, সেখানেই আহাম্মুকি। ওরা জানেই না কাউকে আপন করতে, ভালবাসতে। নিজেদের স্বার্থটা বোঝে, অথচ সেজন্যে যে একটু মেহনৎ করতে হয়—একটু বুঝে-সমঝে চলতে হয়—কি অপরের মন যুগিয়ে সেটা আদায় করতে হয়—এটুকু বোঝার মতো জ্ঞান ওদের নেই, অত ধৈর্যও নেই। তাই তো তোকে বলছি, খুব সাবধান, ছেলেদের ওপর একতিল ভরসা করিস নি। ঐ ঝাড়েরই বাঁশ ওরা!'

তারপর একটু দম নিয়ে বলে, 'তবে এও সত্যি, তোর টানেই এসেছি। তোর জন্যেই যেটুকু চিন্তা। তোকে না পথে বসে ভিক্ষে করতে হয়, আমার সাধ্যমতো সেইটুকু ক'রে যাব। তবে এর বেশী নয়। তাহলেই তো ঐ ছেলেরা হাল ছেড়ে দিয়ে আরাম করতে নবাবী করতে শুরু করবে। বেশিতে দরকার নেই, মাথা গোঁজার একটা আস্তানা ক'রে দিয়ে গেলুম, তোর একটা পেট—বিধবার খরচ—বুঝে চলতে পারলে ঐতেই চলে যাবে। তারপর তুই বোকামি করে ক্ষোয়াস—তুই-ই পথে বসবি!'

কমলার বিয়ের আগেই চিঠি লিখে ভোলাকে আনিয়ে ছিল। বিয়ের পরদিন বরকনে চলে যাবে, সেও গাড়িতে উঠবে। অনেক বলে আশা সেটা বন্ধ করল। 'অন্তত ফুলশয্যের ঝঞ্ঝাটটা চুকে যাক, তারপর যাবেন মা, একটা-দুটো দিনে আর কী এমন এসে যাবে! ভোলাও আপনার থাক না, এ ক'টা দিন তো জায়গার অসুবিধে নেই!'

এতে আর 'না' বলতে পারল না। এই শেষ, আর আসবে না—আসা হবে না—এক রকম নিশ্চিত, আর সত্যিই, এতদিনই রইল, দু'টো দিনে আর এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে!

জায়গারও অভাব ছিল না। পাড়ার লোকের দয়াতেই সে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। সকলেই খুব করছে এদের বিপদে। করছে —হেমন্ত যা বুঝল—আশার জন্যেই। তার স্বভাবের জন্যেই সকলে তাকে ভালবাসে। ভাগ্যক্রমে সামনের বাড়ির নিচের তলার ভাড়াটে সেই সময়ই উঠে যাচ্ছে, নতুন ভাড়াটে অবশ্য প্রস্তুতই ছিল। পাড়ার লোকেরা ভদ্রলোককে ধরে—চার-পাঁচটা দিনের জন্যে আটকাল বাড়িটা। বর্ষাকাল, ম্যারাপ করতে অনেক খরচা পড়বে গরিব মানুষদের, তাও অসুবিধে, বাসরঘর, ভাঁড়ার, আত্মীয়-কুটুমদের থাকার ব্যবস্থা—সবই তো দরকার। বরং উনি যদি কিছু ধরেও নেন সে বাবদ—তো এদের লাভ।

বাড়িওলা অবশ্য কিছুই নিলেন না। হেমন্ত নিদেন চুনকামের খরচটা দিতে চেয়েছিল, তিনি তাতেও হাত জোড় করলেন। বললেন, 'চুন তো আমাকে দেওয়াতেই হত—সেটাই না হয় দু'দিন পরে দেওয়াব। ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার হচ্ছে, অনাথা মেয়ে—এতে যদি এটুকুও না করতে পারি তো কী করলুম জীবনে!'

বিয়ে নির্বিঘ্নেই মিটে গেল। জামাইকে দেখেও ভাল লাগল হেমন্তর। তবে এ দেখার কোন মূল্য নেই তাও সে জানে। কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবে না, মেয়ের কপালে কী উঠল লটারীর ফল।

হেমন্ত উপস্থিত থাকাতেই আরও—বিয়ে বেশ ভালভাবে মিটল।

মেয়েকে ব্রোঞ্জের নয়—সোনার চুড়িই গড়িয়ে দেওয়া হল, উপরন্তু বারোমাস পরে থাকার মতো মাঠাবালা এক জোড়া। ফুলশয্যার তত্ত্বও অল্পের ওপর বেশ গুছিয়ে দিল হেমন্ত, কোন খুঁৎ থাকতে দিল না।

ফুলশয্যের তত্ত্ব সঙ্গে নিয়ে সবাই রওনা হয়ে গেলে মোটামুটি ঘরদোর গুছিয়ে আশা হেমন্তর কাছে এসে বসল। চোখে জল টলটল করছে তার, আগেই টিকিট কাটা হয়ে আছে, পরের দিন বেনারস এক্সপ্রেসে যাওয়া। সেইটেই যত ভাবছে তত যেন নিজেকে নতুন ক'রে অসহায় বোধ করছে আশা, কথাটা ভাবতেই বার বার চোখে জল এসে যাচ্ছে। নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করা পর্যন্ত থাকতে বলেছিল, হেমন্ত রাজী হয় নি। সে আরও পনেরো-কুড়ি দিন দেরি হবে—ততদিন এখানে থাকতে রাজী নয়।

সকাল থেকেই বিয়েবাড়ির কাজে মন নেই আশার, কেবল যেন শাশুড়ির পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে। হেমন্তই ধমক দিয়েছে সে জন্যে, 'মর আবাগী—থৈ-থৈ করছে লোক, অসুমর কাজ পড়ে, তুই বাড়ির গিন্নি, কেবল আমার সেবার তদ্বির করার জন্যে ঘুরছিস কেন? আমারটা আমি ঠিক করিয়ে নোব, তুই অন্য দিকে মন দে—'

এখন এসে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কেঁদেই ফেলল আশা।

'আবার কবে আসবেন মা?'

হেমন্ত হাসল। ম্লান হাসি। এই সেবা এই আন্তরিকতা কি তার মনেও দোলা লাগায় নি, আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তা কি তার মনকেও একটু ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে নি?

হয়ত সেই জন্যেই তার এত ব্যস্ততা, এমন দড়িছেঁড়া ক'রে চলে যাওয়া।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আর আসব না। অন্তত আসার আর ইচ্ছে নেই।'

'আর কোনদিনই আসবেন না? সে কি? আপনার গোপাল কি শুভার বিয়েতে?'

'এলে তোর টানেই আসতুম পাগলী। কিন্তু তুইও যে আমার শ্বশুরকুলেরই একজন। এবার এই চিরদিনের মতোই এদিকের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গেলুম। অবিশ্যি চিরদিন আর ক'দিন আমার! ভোলা বলে ওভারডিউ—আমার আর একজন্মও ঘুরে ফের মরার বয়স হয়ে গেল।...তবে যদ্দিনই বাঁচি—আর না। অনেক হয়েছে। নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার, তা আমি তো অনেকবারই গেলুম, আর কেন?'

'তাহলে আর দেখা হবে না কোনদিন!' যেন আর্তস্বরে প্রশ্ন করে আশা।

'কী লাভ আর চোখের দেখা দেখে—এই তো এতদিন রইলুম। আমার কি আর মরার সময় হয় নি? ধরে নে মরেই গেছি।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে চোখের জল ফেলল আশা। তারপর বলল, 'আমি—আমি যদি কাশীতে যাই, তাড়িয়ে দেবেন?'

আবারও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল হেমন্ত, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তাড়িয়ে দোব না, তবে না গেলেই ভাল হয়। আর পেছনের দিকে তাকাস নি মা, সামনের দিকে তাকা, ছেলেমেয়েদের দিকে মন দে, ওরা যাতে মানুষ হয়, সুখী হয়—সেই দিকে গ্যাখ। আমার সংস্পর্শে বিষ আছে, আমার এ টাকাও অভিশপ্ত। এদিকে তাকিয়ে থেকে ওরা কেউ সুখী হল না, বরং জ্বলে-পুড়ে মল আরও। নিজেদের মতো থাকলে হয়ত একরকম কাটিয়ে যেতে পারত। সেইজন্যেই তোকে বেশী টাকা দিলুম না, এই যে দিলুম—তাতেই ভয় হচ্ছে—হয়ত তোর অশান্তির কারণ হয়ে রইল।'

তারপর একটু থেমে গাঢ়কণ্ঠে বলে, 'মেয়েছেলের—বিশেষ আমাদের হিন্দু-ব্রাহ্মণের ঘরে—স্বামী চলে গেলে সুখের কথা বলা বিড়ম্বনা—তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তাও হয়ত উচিত হচ্ছে না, ভগবান আমার কোন কথাই শোনেন না—তবে তোর মন ভাল, দয়ামায়া আছে, হয়ত তোর ভাল হবে; তুই সুখী হ' শান্তি পা—আমার কথা আর ভাবিস নি। আমি মরেই গেছি এইটে ভেবে

নে। চিরদিন জ্বলে আর জ্বালিয়েই গেলুম মা, আমার নজর থেকে আমার নিঃশ্বাস থেকে দূরে থাকাই ভাল। ছোটবেলায় শাশুড়ি বলতেন পিশাচে-পাওয়া—কে জানে কথাটা সত্যিই কিনা! আমার সংস্রবে এসে কেউ সুখী হয় নি। সেইজন্যেই চিরদিনের মতো দূরে সরে যেতে চাইছি।'

আশা আর শুনতে পারল না—হেমন্তর কোলের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে যেন হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল, 'আমারও যে আর কেউ নেই মা, আমার মুখের দিকে চাইবার কেউ যে রইল না!'

॥ ৩৬ ॥

কথাটা মনে এসেছে কমলার বিয়ের সময়ই। ভোলা মাত্র আগের দিনই এসেছে, কিন্তু সে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবার ছেলে নয়—আসামাত্রই অনায়াসে গোপাল আশিসদের দলে মিশে গেছে। বিয়ের দিন বেলা তিনটে নাগাদ মনে হল যে, ভোলারই বোনের বিয়ে—সে-ই এ বিবাহের কন্যাকর্তা। সব জায়গায় সব কাজে অগ্রণী।

চেহারা হিসাবেও ওকেই মানায় কর্তা বলে। গোপালের রঙ্টা মায়ের মতো ফরসা হলেও চেহারার আড়াটা দাঁড়িয়েছে এখন অনেকটা নিমাইয়ের মতো—অর্থাৎ কোন আসর বা মজলিসে পাত্তা পাওয়ার মতো নয়। আশিসকে তো আরও ছোট, আরও ছেলে-মানুষ দেখায়। তাছাড়া তারা কখনও ভার নিয়ে অগ্রণী হয়ে কোন কাজ করে নি—তাদের এখানে এমন কোন আত্মীয়ও নেই যাদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে-থা কাজে-কর্মে খাটা-খাটুনি করবে। সুতরাং এ-বিষয়ে দু'জনেই অনভিজ্ঞ ও অপটু, বাকীরা তো নিতান্তই ছোট। যা করছে প্রতিবেশীদের উপদেশ ও নির্দেশে। তাতে গোলমালও হচ্ছে—কারণ একজন একটা পরামর্শ দিচ্ছেন, পরক্ষণেই আর একজন সেটা উড়িয়ে অন্য রকম করতে বলছেন।

ভোলাকে দেখে কিন্তু মনে হল নেতৃত্বটা যেন তার সহজাত।

সেও কখনও একাজ করে নি, বিশেষত তার এ সমাজ নয়—বাঙালীর বাড়ির—আরও ব্রাহ্মণদের, ক্রিয়া-কলাপ কিছুই জানে না। কিন্তু কিছুটা এদের কথাবার্তায়—কিছুটা হেমন্ত ও আশার কাছ থেকে শুনে অতি সহজে এবং অনায়াসে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তারপর থেকে কিছুই বলতে হল না, দেখতেও না। শুধু পূজা-অনুষ্ঠান, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে যেগুলো তথ্যের ব্যাপার—সেগুলো মেয়েদের জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছিল।···

ওকে দেখাচ্ছিলও বড় চমৎকার। সাধারণ মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা আর একটা গেঞ্জি—সন্ধ্যার সময় তার ওপর একটা সাধারণ পাঞ্জাবি চাপিয়েছিল—তাতেই যেন চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। সহস্র কাজ সহস্র কথাবার্তার মধ্যে হেমন্ত ওকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিল এবং অবসরমতো চেয়েই থাকছিল। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ—তাতে গেঞ্জিটা আঁট হয়ে বসা, আরও ঘামে ভিজে গিয়েই গায়ের সঙ্গে বসে গেছে—তাতে দেহের নিখুঁত রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে; উত্তেজনা ও ছুটোছুটিতে ওর উজ্জ্বল শ্যাম মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছে—তার মধ্যে সব সময় সব অবস্থাতেই মুখে অভ্যস্ত হাসিটি; মধ্যে কাশীর রেওয়াজ মতো পান-জর্দা খাওয়া ধরেছিল, হেমন্তর কাছে বকুনি খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে, সুতরাং এখনও নিষ্কলঙ্কই আছে হাসি, কালো ছোপপড়া দাঁতে অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে নি; রঙ্ ফরসা বা মুখ-চোখ কাটাকাটা না হওয়া সত্ত্বেও তাকেই সবচেয়ে সুন্দর লাগছিল, কেবলই মনে হচ্ছিল হেমন্তর—ভোলা যদি তার সত্যিকারের ছেলে বা নাতি হত তাহলে এতদিনের সব ক্ষোভ সব দুঃখ শোধ হয়ে সুখের পাত্র উপচে পড়ত জীবনে।

আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে, তা যে হয় নি সে-ই ভাল, আপনার নাতি হলে ঐ বিশুর মতো বাঁদর—বাঁদরও না, তাদের তবু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে কিছু—আস্ত শুয়ার একটা তৈরী হত। সম্পর্কে আপন নয় বলেই যথার্থ আপন হয়ে উঠতে পেরেছে।···বেঁচে থাক, সুখী হোক—রক্তের সম্পর্কে আর দরকার নেই।

ওর দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকতে থাকতেই মনে হয়েছে কথাটা। বিশেষ শুভদৃষ্টি স্ত্রী-আচারের সময়, বরের পিছনে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি—হাসাহাসি করছে যখন—মনে হয়েছে এই ভোলার সঙ্গেই কমলার বিয়ে দিলে হত, ভারী চমৎকার মানাত! এ পাত্রের চেয়ে অনেক ভাল পাত্র হত ভোলা, শুধু চেহারায় নয়—মানুষ হিসেবেও। হেমন্ত জোর করলে আশা বোধহয় অমত করত না।

তখন অবশ্য এসব ভেবে লাভ ছিল না। তাছাড়াও, পরে মনে হয়েছে, সে কথা যে মাথায় যায় নি বা সে চেষ্টা করে নি, এটা ভগবানেরই অনুগ্রহ। ওর ওপর, ভোলার ওপরও। ঐ ঝাড়েরই মেয়ে তো কমলা, বাপের বংশের বদবুদ্ধি ও মায়ের বদমেজাজ যদি পেয়ে থাকে তো যেখানে যাবে তাদের জীবন সংসার নষ্ট ক'রে দেবে। বাপ রে, ভোলার অমন দুর্গতি ভাবলেও যেন গা শিউরে ওঠে!

কিন্তু কথাটা মাথাতে ছিল সেই থেকেই।

কাশীতে ফেরার পর—এতদিনের পরিশ্রম, পথকষ্ট ও মানসিক উত্তেজনা আবেগের ধকলে ক'দিন খুব শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল, চুপ ক'রে শুয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে পারে নি। মুনিয়া আর ভোলা স্নান প্রভৃতি প্রাত্যহিক কাজগুলো করিয়ে দিয়েছে, মুখ ধুইয়ে দিয়েছে—বাড়িওলারা নারায়ণের অন্নপ্রসাদ দিয়ে গেছেন। তিন-দিনের দিনই অবশ্য মুনিয়া একটা রান্নার লোক এনে দিয়েছে, নইলে কতদিন ওঁদের সাহায্য নিতে হত তার ঠিক নেই। জ্বরজারি কিছু নয়, পেটের গোলমাল তো নয়ই—শুধুই ক্লান্তি আর অবসাদ। গত তিন-চার মাসে দেহের থেকে মনের ওপর দিয়ে ঝড় অনেক বেশী বয়ে গেছে, এ তারই প্রতিক্রিয়া।

দিন-সাতেক পরে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে আবার। সন্ধ্যার পর কাছে বসিয়ে বলে, 'ভোলা, তুই বিয়ে কর, ভাল মেয়ে দেখি একটা। তোদের হিন্দুস্থানী মেয়ে যদি চাস তো তাই চেষ্টা করি। তবে ও বাড়িতে কি এখানে থাকা চলবে না। আলাদা বাসা ক'রে থাকবি বৌকে নিয়ে, মুনিয়া তো

এখানেই থাকে বেশির ভাগ—তোর দাদা তো থাকেই না—ও বাসা তুলে দে।'

ভোলা চমকে ওঠে যেন, 'বিয়ে? না না, তোমাকে কে দেখবে তাহলে? ওসব হাঙ্গামা বাধিও না বলে দিচ্ছি। বিয়েতে আমার দরকার নেই। কে আসবে কেমন মেয়ে—তোমাকে কি চোখে দেখবে—না, সে হবে না। তোমাকে পর করতে পারব না।'

দু' চোখে জলের বন্যা নামে হেমন্তর। বহুদিনের শুষ্ক চোখের কোল বেয়ে বাধা-বন্ধহারা জলের স্রোত ঝরতে থাকে।

আনন্দের অশ্রু এই বোধহয় জীবনে প্রথম।

আছে, এখনও কিছু পাওনা তাহলে আছে।

বোধহয় ভগবান এইটুকুর জন্যেই এই একশ' বছর বাঁচিয়ে রেখেছেন; অথবা একশ' বছর ধরে পরীক্ষা ক'রে জ্বালিয়ে গালিয়ে পাপের খাদ শূন্য ক'রে নিলেন এই পুরস্কারের জন্যে।

মনে হল এতকাল পরে তারকই কথা কয়ে উঠল এই হীনজন্ম ছেলেটার মুখ দিয়ে। ঝিয়ের ছেলে, তায় সম্ভবত জারজ।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক কেঁপে ওঠে, একটা হিম আশঙ্কা বোধ করে।

তারক ওকে এমনি ভালবাসত, সে বাঁচে নি। ওর যা কপাল, যদি এও যায়? ভগবান তার আগে ওকে কেন নিচ্ছেন না, আরও কি কাজ বাকী আছে তাঁর, আরও কত শাস্তি কত আঘাত দিতে চান? আরও কত পোড়ানো দরকার মনে করেন।

অন্ধকারে বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। গঙ্গার ওপরের বারান্দা। নিচে ঘাটের দু' একটা আলো আর রাস্তার ক'টা আলোর যা সামান্য আভা এসে পড়েছে—তাতে চোখের জলটা দেখতে পাবার কথা নয়, দেখতে পায়ও নি বোধহয় ভোলা, তবে হয়ত ঐ ধরনের কিছু অনুমান ক'রে থাকবে—তাই সে চুপ ক'রেই রইল।

অনেকক্ষণ বসে রইল এমনিই, তরঙ্গাঘাতে ভেঙে যাওয়া আলোর টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে। দূরে কোথায় কোন দেবালয়ে আরতির

শব্দ হচ্ছে; নিচে পথের ওপাশে কে একটি হিন্দুস্থানী মেয়েছেলে কর্কশকণ্ঠে ঝগড়া করছে সম্ভবত তার মেয়ের সঙ্গেই—খিস্তি ক'রে বাপ-মা তুলে গাল দিচ্ছে তাকে; মিষ্টির দোকানে ভোলানাথবাবু নেতাজী যে বেঁচে আছেন তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন—সবটা জড়িয়ে এটা যেন তাদের চিন্তার একটা পৃষ্ঠপট রচনা করেছে, এই মিলিত কোলাহল ও গঙ্গার বুকে ভেসে যাওয়া আলোর প্রতিবিম্ব-গুলো। এ দৃশ্য বা শব্দ কোনটাই তাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হচ্ছে না, দু'জনেই নিজেদের মনের গহনে ডুব দিয়েছে।

অবশেষে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে গাঢ়কণ্ঠে হেমন্ত বলে, 'তাই বলে তুই বিয়ে করবি না! না-ই বা সে দেখল আমাকে!··· আমার এতকাল কাটল কি তোর ভরসায়? তাছাড়া সেইজন্যেই তো দূরে সরিয়ে দিতে চাইছি, আমার কপালে সেবা-যত্ন সয় না রে! তোর কোন কিছু—কোন, মানে বিপদ-আপদ ঘটবার আগে তুই সরে যা, সেই ভাল!'

অকস্মাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভোলা ওকে কচি মেয়ের মতো কোলে টেনে নিয়ে বলে, 'আমার কিচ্ছু হবে না। আর তুমি বা কদ্দিন? সত্যিই তো অমর নও! যে ক'টা দিন আছ, আমি থাকি না তোমার কাছে! তুমি গেলে আমি ঠিক বিয়ে করব—তোমাকে জবান দিচ্ছি!'

'কিন্তু সে বিয়ে সে বৌ তো তাহলে আমি দেখতে পাব না!'

'না-ই বা দেখতে পেলে! কত বিয়ে কত বৌ তো দেখলে আজ-তক্। তাতে কি চারটে হাত বেরোল তোমার?'

আর কথা বাড়ায় না হেমন্ত। ছোট মেয়ের মতো এই বলিষ্ঠ পুরুষ-দেহের আদর উপভোগ করে। আবারও আনন্দে চোখ সজল হয়ে আসে তার।

কিন্তু কৈ, আরও একটা বছর কেটে যায়, সে বহু প্রতীক্ষিত মৃত্যুর তো দেখা মেলে না!

শুধু শরীরটাই ক্রমশ আরও অথর্ব, একেবারে অচল হয়ে আসে, ক্রমশ যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। এখন আর কেউ ধরে না নিয়ে গেলে কলঘরেও যেতে পারে না। রান্নার শখ এত, খুন্তি ধরতে গেলে হাত থেকে খসে পড়ে, সাঁড়াশি আর কড়া নামানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

এবার এই প্রথম যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে কি এই-ভাবেই শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকবে নাকি—দু'চার বছর? কে দেখবে তাকে এখানে? দেখার লোক আছে অবশ্য, ভোলাই তো আছে। মুনিয়া গুছিয়ে সেবা করতে পারে না, তার দিকে অতটা আন্তরিক টান থাকারও কারণ নেই। পুরনো ঝি, এই মাত্র। তবে ভোলা একাই একশ'। কিন্তু ঠিক এইটেই চায় না সে, ভোলাকে জড়াতে চায় না এমনভাবে, তার জীবনটা বিড়ম্বিত করতে চায় না। কতকাল আরও বাঁচবে তার ঠিক কি, ভগবান তার কপালে মৃত্যু লিখতেই বোধহয় ভুলে গেছেন—এইভাবে তাকে নিয়ে পড়ে থাকবে ছেলেটা, ওর কাজ-কর্ম, উন্নতি, গার্হস্থ্য জীবন—সব থেকে বঞ্চিত হয়ে? তাছাড়াও তার জীবনের অভিশাপ তো আছেই, কেবলই ভয় হয়, তাকে যে ভালবাসবে, তাকে যে দেখবে সে আর বাঁচবে না।...

না, আর নয়, এখান থেকে পালাতে হবে।

কাশীতে মৃত্যু, মণিকর্ণিকা-প্রাপ্তি তার কপালে লেখেন নি ভগবান। অবশ্য ভগবান কিছুই ভাল লেখেন নি তার কপালে, কোন সাধই তার পূর্ণ হবে না—তা সে জানে। এখন আর তার সে ঝোঁকও নেই। এ একটা কথার-কথা মাত্র তার কাছে, বহু দিনের সংস্কার এই পর্যন্ত। মণিকর্ণিকায় দেহটা ভস্ম হলেই চতুর্ভুজ হয়ে শিবলোকে চলে যাবে—এমন ধারণা তার এখনও গড়ে ওঠে নি মনে। অথবা একটু একটু ক'রে—বার বার ঘা খেয়ে—এই ধরনের ভক্তি-বিশ্বাস—যেটুকু বা ছিল, কমেই যাচ্ছে, কমে গেছে।

সুতরাং এবার—কোথাও মরতে যাওয়া দরকার। সেই সঙ্গে দরকার টাকাগুলোর সদগতি করা—আর তার আগে ভোলার স্নেহের

ঋণ শোধ ক'রে যাওয়া। অনেকদিন আগে একটা উইলের মতো লিখে রেখে ছিল য়্যাটর্ণীর কাছে—কিন্তু সে ইচ্ছা এখন আর নেই। নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। সোজা হচ্ছে ভোলাকে দিয়ে যাওয়া, লোভও খুব—তবে তা দেবার সাহস নেই। হয়ত মনের ভুল, তবু যে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেছে তাকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে নির্মূল করা যায় না। কেবলই মনে হয় এই টাকার জন্যে বহুলোকের নিঃশ্বাস পড়েছে, বহুলোকের লুব্ধ প্রত্যাশা ছিল, এ টাকায় অভিশাপ লেগে আছে। ভোলার জীবনটাই হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে সে নিজে চেষ্টা ক'রে বড় হচ্ছে সেই ভাল।

কাকে দেবে আর কোথায় যাবে?

দীর্ঘকাল ধরেই ভাবছে কথা দু'টো। এক আশার কাছে যেতে পারে, সে মাথায় ক'রে রাখবে। কিন্তু তারও যা শরীর, সেখানে গিয়ে পড়া মানে তার ওপর অত্যাচার করা। তাছাড়া, তার ছেলেমেয়েরা কী চোখে দেখবে কে জানে!

সুরেন? সে এ টাকা নেবে না। দাদার কোন ছেলেমেয়েই নেবে না। তাদের ঠাকুর্দার নিষেধ। বড় ভাইপোও মারা গেছে। তার স্ত্রীকে কখনও দেখে নি পর্যন্ত। পাকিস্তান হওয়ার পর সুরেন দেশে গিয়ে বসেছে, তার ভাইপো-ভাইঝি—ছোট ভাই—এদের সংসার। সুরেন বিয়ে করে নি, কেন করল না শেষ পর্যন্তও—সেটা হেমন্ত কতকটা আঁচ করতে পারে—বোধহয় সেই জন্যেই তার শরীরও ভেঙেছে। শেষ যেবার কাশী এসেছিল, সেবারই দেখেছে হাঁপানির মতো। দীর্ঘকাল কষ্ট ক'রে ক'রে শরীরের যন্ত্রগুলো এমনিতেই বিকল হয়ে এসেছে, তার ওপর মনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চেপে রাখার ফলেই সম্ভবত—একেবারেই যেন বুড়ো হয়ে গেছে। চিকিৎসার নাম ক'রে কিছু দিতে চেয়েছিল হেমন্ত—সুরেন তাও নেয় নি; হাসিমুখে এড়িয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, 'সবই তো আপনার দৌলতে পিসীমা, এত বড় চাকরি কি আমার পাবার কথা? যা দু-চার টাকা জমেছে সেও তো একরকম আপনারই দেওয়া।...

ওঁরা এখানে কল খুলেও আমাকে ডেকেছিলেন, দু' বছর কাজও করেছি, সেও অনেক দিয়েছেন। আর কেন—মিছিমিছি ?'

অর্থাৎ মিছিমিছি বাপের হুকুমটা অমান্য করি কেন ?

তাকে আর বলে বা অনুরোধ ক'রে কোন লাভ নেই। তাহলে বাকী থাকে নিভা।

নিভাদেরও বিপর্যয় বড় কম হয় নি। ওদের সম্পত্তি বলতে জমি-জমাই বেশী ছিল; গুরু-পুরুতের বংশ, বাসন-কোসনই তিন-চার সিন্দুক, নগদ টাকার জোর খুব একটা কোন কালেই ছিল না। আয় মন্দ ছিল না হয়ত, কিন্তু ওর শ্বশুর গুরুদাসবাবুর হাত ছিল দরাজ—সবই খরচ ক'রে গেছেন, পয়সা জমাবার কথা কোনদিন ভাবেন নি। জমেও নি। তাই, পাকিস্তান হবার পরও অতুল বা নিভার শাশুড়ি এখানে আসতে রাজী হয় নি প্রথমটায়। ওখানেই টিকে ছিল কোনমতে। কে ওদের বুঝি বুঝিয়েও ছিল যে, ওদিকটা ভারতেই এসে যাবে, পাকিস্তানে যেতে পারে না।

আগে এলে সব না হোক, অনেক আনতে পারত। সম্পত্তি বদল করলেও ভাল সম্পত্তি পেত। কেউ কেউ পাঁচ-সাতখানা বাড়ি পেয়ে গেছে ওখানের জমির বদলে। ওরা যখন মনস্থির করল, যখন আর কোনমতেই থাকা সম্ভব হল না, তখন একরকম সব ফেলেই চলে আসতে হল। ভাগ্যে ছিল তাই—গুরুদাসবাবুর অনেক দানপুণ্য ছিল—একেবারে শেষ মুহূর্তে এইটুকু সম্পত্তি বদলে পাওয়া গেল। যা ফেলে আসতে হল তার তুলনায় কিছুই নয়—তবু একটা পাকা বাড়ি, বিঘে তিনেকের বাগান, বিঘে দুই জলকর আর দশ-এগারো বিঘের মতো ধানজমি। এও ভাগ্য বলতে হবে—এ ভদ্রলোক একটা পাকাপাকি দখল চাইছিলেন তাই, নইলে ওরা যখন এসেছে তখন আর ওখানে কেউ হিন্দুর বাড়ি দাম দিয়ে কিনছে না, জানে সবই তো মুফতে আসবে।

খুবই কষ্টে দিন যাচ্ছে ওদের। চিরদিন সচ্ছলতার মধ্যে কাটিয়ে এসে পাই-পয়সার হিসেব ক'রে সংসার চালানো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

অথচ এখন তাই করতে হচ্ছে ওদের। অতুল একবার এসেছিল এখানে। বাপ-মার 'গয়া' করতে এসেছিল—সেই সময় কাশীতে এসে দেখা ক'রে গিয়েছিল। এই ক' বছরের মধ্যেই যেন খুব বুড়ো হয়ে গেছে বেচারী। তার মুখেই শুনল—গাছের নারকোল কি আম-কাঁঠাল ছেলেমেয়েরা খেতে পায় না—জমা ধরিয়ে দিতে হয়েছে, নইলে নগদ টাকা হাতে আসে না। তবু অতুল এখানেও একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিয়েছে, তবে সেও ঐ স্থানীয় ইস্কুলে নিচের ক্লাসে পড়ানো—ক'টা টাকাই বা পায়!

বড় ছেলেটিকে সম্প্রতি কি একটা কারখানায় ঢুকিয়েছে—অতুল বিনয় ক'রে বলল, সেও একরকম হেমন্তরই দয়ায়। কারণ সুরেন তার মনিবকে দিয়ে আর একজনকে সুপারিশ ধরিয়ে এটা ক'রে দিয়েছে। নইলে ওর মতো ছেলের, বিশেষ এত বয়সে এ চাকরি নাকি হবার কথা নয়। সুরেনের জন্যে যে এত করেন ভদ্রলোক—সে নাকি এই বর্তমান মালিকের বাবা হেমন্তর বন্ধু-স্থানীয় ছিলেন বলে, হেমন্তর ভাইপো বলেই সুরেনের এত খাতির।...

নিভার কাছেই যাবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

নিভা তাকে ফেলবে না। অতুলও না।

অতুল তিন-চারদিন ছিল, ভাল ক'রেই লক্ষ্য করেছে, মানুষটা যথার্থ ভদ্র এবং ভাল মানুষ। আর ওদের কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মানুষ হয়েছে—তারাও ভদ্র হবে, এইটেই আশা করা যায়।

তবে নিভা কি টাকাকড়ি নিতে রাজী হবে? ওর কোন বাধা নেই—কিন্তু এমনিতে কিছু নেয়ও না—কখনও কিছু পাঠালে তার দু'গুনো ফেরত পাঠায় কোন-না-কোন ছলে। সেইজন্যেই আজকাল আর কিছু দেয় না হেমন্ত।

ওকেই একটা চিঠি লিখে দেখবে নাকি?

যদি অন্তত খরচাটুকুও নেয়!

অনেক ভেবে অনেক চিন্তা ক'রে শেষ অবধি নিভাকেই একটা চিঠি লেখে। এখন আর কলমও যেন ধরতে পারে না, হাত

কাঁপে। তবু হাতের লেখা একেবারে যে দুষ্পাঠ্য হয় নি এই তো আশ্চর্য।

নিভার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই সে এধারে কাজে লেগে যায়। ভোলাকে গৃহী ক'রে না গেলে তার কর্তব্যে প্রত্যবায় ঘটবে।

সব বেচে দিয়ে এখনও ওর কাশীতে দু'খানা বাড়ি আছে, একটা খুব ছোট বাড়ি—পাতালেশ্বরে, আর একটা একটু বড় লক্ষ্মীকুণ্ডর কাছে, মিছরিপোখরায়। এই বাড়িটায় ওপর-নিচে দু-তিন ঘর ভাড়াটে ছিল—সম্প্রতি তেতলা খালি হয়েছে, ভোলাই মেরামত করিয়ে চুনকলি ফিরিয়ে দিয়েছে, ভাড়াটেও হাঁটাহাঁটি করছে, কিন্তু হেমন্ত ভাড়া বসাতে বারণ করেছে এখন।

কেন বারণ করেছে, তা ভোলাকে কিছু বলে নি। আসলে এই বাড়ি খালি হওয়ার প্রসঙ্গেই কথাটা মনে পড়েছে তার, এটাকে ভগবানের নির্দেশ বলেই মনে হয়েছে।

পাতালেশ্বরের বাড়ির দোতলায় এক ভদ্রলোক থাকেন, অনেকদিন ধরেই দেখছে ওঁকে, আগে সিমন চৌহাট্টায় ওর যে বাড়ি ছিল সেখানেই ইনি প্রথম ভাড়া আসেন—ইস্কুল মাস্টারী করতেন, রিটায়ার করেছেন, এখন দু'টো-তিনটে টিউশনী ক'রে সংসার চালান। দু'টি ছেলেমেয়ে ছিল ভদ্রলোকের, ছেলেটি বি-এ পাস ক'রে একটা চাকরিও পেয়েছিল, সেই সময় স্নায়ু শুকিয়ে আসা রোগ ধরে। ভদ্রলোক সাধ্যের অতীত চিকিৎসা করিয়েছিলেন। ইস্কুল থেকে যা পেয়েছিলেন, যা হাতে ছিল, মায় স্ত্রীর ধূলিগুড়ি যা গহনা ছিল—সব বেচে দিয়েও সে ব্যয় বহন করেছিলেন, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারেন নি। এখন শুধু সন্তান বলতে ঐ একটি মেয়ে রমা, উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, স্কুলের পড়া শেষ করেছে, অর্থাভাবেই কলেজে দিতে পারেন নি তপনবাবু। বেশী বয়েসে বিয়ে করেছেন, ওঁর নিজেরই এখন চৌষট্টির কাছাকাছি বয়স, এ বয়সে আর এর চেয়ে রোজগার ক'রে টাকা জমিয়ে যে মেয়ের বিয়ে দেবেন তা সম্ভব হবে না, এ

তিনি বোঝেন। অথচ কী করবেন তাও জানেন না, শুধুই বিলাপ করেন আর কপাল চাপড়ান।

ভাড়া ছিলেন ভদ্রলোক কুড়ি টাকায়—কিন্তু তাও দিতে পারেন না সব মাসে। হেমন্ত চায় না, ভোলাকেও তাগাদা করতে বারণ করে। দিতে হবে না, একথা বলতেও সঙ্কোচে বাধে। ভদ্রলোক অপমানিত বোধ করতে পারেন। দেওয়া-না-দেওয়া মিলিয়ে চলছে। দিতে এলে 'না' বলে না, না দিলেও চায় না।

তপনবাবুর স্ত্রী মেয়েটিকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন কয়েকবারই, মধ্যে মধ্যেই আসেন। যখন বুকটা ফেটে যাবার মতো হয়—তখনই ছুটে চলে আসেন হেমন্তর কাছে—ব্যথার ব্যথী বলে। রমাকে ভাল ক'রেই দেখেছে হেমন্ত, ভারী শান্ত ও ভদ্র মেয়েটি। সুন্দরী বলা চলে না কোনমতেই—খারাপ দেখতেও নয়। মোটের ওপর হেমন্তর ভালই লাগে। তপনবাবুরা ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী উপাধি—শাণ্ডিল্য গোত্র। আগে চব্বিশপরগণার হরিনাভির কাছে দেশ ছিল, বহুকাল হল সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, সেখানে কে আছে আর কি আছে তাও জানেন না।

এই তপনবাবুকেই একদিন লোক দিয়ে ডেকে পাঠাল হেমন্ত। বলে দিল বিকেলের দিকে আসতে, তিনটে-চারটের সময়। এই সময়টা ভোলা কোনদিনই বাড়ি থাকে না—ভোলা আজকাল এই বাড়িতেই থাকছে, রাত্রেও কাছে শোয়, কারণ এক-একদিন ওঠা তো দূরের কথা, পাশ ফিরিয়ে দেবার জন্যেই লোক ডাকতে হয়।

তপনবাবু এসে বসতে মুনিয়াকে একটা অছিলায় বাইরে পাঠিয়ে দিল। যে বুড়ি রান্না করে সে এই সময়টায় পাঠ শুনতে যায় রাণীভবানীর গোপালবাড়ি—বাড়ি খালিই থাকে।

হেমন্ত কোনরকম ভনিতা না ক'রে সোজাসুজিই প্রশ্ন করে, 'রমার বিয়ে দেবেন ?'

ভদ্রলোক রীতিমতো থতমত খেয়ে যান। তিনি ভাবতে ভাবতে আসছিলেন, বোধহয় অনেক টাকা বাকী পড়েছে বলেই

খোদ মালেকা ডেকে পাঠিয়েছেন। আর যা-ই হোক এমন অনুকূল অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আমতা আমতা ক'রে বলেন, 'দেওয়াই তো উচিত, মানে, দিতে পারলে তো বেঁচে যাই, কিন্তু সামর্থ্য যে একেবারেই নেই—সেই জন্যে কোন চেষ্টাও করি না।'

'যদি সামর্থ্যে কুলোয়? তেমন পাত্র যদি থাকে—দেবেন? একটু সাহসের পরিচয় দিতে হবে কিন্তু!'

'আমার যে একেবারেই কিছু নেই। কিছু নয় কিছু নয় ক'রেও কোন না দু-তিন হাজার খরচ হবে—'

'সে ব্যবস্থাও যদি হয়?'

'তাহলে তো বেঁচে যাই মাসীমা। সত্যি বলছি, এই দুর্ভাবনায় আরও পাগল হতে বসেছি—'

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, হেমন্ত শেষ করতে দেয় না, পুনশ্চ সোজা প্রশ্ন করে, 'আমার ভোলার সঙ্গে দেবেন?'

'কে?' চমকে ওঠেন তপনবাবু, 'কার সঙ্গে? ভোলা—মানে, ঐ যে ভাড়া নিতে যায়?'

'হ্যাঁ। ও-ই।'

'ও, মানে—ও তো এদেশী হিন্দুস্থানী—তারপর ও তো মানে—'

'আমার ঝিয়ের ছেলে। হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তপনবাবু, ও বি-এ পাস করেছে। রিক্‌শার ব্যবসা করে। আমি ছ'খানা রিক্‌শা দিয়েছিলুম, সেই আয় থেকে আরও আটখানা করেছে। এখানের হিন্দী কাগজে কি কাজ করে, সেখান থেকেও দু'শো টাকার মতো পায়, তা বাদে আরও কোন কোন কাগজে রিপোর্টারের কাজ করে, সেখান থেকেও কিছু কিছু পায়। এখন আমার এখানে থাকে—প্রতিদিনের বাজার খরচা ও দেয়, আমার পয়সায় খায় না। স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী—সে তো নিজের চোখেই দেখছেন। অমন চরিত্র আজ-কালকার দিনে লাখে একটাও মেলে না, সেগুলোও হিসেবে ধরুন।'

'তা ঠিকই। সবই তো বুঝছি। তবু সমাজ বলে একটা জিনিস আছে তো! আমরা ব্রাহ্মণ—'

'ভোলারও শুনেছি ব্রাহ্মণেরই ঔরসে জন্ম, তবে বৈধ নয়। আমি কোন কথাই গোপন করতে চাই না তপনবাবু, কিন্তু আপনি নিজের কথাটাও ভাবুন। এই মেয়ে যদি একটা ভাঙ্গী কি চামার ছেলের সঙ্গে প্রেম ক'রে রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করত—কী করতেন? এই কাশী শহরেই এমন বিয়ে ক'টা হল তার খবর রাখেন?....আপনি তো নিজেই বলছেন যে, এক পয়সা খরচ করার ক্ষমতা নেই আপনার। তাহলে কি করবেন? মেয়েকে তো একটা চাকরিতেও ঢোকাতে পারেন নি, এই বাজারে আর যে পারবেন বলেও মনে হয় না। আপনার এই বয়স আর এই শরীর—শোকাতাপা মানুষ, আপনি আর ক'দিন এইভাবে ছেলে পড়িয়ে সংসার টানতে পারবেন বলে মনে করেন? আপনি অপারগ হলে কি মারা গেলে রমা আর রমার মার কি হবে ভেবেছেন? তখন হয়ত—মেয়েদের যে দুর্গতি কল্পনা করলেও পাপ হয়—মেয়ের সেই দুর্গতিই দাঁড়াবে, সেই পথেই নামতে হবে, একথা ভেবে দেখেছেন কি?'

ভেবেছেন বৈকি তপনবাবু, তবে বেশী ভাবতে পারেন নি। যখনই ভবিষ্যৎ ভাবার চেষ্টা করেন বুকের মধ্যে কেমন করে, সারা শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে—তখনই ও চেষ্টা ছেড়ে দেন, বাবা বিশ্বনাথের ওপর দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

আজও এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার ফলে তপনবাবু ঘেমে উঠলেন, আজও তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। জলে ডোবার মতো হলে মানুষ যেমন আঁকু-পাঁকু ক'রে ওঠে, এবং বিরাট হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করে—তপনবাবুও কতকটা সেই-ভাবেই আকুলিবিকুলি ক'রে উঠলেন; ব্যাকুলভাবে কী যেন বলবারও চেষ্টা করলেন খানিকটা, তারপর বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে অন্যদিনের মতোই হাল ছেড়ে দিয়ে করুণভাবে হেমন্তর মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

হেমন্ত কিন্তু নির্মম। সে ওঁকে বৃথা-চিন্তার ঘরে—যে চিন্তায় কোন ফল হয় নি আজ পর্যন্ত এবং হবার কোন উপায়ও নেই—

হাতড়াতে দিল না। তেমনি বলেই চলল, ‘আপনার আর ছেলেপুলে নেই যে, তাদের বিয়ের সময় এ প্রশ্ন উঠবে, আর ওদের ছেলেমেয়ের যখন বিয়ের প্রশ্ন দেখা দেবে তখন এত খবর বোধহয় কেউ নেবেও না, তারা নিজেরাই নিজেদের বিয়ে ঠিক করবে হয়ত—ভোলার পদবী রায় বলেই বলে, রায় সব দেশেই আছে, সব জাতেই আছে, আমার নাতি বলে পরিচয় দেবে। ওর যে জন্মদাতা সে শুনেছি মুখুয্যে, ভরদ্বাজ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র বলেই চালাবে। এমন কত চলছে তার খবর রাখেন ? এই কাশী শহরে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে যারা বাস করে—তাদের ক’জন বিবাহিত—তা কেউ জানে ? দেখুন, এখানে আমারও অনেকদিন কাটল, অনেক দেখেছি। কলকাতা শহরেও ঢের দেখেছি, বিয়ের সম্বন্ধর সময় বংশ-পরিচয় নিয়ে একটু চাপ দিলেই বহু লোক আমতা আমতা করে।’

তারপর গলার সুর একটু নামিয়ে বলে, ‘ওসব রেখে দিন। শুনুন, এ বিয়েতে রাজী হলে আমি ঐ বাড়ি রমার মাকে দান নয়—সাফ বিক্রীকোবালা লিখে দোব—দান বিক্রী যাকে যা খুশি করতে পারবেন, আপনার অবর্তমানে ঐ বাড়ির যা সামান্য ভাড়া ওঠে তাইতে সে চালিয়ে নিতে পারবে। আর মিছরিপোখরার বাড়ি রমা-ভোলা দু’জনের নামে লেখাপড়া ক’রে দোব—রমাকেই দিতুম, আজকালকার মেয়েদের বিশ্বাস নেই—নাতি-নাতবোয়ের বিয়ের যৌতুক। ওর তেতলা খালি হয়েছে, ঐখানেই সংসার পেতে দোব ওদের। ভোলার মা অনেকদিন ধরেই তীর্থে যেতে চাইছে, বৃন্দাবনে থাকতে চায়—সে ব্যবস্থাও আমি ক’রে দোব, তবে মা বলে পরিচয় দেবে না, তা নয়—অসুখ-বিসুখ হলেও অবশ্য ভোলার কাছে এসে থাকবে। মাকে দেখবে না কি মা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করবে—সে শিক্ষা ভোলার নয়।···এখন ভেবে দেখুন কী করবেন। বরং রমার মার সঙ্গেও পরামর্শ করুন।···তবে আমার আর সময় নেই, উত্তর আমার কালকের মধ্যেই চাই।’

উত্তর আশানুরূপই পাওয়া যায়। দু' দিনের মধ্যেই দু' দিক থেকে দু'টি উত্তর আসে, হেমন্তর ভবিষ্যতে যবনিকা টেনে দিতে।

তপনবাবুদের রাজী হওয়াতে একটু বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। হেমন্ত খুশীই হল সে খবরে। মনে হল ভোলার সঙ্গে যাকে জন্মের মতো গেঁথে দিচ্ছেন—সে হয়ত একেবারে অনুপযুক্ত হবে না, ভোলার মূল্য বুঝবে।

তপনবাবুর স্ত্রী এই সম্বন্ধের প্রস্তাবে ঝুঁকে পড়লেও, তপনবাবুর প্রাচীনপন্থী ইস্কুল মাস্টারের মন শেষ পর্যন্তও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এ ধরনের মন বর্তমান বা ভয়াবহ ভবিষ্যৎ—কোনটাই দেখতে পায় না, দেখে না—একটা অতীত সংস্কারের কঙ্কালকে জড়িয়ে থাকে। সেও একটা আব্‌ছা অস্পষ্ট ধারণাতে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে। সে সংস্কারের যথার্থ মূল্যায়ন করার সামর্থ্য বা সময়ও নেই, বিধি-নিষেধের অর্থও বোঝার চেষ্টা করে না—বিচার বা যাচাই তো নয়ই। যে কায়া কবেই অন্তর্হিত হয়েছে, তার ছায়া—ছায়াও নয়, ছায়ার স্মৃতিটাকেই কর্তা বলে জেনে আসছে, সেইখানেই ধুনো-গঙ্গাজল ছড়াচ্ছে।

তপনবাবুর মন এই বদ্ধ সংস্কারের বন্ধন থেকে কিছুতেই হয়ত নিজেকে মুক্ত করতে পারত না, যদি না তাঁর স্ত্রী—নির্বোধ, যুক্তিবধির, তথ্যান্ধ স্বামীকে বোঝাবার সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষীণ সূত্র, সুদূর আশাকে অবলম্বন করার চেষ্টা করতেন। বোধ হয় হঠাৎই মনে এসেছিল তাঁর কথাটা, হয়ত ভবিতব্যই যুগিয়ে দিয়েছিল—বলেছিলেন, 'আচ্ছা বেশ তো, মেয়েকেই একবার জিজ্ঞেস করো না, ত্থাখো না ও কী বলে!'

তপনবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ও আবার কী বলবে, ও কি বোঝে!'

'তা কেন বুঝবে না?' জবাব দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, 'একেবারে

তো আর ছেলেমানুষ নয়। তাছাড়া ওকেই তো বুঝতে হবে। বলা যায় না, তোমারই যদি কোন ভালমন্দ হয়, এই তো লো প্রেসারের রুগী, না একটু ওষুধ, না একটু ভালমন্দ খাওয়া—তখন তো ওকেই দাঁড়াতে হবে, মাথার ওপর আর তো কেউ নেই দাঁড়াবার মতো।'

কী বুঝেছিলেন তপনবাবু কে জানে, বোধ হয় ভেবেছিলেন মেয়ে তাঁর মতেই মত দেবে—তিনি উদাসীনভাবে বলেছিলেন, 'তা ছাখো, তুমিই জিজ্ঞাসা ক'রো।'

ওঁরা ঘরের ঠিক বাইরে বসে কথা বলছিলেন, রমা ঘরে ছিল, সবই শুনেছে সে, সুতরাং নতুন ক'রে কোন প্রশ্ন করতে হল না। মা ঘরে ঢুকতে সে নিজেই সে-কথার সূত্র ধরলে, 'আমাকে বেহায়া ভেবো না মা, নিজের বিয়ের কথায় কথা বলছি বলে, তোমরা জিজ্ঞেস করলে তাই, নইলে হয়ত নিজেকেই কথাটা পাড়তে হত—লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে, সেইটেই ভাবছি কাল থেকে—। শুধু তো আমার ভবিষ্যৎ নয়—তোমারও ভবিষ্যতের প্রশ্ন আছে—হয়ত বাবারও। বাবাও কত দিন বাঁচবেন—কীভাবে বাঁচবেন, কেউ বলতে পারে না।··· আমার তো মনে হয়, বাবা যদি আমাকে কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাস করাতে পারেন, কিংবা এই বিদ্যেতেই একটা চাকরি ক'রে দিতে পারেন—যত অল্প টাকারই হোক—সে আলাদা কথা, নইলে এখানে বিয়ের কথাতেই রাজী হওয়া উচিত। বাবা কি মনে করেন উনি কোনদিন সঘরের একটা চলনসই পাত্র দেখেও বিয়ে দিতে পারবেন, না, দৈবাৎ কোন মোটা টাকা এসে পড়বে বলে ভাবছেন? ওঁর যা শরীর, বেশী দিন তো এমনভাবে ছুটোছুটি ক'রে খাওয়াতেও পারবেন না আমাদের। তার পর কী হবে? সেটা কি ভেবে দেখেছেন? আমি তো টিউশনীরও চেষ্টা করেছিলুম, তাও তো সবাই বি-এ বি-এস-সি পাস চায়—আর পাচ্ছেও তো—আমাকে কেন দেবে?'

কথাগুলো বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলেছিল রমা, তপনবাবুর

শুনতে কোন অসুবিধা হয় নি। কণ্ঠস্বরে যে প্রচ্ছন্ন তিক্ততা ছিল, তাও তাঁর কান এড়ায় নি। এর পর, আর কিছু বলতে না পেরে, কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বলেছিলেন, 'কিন্তু এ তো একরকম মেয়ে বিক্রী করাই হল মা।'

'দোষ কি বাবা? আগে যে লোকে পুষ্যিপুত্তুর দিত সেও তো শুনেছি—এই রকম কিছু কিছু সুবিধে বা টাকার বদলেই। তুমিও তাই মনে করো না। এমনিও তো—আমারই খাওয়ানো উচিত রোজগার ক'রে—তাই ধরে নাও।'

তবু, মজ্জমান ব্যক্তির তৃণ অবলম্বনের মতো, শেষ ক্ষীণ চেষ্টা করেন একটা তপনবাবু, স্ত্রীর প্রচেষ্টার পাল্‌টা হিসেবে, বলেছিলেন, 'আচ্ছা, ছেলেটাকে তো তুই দেখেছিস। তুই পারবি ওকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে? লজ্জা করিস নি—বড় হয়েছিস, এত কথা বললি বলেই জিজ্ঞাসা করছি—'

এবার একটু দেরি হল উত্তর দিতে। এই বিলম্বতে তপনবাবুর মনে কোন আশার সঞ্চার হয়েছিল কিনা কে জানে—যদি বা হয়ে থাকে সমূলে বিনাশ ক'রে, মেয়ে ঈষৎ লজ্জিত, অপ্রতিভ কণ্ঠে বলেছিল, 'কেন, অপছন্দ করার মতো কি শ্রদ্ধা না করার মতো তো কিছু মনে হয় না আমার!'

এর পর আর তপনবাবু অমত করতে বা অন্য কোন বাধা সৃষ্টি করতে ভরসা পান নি।

তপনবাবুর কাছ থেকে কথা পেয়ে এইবার ভোলাকে বলল হেমন্ত।

ভোলা একেবারে লাফিয়ে উঠল, 'না-না, এ কী করেছ! না না, এ হতে পারে না। আমি তো তোমাকে বলেইছিলুম। না, ছিঃ! এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি, আর ওঁরা—সত্যিই তো বাঙালী ব্রাহ্মণ, এ কখনও ওঁরা রাজী হন—'

হেমন্ত অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে ওঠে, 'তুই থাম দিকি! তারা

রাজী হয়েছে—তুই এখন সেই চিন্তা করছিস এখন থেকে আর অত ওদের দিক টানতে হবে না।'

চোখে তার প্রসন্ন কৌতুকের আভাস, অনেক দিন পরে।

কেমন যেন বোকা হয়ে যায় ভোলা। তারপর মুখ গোঁজ ক'রে বলে, 'সে আমি অত জানি না। আমি তো বিয়ে করব না বলেছি, সেটার কি?'

'উঁহু, বিয়ে করবি না বলিস নি, বলেছিলি আমি মলে তবে বিয়ে করবি। নইলে আমাকে যদি সে বৌ না দেখে—এই তো? কথাগুলো পরিষ্কার মনে আছে আমার। উলটে বলেছিলি, আমি মলে নিশ্চয় বিয়ে করবি। জবান দিয়েছিলি আমাকে, ইয়াদ আছে?'

'আছে। তা তুমি বেঁচে থাকতে তবে সে-কথা উঠছে কেন?'

'বেঁচে থাকতে উঠছে না। এবার মরতেই যাচ্ছি যে। আমার সেবার ভাবনা—দেখার ভাবনার দায়িত্ব থেকে তোকে ছুটি দিয়ে যাচ্ছি। আমার জন্যে কত দিন তোর বিয়ে আটকে রাখব বল্!'

'তার মানে? তার মানেটা কি কিছুই তো বুঝছি না। হেঁয়ালি ছেড়ে পরিষ্কার ক'রে বলো দিকি!'

এবার ভোলার অসহিষ্ণু হবার পালা।

হেমন্ত আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'আমি যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি রে, চিরদিনের মতো। আর থাকব না এখানে, আসবও না। ভাইঝির কাছে চলে যাচ্ছি। সেই যে নিভা, কত তো গল্প করেছি তোর কাছে—সেইখানেই চলে যাচ্ছি।'

'সে কি! না, সে হবে-টবে না। না, আমার চোখের বাইরে যেতে দোব না। দরকার হয় তো সেই ভাইঝিই এখানে আসুক। তুমি যাবে কেন? না, সো নেহি হোগা!'

বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভোলা।

আবারও শুষ্ক কুঞ্চিত-চর্ম চোখের কোলে এক ঝলক তপ্ত অশ্রু উছলে ওঠে। আনন্দের, সুখের অশ্রু।

'দূর ক্ষ্যাপা! সে আসবে কি, তার জাজ্বল্যমান সংসার। শোন, পাগলামি করিস নি। দেখছিস তো ক্রমশ আমি ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছি। কেউ ধরে না তুললে আমি উঠতে পারি না। এক উপায়, এখানে দিন-রাত নার্স রেখে থাকা। তা সে আজকালকার নার্স তো দেখছি, সব ফাঁকিবাজ। তা ছাড়া এক তুই—তোর কাজ-কর্ম ফেলে দিন-রাত পাহারা দেওয়া তো আর তোর সম্ভব নয়, এই জোয়ান বয়েস, উন্নতির সময়; ভূতের মতো খাটবি এখন—একটা মড়া বুড়িকে আগলে বসে থাকবি কেন?'

পিঠের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে দেয় রাগ ক'রে, বলে, 'না না, তা হোক। কেন, তারাই আপনার লোক—আমি কেউ নয়। তুমি আমার নিজের ঠাকুমা হলে কি করতে? না কি আমিই ফেলতে পারতুম? সে হবে না, তাহলে আমাকেও সেখানে যেতে হয়।'

'তা হয় না।' এবার হেমন্তর কণ্ঠস্বরেও অভ্যস্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, 'তোর কাছ থেকে দূরে থাকব বলেই আমি এই নির্বাসনে যাচ্ছি। ওরে, ছেলেকে হারিয়েছি—সে আজ ষাট বছরের কথা—তার পর আর তোর মতো এত আপন, এত বুকের ধন আর কাউকে পাই নি। তোর যদি কোন ভাল-মন্দ হয়—সে আমি সইতে পারব না। বুড়ো বয়সে—গঙ্গায় গিয়ে ডোববার শক্তি নেই, মেঝেতে মাথা ঠুকে মরতে হবে।'

ভোলা বলে উঠতে যায়, 'যত সব বাজে কথা আর বাজে ভাবনা তোমার—'

ওর মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে হেমন্ত বলে, 'হয়ত বাজে, কিন্তু জানিস তো বুড়ো মানুষের মাথাতে একটা কথা ঢুকলে আর সহজে যেতে চায় না। তাছাড়া—জীবনের শেষ সাধ আমার—তোর বৌ দেখে তোকে থিতু দেখে যাব। কোন সাধই তো মিটল না জীবনে—ভেবেছিলুম টাকা হাতে এলে সব হবে। টাকাটাই আরও অভিশাপ হয়ে উঠল। এই শেষ সাধটা মিটিয়ে দে। দুঃখ করিস নি—তোর কাছ থেকে এই জীবনের শেষে যা পেলুম, আর কারও

কাছ থেকেই পাই নি। কে জানে তারক বেঁচে থাকলে বিয়ে-থা করলে কী মূর্তি ধরত !···তোর হাসিমুখ দেখে নিজেও হাসিমুখে সরে যাই—তুই আর বাধা দিস নি।'

ভোলার চোখও জলে ভরে ওঠে, সে হেমন্তর কোলে মাথাটা গুঁজে দিয়ে বলে, 'কেন আমাকে এমন ক'রে পর ক'রে দিচ্ছ বড়মা, কেন কেন? কী করলুম আমি তোমার? এই সময় চলে যাচ্ছ, কোথায় কখন মরে যাবে—টেরও পাব না, না না। সে ভাল নয়। বিয়ে না হয় করছি—তুমি এখানে থাকো লক্ষ্মীটি!'

'মরার সময় যদি খবর না পাস, আমি জনে জনে বলে যাব—মরার খবর যেন তোকে অতি অবিশ্যি দেয়, তুই এখানে আমার পিণ্ডি দিস, সেই আমার আসল পাওনা।···যদি পরলোকে স্বর্গ বলে কিছু থাকে—তোর পিণ্ডি আমি হাত পেতে নোব।'

নির্জন ঘরে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে। যেন অন্ধকার নেমে আসে এমনি ক'রে একটি অতি প্রবীণ ও একটি অতি নবীন জীবনেও···

ঘরে আলো রইল কিনা, আলো জ্বলল কিনা—এদের কেউ টের পেল না, চোখ চেয়ে দেখলও না। দু'জনের মনের কথা দু'জনের চোখের জলেই প্রকাশ পেল শুধু। আর কারও কিছু বলার প্রয়োজন রইল না।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে হেমন্তই জোর ক'রে ওর মুখখানা তুলে ধরে, প্রাণপণে লঘু হবার চেষ্টা ক'রে বলে, 'অমন করিস নি পাগল, এই সময় তুই কোথায় আমাকে মনের জোর যোগাবি—মদত দেওয়া না কি যেন বলিস তোরা—না তুই-ই কেঁদে ভাসাচ্ছিস···বড্ড বুড়ো হয়েছি রে, তুই সাহায্য না করলে তো যাওয়ার আগে এত কাজ সেরে যেতে পারব না।···অনেক, অনেক কাজ যে, এতদিন ফেলে রাখাই উচিত হয় নি। এবার চটপট সেরে নিতে হবে, তুই একটু শক্ত হয়ে দাঁড়া, নইলে আমি এসব করব কী করে?'

সত্যিই অনেক কাজ। আরও কাজ বাড়ল। বাড়িয়ে দিল নিভাই।

নিভার চিঠিটা এসেছে দুপুরে। তপনবাবু তাঁর বার্তা জানিয়ে যাওয়ার খানিকটা আগে।

বুক যে এখনও অনেক শক্ত আছে, স্নায়ু যে পেশীর থেকে এখনও অনেক বলবান, আজ তা আর একবার নতুন ক'রে বুঝল হেমন্ত।

নিভার চিঠিতে বুকে যে প্রলয়ের ঝড় উঠেছিল—আবেগ-স্মৃতি-বেদনা-হতাশা—সব মিলিয়ে, সে একটা সব অনুভূতি একাকার-করা তুফান, সাইক্লোন বললেও বুঝি তাকে বোঝানো যায় না। তাও তো শান্ত হয়ে, নিথর হয়ে বসে থেকে সহ্য করল। কৈ, হার্টও তো ফেল করল না, আজকাল যাকে স্ট্রোক বলে তাও তো হল না! বহু আঘাত সহ্য করারই বুঝি ফল এটা। পাথর হয়ে গেছে বুক, অসাড় হয়ে গেছে অনুভব শক্তি।

তার পর আবার তপনবাবুর এই খবর।

আনন্দ? হ্যাঁ, আনন্দই তো হবার কথা। যা চেয়েছিল, তাই পেল, তাই হল। আনন্দ হবে বৈকি!

কিন্তু,—একটা জিনিস কখনই করে নি হেমন্ত এতখানি জীবনে, সেটা হচ্ছে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভাবের ঘরে চুরি করা, নিজেকে ঠকানো—এটা তার ধাতে সয় না। এক-আধবার করতে গিয়ে দেখেছে ওর ভেতরে অতির্জাগ্রত, অতিসচেতন যে ব্যক্তিসত্তা আছে—বা বিবেক, কী বলবে?—তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি।

তপনবাবুর এই সম্মতি জানানোতে, বিশেষ রমার বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, তার ভোলার দিকে ঈষৎ আকর্ষণের আভাস পেয়েও খুশী হবার কথা, হয়েছেও; কিন্তু তার মধ্যেই যে কোথায় একটা বেসুরও বেজেছে, কোথায় একটা আশার-পিছনকার-আশাভঙ্গ হওয়ার সামান্য একটু হতাশাবোধ, শেষ অবলম্বন হারিয়ে যাওয়ার উদ্বেগও—সেটাই বা অস্বীকার করে কী ক'রে?

বুকের মধ্যে একটা হিম হিম ভাব, সেই সঙ্গে একটু যেন—কী বলবে হেমন্ত—ঈর্ষা কি?—ঈর্ষা বললে হয়ত ঠিক বোঝানো যায় না,

অথচ আর কোন সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায় না—একটা বিরূপ অনুভূতিও কি বোধ করে নি? যখন তপনবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে যুক্তি দিয়ে লোভ দেখিয়ে প্রস্তাবটা পেড়েছিল তখন কি মনের অগোচরে তাহলে একটা ক্ষীণ আশা ছিল সেই সঙ্গে যে, তপনবাবু হয়ত রাজী না-ও হতে পারেন? আর তাহলে অন্তত—মেয়ে খোঁজার অজুহাতে আর ক'টা দিন সময় পাওয়া যাবে?···এখন আর কোন ছুতো কোন অজুহাতই রইল না—তাই কি এই একটা সর্বস্ব হারাবার ভাব বুকের মধ্যে?···এটা কি ভোলা পর হয়ে যাবারই আশঙ্কা, তাকে চিরদিনের মতো হারাবার ভয়?···সত্যিই তাহলে পর হয়ে গেল?···জীবনের এই শেষ অবলম্বন ছেড়ে তার সেই কোন্ সুদূরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে আর কোন বাধা রইল না?···

কিন্তু সে যা-ই হোক, সময় আর মোটে নেই।

সত্যিই অনেক কাজ তার, অনেক দায়িত্ব!

এ কাজের বোঝা নিভাই চাপিয়ে দিয়েছে—তার চিঠিতে।

চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দিয়েছে, সাগ্রহে। আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু তার ভাইঝি তার ভাইঝির মতোই জবাব দিয়েছে।

লিখেছে—

'এতদিন পরে তোমার চিঠি পাইয়া যেমন আনন্দও হইল, তেমনি কিছু দুশ্চিন্তাও যে না হইতেছে তা নয়। কথাটা অনেক দিন ধরিয়াই আমাদের মনে হইয়াছে, প্রায়ই আলোচনাও করি। মেজদা (সুরেনদা)-ও এই বাড়িতে আসিয়াই কথাটা বলিয়াছিলেন, "পিসীকে এখানে রাখা যায় না? তাহলে খুব ভাল হয়। কোথায় পড়ে আছে, অনাত্মীয়দের মধ্যে। বিশ্বনাথের ওপর ভরসা ক'রে ছিলুম, সে-ও তো গোরার পথই ধরল। পিসীর বয়সও বোধহয় একশো পেরিয়ে গেল, এখন আপনার লোকের কাছেই থাকা দরকার। অন্তত মরার সময় একটু জল, মরার পর আগুন দেবার জন্যেও।"

'তা তবু আমরা ভরসা করি নাই। অবস্থায় আগের সচ্ছলতা নাই,

তাহা তো তুমি জানই। কোনমতে সংসার চলিয়া যাইতেছে—এই মাত্র। বাড়িটা পুরানো আমলের, পাড়াগাঁয়ের বাড়ি, মোটা মোটা মাটির গাঁথুনি দেওয়াল। দর-দালানে ঘেরা বাড়ি। সেজন্য একটু স্যাঁৎসেঁতে ভাব, চারিদিকে বাগান থাকা সত্ত্বেও ঘরে যেন তেমন হাওয়া খেলে না। এখনও ইলেকৃট্রিক আসে নাই, তবে শুনিতেছি দুই-চারি দিনের মধ্যেই আসিবে, টাকা জমা লইয়াছে। মা গঙ্গাও এখান হইতে অনেক দূরে, মরিলে গঙ্গায় দেওয়া বোধ হয় হইবে না। তবে জ্যান্তে তো অনেক গঙ্গা-স্নান করিলে, বোধ করি হাজার বার পুরাইয়া গেল—মরার পর দেহটা, দেহের ছাইটা গঙ্গায় গেল কিনা, অত দেখার প্রয়োজন বা কি!

'এসব অসুবিধা জানিয়াও যদি আসো—আমরা মাথায় করিয়া রাখিব। যতদিন আমরা দুই বুড়াবুড়ি আছি, যত্নের অভাব হইবে না। কবে নাগাদ আসিতে পারো জানিলে তোমার জামাই গিয়া লইয়া আসিবে। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার বলিয়া রাখিতেছি—খরচপত্র দিবার চেষ্টা করিও না, তোমার কাছ হইতে এক পয়সাও লইতে পারিব না। যদি আত্মীয়ের মতো, গুরুজনের মতো আসিয়া থাকিতে চাও তো এসো—আবারও বলিতেছি, মাথায় করিয়া রাখিব, সাধ্যমতো নগেন বাঁড়ুয্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করিব।

'একটা কথা বলি, কিছু মনে করিও না। টাকার অহঙ্কার বড় বেশী তোমার। তুমি সর্বাগ্রে টাকা দিয়া মানুষকে কিনিয়া নিতে, তাহাকে বিনত করিতে চেষ্টা করো—সেই জন্যই জীবনে বার বার ঘা খাও। আমি বলি কি, ও পাপ চুকাইয়া দিয়া চলিয়া এসো। টাকার চিন্তা থাকিলে মরিয়াও সুখ হইবে না। টাকার জন্য যাহারা আত্মীয়তা করিবে তাহারা কেহ আত্মীয় নয়। অনেক দিন তো হইল, আর কতকাল ও বোঝা টানিবে? যাহাকে হোক দিয়া দায়মুক্ত হইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এসো। ঐ বোঝা নামিয়া গেলে অনেক শান্তিও পাইবে।

'অনেক কিছু হাবড়হাটি বকিয়া গেলাম। নিজগুণে ক্ষমা করিও। আমাদের সকলের প্রণাম লইও। ইতি—

সেবিকা নিভা।'

বুকের মধ্যে যে ঝড় ওঠে তা যত বড় ঝড়ই উঠুক, ভেতরে উঠে ভেতরেই মিলিয়ে যায়। শক্ত হতেই হবে, এতকাল এত ঝড়-ঝাপ্টা কাটিয়ে এসে আজ আবেগের কাছে হার মানবে না—এটা ঠিক। গোটা নাটকটা পেরিয়ে এসে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে খুঁৎ রাখা চলবে না। দর্শকদের বাহবার মধ্যে বিদায় নেওয়া চাই।

অবশ্য অন্যদিক থেকে জোরও পেয়েছে খানিকটা।

নিভার চিঠিটা তার গুরুমন্ত্রের কাজ করেছে। মুক্তির, মোক্ষের সন্ধান দিয়েছে। আশ্চর্য, একথাটা এতদিন কেউ বলে নি কেন?

সত্যিই তো এই টাকাটা, এই বিষয়টাই পায়ে বেড়ির মতো, পেছনে বাঁধা পাথরের মতো তাকে বেঁধে রেখেছিল। এই টাকার অহঙ্কার, টাকার শক্তি সম্বন্ধে একটা অতি উচ্চ অপ্রাকৃত ধারণা তার জীবনে বহু অশান্তি এনেছে, তাকে বেঁধে মেরেছে। অথচ এ টাকায় সে কাউকেই আপন করতে পারে নি। যে কিছুটা আপন হয়েছিল—সে সুরেন তার এক কপর্দকও আশা করে নি, নেয় নি। ভোলা যে আপন হয়েছে, তার পিছনে একটু স্নেহ একটু উৎসাহ ছাড়া সে প্রায় কিছুই খরচ করে নি।

শুনেছে আগে নাকি চন্দননগরে—ফরাসীদের রাজত্ব ছিল, তখন কেউ মাতলামি বা অন্য কোন ঐ ধরনের অপরাধ করলে 'তুড়ুম ঠুকত'। একটা তেকোণা কাঠের বেড়িমতো ফ্রেম গলায় পরিয়ে হাতটা ওপরে বেঁধে দিয়ে ঐ কাঠের ফ্রেমের তিনটে কোণ থেকে তিনটে পাথর বা লোহা ঝুলিয়ে তাকে রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হত, প্রতি পদে ঐ পাথরগুলো এসে হাঁটুতে লাগত, অথচ বেচারীরা থামতেও পারত না, চলতেই হত। যত আস্তে যত সাবধানেই চলুক না কেন—ঐ আঘাত থেকে অব্যাহতি ছিল না। তা ওরও

এই সম্পত্তি চিরদিন পদে পদে তাকে আঘাতই দিয়ে যাচ্ছে—রেহাই পায় নি একটি মুহূর্তও।

এতদিনে ভুল ভেঙেছে—আর দেরি করবে না সে।

এবার সে ছুটি নেবে। নিঃস্ব, রিক্ত হবার পরম শান্তি উপভোগ করতে চায় সে। তার জীবনে এ হবে এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

শুরু করল এক অদ্ভুত ব্যাপার দিয়ে। ভোলার সঙ্গে কথা হওয়ার পরের দিনই সে পাড়ার পণ্ডিতমশাই জ্যোতি কাব্যতীর্থকে ডেকে পাঠাল। কোন মেয়ে-ইস্কুলে পণ্ডিতি করেন ভদ্রলোক, অবসর সময়ে কিছু কিছু যজমানিও করেন, তবে সে খুব সীমাবদ্ধ ক'টি ঘরে। তাঁকে দিয়ে দু'-একটা কাজ করিয়েছে হেমন্ত, অক্ষয়-তৃতীয়ার কলসী-উৎসর্গের ব্রত ইত্যাদিতেও তাঁকেই ডেকেছে। বিশুর পৈতেও দিয়েছেন তিনি।

তাঁকে ডেকে ভোলার বিবাহের একটা দিন দেখতে বলল, খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে চায় সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শমন শিয়রে তার—শিয়রে বলা বোধ হয় ভুল—পায়ে ধরেছে তার, চলৎশক্তিরহিত ক'রে দিয়েছে প্রায়। সময় আর মোটে নেই। এখন ওর যা জ্ঞাতব্য—পণ্ডিতমশাই এ-বিয়ে দেবেন কি ?

পণ্ডিতমশাই লোভ ও সংস্কার দুইয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দোল খেয়ে বললেন, 'না-ই বা দিলুম মা ! আমি বরং অন্য ভাল লোক দেখে দিই—?'

'দিলেনই বা !' হেমন্তর শানিত কণ্ঠ যেন ওঁর গলায় কেটে কেটে বসে, 'আপনি যত বিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিতমশাই, সকলেরই কি ঠিকুজি-কুলুজী উল্‌টে দেখতে গিছলেন—তারা সবাই বৈধ সন্তান কিনা ? না তাদের সকলের বাপ-মার বিয়েতে আপনি উপস্থিত ছিলেন ?...পণ্ডিতমশাই, দিন-কাল বড় আজব পড়েছে—আপনিও মেয়ে ছেলে নাতি-নাতনী নিয়ে ঘর করেন, আপনার নাতি বা নাতনী যে নিজের জাতেই বিয়ে করবে তা আপনি জোর ক'রে

বলতে পারেন ? আপনার পাশের বাড়িতেই তো শুনেছি সেদিন বস্তির ছেলের সঙ্গে শুঁড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে !'

পণ্ডিতমশাই ভাঙেন তবু মচকান না, কাষ্ঠহাসি হেসে বলেন, 'না, সে কোন কাজের কথা নয়। তবে আপনি বলছেন যখন— তখন দোব।'

'তাহলে দিন দেখুন একটা। আর একটা কথা, খুব গরিবের মেয়ে, পয়সার জন্যে বিয়ে হচ্ছে না, এমন আপনার সন্ধানে আছে ? যথার্থ দুঃস্থ ? মানে টাকা দিলে বিয়ে হয় এমন ? তাহলে—যদি এর মধ্যে মানে এই মাসখানেকের মধ্যে বিয়ে ঠিক করতে পারে— খরচা যা লাগে আমি সব দোব !'

কথাটা নিচের তলার ভাড়াটে মহলে, আশপাশেও বলে দেয় সবাইকে।

অনেকেই হাঁক-পাঁক করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটির বেশি পাকা সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। এমন আবুহোসেনী খেয়ালের জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না, যারা অতি দরিদ্র, তারা কেউ মেয়ের পাত্র খোঁজও করে না, দৈবের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। যে তিনটি পাওয়া গেল—তিনজনেরই পাত্রী ও পাত্রপক্ষকে ডাকিয়ে দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ ক'রে পুরো খরচা দিয়ে দিল, মায় সম্ভাব্য তত্ত্ব-তাবাশের খরচা সুদ্ধ।

যত তাড়াই করুক, দেড়মাস সময় লেগে যায় সব গুছিয়ে নিতে। অনেক কাজ সারতে হয়েছে এর মধ্যে।

রমার মাকে ও ভোলাদের—বাড়ি দু'খানা লেখাপড়া ক'রে দিয়েছে। ওদের বিয়ের সব কাজ উৎসব সারা হয়ে গেছে। একদিন চয়ারে ক'রে তেতলায় উঠে ওদের সংসারে কাটিয়েও এসেছে, মাকে দিয়ে রাঁধিয়ে সেখানে বসে খেয়েছেও সেদিন। ওদের সংসার গুছিয়ে দিতেও কম সময় লাগে নি। আগেকার দিন হলে নিজেই রিক্শা ক'রে সমস্ত শহর চষে ফেলত, এখন ফি-হাত ভোলার শরণাপন্ন হতে হয়। এবিষয়ে স্বভাবতই ভোলার একটা কুণ্ঠা আছে, সেজন্যে

লোক ডাকিয়ে এনে বাড়িতে বসে ফরমাশ দিতে হয়। মনের মতো বেছে দেখে নিতে পারে না বলে ছটফট করে, সময়ও লাগে।

খাট-বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল, বসার চেয়ার, সোফা, বাসন, মীটসেফ—তা ছাড়া গহনা। খুব আতিশয্য করে নি—ঐশ্বর্যের শেকল আর কাকেও পরাবে না, জড়োয়া গহনা একখানিও দেয় নি—তবু গা-সাজানো সবরকম—সেও তো কম নয়।

ভোলা বলেছিল, 'বাসন-কোসন তো তোমারই একগাদা রয়েছে। এত ছিষ্টি খরচ করছ কেন—মিছিমিছি ?'

তাতে হেমন্ত জবাব দিয়েছে, 'এই তো প্রথম খরচ ক'রে সুখ হচ্ছে রে। তাছাড়া—সবই পড়ে থাকবে, আমি চলে গেলে যদি কিছু রাখতে চাস রাখিস। তবে আমি বলি কি, আমার কোন জিনিস নিয়ে দরকার নেই। অবশ্য স্মৃতি হিসেবে যদি রাখতে ইচ্ছে হয়—যা খুশি রাখিস, সব রাখলেও ক্ষতি নেই। তোর যা ইচ্ছে হয় করিস।'

মুনিয়ার নামে দু'হাজার টাকা পোস্ট-অফিসে জমা ক'রে দিয়েছে। বলে দিয়েছে, 'এটা তোর অসুখ-বিসুখের জন্যে রইল—যদি এতেও না কুলোয়, ছেলে তো রইলই, ছেলে দেখবে। তবে মনে হয় এতেই তোর চলে যাবে।'

আরও একটা ব্যবস্থা সে ক'রে দিয়েছে মুনিয়ার, বৃন্দাবনে একটি মঠে হাজার-তিনেক টাকা দিয়ে লেখাপড়া করিয়ে নিয়েছে—যতদিন মুনিয়া বাঁচবে তাঁরা একটা ঘর দিয়ে রাখবেন এবং দু'বেলা প্রসাদ দেবেন। সব ব্যবস্থা ক'রে মঠের লোকের সঙ্গে মুনিয়ার মোকাবেলা করিয়ে মুনিয়াকে বলে দিল, 'তাই বলে তোকে জোর ক'রে পাঠাচ্ছি না—যখন খুশি, যতদিন খুশি এসে ছেলের কাছে থাকিস, তবে তুই বৃন্দাবনে থাকতে চেয়েছিলি—সেই জন্যেই পাকা বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম। আর কি জানিস, বেটা-বৌয়ের সংসারে চিরদিন না থাকাই ভাল। ওতে বড় অশান্তি হয়। মাঝে মাঝে আসবি, আদর খেয়ে চলে যাবি সেই ভাল।'

আরও কিছু কিছু খুচরো খয়রাতের কথাও মনে ছিল তার। এই দু'বাড়ির নিচের তলার যত দরিদ্র ভাড়াটের দল, আশপাশের কিছু-কিছু হতভাগ্য গৃহস্থ ; বাকী যা কিছু থাকবে—উকীলের প্রাপ্য এবং আইনের খরচা বাদে—শহরের ক'টি হাসপাতালে সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে। অযোধ্যার এক হাসপাতাল এসে ধরেছিল এই দান-ছত্রের খবর পেয়ে—তাদেরও কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করল—তারা তারক আর কমলাক্ষর নামে দু'টি ব্লক ক'রে দেবে সেখানে।

তবে এসব হিসেব-নিকেশ লেখা-পড়ায় কিছু সময় লাগবে। অতদিন থাকবে না সে। প্রতি রাত্রেই বৌকে সেখানে ফেলে ভোলা এ-বাড়ি এসে শোয়—কারও কোন কথাই শোনে না। এতে আনন্দও যতখানি, দায়িত্বও সেই পরিমাণে বেশী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটি দেওয়া ও নেওয়া দরকার। বিয়ের চার-পাঁচটা আর অষ্টমঙ্গলার দিন ভোলা থাকতে পারে নি, হেমন্তই দেয় নি থাকতে—ও নিজেই বলে 'মড়া আগলে বসে থাকা'—কিন্তু সেই ক'টা দিনেই যে অসহায় ভাব বোধ করেছে সে, মনের গোপন প্রকোষ্ঠে ক্ষতি-বোধের বেদনা ও অকারণ সূক্ষ্ম একটা অভিমান—তার পর আর নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। দ্রুত সরে যেতে হবে তাকে, যত দ্রুত হয়। সই-সাবুদ সব ক'রে দিয়েছে, এখন যেটুকু কাজ বাকী আছে—উকীল করবে। ঠিক ঠিক করে কিনা দেখবার ভার রইল ভোলার ওপর। একটা আম-মোক্তার-নামাও ক'রে দিয়েছে ভোলার নামে—যদি কোন দরকার পড়ে শেষ মুহূর্তে। আর, সব ফেলে মুক্ত হয়েই যখন যাচ্ছে—তখন পেছনে কী হল তা দেখার অত মাথা-ব্যথাও নেই।

এবার যাত্রার পালা।

ভোলাকে বলে, 'অতুলকে তো সব বলাই আছে। একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে এবার, যত তাড়াতাড়ি পারে যেন এসে নিয়ে যায়।'

'দাঁড়াও, ভট্টাচার্যিমশাইকে পাঁজি দেখতে বলি—দিন দেখি!'

'দূর বোকা! আমি যাব তার আবার দিনক্ষণ কি। মরতেই তো যাচ্ছি। মরার বাড়া তো গাল নেই।'

'মরার বাড়াও গাল আছে বৈকি। একটা য়্যাক্সিডেন্ট হয়ে যদি হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকো—কী প্যারালিসিস হয়—তখন?...না না, অদিনে অক্ষণে যাওয়া হবে না।'

'ঐ ক'রে তুমি যাওয়াটা পিছিয়ে দিতে চাইছ, না? সে ওষুধও আমার আছে। পাঁজী দেখতে ভটচার্যিকে ডাকতে হবে না। দিন আমিই দেখে নিচ্ছি। আমি জানি—'

'কিন্তু অতুলবাবুকেই বা আসতে লিখছ কেন? বুড়োমানুষ আবার এত দূর—?'

'সে-ই তো নিয়ে যাবে রে!'

'সে কিসের জন্যে নিয়ে যাবে! আমিই যখন যাচ্ছি, তখন আর তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?'

'তুই কোথায় যাবি?' হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'না না, দরকার নেই। সে-ই আসবে বলেছে—মিছিমিছি—'

'উ-সব বাত ছোড় দেও মাজী।...সো নেহি হোগা। আমি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব—এক বাত। নইলে যাওয়া হবে না।' ভোলাও দৃঢ়স্বরে বলে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে হেমন্ত। অতুলকে আসতে বলা মানে তার খানিকটা খরচান্তও বটে। এ গাড়িভাড়াও সে নেবে না। নিভাকে লিখেছিল যে, 'কিছুই কি নিয়ে যাব না? শ্রাদ্ধের খরচটা অন্তত রাখ?' তাতে সে উত্তর দিয়েছে, 'শ্রাদ্ধ আমরা যেমন পারি তেমনিই করব—তার জন্যে তোমার টাকা লাগবে না। ক'টা তোমার উপযুক্ত বেটা আছে শুনি যে, দানসাগর কি বৃষোৎসর্গ করতে হবে? যতটুকু যা হওয়া দরকার—আশা করছি সেটুকু করতে পারব।' সুতরাং অতুলের গাড়িভাড়া যে সে নেবে না, এও জানা কথা।

সে বলল, 'বেশ, তুই-ই চ সঙ্গে। তবে একটা কথা—তুই হাওড়া থেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়ে চলে আসিস। এটা আমার হুকুম।...

সেখানে—সেখানে কেমন ঘর-বাড়ি, কী অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ব— সে তোর না দেখাই ভাল। মিছিমিছি হয়ত দুঃখ পাবি। আর সেখানে যদি তেমন ভাল না লাগে, তুই চলে আসার সময় আমারও কষ্ট হবে, ছাড়তে ইচ্ছে করবে না।…কী লাভই বা? সে অবধি না-ই গেলি!'

ভোলা যেন হঠাৎ বড় বেশী নির্বাক হয়ে যায়। প্রাণপণে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকে শুধু বলে, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

তা বলে সে যে ঠিক এমন কাণ্ড করবে, তা কে জানত!

ট্রেন থেকে নামতে অতুল নিভা, নিভার দুই ছেলে যখন এসে প্রণাম করছে, কুশল-প্রশ্ন ইত্যাদিতে কয়েক মিনিট ব্যস্ত থাকবে হেমন্ত—এ-তো স্বাভাবিকই, তার পরই এদের সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আর ভোলাকে দেখতে পেল না। মালও নামানো হয় নি গাড়ি থেকে—ভোলা কোথায় গেল? প্রথমটা ভেবেছিল বাথরুমে গেছে হয়ত, কি এদিক-ওদিকে কী কাজে গেছে, কিন্তু বেশ খানিকটা অপেক্ষা ক'রেও তার দেখা পাওয়া গেল না, প্ল্যাটফর্ম ক্রমশঃ জনবিরল হয়ে এল।

এরা সকলেই বিস্মিত, উদ্বিগ্নও।

নিভার ছোট ছেলে বলল, 'কী রকম দেখতে—মানে মোটামুটি—বলুন না। তাহলে খুঁজে দেখি।'

হেমন্ত তখন একটা বাক্সর ওপর বসে পড়েছে।

অকস্মাৎ আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে পা-দু'টো। বুকটাও বড় খালি-খালি, কেমন যেন কাঁপছে—

সে চোখ বুজেই অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'না ভাই। তাকে আর খুঁজে লাভ নেই। চলো আমরা চলে যাই—'

নিভা একটু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

হেমন্ত বিশ্বাসঘাতক চোখদু'টোকে সামলাতে না পেরেই বোধহয় চোখের পাতা বুজে বসে ছিল প্রাণপণে, এখন হাসির একটা চেষ্টা

ক'রে আস্তে আস্তে এক রকমের বিকৃতকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'ওকে বলেছিলুম হাওড়া থেকেই তুই ফিরে আসিস, ওদের জিম্মে ক'রে দিয়ে—ওদের বাড়ি পর্যন্ত তোকে নিয়ে যাব না—একটু জোর ক'রেই বলেছিলুম—সেই জন্যেই, সেই অভিমানেই বোধহয় সরে পড়েছে।'

তারপর আরও আস্তে, কতকটা যেন আপন মনেই বললে, 'কিম্বা, কিম্বা বলে-কয়ে যেতে পারবে না বলেই—। তোদের সামনে অতবড় ছেলেটা চোখের জল ফেলে ব্যাভ্রম হতে চায় না—। কিম্বা আমাকেই কষ্ট দিতে চায় নি।...তা ভালই তো। ভালই করেছে। এ-ই ভাল হল।'

তারপর—ঈষৎ উৎসুক, কেমন যেন ছেলেমানুষের মতোই নিভাকে বলে, 'সেই ঠিকানাটা তোকে লিখে পাঠিয়েছিলুম, রেখে দিয়েছিস তো, যত্ন ক'রে? আমি ম'লে ওকে অতি অবশ্য খবরটা দিস। আমি কাশীতে বসে কথা দিয়ে এসেছি—বাক্যদত্ত।'

বলে নিজেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে অভ্যাসমতোই হাতটা বাড়ায়—এসব ক্ষেত্রে ভোলাই প্রয়োজন বুঝে চট ক'রে এসে ধরে তোলে, তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে দীর্ঘকাল—এখন সে অবলম্বন না পেয়ে বসে পড়ে আবার।

আবারও আপন মনেই যেন চুপি চুপি বলে, 'বেশ করেছে। ভালই করেছে। এই তো ভাল, এই ভাল হল।'

—শেষ-